ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা

ও

যোগেশচন্দ্র বাগল

(যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারক গ্রন্থ)

সম্পাদনা

মোহনলাল মিত্র

কানাইলাল দত্ত

যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি রক্ষা কমিটি

নব ব্যারাকপুর। ২৪ পরগণা

Unabingsa Sataker Banglar Katha o Jogeshchandra Bagal. (A collection of Essays). Edited by Mohanlal Mitra and Kanailal Datta, Jogeshchandra Bagal Smriti Raksha Committee, New Barrackpore, 24 Parganas. Published in

Published by arrangement with Bengal Book Society, New Barrackpore, 24 Parganas.

পরিবেশক

আলফা পাবলিশিং কনসার্ন

১২, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৯

মুদ্রণ :

শ্রীকান্ত প্রেস। কলিকাতা ৯। শ্রীরাধারমণ বসাক কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরে তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যধন্য কিছু মানুষ নব বারাকপুরস্থ গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল বি. টি. কলেজে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। ঐ সভাতেই একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়।

যোগেশচন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে নব বারাকপুর উদ্বাস্তু পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। নব বারাকপুরে আসবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তথাপি এই উপনগরীর শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র বস্তুত জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় এবং অনুপ্রেরণায় সাহিত্য অনুরাগী ও সাহিত্যসেবীদের সংস্থা 'সাহিত্যিকা' নববারাকপুরে গড়ে ওঠে (১৯৬২)।

স্বাভাবিকভাবে এই সব ক্ষেত্রের কর্মীগণ যোগেশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। তাঁরা অবশ্য আশা করেছিলেন যে, কালক্রমে বৃহত্তর বঙ্গসমাজের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও সাহায্য পাওয়া যাবে। সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি। এই নিবেদনে সে সব কথা সবিস্তার বলার অবকাশ নেই। তবুও প্রসঙ্গান্তর হলেও একটি সাধু প্রচেষ্টার কথা এখানে বলতে চাই।

নব বারাকপুরের একটি প্রথম শ্রেণীর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নাম করা হয়েছে 'যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়'। নব বারাকপুর সমবায় শহরের পত্তনের দিন (১৪ এপ্রিল, ১৯৫০) থেকেই সেখানকার সর্ববিধ গঠন কর্মের অগ্রনায়ক শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের তৎপরতায় বিদ্যালয়ের নামকরণটি নীরবে সম্পাদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নব বারাকপুরের জনসাধারণ সর্বান্তঃকরণে এই কাজটি অনুমোদন করেছেন।

অতঃপর স্মৃতিরক্ষা কমিটি একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন। যোগেশচন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারাবার পরও বিদ্যাচর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তখন অপরের সাহায্যে যোগেশচন্দ্রকে লেখাপড়ার কাজ করতে হতো।

এই সময় আমরা উভয়েই তাঁকে বই পড়ে শুনিয়েছি, তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছি, বক্তব্য লিখে নিয়েছি এবং নানা স্থানে সঙ্গী হয়েছি। স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্যবর্গের নিকট ব্যাপারটি সুপরিজ্ঞাত। তাই স্বভাবত যোগেশচন্দ্রকে সেবার পুরস্কার স্বরূপ গ্রন্থখানি সম্পাদনের ভার তাঁরা আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, যদিও এ কাজের জন্য যোগ্যতর লোকের অভাব ছিল না।

স্মৃতিরক্ষা কমিটি যে ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকুন না কেন, পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর একখানি তথ্যগ্রন্থে পরিণত করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নি। পরিকল্পনার একটি কাঠামো তৈরি করে আমরা প্রতিনিধি-স্থানীয় সুধীবর্গের অনেকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পেশ করি। প্রায় সকলের নিকট থেকেই কিছু-না-কিছু সুপরামর্শ পেয়েছি। এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য।

বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে যোগেশচন্দ্র আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু মুখ্যত তিনি বাঙলার (উনিশ শতকের) নব জাগরণের ইতিহাসকার। এই স্বর্ণযুগের কাহিনী আজ স্বপ্নের মতই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সর্বক্ষেত্রে এখন বঙ্গ সন্তান যেন করুণার পাত্র হয়ে উঠেছেন। জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কি না তা নিয়েও তো এক সময় সংশয় দেখা দিয়েছিল। পূর্ব বাংলায় যদি বাঙালীর জাতীয়তাবাদী শক্তি জয়ী না হতো, স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো, তা হলে বাঙালীর অবস্থা বহুলাংশে ইহুদীদের মতই হতে পারত। এক সময় তো ঠাট্টা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলাই হতো—বাংলা দেশটাকে (পশ্চিম বাংলা) রেখে কোন লাভ নেই, ওটাকে বিহার, ওড়িশা ও আসামের মধ্যে বাটোয়ারা করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়!

দেড় দু'শ বছর মাত্র পূর্বে বাঙ্গালী অসাধ্য সাধন করেছে। মহাত্মা রামমোহন থেকে সদ্য পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত শত শত বিস্ময়কর বাঙালী প্রতিভার দীর্ঘ মিছিল আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই যোগেশচন্দ্রের রচনার মুকুরে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাকার সহস্র ধারায় বাঙালীর

কর্মকৃতি সে-যুগে ভারত-হিতসাধনে ব্রতী হয়েছিল। সেই বৃহৎ ও ব্যাপক কর্ম প্রয়াসের পশ্চাতে যে অনন্যসাধারণ চিন্তা-বিপ্লব ছিল তা ধার করা কোন 'ইজম' নয়। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার কোন স্থান সেখানে ছিল না। এই জন্যই, বোধহয়, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজের প্রভাব সত্ত্বেও প্রতিভাধর বাঙ্গালী প্রধানেরা সকলেই খাঁটি স্বদেশী মানুষ ছিলেন; গান্ধীজি যাঁকে বলেছেন ষোল আনা স্বদেশী ঠিক তাই। সেই কথাটাই আমাদের এই পুস্তকে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামরূপ সমুদ্র মন্থন থেকে যে হলাহল উঠেছিল তার প্রায় সবটাই পড়েছে বাঙালীর ভাগ্যে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকলের অদৃষ্টেই এটা ঘটেছে। বাংলার উভয় খণ্ডে এখনো সহস্র সহস্র মানুষ সর্বহারা, চাকরিসর্বস্ব। বঞ্চনার ব্যথা থেকে পূর্বখণ্ডে বাংলা দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। পশ্চিম খণ্ডে কর্মকে অস্বীকার করে শ্রমবিমুখীন সহজিয়া সাধনার পালা চলছে বলেই মনে হয়।

উনিশ শতকের বাঙালী অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে কঠোর ও কঠিন শ্রমের দ্বারাই এ দেশে সোনা ফলিয়েছিলেন। সেই অনবদ্য ইতিহাস চারণের ন্যায় যোগেশচন্দ্র আমাদের শুনিয়ে গেছেন। পরাজিত বিপর্যস্ত রাজপুতেরা অতীতের গৌরব গাথা স্মরণ করে একটি অন্ধকার যুগে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন পণ করে উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছিল। রাজপুত জীবনে ঐ যুগটাই এখন সর্বাধিক গৌরবের। দুর্যোগের অন্ধকার কোন জাতির পক্ষে কলঙ্ক তিলক না হয়ে গৌরবের রাজটীকা হয়ে দেখা দিতে পারে, যদি সে জাতি তার অতীত গৌরব ফিরে পেতে যত্নশীল হয়। তাই আমরা মনে করি বাঙালী জীবনে আজ উনিশ শতকের নব জাগরণের কাহিনীর মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়া দরকার। যোগেশচন্দ্র-ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনা পাঠ ও আলোচনা এবং পর্যালোচনা এই কাজের সহায়ক হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু বিন্যাসে যত্ন নিয়েছি।

মোটামুটি চারটি ভাগে রচনাগুলি ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিভাগগুলি সুনির্দিষ্ট। প্রথম ভাগে আছে যোগেশচন্দ্রের জীবন-সাধনা অর্থাৎ তাঁর রচনা সম্পর্কে আলোচনা। দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছে যোগেশচন্দ্রের জীবন কথা, অর্থাৎ জীবনীমূলক রচনা এবং প্রসঙ্গ কথা বা স্মৃতিচারণ। উনবিংশ শতাব্দীর

বাংলার কথা হলো তৃতীয় বিভাগ। পণ্ডিতসমাজ উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালীকে বুঝাবার জন্য তখনকার মুখ্য মুখ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। বিবিধ পুস্তকাবলী সহজেই পাওয়া যায় বলেই মুখ্যত পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখকের মতামত পরিবেশন করেছি। তাই কোন কোন রচনার মধ্যে মতভেদ ও অন্য কিছু কিছু পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে। এই স্বাধীন চিন্তাকে মর্যাদা দেওয়াই সমীচীন।

শেষ বিভাগটি যোগেশচন্দ্রের রচনাপঞ্জী। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত লেখার পঞ্জী রচনা খুবই আয়াসসাধ্য কাজ। এ ব্যাপারে প্রথম প্রয়াসেই সম্পূর্ণতা দাবী করা সমীচীন নয় তা আমরা জানি। তবু এই পুস্তকে পরিবেশিত পঞ্জী ত্রুটিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ বলেই আমাদের ধারণা। যোগেশচন্দ্রের জীবনকালে শ্রীপুলিন সেনের অনুরোধে যোগেশচন্দ্রের গবেষণা প্রবন্ধাবলীর একটি পঞ্জী আমরা প্রস্তুত করে দেই। জিজ্ঞাসা পরিবেশিত যোগেশচন্দ্রের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' পুস্তকের পরিশিষ্টে পুলিন বাবু এটি মুদ্রিত করেন। তাতেই কাজটি বহুলাংশে সহজসাধ্য হয়েছে।

সব ব্যাপারেরই একটি অপরিহার্য বৈষয়িক দিক থাকে। অতএব সে সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে আমাদের দোষ-ত্রুটির পরিধি বেড়ে যাবে। তাই এবার কিছু বৈষয়িক বিষয়ের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি।

বইয়ের ব্যাপারে লেখকের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। এই পুস্তকের লেখকবর্গ যোগেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতির বশেই যে লিখেছেন এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবু প্রায় প্রত্যেককে আমরা নানা ফরমায়েস দ্বারা যথেষ্ট বিরক্ত করেছি। যোগেশচন্দ্র প্রীতির সেতুবন্ধন থাকায় তাঁরা আমাদের সহজেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। চলতি ধারায় ভূমিকায় দু'টি কৃতজ্ঞতার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে দিলে সম্পাদকীয় কর্তব্য পালিত হয়। এ ক্ষেত্রে সে কাজ করলে আমাদের প্রত্যবায় ঘটবে। কেনন', দিনের পর দিন লেখার জন্য যাতায়াত এবং কি লেখা হবে তার আলোচনা করার ফলে সকলেই প্রায় আমাদের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে উঠেছেন। তাই কৃতজ্ঞতা বা ঋণ স্বীকার নয়, বয়স ও সম্বন্ধ অনুসারে শ্রদ্ধাযুক্ত প্রণাম ও প্রীতি জ্ঞাপন করি প্রত্যেককে।

অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের সমস্ত হিসাব ভুল প্রমাণিত হয়েছে; কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ হয় নি। এই শোচনীয় অবস্থায় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থটি ছাপার একটা সুযোগ করে দেন। শ্রীকান্ত প্রেস শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে ছেপেছেন। তাদের সহযোগিতা অতুলনীয়। চিত্তের সঙ্গে বিত্তার এবং বিনয়ের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই প্রেসের অন্যতম কর্ণধার শ্রীহারাধন বসাক ও শ্রীরাধারমণ বসাকের মধ্যে। এখন তো চারিদিকে দুর্যোগ। বিজলি নেই, ছাপাখানা বন্ধ। কাগজের দাম তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। চার হাজার টাকার বাজেট নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। কাগজ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি ও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য ৮॥ হাজার টাকারও বেশী ব্যয় পড়েছে।

যোগেশচন্দ্র তাঁর রচনাসমষ্টির মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার অন্য প্রচেষ্টা তাই বহুলাংশে অর্থহীন। তবু আমাদের এই প্রচেষ্টা সুধীজনের সহায়তা পেলে আমরা কৃতার্থ হব, আমাদের যোগেশচন্দ্র-সেবা সার্থক হবে।

নব বারাকপুর | ২৪ পরগণা
নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
১৩৭১ বঙ্গাব্দ

মোহনলাল মিত্র
কানাইলাল দত্ত
সম্পাদকদ্বয়

সূচীপত্র

জীবন সাধনা পৃষ্ঠা

জীবনকথা ও প্রসঙ্গ

ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা

রচনাপঞ্জী

তোমার লেখনী মুখে ইতিহাস কথা হয়ে ওঠে,
সে·কথার স্বপ্নখানি বাস্তবের ফুল হয়ে ফোটে
—কালীপদ চক্রবর্তী

জগত্তারিণী পুরস্কার প্রাপ্তির পর নব বারাকপুর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে যোগেশচন্দ্রের সম্বর্ধনা।
বাম দিক হইতে—শ্রীহরিপদ বিশ্বাস, সভাপতি, নব বারাকপুর স. হোমস্; শ্রীকার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
(ডি. ডি. পি. আই); যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এস. ডি. ও.) বারাকপুর,

যোগেশচন্দ্রের জীবন-সাধনা

যোগেশচন্দ্র বাগলের
শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদান

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

যোগেশচন্দ্র বাগল বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৈনিক সংবাদ পত্রে ও মাসিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী সংখ্যায় এত অধিক যে তার তালিকা প্রস্তুত ও সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট কষ্ট-সাধ্য। সম্প্রতি 'ইতিহাস' নামক সাময়িক পত্রে শ্রীগৌতম নিয়োগী তাঁহার রচনাবলীর বিবরণ দিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার তালিকার মধ্যেও হয়ত কিছু বাদ গিয়াছে কিন্তু এই তালিকাটি পাঠ করিলেই যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যিক অবদানের যে ধারণা হয় তাহা বিস্ময়কর এবং একজন লোকের জীবনব্যাপী সাহিত্যিক সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। সুতরাং ইহা বলাই বাহুল্য যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যিক অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং আমি তাঁহার ঐতিহাসিক রচনার সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিব।

আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্য যুগের হিন্দুগণের ঔদাসীন্য ছিল তাহা সকলেই জানেন। বিগত এক শত বৎসরে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং ফলে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিত ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের—অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত—ইতিহাস সম্বন্ধে যে পরিমাণ পঠন-পাঠন ও গবেষণা হইয়াছে—সে তুলনায় উনিশ শতকের

বাংলা—তথা ভারতের—ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা খুব কমই হইয়াছে। বঙ্গদেশে এইরূপ হওয়ার প্রধান কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের বিবরণ ছাড়া বঙ্গদেশের—তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্য কোন প্রসঙ্গ প্রবেশিকা হইতে এম্, এ পরীক্ষার কোনটিরই বিষয়বস্তু ছিল না। এ সম্বন্ধে কেহ কোন গবেষণা করে নাই—গ্রন্থ রচনা তো দূরের কথা।

বিংশ শতকে আমাদের ইতিহাস-জ্ঞানের এই অভাব দূর করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যে তিন জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহাদের অন্যতম—আর দুইজন ৺ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় ঘোষ। এই দুইজন উনিশ শতকের সংবাদ পত্র হইতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান উপাদান বলিয়া চিরদিন সমাদৃত হইবে। এই সমুদয় উপাদান অবলম্বন করিয়া ইঁহারা দুইজনেই গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা উনিশ শতকে বঙ্গদেশের ইতিহাসের নানা বিভাগে আলোকপাত করিয়াছেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল শুধু উপাদান সংগ্রহ কার্যে ব্রতী হন নাই, তিনি যে সমুদয় মূল্যবান নূতন উপাদানের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নব জাগ-রণের নানা বিভাগে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমুদয় তথ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত,—বঙ্গদেশের যে সমুদয় মনস্বী এই নবজাগরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন চরিত ও অবদান সম্বন্ধে আলোচনা। "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা" (১৯৪১, ১৯৬৩) ও "ভারতের মুক্তি সন্ধানী" (১৯৪৭, ১৯৫৮) এই দুইখানি গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র ২৫।২৬ জন এই শ্রেণীর মনস্বীর সম্বন্ধে তথ্য পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় এগারো জন মনস্বীর জীবনী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে-সব প্রতিষ্ঠান এই নব জাগরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল "বাংলার নব্য সংস্কৃতি" গ্রন্থে (১৯৫৮) প্রায় ২০টি এরূপ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন।

"কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র" গ্রন্থে যে সমুদয় শিক্ষা-কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে তাহাদের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি—যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি সুপরিচিত হইলেও ইহাদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল এবং এখনও আছে।

তৃতীয়তঃ, যে "হিন্দুমেলা" ভারতের নব জাতীয়তা গঠনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, অথচ যাহার কথা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে তাহার বিবরণ।

চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশের নব জাগরণে নারীর অবদান এবং তাহার মূল স্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে 'বেথুন সোসাইটি' (১৯৬১) "বাংলার স্ত্রীশিক্ষা" (১৯৫০), "জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী" (১৯৫৪)-এই তিনখানি গ্রন্থে তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের বিভিন্ন দিকের এরূপ বিস্তৃত আলোচনা যোগেশচন্দ্রের পূর্বে বা পরে আর কেহ করেন নাই। এই সমুদয় উপাদানের সাহায্যে তিনি তিনখানি গ্রন্থে এই নব জাগরণের একটি সামগ্রিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার প্রথম গ্রন্থ "মুক্তির সন্ধানে ভারত" (১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৬০), দ্বিতীয় গ্রন্থ "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা" (১৯৪১, ১৯৬৩), তৃতীয় গ্রন্থ "বাংলার নব জাগরণের কথা" (১৯৬৩)।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নব জাগরণ হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্রের মতামত ও উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা পরিস্ফুট হইবে।

বর্তমান কালে অনেকেই মনে করেন যে, বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির জন্য যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহা রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য। যোগেশচন্দ্র ইহার প্রভাব একেবারে এড়াইতে না পারিলেও স্বীকার করিয়াছেন যে এ বিষয়ে ডিরোজিওর কৃতিত্বও কম নহে। যাহারা ডিরোজিওর অবদান একেবারে অস্বীকার করেন না এবং তাঁহার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এ বিষয়ে যে যথেষ্ট অবদান আছে তাহা স্বীকার করেন—তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা রামমোহনের চিন্তাধারা ও আদর্শ দ্বারাই

অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় প্রবীন ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার এই কথাটি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা আমি ডিরোজিওর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ যুক্তি-তর্ক দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি এবং রামমোহন রায় ও ডিরোজিও দ্বারা অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যে দুইটি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে এই স্মৃতিকথা লিখিতে গিয়া তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ সম্প্রতি আবার পাঠ করিয়াছি। "বাংলার নব জাগরণের কথা" খানি পড়িয়া দেখিলাম তিনি আমার লেখার অনেক পূর্বেই এই কথা আরও জোরের সহিত বলিয়াছেন। ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তাঁহার ছাত্রশিষ্যরা যাহা করিয়াছিল তাহার "যুগান্তকারী ফলাফলের" উল্লেখ করিয়া যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন: "রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কথা আজ সুবিদিত। হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রগতিশীল ভাবধারায় এতখানি আপ্লুত হইয়াছিল যে, এতাদৃশ আন্দোলনসমূহের প্রবর্তক রামমোহন রায় তাহাদের নিকট আধুনিক পরিভাষায় 'মডারেট' বা ধীরপন্থী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন। এই কারণেই হয়ত পরবর্তী কালের লেখকগণ ডিরোজিওর শিষ্যগণকে "বিপ্লবী" আখ্যা দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদিগকে "উচ্ছৃঙ্খল" বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই…রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের শিক্ষাকে নাস্তিক্য বুদ্ধির পরিপোষক বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।" (২৫-২৬ পৃঃ)

এই দুয়ের প্রভেদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন: "ডিরোজিওর শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল যুক্তি। যুক্তির মানদণ্ডে বিচার দ্বারা অলীক বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া সার বস্তু আঁকড়াইয়া ধরিতে ছাত্রশিষ্যদের উপদেশ দিতেন।…ডিরোজিও-প্রদত্ত এবম্বিধ শিক্ষায় যুব-ছাত্রদল উৎসাহিত হইয়া এই যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা কার্যে প্রতিফলিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। হিন্দু ধর্মের অর্বাচীন রীতি-নীতি এবং হিন্দু সমাজের আচার-আচরণের মধ্যে এই ছাত্রদল জ্ঞানবুদ্ধি-বিরোধী অবান্তর বিষয়েরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইলেন।…আহার করিবেন কিন্তু কাহার নিকট

হইতে (কি) খাদ্য গ্রহণ করিবেন তাহা ভাবিবার যুক্তিযুক্ততা কি ?...সাম্য যে শিক্ষার মূলে, তাহা জাতি বা শ্রেণী বৈষম্য স্বীকার করিবে কেন ?"...(২৭ পৃঃ)

যোগেশচন্দ্রের এই বিশ্লেষণের যাথার্থ্য বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামমোহন জাতিভেদ মানিতেন—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের প্রস্তুত খাদ্য খাইতেন না —বিলাত যাওয়ার সময় জাহাজে নিজের ভৃত্য পাচক ও খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন—এবং বিলাতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের চিহ্ন-স্বরূপ গলায় উপবীত ধারণ করিতেন—বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেন না ইত্যাদি। যুক্তির দ্বারা চালিত না হইয়া সামাজিক ব্যাপারে অধিকাংশের মত অবলম্বনপূর্বক চলাই তিনি কর্তব্য মনে করিতেন—ইহা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন। সুতরাং রামমোহনের সহিত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে গুরুতর মৌলিক প্রভেদ ছিল, তাহারা যে রামমোহনের অনুবর্তী না হইয়া গুরু ডিরোজিওর নির্দেশ মানিয়া চলিতেন এবং কেবল মাত্র যুক্তির মানদণ্ড দ্বারাই সামাজিক প্রথার বিচার করিতেন যোগেশচন্দ্রের এই মত যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গত এক বৎসর রামমোহনের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা বলা হইতেছে তাহার সারমর্ম এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে নব জাগরণের মূলে আছেন কেবল মাত্র রামমোহন রায়—একমেবাদ্বিতীয়মের নূতন সূত্র। যোগেশচন্দ্রের চিন্তাধারা যে এই গতানুগতিকতার প্রভাব হইতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও মুক্ত ছিল ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

আর একটি প্রসঙ্গেও যোগেশচন্দ্রের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেটি হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ। আমাদের দেশের বড় বড় নেতারা ইহাদের মধ্যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ডেন, জুট, স্যাকসন প্রভৃতি মিলিয়া যেমন ইংরেজ জাতি গঠিত হইয়াছে তেমনি হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতে এক নব-জাতির সৃষ্টি হইয়াছে—সুতরাং মুসলমান রাজত্বের সময় হিন্দুরা স্বাধীনই ছিল—ইংরেজদের আমলেই তাহারা সর্বপ্রথমে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়াছে। এখনও এই ধারণা একদল হিন্দুর—বিশেষতঃ রাজনীতিক নেতাদের মনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মতে স্বাধীন ভারতে হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়া সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক (communal) মনোভাবের পরিচায়ক—সুতরাং আমরা হিন্দু

নহি, ভারতীয়। মুসলমানেরা কিন্তু পাকিস্তানকে ইসলামীয় রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই মহাদেশের মানবগোষ্ঠী মুস্লিম ও ভারতীয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত। হিন্দুর এদেশে কোন স্থান নাই। যোগেশচন্দ্র তাঁহার "বাংলার নবজাগরণের কথা" নামক গ্রন্থে "বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমান" শীর্ষক অধ্যায়ে উনিশ শতকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মতকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ওহাবীদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: "হিন্দুর উপর অত্যাচার নিপীড়ন স্থানীয় ওহাবীদের দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তিতুমীর বা তিতু মিঞা একজন বিখ্যাত বীর ও স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। কিন্তু মধ্য বাংলায় হিন্দু-দলনের নেতা ছিলেন এই তিতুমীর বা তিতু মিঞা···হিন্দু-দলন ব্যতীত অন্য কোন আদর্শ তাহাদের মধ্যে ছিল না। ক্রমে এই হিন্দু-দলন কার্য মধ্য বাংলা হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। গত শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে পূর্ব বঙ্গে শরিয়তুল্লা ও তৎপুত্র দুদুমিঞার পরিচালনায় ব্যাপক হিন্দু-নিপীড়ন-প্রয়াস চলিয়াছিল। তাহাদের একটি উর্দু সঙ্গীতের শেষ দুইটি পংক্তির ইংরেজী অনুবাদ হইতে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্যক বুঝা যাইবে: "Fill the uttermost ends of India with Islam, so that no sounds may be heard but Allah Allah". (পৃঃ ১৮৪-৫)

যোগেশচন্দ্র যদি আর কয়েক মাস বাঁচিয়া থাকিতেন তবে জানিতে পারিতেন যে, দক্ষিণ ভারতে কেরল রাজ্যে এই শতকে (১৯২১) "কেরলের মোপলা" নামক মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের উপর তিতুমীর অপেক্ষা শতগুণ বেশী অত্যাচার করিয়াছিল,—অথচ সম্প্রতি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'মুক্তি সংগ্রামের' (?) সৈনিকদের যে তাম্রপট্ট ও মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে বহু সংখ্যক মোপলা তাহা পাইয়াছে—কারণ তিতুমীর যেমন ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল মোপলাদের অত্যাচার দমনের জন্য যে সরকারী সৈন্যবাহিনী পাঠান হইয়াছিল মোপলারা আত্মরক্ষার্থে তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ৺যোগেশ চন্দ্র দুঃখ করিয়াছেন যে, তিতুমীর একজন বিখ্যাত বীর ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ বলিয়া আখ্যাত

হইতেছেন। কিন্তু যখন স্বাধীন ভারতে মোপলারা কেবল শহীদ ও বীর বলিয়া আখ্যাত নহে, তাম্রপট্ট ও মাসিক বৃত্তিসহ স্বাধীনতা সমরের বীর বলিয়া কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পূজিত হইল—তখন ইহার বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদও কেহ করিয়াছে—এরূপ আমার জানা নাই। এক্ষেত্রেও যোগেশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—কালোকে কালো বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, শাদা বলিয়া গুণ গান করেন নাই।

যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—গত শতাব্দীতে মুসলমানদের ভিতরে রেনেসাঁস বা নব জাগরণ আসিল না। তিনি ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া হিন্দুর প্রতি মুসলমানদের বর্তমান মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন (২০০-২০১ পৃঃ) অপ্রীতিকর হইলেও তাহা সত্য। এ ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক সত্যে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া দেন নাই। অথচ তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা যে, ইহাই প্রথম নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক সম্মেলন। কিন্তু ইহার পূর্বে দুইবার যে কলিকাতায় এই প্রকার নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক অধিবেশন হয়, এবং কংগ্রেসের ন্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয়—এই তথ্যটি অনেক বাঙ্গালীই জানেন না, এবং অবাঙ্গালীরা মানেন না। এমন কি, জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে পট্টাভি সীতারামাইয়া দুই বৃহৎ খণ্ডে কংগ্রেসের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে ইহার উল্লেখ মাত্র নাই—অথচ জাতীয় কংগ্রেসের উৎস কোথায় ইহা নিয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। যোগেশচন্দ্র কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এই জাতীয় সম্মেলনের বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কলিকাতার সুবিখ্যাত নেতৃবৃন্দ—শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং পুরাতন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেন যোগদান করেন নাই—তাহার সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র আলোচনা করিয়াছেন। এই রহস্যের সমাধান তো দূরের কথা—এই ব্যাপারটির সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান বা কোন ধারণাই নাই।

বঙ্গদেশের বিপ্লববাদ সম্বন্ধেও যোগশচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধান

যোগ্য : "বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলিতে গেলে বঙ্গের বিপ্লববাদের উৎপত্তি বিষয়েও কিছু বলা দরকার। বর্তমান কালে কোনো কোনো লেখক বিপ্লববাদকে 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'সন্ত্রাসনবাদ' বলিয়া হালকা ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে এক মহান আদর্শ রূপে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল সে বিষয়ে তাঁহারা তেমন তলাইয়া দেখেন না। এই আদর্শের বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—আত্মশক্তির উদ্বোধন দ্বারা স্বদেশের মুক্তি সাধন।" (বাংলার নব জাগরণের কথা, ১২৯ পৃঃ)।

বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ যখন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের মাহাত্ম্য বর্ণনে সোচ্চার এবং কেবলমাত্র ইহা দ্বারাই আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে— ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছিলেন তখনকার দিনে বিপ্লববাদের উচ্চ আদর্শের এই আলোচনা নিরপেক্ষ যুক্তি ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

যোগেশচন্দ্র বিগত দেড়শত বছরের বাংলার ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ও অন্যান্য উপকরণ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে এমন অনেক সংবাদ দিয়াছেন যাহা সাধারণের অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি। "তাঁহার তৎকালীন কোনো কোনো কাজ, যেমন বুয়র যুদ্ধে বুয়রদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্যদান, নবভাবোদ্দীপ্ত বাঙ্গালীর সমর্থন লাভ করে নাই, আর এই কারণেই হয়ত কলিকাতায় আসিলে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির পরিবর্তে 'ইংলিশম্যান' ও অন্যান্য ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের দ্বারা তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন" (ঐ, ১১৮ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ নাই। যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন "পরবর্তী কালে কোনো কোনো বিপ্লবীর মুখে শুনিয়াছি এবং কোনো কোনো বিপ্লবী নেতা লিখিয়াও গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-মাতানো কবিতা ও সঙ্গীত বিপ্লবী জীবনের গতিপথের নির্দেশ দিয়াছিল" (ঐ, ১২০ পৃঃ) এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। একাধিক বিপ্লবী আমাকেও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বোঝা যায় উনিশ-বিশ শতকের বাংলার নব জাগরণের ইতিহাস সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং যে কয়েকজন লেখক এ সম্বন্ধে চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে

যোগেশচন্দ্রের স্থান যে খুবই উচ্চ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় যথাসম্ভব মূল উপকরণগুলির সাহায্যে ও যুক্তি সহকারে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিতেন এবং ভাবাবেশে গতানুগতিক পথের অনুসরণ করিতেন না, ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বর্তমান যুগে এই প্রচেষ্টা ও মনোবৃত্তি খুবই দুর্লভ। যোগেশচন্দ্রের ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই এমন কথা বলি না—এরূপ ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই এমন কোন ঐতিহাসিকের সংবাদও জানি না। কিন্তু তিনি নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা বঙ্গদেশের ইতিহাস যে ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন—এরূপ আশা করা অসঙ্গত হইবে না। তিনি বহু দিন যাবৎ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করি।

বাংলার নবজাগরণ ও যোগেশচন্দ্র বাগল

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী দুবার জেগেছিল; একবার ষোড়শ শতাব্দীতে, আর দ্বিতীয়বার উনবিংশ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীতে তার প্রাণকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং প্রেরণার উৎস ছিলেন শ্রীচৈতন্য। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলিকাতা এবং তার ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী। প্রথম জাগরণ মূলত ধর্ম-আন্দোলনকে ঘিরে। দ্বিতীয় জাগরণ সমাজের এবং জাতীয় জীবনের সকল দিক জুড়ে। সে জাগরণের ফলশ্রুতি এখনও চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে অনেকে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে যে রেনেসাঁস সংঘঠিত হয়েছিল তার সহিত তুলনা করে থাকেন। এই দুই জাগরণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তাদের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। ইউরোপের আন্দোলন স্থরু হয় প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে। চাই তাকে রেঁনেসাস বলা হয়। আমাদের দেশের আন্দোলনে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে নি, যা ঘটেছিল তা হল এক জরাগ্রস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত পশ্চিমের তরুণ বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে উভয়ের মধ্যে একটি আদান-প্রদান। পরিণতিতে যা গড়ে উঠেছিল তা ঠিক প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনও নয়, আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির একাধিপত্যও নয়।

আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি উপমা প্রয়োগ করা যেতে পারে। আগুন দীর্ঘ সময় ধরে জ্বললে তার তেজ স্তিমিত হয়ে যায়। যে কাঠ তার ইন্ধন জোগায় তার ওপর ভস্মের আস্তরণ পড়ে তাকে আর ভাল করে জ্বলতে দেয় না; ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন তাকে আবার জ্বালিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হয় কাঠি দিয়ে দিয়ে আঘাত হানবার আর নূতন ইন্ধন দেবার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার তথা ভারতের সংস্কৃতির সেই দশা ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতের মনীষীদের সাধনায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা

ছিল প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই ভাস্বর। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার এবং নানা যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের আস্তরণে তার যৌবনের দীপ্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তখন সেই আচ্ছন্ন ভাব থেকে তাকে জাগ্রত করতে দরকার ছিল বাহির হতে আঘাতের এবং নূতন ইন্ধনের। ইতিহাসের অনির্বচনীয় বিধানে সে আঘাত এসেছিল ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে।

ইংরেজ শুধু মাত্র বিদেশী হয়ে আসে নি; আরও বড় কথা, তার এক উদীয়মান বিজ্ঞানভিত্তিক রাজসিক সংস্কৃতির বাহন হয়ে এসেছিল। তার বাহিরের রূপ শুধু অভিনব নয়, দর্শন মাত্রেই তা মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। ইংরেজের শুধু জীবন-ধারণের রীতি বিভিন্ন নয়, ধর্ম বিভিন্ন নয়, সে প্রযুক্তি বিদ্যায় বলীয়ান। সে বাষ্পশক্তির সাহায্যে সূতা উৎপাদন করে, বস্ত্র বপন করে, সমুদ্রে জাহাজ চালায়। তা শুধু আঘাত হানতে উপযুক্ত নয়, নূতন ইন্ধন জোগাবারও ক্ষমতা রাখে।

এই দুই সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে বাঙালীর জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা বিচিত্র ইতিহাস, এখানে ঠিক প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে তার ব্যাপকতা কতখানি তা আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। সুতরাং এই ব্যাপকতা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

জাতীয় জীবনে এই সংঘাতের ফলে নানাভাবে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে ক্ষেত্র অনুসারে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই রকম:

(১) ইংরাজি শিক্ষার আগ্রহ এবং তার ব্যবস্থা। এটিকে আমরা আন্দোলনের প্রথম ধাপ বলতে পারি। কারণ ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত না হলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ঘটত না এবং সংঘাতও সৃষ্টি হত না।

(২) সংঘাতের মূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ধর্মের ক্ষেত্রে। পৌরাণিক রীতিতে বিগ্রহ-পূজা নূতন সংস্কৃতির চোখে পৌত্তলিকতার সমস্থানীয়। সুতরাং সাকার ও নিরাকার উপাসনা নিয়ে এক তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

(৩) বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত পরিচিত হবার ফলে নানা যুক্তিহীন কুসংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও প্রতিকারের জন্য আন্দোলন সুরু

হয়েছিল। এই আন্দোলন প্রধানত নারী জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল; কারণ পুরুষ-শাসিত সমাজে তারা শুধু নিপীড়িত নয়, অবহেলিত ছিল। একে নারীকল্যাণমূলক আন্দোলন বলতে পারি।

(৪) ইংরাজি সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শে এসে বাংলা সাহিত্যেরও নব জাগরণ ঘটেছিল। এই সংঘাতের ফলেই বাংলা গদ্য সাহিত্য জন্মলাভ করে।

(৫) সর্বশেষে এক স্বাধীন জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত জাতির সংস্পর্শে এসে বাঙালীর মনেও জাতীয়তা-বোধ জন্মগ্রহণ করেছিল। ফলে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় ক'রে পরবর্তী শতাব্দীর মুক্তি-আন্দোলনের পথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিল।

এ হতে খানিকটা ধারণা হবে উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ কতখানি ব্যাপক ছিল। এক কথায় বলা যায়, তা জাতির সমগ্র জীবনকে জুড়ে তাকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করেছিল। একে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অভ্যুদয় বলা যায়। এত বিরাট যে ব্যাপার তার হোতা একজন হতে পারেন না, হোতা ছিলেন বহু এবং যে হেতু এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাচীনের সঙ্গে নবীন ভাবধারার সংঘাত, আন্দোলনে দুই পক্ষেরই প্রতিনিধি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, যে পরিবর্তন সংঘঠিত হয়েছিল তাতে উভয় পক্ষেরই দান আছে। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে তার সবিস্তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কে কে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ইংরাজি শিক্ষায় পথপ্রদর্শক ছিলেন রামমোহন। বোধহয় তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজ চেষ্টায় ইংরাজি ভাষা ভাল রকম আয়ত্ত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তিনি রক্ষণ-পন্থীদের প্রতিকূলতায় তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মতের জন্য তিনি তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তবে তিনি নিজে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে যিনি সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ডেভিড হেয়ার। শাসক গোষ্ঠীর একজন হয়েও তিনি ভারতের কল্যাণকে বেশী মূল্য দিয়েছিলেন। এমন মহাপ্রাণ ইংরেজ আরও অনেক এসেছিলেন যাঁরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে

বিশ্বজনীন মানবিকতার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও একটি ভূমিকা ছিল। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন ক'রে ইংরাজি শিক্ষাকে দরিদ্র ছাত্রদের নিকট সহজ লভ্য করেছিলেন।

তারপর আসে ধর্মসম্পর্কিত আন্দোলন। ঠিক বলতে, উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট অংশ জুড়ে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন যখন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন তখন তার সূত্রপাত। তারপর হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের পরিচালিত 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়াশীল রূপ। তারপর ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ভিতর দিয়ে নিরাকার উপাসনাকে জাতীয় আদর্শে গড়ে তোলা এক নূতন রূপ। শেষে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে সাকার ও নিরাকার উপাসনা নিয়ে বিতর্কের অবসান। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর আন্তর্জাতিক বার্ষিক ধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত বিবেকানন্দের ভাষণে হিন্দু ধর্মের প্রকৃতির ব্যাখ্যাই তার অবসান সূচিত করে। সুতরাং এই ধর্মসম্পর্কিত বিতর্ক ১৮১৫ হতে ১৮৯৩ অবধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে জীবিত ছিল। এতে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে রক্ষণপন্থীদের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব অন্যতম। হিন্দু কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের গুরু। ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

তারপর উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার বিষয়ক আন্দোলন। একে আমরা নারীকল্যাণবিধায়ক আন্দোলন বলে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি; কারণ এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবে সমাজ-সংস্কার করা যাতে নারীজাতির দুর্দশা মোচন হয়। এই প্রসঙ্গে সতীদাহ প্রথা নিরোধের আন্দোলনের কথা এসে পড়ে। রামমোহন এর সপক্ষে নানাভাবে আন্দোলন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তার সহায়তা করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই বর্বর প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ক'রে বিশেষ সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর এ বিষয়ে যিনি সব থেকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি আন্দোলন ক'রে

রক্ষণশীলদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তক আইনের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন সিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। অনুরূপ ভাবে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় সরকার এ বিষয়ে আইন রচনা করতে পারেন নি। তারপর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন জেলায় অনেক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জন ড্রিঙ্কওয়াটার বীটুন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেটি এখন বেথুন বিদ্যালয় নামে খ্যাত।

তারপর আসে বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের কথা। বাংলা পদ্য সাহিত্য প্রাচীনকাল হতেই সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলা গদ্য সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতেই দুই সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে তার জন্ম। ঠিক বলতে কি, ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের অধ্যক্ষ কেরি সাহেবের উৎসাহেই রামরাম বসু প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন। তারপর ইংরেজ প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় তাঁদের ব্যবহারের জন্য 'বত্রিশ সিংহাসন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সূচিত করে রামমোহন-রচিত 'বেদান্ত গ্রন্থ'। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত জনক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর রচিত 'শকুন্তলা উপাখ্যান' ও 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে একটি উৎকৃষ্ট গদ্যরীতি প্রবর্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাই গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য পদ্য সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে বাংলা পদ্য সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটে। এ বিষয় পথিকৃৎ হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি পশ্চিম হতে সনেট এনে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেন। মিলটনের অনুসরণে গুরুগম্ভীর ভাষায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

দেশাত্মবোধের প্রথম জন্ম পশ্চিমদেশে। ইংলণ্ডেই বোধহয় তার প্রথম জন্ম হয় রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়। তাঁর প্রেরণায় সংস্কৃতি ভাষা ও

জাতির ভিত্তিতে ইংরাজ জাতির মধ্যে একটি সংহতিবোধ ফুটে উঠেছিল। দেশাত্মবোধ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এক রকম বলা যায়, নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টাই অনিচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বলপূর্বক আরোপিত অধীনতা স্বীকার করতে চায় নি বলেই নেপোলিয়ানের পতন ঘটে। তার ফলে ভৌগোলিক অঞ্চলকে ভিত্তি ক'রে ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত নানা জাতির জন্ম হয়। এই প্রেরণার প্রভাবেই জার্মাণ জাতি ও স্পেনীয় জাতি গড়ে ওঠে এবং ইটালি ও গ্রীস স্বাধীন হয়।

ইংরাজি সাহিত্যের মাধ্যমে এই নূতন আদর্শ আমাদের মনকে স্পর্শ করে। তার প্রতিক্রিয়া প্রথম লক্ষিত হয় সাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং পরবর্তীকালে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীত' ও নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উল্লেখযোগ্য।

এই জাতীয়তাবোধ পরিস্ফুরণের চেষ্টায় নবগোপাল মিত্র ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের উদ্যোগে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেলার প্রবর্তন হয়। তার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় 'নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান' এবং 'স্বদেশী শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত দ্রব্য প্রদর্শন। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় পরিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—'আমাদের এই মিলন………… স্বদেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য।'

জাতীয়তা-বোধের পরিস্ফুরণে সংবাদপত্রেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দি বেঙ্গলী' নামে একটি ইংরাজী দৈনিকের স্বত্ব ক্রয় ক'রে তাকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে রূপান্তরিত করেন। বেশ কয়েক বছর আগে শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ তাঁদের গ্রামের নামে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রবর্তন করেন। তা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তা-বোধের পরিস্ফুরণে এবং পরবর্তী কালে মুক্তি-আন্দোলনে এই দুটি পত্রিকার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু এ বিষয়ে যিনি সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি হলেন একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, নাম এলেন অকটেভিয়াস হিউম। তিনি মনে প্রাণে ভারতকে ভালবেসেছিলেন এবং শুধু জাতীয়তা-বোধ

নয়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি প্রতিষ্টান গড়ে তুলেছিলেন। তাই হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠুক।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নব জাগরণের উন্মেষ হয়েছিল তার ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমন সম্ভাবনাপূর্ণ। তারই ফলে বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন ক'রে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এমন এক জাতি গঠনের ব্রত নিয়েছে যা আর্থিক সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে সমান ভাবে বিশিষ্টতা অর্জন করবে, যা জনগণের দারিদ্র-মোচন করবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাক অক্ষুন্ন রাখবে। সুতরাং বর্তমান ভারতকে বিশেষ করে বাঙালীকে বুঝতে উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সহিত আমাদের নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নি। তবে তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই যোগেশচন্দ্র বাগলের সাহিত্য-কীর্তির সার্থকতা। তাঁর সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও আমরা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলাম। তাঁর যে গুণটি আমার সব থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তা হল তাঁর নিরলস সারস্বত সাধনার দৃষ্টান্ত। এক হিসাবে তাঁর সে দৃষ্টান্ত অনন্যসাধারণ; বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি আজীবন গবেষণা ক'রে এসেছেন। শেষ জীবনে যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান তখনও তাঁর গবেষণা কার্য থেমে যায়নি। তিনি অন্যের সাহায্যে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত গবেষণা কার্য অব্যাহত রেখেছিলেন এবং অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে গেছেন।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণার মূল বিষয় ছিল বাংলার নব জাগরণের বিভিন্ন দিক। সেই জন্যই বলছিলাম তাঁর গবেষণা আমাদের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণেই এই তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সহিত পরিচিত হতে বিশেষ সহায়তা করে। তিনি প্রভূত শ্রম স্বীকার করে নান সূত্র হতে এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থাপন করে গেছেন। সেগুলি এ বিষয়ে যারা গবেষণা করবেন তাঁদের কাছে আকারগ্রন্থ হিসাবে কাজে লাগবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলার অভ্যুদয়ের সহিত সংযুক্ত তাঁর যে সব গ্রন্থ আছে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক হতে বিবেচনা করলে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

(১) বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা হয়েছে এমন গ্রন্থ; এবং

নারীকল্যাণের জন্য আন্দোলন ও ব্যবস্থা সম্পর্কিত গ্রন্থ;

(২) যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর এই সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের ইতিহাস রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিছিলেন তাঁদের জীবনী সম্পর্কিত আলোচনা;

(৩) জাতীয়তা-বোধ ও মুক্তি-আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ;

(৪) শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কিত গ্রন্থ।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এই গ্রন্থগুলিঃ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৪১)

এতে নবজাগরণে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কীর্তি-কলাপের আলোচনা আছে। এঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও, জন ড্রিঙ্কওয়াটার বীটুন এবং আনন্দমোহন বসু অন্যতম।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি (১৯৫৮)

বাংলার নবজাগরণে যে যে প্রতিষ্ঠান বিশেষ সহায়তা করেছিল এতে তাদের বিবরণ আছে। একাডেমিক এসোসিয়েশন, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এদের অন্যতম।

কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (১৯৫৯)

এখানে অতিরিক্ত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়। এসিয়াটিক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, মেডিকাল কলেজ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতির আলোচনা আছে।

বাংলার নবজাগরণের কথা (১৯৬৩)

এই গ্রন্থে সাধারণ ভাবে নবজাগরণের বিষয় আলোচনা আছে।

নারী-কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর একখানি গ্রন্থই পাওয়া যায়ঃ

বিশিষ্ট নেতাদের জীবনী সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল :

(১) বিদ্যাসাগর পরিচয় (১৯৫৯)

নববঙ্গ গঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায় :

(২) রাধাকান্ত দেব (১৯৪২)
(৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৪)
(৪) রাজনারায়ণ বসু (১৯৪৫)
(৫) রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় (১৯৪৮)
(৬) কেশবচন্দ্র সেন (১৯৫৮)

এই সব কটি গ্রন্থই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রবর্তিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্ভূক্ত।

জাতীয়তা-বোধ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাও আলোচিত হয়েছে। তা দেখায় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস যোগেশচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। এই শ্রেণীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়ে :

মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৯৪০)

এটি একটি বড় গ্রন্থ এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ।

জাতীয়তার নব মন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত (১৯৪৫)

জাতি বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১৯৪৫)

দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের সহিত যে সংঘর্ষ ঘটেছিল তার ইতিহাস।

ভারতের মুক্তি সন্ধানী (১৯৪৭)

শেষের শ্রেণীতে পড়ে শিক্ষার রীতির পরিবর্তনের ইতিহাস। এ সম্বন্ধেও তাঁর কিছু মূল্যবান গ্রন্থ আছে। তাদের তালিকা এই :

(১) বাংলার উচ্চ শিক্ষা (১৯৫৪)

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার ইতিহাস এখানে আলোচ্য বিষয়।

(২) **Beginnings of Modern Eduction in Bengal**
(৩) বাংলার জন শিক্ষা (১৯৪৯)
(৪) বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৯৫০)

বেথুন কলেজ স্থাপনের (১৮৪৯) পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে

যোগেশচন্দ্রের 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত'

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যখন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তখন যাঁরা চিন্তানায়ক ছিলেন তাঁরা অনেকে ডিরোজিওর শিষ্য। যাঁরা সে যুগে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিওর নাম প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত একটি অনুবাদের কথা অনেকের মনে পড়বে—

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ। মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।

ডিরোজিওর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা ও যুবক-সম্প্রদায়ের মনকে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করা। তাঁর শিষ্যরা অনেকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যে ভাবে পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রথম উদ্দেশ্য সেভাবে করেন নি। নব্যবঙ্গের জীবনযাত্রা ও আচরণ সমালোচনার বিষয় হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার ডিরোজিওর শিষ্যদের পরিহাস করে এক শ্লোক রচনা করেছিলেন। তার শেষ দুটি চরণ এই রকম—

ফিরীঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ্ ডিরোজিও কুশেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ বিদিগ্ জ্ঞানবর্জিতাঃ॥

ডিরোজিওর এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদালতে বলেছিলেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" এ উক্তিতে স্বাধীন মনের পরিচয় আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের সংস্কৃতির প্রতি কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাও প্রকাশ

পেয়েছে। অনেকের মনে দেশীয় সংস্কারের প্রতি যে প্রতিকূল মনোভাব ছিল, বিদেশী সংস্কারের প্রতি হয়তো সে-রকম ছিল না। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল পূর্বাভাসে এই কথাই বলেছেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে 'যুগযুগান্তের মোহনিদ্রা' দূর হয়েছিল, কিন্তু নতুন মোহাচ্ছন্ন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে হিন্দুমেলা বাংলা দেশকে পরিত্রাণ করেছে। এ কথা মনে রাখলে হিন্দুমেলার সার্থকতা বোঝা যাবে।

মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭) চৈত্র-সংক্রান্তিতে। প্রথম তিন বৎসর একে চৈত্রমেলা বলা হত। 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' পত্রিকা লিখেছিলেন, চড়কের সময় যে-সব 'কষ্টদায়ক শারীরিক প্রথা' প্রচলিত ছিল, সরকারি হুকুমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে যুবকদের উৎসাহে চৈত্রমেলার প্রবর্তন হয়। এই উক্তিতে ভুল ধারণার অবকাশ আছে। গাজনের উৎসব ও চৈত্রমেলা এক জাতীয় অনুষ্ঠান নয়।

রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন অন্য অনেকের মতো ইংরেজি শিক্ষার ফলে তাঁর মনের আমূল পরিবর্তন হয় নি। 'আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।' তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল চিন্তাধারার বিপ্লব ও সমাজ-জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এই পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে হলে জাতীয় ভাবের প্রসার ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর মেলার কর্তৃপক্ষ মেলার উদ্দেশ্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথার পুনরুক্তি করেছিলেন—

"স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা" ও "স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই" মেলার উদ্দেশ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাল্যকথা'য় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন—"আমি বোম্বাইয়ে কার্য্যারম্ভ করার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন।...কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধ'রে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের

দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।" প্রথম দিকে হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের মেজদাদা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

নবগোপাল মিত্রর 'ন্যাশনাল পেপারে' ১৭ এপ্রিল, ১৮৬৭ তারিখে মেলার প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। অধিবেশন হয়েছিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন চিৎপুরে রাজা নরসিংহ রায়ের বাগানবাড়িতে। দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে উপকারী তাহা বোধহয় কাহারও অগোচর নাই। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোনও বিষয়-সুখের জন্যও নহে, কোনও আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" মেলার অনুষ্ঠাতাগণ একটি বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করেছেন। দেশের "উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠানে" সর্বত্রই "রাজপুরুষগণ এবং অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই" প্রবর্তক। কিন্তু চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান ও ইহাতে ইয়োরোপীয়দিগের নামগন্ধ নাই। মনোমোহন বসুও একটি 'বিশেষ মেলার' প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন, "যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রীতিবন্ধন হইতে পারে।" তাঁর দৃষ্টি ভাবীকালেও প্রসারিত ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, চৈত্রমেলায় যে বীজ রোপণ করা হয়েছে, তার ফলে ভবিষ্যতে "অতি শুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত" হবে। "তার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয়না। অপর দেশের লোকেরা তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতফল ভোগ করিয়া থাকে।" এর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, প্রথম যুগের কংগ্রেসের আবেদনের সুরের সঙ্গে হিন্দুমেলার পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ স্পষ্ট। সে যুগের কংগ্রেসের বিবিধ প্রস্তাবকে রবীন্দ্রনাথ "আবেদন ও নিবেদনের থালা" বলেছেন। হিন্দুমেলাকে এ কথা বলবার কোনো অবকাশ ছিল না। তার একটি কারণ সুস্পষ্ট। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের 'স্বদেশাভিমানের" কথা উল্লেখ করেছেন—"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি

প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" কেবল ঠাকুর পরিবারের অর্থানুকূল্য নয়, ঠাকুর পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুমেলাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

১৮৮০ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনই সম্ভবতঃ হিন্দুমেলার শেষ অধিবেশন। নবম অধিবেশন (১৮৭৫) উপলক্ষ্যে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিলেন 'ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে।' কিন্তু এই সময় থেকেই সংবাদপত্রে মেলার কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টম অধিবেশনের সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হিন্দুমেলা ক্রমে 'মেমসাহেবদের ফ্যান্সি ফেয়ার'-এ পরিণত না হয়। অমৃতবাজারের আশঙ্কার কারণ হয়তো অনুমান করা যায়। মেলার সংগীতচর্চা, আতশবাজী, মহিলাদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী অমৃতবাজার পত্রিকার প্রীতিকর হয় নি। পত্রিকা-সম্পাদক মনে করেছিলেন মেলায় মধুর রসের আধিক্য হচ্ছে। পত্রিকা কয়েক বৎসর পূর্বেই লিখেছিলেন, "হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ মেলাটি এখন পর্যন্ত তদনুরূপ বৃহত্তর হইল না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।... এখন আমাদের মধুর রস ছাড়িয়া তিক্ত রসস্বাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে।" ১৮৭৮ সাল থেকে মেলার অধিবেশনের সময় পরিবর্তিত হয়। প্রথম কয়েক বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে, পরে মাঘ সংক্রান্তিতে মেলার অনুষ্ঠান হত। এখন থেকে তার পরিবর্তে সরস্বতী পূজার সময় অনুষ্ঠান করা ঠিক হয়। তখন হিন্দুমেলার উৎসাহ অনেক কমে এসেছে। ১৮৮০ সালে 'সুলভ সমাচার' হিন্দুমেলার অবনতি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন—"বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।"

হিন্দুমেলার অবনতির একটি কারণ অবশ্য এই যে, সেই সময় একাধিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় স্বভাবতই সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া লীগের জন্ম হয়েছিল ১৮৭৫ সালে এবং ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক উদ্দীপনার যে নতুন স্বাদ শিক্ষিতসম্প্রদায় পেয়েছিলেন হিন্দু-মেলায় তার অভাব ছিল। কিন্তু এ কথা বললে অন্যায় হবে না হিন্দুমেলার সঙ্গে দেশের মাটির যে মিল ছিল এই-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তা ছিল না। তাদের কাঠামো অনেক পরিমাণে বিদেশী। সে যুগের যাঁরা নেতা ছিলেন

তাঁদের অনেকের দৃষ্টি দূর সিন্ধুতীরে নিবদ্ধ ছিল এবং আচরণে ও মানসিকতায় তাঁরা দেশবাসীর প্রতীক ছিলেন না। এঁদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কোট পরা কায় সঁপেছেন হায় শুধু স্বদেশের জন্য।'

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান থেকে বাংলা দেশে জাতীয় সংগীতের উৎপত্তির কথা বলেছেন। "ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়।" সব দেশেই রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যও সে পরিচয় বহন করছে। কিন্তু সে যুগের অনেক জাতীয় সংগীতের সঙ্গে হিন্দু-মেলা উপলক্ষ্যে যে-সব গান রচিত কিংবা গীত হয়েছিল তার প্রভেদ চোখে পড়বে। তখনকার দেশাত্মবোধক সংগীত সাধারণতঃ ভারতভিক্ষা বা ভারত-বিলাপে পরিণত হত। যে রচনাকে স্বাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা মনে করা হত তাতেও ইংরেজের স্তুতির অন্ত ছিল না। একজন বিখ্যাত কবি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তার এক অংশ এই রকম:

ধন্য রে বৃটন ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগযুগান্তের অমানিশা ঘোর
তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত ভুবন
এ সখ্য বন্ধনে বাঁধিল।

হিন্দুমেলার একটি গান 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে' তখন বিখ্যাত হয়েছিল। এর শেষের দু' চরণ এই রকম—

আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।

গানটিতে একটি নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে গান প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছে, সে হচ্ছে—

গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি অতিশয়োক্তি করেন নি।

এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রধানত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জীবন ও চিন্তানায়কদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ সহজলভ্য হয়েছে, গত শতাব্দীর ছবি এই শতাব্দীর পাঠকের কছে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের কাহিনীর সঙ্গে অনেকের ভালো পরিচয় ছিল না। এ কথা হয়তো সত্য যে বাঙালী ঐতিহাসিকেরা অন্য প্রদেশের ইতিহাস চর্চায় যে-রকম উৎসাহ দেখিয়েছেন বাংলা দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস রচনায় সে-রকম উৎসাহ দেখান নি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এবং অল্প কয়েকজন গবেষকের চেষ্টায় সে ত্রুটি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে যখন বাংলা দেশের একটি ক্ষীণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল তখন তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। তাকে তিনি 'সুবর্ণের মুষ্টি' বলেছেন। হিন্দুমেলার ইতিহাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন এ কথা বলবার মতো কেউ ছিলেন না। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অসংখ্য কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচন্দ্র বাগল

নারায়ণ চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ গবেষক লোকান্তরিত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রটিকে যে তিনি কতো ভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এই ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা যোগেশচন্দ্রের আগে বাংলার উনিশ শতকের সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা বড়ো একটা হয়েছে বলে মনে হয় না। হলেও তার পরিমাণ অতি সামান্য। বলতে গেলে যোগেশচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি, যিনি একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অবলম্বনে প্রণালীবদ্ধ ভাবে বাংলার উনিশ শতকের ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ ইত্যাদি বিবিধ আন্দোলনের মূলগত প্রেরণাগুলির সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং সে কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন।

আমরা যাকে আজ 'রেনেশাঁস' বা 'নবজাগরণ' বলি সেটা উনবিংশতি শতাব্দীর বাংলার নানামুখী কর্মতৎপরতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে, আর এই রেনেশাঁস বা নবজাগরণের স্বরূপলক্ষণ আর রীতি-পদ্ধতির নিরূপণই যোগেশচন্দ্রের আজীবনের সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পরে তাঁর প্রদর্শিত পথে আরও অনেকে পরিক্রমা শুরু করেছেন। বস্তুত, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বঙ্গীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণা একটা প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং একাধিক নূতন প্রজন্মের গবেষক এই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের উদ্যম আর অনুশীলনের পিছনে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত একটা মুখ্য প্রেরণা হিসাবে কাজ করছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

যোগেশচন্দ্র যখন সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত করেন, সেটা এই শতকের তিরিশের দশকের গোড়াকার কোনো একটা সময় হবে। কিংবা তারও

কিছু আগে হতে পারে। ওই সময় থেকে চল্লিশের দশকের প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত কালে তিনি বহু বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করেছেন এবং মনে হয় সাংবাদিক বৃত্তির কৌতূহল-বৈচিত্র আর বিচিত্র পথগামিতাটাই তৎকালে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। শিশু-সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত রকমারি বিষয়ের কোনোটাই সেই সময়ে যোগেশচন্দ্রের মনোযোগের বহির্ভূত ছিল না। অন্তহীন বিষয়ে অক্লান্ত তিনি লিখেছেন এই সময়ে। কিন্তু পরে তাঁর রচনার ধারার পরিবর্তন হয়। ঐতিহাসিক সুধী স্যার যদুনাথ সরকারের প্রবর্তনায় এবং সহকর্মী সুহৃৎ সুপরিচিত গবেষক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বহু বিষয়চারিতা ছেড়ে একমুখী রচনায় নিবিষ্টচিত্ত হন। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীকে তিনি তাঁর কেন্দ্রীভূত মনোযোগের বিষয় করে তোলেন। যোগেশচন্দ্রের রচনার বিষয়ে এই পরিবর্তন এবং একাগ্রী অভিনিবেশ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অশেষ কল্যাণের কারক হয়ে ওঠে। একে একে তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ওই সব বিবর্তনের ধারক-বাহক পর্যায়ের প্রধান প্রধান পুরুষ সম্বন্ধে বহু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জীবনের শেষ দিন (১৯৭২ জানুয়ারী) পর্যন্ত তাঁর এই কাজের বিরাম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বছর প্রথমে তিনি প্রায়ান্ধ এবং পরে সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় কাটিয়েছেন। সেই চূড়ান্ত ভাগ্যবিবর্যয়ের দিনগুলিতেও তাঁর অধ্যবসায় অব্যাহত ছিল। অনুলিখনের সাহায্যে তিনি এই পর্বেও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ ও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। এ এক বিরলদৃষ্ট সারস্বত ব্রতসাধনার উদাহরণ। জ্ঞানের জগতে যোগেশচন্দ্রের একনিষ্ঠ তপস্যার কথা মনে হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়।

উনিশ শতকের গবেষণার পর্বে যোগেশচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' (১৩৪৭)। (সম্প্রতি এই বইখানির একটি পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, রূপান্তরিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে যাতে লেখক বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মুক্তিসাধনার ইতিবৃত্তকে কংগ্রেসের যুগে সীমিত না রেখে আরও অনেক আগে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে, এই বইয়ে তিনি মুক্তিসাধনার কালারম্ভ করেছেন রামমোহনের যুগ থেকে।) এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখে দেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। বার বার একে একে

তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যথা, 'জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ', 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত', 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'বাংলার জাগরণ', 'বঙ্গের নব্য সংস্কৃতি', 'উনবিংশ শতব্দীর বাংলা', 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', বেথুন সোসাইটি', 'বঙ্গসংস্কৃতির কথা', 'বরনীয়', **History of the British Indian Association, Peasant Revolution in Bengal'** ইত্যাদি। এ ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' পর্যায়ে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি জীবনীগুলির তিনি প্রণেতা। ইংরেজী-বাংলায় কম পক্ষে তিনি পঞ্চান্ন-ষাট খানা বইয়ের রচয়িতা। এ ভিন্ন বহু প্রবন্ধাদি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণা কর্মের প্রকৃতি এবার একটু আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। তাঁর কাজের ধারার মধ্যেই তাঁর কাজের অনন্যতার প্রমাণ রয়েছে।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা অনেক দিন যাবং 'নবজাগরণের কাল' বলে অভিহিত করে আসছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা আবার তুলনা ভালবাসেন, বিশেষ বিদেশের সঙ্গে তুলনা দিতে পারলে তো কথাই নেই, তাঁরা এই কালটাকে ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের রেনেশাঁসের সঙ্গে প্রতি-তুলনা করে গর্বানুভব করে আসছেন। কিন্তু কি এই বঙ্গীয় রেনেশাঁসের স্বরূপ, কিসে তার বৈশিষ্ট্য, কেমন তার ধারাধরণ—এ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বছর আগেও যে আমাদের মনে সুষ্ঠু একটা ধারণা ছিল তা কিন্তু বলা যায় না। আসলে বাংলার উনিশ শতক সম্বন্ধে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ কথাটা আমরা ব্যবহার করেছি কতকটা যেন ধরতাই বুলি হিসাবেই—কথাটার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেই। কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য যদি আমাদের উপলব্ধি হতো তো আমরা দেখতে পেতুম ইংলণ্ডের ষোড়শ শতকের নবজাগৃতির সঙ্গে আমাদের এই বঙ্গীয় নবজাগৃতির বিশেষ কোনো মিল নেই। একসঙ্গে বহু শক্তিমান্ মানুষের আবির্ভাব, প্রবল সৃজনী কর্মতৎপরতার প্রাচুর্য, আকাশে বাতাসে আশা ও আত্মবিশ্বাসের উন্মাদনা—এইগুলি দিয়ে যদি নবজাগরণের গোত্রলক্ষণ নির্ণয় করতে হয় তো এলিজাবেথীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে বাংলার উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের অবশ্যই যথেষ্ট মিল আছে।

কিন্তু এ তো হলো বহিরঙ্গের মিল—অন্তরঙ্গের মিল একে বলা চলে না। অন্তরঙ্গ বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গীয়-রেনেশাঁসে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পার্থক্যটির উপর এক নজর চোখ বুলনো যেতে পারে।

প্রথমত, ইংলণ্ডীয় রেনেশাঁসের প্রকৃতি মূলতঃ শিল্প ও সাহিত্যগত; বঙ্গীয় রেনেশাঁসের ভিতর শিল্প-সাহিত্য একটা বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে থাকলেও সেটাই তার কর্মতৎপরতার সব নয় বা প্রধান কথা নয়। প্রকৃত পক্ষে, বঙ্গীয় রেনেশাঁসের মূল উপজীব্য বলতে যদি কোনো একটি প্রেরণা ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মতৎপরতাকে বোঝাতে হয়, নিঃসন্দেহে তা হলো ধর্ম। উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মকে আশ্রয় করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটি দেখা যায় না। ইংলণ্ডে ধর্ম নিয়ে বহু আন্দোলন-উপপ্লব হয়েছে সত্য কথা, এমনকি ধর্মসংস্কারের প্রশ্নে সে দেশে বহু রক্তারক্তি কাণ্ডও ঘটে গেছে, ইংলণ্ডের রাজবংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু দেখা যায় যে ইংলণ্ডের রেনেশাঁসের সঙ্গে কিন্তু ধর্মের বিশেষ সম্পর্ক নেই। ইংলণ্ডের ষোড়শ-শতকীয় রেনেশাঁসের মধ্যমণি হলেন শেকস্‌পীয়র আর তাঁকে ঘিরে অন্যান্য নাট্যকার ও কবিবৃন্দ। এর সঙ্গে ধর্মের নামগন্ধ নেই।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের চরিত্রই আলাদা। এই শতকের শুরুতে রাজা রামমোহনে যে নবজাগরণের আরম্ভ, এই শতকের শেষ পাদে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তি-আন্দোলনে সেই নব-জাগরণের সমাপ্তি। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক নানা চেষ্টা বঙ্গীয় নবজাগরণের মধ্যবর্তী স্তরটিকে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণের শুরুতেও ধর্ম, মাঝেও ধর্ম, শেষেও ধর্ম। এমন কি, এই শতাব্দীর প্রান্তকালে যে নতুন মানুষটির আবির্ভাব হলো, দেখা যায় জাতীয়তার কর্মোদ্যম দিয়ে জীবনারম্ভ করলেও তিনিও জীবন-পরিক্রমা শেষ করলেন ধর্মে—শ্রীঅরবিন্দ। কাজেই আমরা যদি বলি বঙ্গীয় রেনেশাঁসের মূল প্রকৃতি হলো ধর্ম এবং এইখানেই ইংলণ্ডীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য, তা হলে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হবে না।

এই দুই রেনেশাঁসের আরেকটা যে প্রধান তফাৎ তা হলো ইংরেজী শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কালে;

আর বাংলার এই জাগরণ ঘটেছে এদেশের ঔপনিবেশিক পর্বে—পরাধীন অবস্থায়, অর্থাৎ অপর এক পরাক্রান্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের আমলে। ফলে, রাজনীতি অর্থনীতি—সব অবস্থাতেই মৌলিক পার্থক্য। সমালোচক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির বহির্বিশ্বে অভিযান আর সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সঙ্গে ষোড়শ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের বিকাশ ও আবিষ্কারের কী নিগূঢ় সম্পর্ক। বস্তুতঃ সেকস্‌পীয়রের মতো যুগান্তকারী নাট্যপ্রতিভার অভ্যুদয়ই সম্ভব হতো না, যদি রাণী এলিজাবেথের শাসনকালীন অবস্থার এই বস্তুগত বৈশিষ্ট্য না থাকতো। ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজ রাজকবি লর্ড টেনিসনের কাব্যে আশা ও বিশ্বাসের অমিত উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এ কখনই সম্ভব হতো না, যদি না উনিশ শতক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা মুখ্য সম্প্রসারণের কাল হতো। সম্প্রসারণের কালে আশাবাদ আর আনন্দের মেজাজটাই থাকে প্রবল, হতাশা তখন ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারে না।

. এই মৌলিক পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাংলাদেশের রেনেশাঁসের প্রকৃতি বিচার করতে হবে। গবেষক হিসাবে যোগেশচন্দ্রের কাজের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, তিনি আমাদের নব জাগরণের অন্তর প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে তার বিচার-ক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ধর্ম-সংস্কারই হলো বাংলার উনিশ শতকের সাধনার মূল প্রেরণা—তাকে দণ্ড স্বরূপ অবলম্বন করে সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারকেন্দ্রিক কর্ম-তৎপরতা এবং শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিবেগ স্ফূর্তিলাভ করেছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—উনিশ শতকের এই কয় জন দিক্‌পাল বাঙালী মূলতঃ ধর্মমার্গের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও দেখা যায় ধর্ম তাঁদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তরর করেছিল। অবশ্য এ দুয়ের ধর্মের প্রকৃতি ছিল আলাদা। একজন নব-হিন্দুত্বের ধারক ও বাহক ছিলেন; অন্যজন রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় সংস্কার আত্মস্থ করে তাকে আধুনিক মননের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। অবশ্য ধর্মের ব্যতিক্রমও আছে—বিদ্যাসাগরের কাজের মূলে আছে গভীর-গূঢ় মানবহিতৈষণা; ধর্মোপলব্ধি বা এই জাতীয় অনির্দেশ্য প্রেরণা আদৌ তাঁর ব্যক্তিত্বের চালিকাশক্তি নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর

একটি একক দৃষ্টান্ত, তাঁর তুলনা তিনি স্বয়ং। তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম না মেনেও বোধহয় গোটা উনিশ শতকের পরিধির মধ্যে বাঙালীকুলে সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ। প্রেম যদি মনুষ্যজীবনের সার্থকতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হয়, তা হলে বিদ্যাসাগরের তুল্য মানুষ আর আমাদের মধ্যে কে হয়েছেন ?

যাই হোক, যোগেশচন্দ্রের কাজের অসাধারণত্ব এখানে যে, তিনি এক দুর্নিবার ইতিহাস-চেতনার দ্বারা চালিত হয়ে উনিশ শতকের বাংলার গোটা সৃষ্টি কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন-ক্রিয়ার মধ্যে ধর্ম এসেছে, এসেছে সমাজ, এসেছে শিক্ষা, এসেছে সাহিত্য, এসেছে রাষ্ট্রনীতি, এসেছে সমাজতত্ত্ব। রামমোহনে তাঁর অনুসন্ধানের শুরু, আর তাঁর অনুসন্ধিৎসার বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে মোটামুটিভাবে ওই শতকের শেষাশেষি এসে। রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি আলাদা ভাবে কোনো অনুশীলন করেন নি সত্য কথা, কিন্তু তাঁদের আশে পাশে উনিশ শতকের গোটা আশী বছর কাল জুড়ে যতো অশেষ শক্তিধর দেশ ও জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অক্লান্তকর্মা বাঙালীর আবির্ভাব হয়েছে—যথা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র,দীনবন্ধু, হরিশচন্দ্র, কৃষ্ণ দাস পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি—সকলেই তাঁর ঐকান্তিক চর্চার বলয়ভুক্ত হয়েছেন, কেউ তাঁর মনোযোগের বহির্ভাগে থাকেননি।

এ কথা ঠিক যে, তিনি মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি কিন্তু ভুললে চলবেনা যে, যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মূল ধাত ছিল ঐতিহাসিকের—গবেষকের; সমালোচকের নয়। মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের কাব্য—প্রতিভার বিচার ও সন্দর্শনমূলক বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়, এখনও হচ্ছে; যোগেশচন্দ্র তাঁর স্বকীয় বিচারণার ক্ষেত্র ছেড়ে এই ক্ষেত্রে গিয়ে আর অযথা ভিড় বাড়াননি। তাঁর লেখনী তথ্যাশ্রয়ী, মনন যুক্তিবাদী, কাব্যের সংবেদনশীলতার সরণীতে বিচরণের অভ্যাসকে পুষ্ট করার অবসর তাঁর জীবনে বড়ো একটা হয়নি। কেমন করেই বা হবে? ইতিহাস আর সমাজ গবেষণায় যিনি সমর্পিতপ্রাণ এবং এ কাজে যাঁর সমগ্র সময়

উদ্যম আর অভিনিবেশ নিয়োজিত, তাঁর ক্ষেত্রান্তরে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কি উপায় আছে? না, বিক্ষিপ্ত হলে চলে? কিন্তু নিজ সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্যপরতন্ত্র। এমন তন্ময়তা নিয়ে বাংলার উনিশ শতকের ধর্ম সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না। এমন কি, সহকর্মী সুহৃৎ অগ্রজপ্রতিম যে ব্রজেন্দ্র নাথের দৃষ্টান্তকে পুরঃসর করে তিনি ইতিহাস গবেষণায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁকেও তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে। ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড উনিশ শতকের খুবই মূল্যবান সামাজিক দলিল এবং তাঁর প্রবর্তিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' পর্যায়ে তাঁর নিজের লেখা বইগুলি যথেষ্ট দামী হলেও দুইয়ের কাজের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিভঙ্গীরও ভেদ হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র সংকীর্ণ কিন্তু অনুসন্ধান নিবিড়; অন্য পক্ষে যোগেশচন্দ্রের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেক বেশী ছড়ানো এবং লক্ষ্য অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী; অর্থাৎ গোটা উনিশ শতকটাকেই তিনি তাঁর মনোযোগের সীমার অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধে একটা বিশেষ প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিপাদ্য কী একটু পরেই সে বিষয়ে আলোচনা করছি। তবে দুয়ের মধ্যে এক ব্যাপারে প্রচণ্ড মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেটা তাঁদের গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কিত। কথাটা একটু বিস্তার করে বোঝানো আবশ্যক।

আমাদের দেশে সত্যিকার উচ্চকোটির পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সচরাচর গবেষণার নামে যা চলে তা হলো এক হাত থেকে অন্য হাতে, অন্য হাত থেকে তৃতীয় হাতে, তৃতীয় হাত থেকে চতুর্থ হাতে পরম্পরাক্রমে বাহিত তথ্যের কারবার। লোকশ্রুতিকে আপ্তবাক্য বলে চালানোর অভ্যাসও বড়ো কম নয়। বাংলা সাহিত্যের সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণা বলতে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর 'সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড' 'থার্ড-হ্যাণ্ড' 'ফোর্থ-হ্যাণ্ড' সংবাদেরই বেসাতি বোঝায়। অর্থাৎ ফাঁকির কারবার। কিন্তু পাছে লোকে ফাঁকি ও মেকিটা ধরে ফেলে এই আশঙ্কায় ওই তথাকথিত গবেষণা-কর্মকে সাধ্যমতো প্রতীতিযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করা হয়। কী ভাবে? না, গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া উদ্ধৃতির বহর সংযোজনা করে, পাদটীকায় চোখে-সর্ষেফুল-দেখিয়ে-ছোড়া গুঁড়ি-

গুঁড়ি অক্ষরের মালা গেঁথে, এবং সর্বোপরি (অর্থাৎ কিনা সর্বশেষে) পর্বত-প্রমাণ গ্রন্থতালিকা জুড়ে দিয়ে। ভাবখানা এই যে. কোটেশনে, ফুটনোটে আর বিবলিওগ্রাফীতে এত এত পাণ্ডিত্যের প্রমাণ যখন এনে হাজির করেছি, তখন কি আর আমার পাণ্ডিত্যে কোনো রূপ সংশয় প্রকাশ করা চলে? কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এইসব পাণ্ডিত্য—প্রদর্শনবাদী পাণ্ডিত্য. প্রায়শঃ লোককে ভাঁওতা দেবার একটা কৌশল। যথার্থ পণ্ডিতেরা এ-জাতীয় কৌশলকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ আর যোগেশচন্দ্র ছিলেন যথার্থ পণ্ডিত গবেষক। তাই তাঁরা এ-জাতীয় কৌশলকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন। লোক-দেখানো পাণ্ডিত্যের জারিজুরি সযত্নে বর্জন করে তাঁরা সর্ব ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্যাশ্রয়িতার পথ গ্রহণ করেছিলেন। এ দুজন যখনই কোনো তথ্য প্রচার করেছেন সর্বাগ্রে সেই তথ্যের মূলানুসন্ধান করেছেন, মূলানুসন্ধান করে সেই তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে তবে তাঁরা তথ্য জনসমক্ষে উপস্থিত করার ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় সত্যনিষ্ঠার চর্চায় গ্রন্থপঞ্জীর গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনার পরিশ্রম স্বীকার করার দরকার করে না, ফুটনোটের দরকার করে না, এমনকি উদ্ধৃতি না দিলেও চলে; শুধু নিজের প্রতি খাঁটী থাকাটাই যথেষ্ট। নিজেকে নিজে চোখ না ঠেরে, প্রবঞ্চিত না করে. যিনি সত্য পথের অনুসরণ করেন, তিনিই যথার্থ সত্যনিষ্ঠ লোক। এই মানদণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ আর যোগেশচন্দ্র উভয়েই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ গবেষক। সত্যের প্রতিষ্ঠায় প্রতি ক্ষেত্রে মূলের উপর নির্ভরতা এবং আকরিক তথ্য যাচাই না করে তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার সংযম উভয়ের গবেষণা-কর্মকে এমন একটা শক্তি আর বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে যা আমাদের দেশের গবেষণা-সাহিত্যে বিরলনিদর্শন বললেও চলে।

যোগেশচন্দ্রের বইগুলি নাড়াচাড়া করলে দেখা যায় তাতে ফুটনোট বা গ্রন্থপঞ্জীর ঝামেলা কম। উদ্ধৃতি আছে, তবে তার সবই বক্তব্যের সঙ্গে একান্তরূপে সম্পৃক্ত ও বক্তব্যের সমর্থনমূলক উদ্ধৃতির জন্যই উদ্ধৃতি উদ্ধারের দৃষ্টান্ত একটিও নেই। অথচ বইগুলির পাঠ্যবস্তু অনুধাবন করলে দেখা যায় তাঁর অতি সাদামাঠা আপাতগুরুত্বহীন বিবৃতির পিছনেও অনুসন্ধানের একটা ভূমিকা আছে। বাহ্যতঃ স্বচ্ছন্দগতি পাঠের তলায় তলায় রয়েছে পদে পদে

প্রদত্ত তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের গুরুশ্রম। পূর্বেই বলেছি, মূল অনুসন্ধান না করে যোগেশচন্দ্র কখনও তথ্য ফিরি করতেন না। এই কথাটাকে উপমা প্রয়োগে বলবার চেষ্টা করলে এই রকম দাঁড়ায়: নদী যখন সমতলে নেমে এসেছে, তখন তার উৎসের কথা খুব কম লোকেই চিন্তা করে। যোগেশচন্দ্রকে এজন্য কী সাংঘাতিক মূল্যই না দিতে হয়েছিল!

মূলানুসন্ধানের তাগিদে ক্রমাগত লাইব্রেরী আর মহাফেজখানার কীটদষ্ট ধূলিসমাকীর্ণ ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ধকল সয়ে তিনি শেষাবধি তাঁর চক্ষুরত্ন দুটি হারিয়েছিলেন। তাঁর চোখ-হারানো তাঁর একনিবিষ্ট বাণী সেবারই মর্মান্তিক পুরস্কার। কোনোরূপ গোঁজামিলের পথে না গিয়ে, অতন্দ্র নিষ্ঠায় অব্যভিচারী চিত্তে বাগদেবীর ভজনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেবীকে সঁপে দিয়েছিলেন: তিনি তাঁর নয়নোৎপল দুটি তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন। হায়, এমন ভাবেই কি বাণীসেবা করতে আছে? মূলানুসন্ধানের প্রবৃত্তিকে আর একটু নীচু সুরে বাঁধলে কী ক্ষতি হতো? জ্ঞানার্জনের একটি প্রধান নির্ভর অথরিটি। পূর্ব যুগের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের একটা মোটা পরিমান অংশকেই অপ্রতিবাদে মেনে নিয়ে আমাদের জ্ঞানের জগতে অগ্রসর হতে হয়। অপরের প্রদত্ত তথ্য ও বিবৃতিকে কথায় কথায় যাচাই করবার চেষ্টা করলে সংসারে এক পা এগনো যায় না, জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয়, যোগেশচন্দ্র সেই অসাধ্য সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সত্য নিরূপণের প্রক্রিয়ায়। পূর্বসূরীদের পরিবেশিত তথ্য ও সংবাদে সত্যাসত্য নিরূপণের আগ্রহে পদে পদে উৎসে ফিরে যাবার চেষ্টা করে তিনি নিজের উপর অত্যধিক পরিশ্রমের গুরুভার চাপিয়েছিলেন। এবং ফলে স্বাস্থ্য খুইয়েছিলেন। একেই বলে সততার বিড়ম্বনা। মানুষ ছিলেন তিনি আপাদমস্তক সৎ। স্বীয় সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে ষোল-আনা সত্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে চরম মাশুল তাঁকে গুনে দিতে হয়েছিল। সান্ত্বনা এই যে, দৃষ্টিহীনতার কারণে শেষ বয়সে তাঁকে বিচিত্র অসুবিধার মধ্যে পড়তে হলেও জোড়াতাড়ার সত্যের কারবার তিনি কখনও করেননি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সত্য ও তথ্যনিষ্ঠা অব্যাহত রেখেছিলেন।

যে কাজের পরিনামে যোগেশচন্দ্রের জীবনে ভীষণ দুর্দৈব নেমে এসেছিল, সেই কাজটাই অমিত সুফলের কারক হয়ে দেখা দিয়েছে ভবিষ্যদবংশীয়

গবেষকদের কাছে। বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রজন্মে যে সব গবেষক উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে কাজ করতে চান বা চাইবেন, তাঁদের পথ বহুগুণে সরল করে দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রের পরিবেশিত তথ্যরাজিকে অপ্রতিবাদে মেনে নিয়ে বর্তমান বা ভবিষ্যদ বংশীয় গবেষক স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারেন উনবিংশ শতাব্দীর উপর নতুনতর আলোকপাতের আশায়। যোগেশচন্দ্র যেখানে অনুসন্ধান থামিয়েছেন, সেইখান থেকে নূতন পথ পরিক্রমায় বহির্গত হওয়া যেতে পারে। যোগেশচন্দ্রের অনুসরণে তার উজান ঠেলে উৎসে ফিরে যাওয়ার আদৌ আবশ্যকতা নেই। কেন না সেই কাজটি যোগেশচন্দ্র নিজেই এমন নিখুঁত ভাবে সমাধা করে গেছেন যে, ওই দিকে আর কোনো অসম্পূর্ণতার ফাঁক রাখেন নি। তাঁকে অক্লেশে যাত্রাবিন্দু রূপে জ্ঞান করে এবারে নতুন নতুন পথে অভিযানের পালা; নতুন নতুন দিগন্তে উন্মোচনের সাধনা। বলা যেতে পারে পরবর্তী গবেষকদের কাজের সৌকর্যের জন্য নিজে প্রাণঘাতী পরিশ্রম করে বাংলার উনিশ-শতকের বিশাল তথ্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে তার চাবিকাঠিটি তাদের হাতেই দিয়ে গেছেন।

এইবারে বিবেচনা করা যেতে পারে উনিশ-শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বিশেষ বক্তব্যটি কী ছিল? আমি যোগেশচন্দ্রের রচনার ধারা অনুধাবন করে এই বুঝেছি যে, তিনি তৎকালীন বাঙালী চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কদের সমাজহিতৈষী প্রগতিশীল ভূমিকাটাকেই বারে বারে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, ধর্ম বস্তুটার প্রগতিশীল ভূমিকা অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাটাই মানব ইতিহাসে বেশী প্রকট। ধর্ম মানুষের মনে নানাবিধ যুক্তিহীন সংস্কারের জন্ম দেয় এবং তার পশ্চাৎমুখীনতাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইউরোপে পুনরুজ্জীবনের আগে পর্যন্ত ধর্মের এই মানবচিত্ত-বন্ধনকারী অন্ধতার ভূমিকাটাই প্রধান ছিল। গোটা মধ্যযুগ ধরে খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের আধিপত্য, আর গীর্জাবাহিত শিক্ষা জ্ঞানের পায়ে শিকলি পরিয়ে রেখেছিল। আমাদের দেশে মধ্যযুগের ইতিহাসও কিছু ভিন্ন নয়। এখানেও ধর্মের নামে ক্রুর অদৃষ্টের স্তবস্তুতি আর প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবদেবীর মূঢ় মহিমার কীর্তনটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল ভীতচকিত লোকমনে। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না, পক্ষান্তরে কুসংস্কারটাই যেন ছিল তার গোত্রলক্ষণ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার খাত-বেয়ে-আসা

যুক্তিবাদের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার আগে পর্যন্ত বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসের এই চেহারাটাই পরিচিত চেহারা ছিল। বাঙালীর শাক্তত‌ন্ত্র কুসংস্কারে ভরা, আর বৈষ্ণবদের রীতিপদ্ধতিও তার ব্যতিক্রম নয়। চৈতন্যদেব তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজের একাধিক যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করেছিলেন সত্য কথা, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার বিলোপ—এইক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড়ো অবদান কিন্তু কৃষ্ণে ভগবানত্বের আরোপ আর রাধা-কৃষ্ণের দৈবলীলায় আধ্যাত্মিকতার তথা অলৌকিকতার সমাবেশ শাক্ত ধর্মের মতো তার ধর্মকেও একান্ত যুক্তি-অসহ করে রেখেছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণবদের এই যুক্তিবিরোধী ঐতিহ্য অদ্যাবধি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথ শাস্ত্রী—এদের ধর্মান্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এখানে যে, তারা তাদের প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের ও যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রভাবে ধর্মকে তার এতদিনের অভ্যস্ত অতিপ্রাকৃতের কুহক থেকে উদ্ধার করে তাকে যুক্তির সরণীতে এনে স্থাপন করলেন। ধর্ম তাদের হাতে প্রতিক্রিয়ার যন্ত্র না হয়ে অগ্রগতির সহায় হয়ে উঠল। বাঙালীর মনকে তারা অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে চালনা করলেন। এই মানদণ্ডে বিচার করলে উনিশ-শতকের ধর্মান্দোলনকে পুরাতন পরিচিত ধর্মের পুনরুজ্জীবনবাদী (রিভাইভ্যালিষ্ট) আন্দোলন মোটেই বলা উচিত হবে না, বলা উচিত তা যুগোপযোগী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এবং সমাজের সর্ববিধ উন্নতি-মানসে এই সংস্কার চেষ্টার প্রবর্তন করা হয়েছিল। আর সত্যি, উন্নতি হয়েছিলও অভূতপূর্ব ও বহুমুখী। সমাজ সংস্কারে, শিক্ষায়, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে, লোকশিক্ষার প্রচারে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানচর্চায়, রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণে, শাসককুলের ও তাদের স্বজাতীয়দের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার প্রাণপ্রবাহের যেন ঢল নেমেছিল। সন্দেহ মাত্র নেই যে, এই বাঁধভাঙ্গা বন্যার মূল কারণ ছিল সমাজে নূতন ধর্মচিন্তার প্লাবন আর এই প্লাবনেরই পলিমাটিতে ফলেছিল সৃষ্টিপ্রাচুর্যের অযুত ফসল। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর অনুষঙ্গে ধর্মের ভূমিকা ছিল নিঃসংশয়িতরূপে প্রগতিশীল, আর সেই প্রগতিশীলতার ভিত্তিমূলে ছিল যুক্তিবাদের দৃঢ় গাঁথুনি।

যোগেশচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজ-

সংস্কৃতির এই শক্তিবাদী বুনিয়াদটির দিকে সকলের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে .বাঙ্গালীকে নতুন করে যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। আজ আমরা বিশ শতকের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এলেও আমাদের মন যে প্রগতিশীল চিন্তার পথ ধরে চলেছে এমন কথা বলা চলে না, বরং একাধিক ক্ষেত্রে আমাদের মন পশ্চাদ্‌গামিতার লক্ষণে ভারাক্রান্ত, এরূপ বললেই ঠিক বলা হয়। নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস, অলৌকিকতার মোহ, অতি-প্রাকৃতের মায়া জাতীয়তার ছদ্মাবরণে পুনরায় আমাদের মনে জাঁকিয়ে বসতে চাইছে। স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে কোথায় আমাদের মন আরও সংস্কারমুক্ত হবে, তা নয়, সংকীর্ণ জাত্যভিমানের রন্ধ্রপথ ধরে নানা মেকী আদর্শ, ততোধিক মেকী দেবতা আমাদের বিমুগ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত মনের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট। এই এক সময়, যখন উনিশ শতকের সংস্কারমুক্ত মননের দ্বারা চালিত হলে আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকার হতো; অথচ সেই সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই আমরা ভুলে যেতে বসেছি। যোগেশচন্দ্রের রচনাবলীর গুরুত্ব ও সার্থকতা এই যে, তিনি তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে বাঙালী মনের সেই বৈশিষ্ট্যকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, যা যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, মানবতামুখী, ঐহিক ও সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ব্যক্তি-জীবনে তিনি গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাসী ছিলেন বলেই জানি, কিন্তু সেটা এক কথা, আর পরকালীন মূল্যবোধে আস্থা স্থাপন আরেক কথা। পারলৌকিক মূল্য বোধগুলির প্রতি তাঁর যে বিশেষ সম্ভ্রমবোধ ছিল, তাঁর লেখায় অন্ততঃ তার কোনো প্রমাণ নেই। ধর্মের বিমূর্ত রূপেরও তিনি উপাসক ছিলেন না। ধর্মের সমাজহিতকর জাতীয়-উন্নয়নমূলক রূপেরই তিনি উপাসক ছিলেন। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের হিতবাদী চিন্তা তার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্মের 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' বা বিশুদ্ধ রূপ নয়, ধর্মের 'প্র্যাগম্যাটিক বা উপযোগবাদী রূপই তাঁর সমধিক মনোহরণ করেছিল। তা যদি না হতো তো তিনি ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসই লিখতেন, যুক্তিবাদী ধর্মসাধনার বিচ্ছুরণরূপে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মৃত্তিকায় যে সব যুগন্ধর মানুষের এবং যে সকল বিদ্বজ্জন সমাজ আর প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়েছিল সে সবের ইতিবৃত্ত প্রণয়নে এমন প্রকাণ্ডরূপে তাঁর সময়, উদ্যম আর মনোযোগ ব্যয় করতেন না। উনিশ শতকের দিকপাল ব্যক্তি-পুরুষদের আলোচনা তো তিনি

করেছেনই, তৎকালীন বিদ্বজ্জন সভাগুলির সবিস্তার কাহিনী এবং জ্ঞান ও শিল্পকলাচর্চার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসও তিনিই প্রথম ধরে দিয়েছেন বাঙালী পাঠকের কাছে (তাঁর 'বেথুন সোসাইটি', বেথুন কলেজের ইতিহাস, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস, হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন° 'হিন্দু মেলা', 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র,' 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা' প্রভৃতি সন্দর্ভ ও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনিই পথিকৃৎ। পরে অবশ্য বিনয় ঘোষ এবং আরও কতিপয় তরুণতর সমাজ-গবেষক এই পথে অগ্রসর হয়েছেন, তবে তাঁর দৃষ্টান্তই যে এই ক্ষেত্রে অনুপ্রাণনার কাজ করেছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করা যায় তা হলো প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের বিবরণ দিতে গিয়ে কখনও-কখনও তিনি প্রতিক্রিয়ার শিবিরের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের উপরেও তাঁর মনোযোগ ন্যস্ত করেছেন। যেমন, রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান রামকমল সেন প্রমুখের জীবনচরিত তিনি রচনা করেছেন। সকলেই জানেন যে রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিষেধ আন্দোলনের বিরোধীদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য, তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের নেতৃপ্রধান রূপে। দেওয়ান রামকমল সেন ডিরোজিও আর তৎচালিত ইয়ং বেঙ্গলদের উপর ছিলেন খড়্গহস্ত এবং হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষক ডিরোজিওকে উৎখাত করবার উদ্যমে তাঁর চেষ্টাও ছিল সর্বাপেক্ষা বিসদৃশরূপে প্রকট। রাজা রাধাকান্তকে এই ব্যাপারে তিনি একজন প্রধান সহায়করূপে পেয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য। এঁদের এই ধরণের সুবিদিত রক্ষণশীল কর্মতৎপরতা থেকে মনে হতে পারে যোগেশচন্দ্র বুঝি এঁদের এইসব প্রতিক্রিয়াপন্থী কর্মকাণ্ডের সমর্থন জানিয়েছেন। মোটেই তা নয়। রাধাকান্ত কিংবা রামকমল তৎকালীন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নেতৃপ্রধান হলেও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিত্তকৌলীন্য তাঁদের শক্তিক্ষমতার একটা প্রধান স্তম্ভ ছিল কিন্তু কেবলমাত্র সেইটেই তাঁদের শক্তির নির্ভর ছিল না। যেমন তাঁরা একাধিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি একাধিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মনোবৃত্তির দ্বারাও চালিত হয়েছেন এবং উনিশ শতকের সেই প্রথমার্ধের বৎসরগুলিতে বাঙালী সমাজের উন্নয়নে অগ্রচারীর ভূমিকাও পালন করে গেছেন।

ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে, বিশেষ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়, এতদুভয়েরই ভূমিকা ছিল মূল্যবান। তাছাড়া শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রচারে রাধাকান্তের ভূমিকা বিশেষ গণনীয়। পণ্ডিতদের সহায়তায় তৎসংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' সংস্কৃত কোষগ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রয়াস। যোগেশচন্দ্র এঁদের এইসব প্রগতিশীল ভূমিকার উপরেই জোর দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতার সমর্থন করেন নি। তা তিনি করতে পারেনও না। বাংলার উনিশ শতকের ধর্ম সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর মনোযোগ ক্ষেপণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সঞ্চালিকা প্রেরণা ছিল যুক্তিকর্ষিত ধর্ম-সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের আদর্শ। তৎকালের যে-কোনো চেষ্টা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, তাকেই তিনি অকৃত্রিম সমর্থন জানিয়েছেন। যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু-পরবর্তী আলোচনায় কারও কারও মূল্যায়নে লক্ষ্য করেছি তাঁকে মূলতঃ রক্ষণশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা মোটেই ঠিক নয়। তা যদি হতো তো যে-উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর সমাজ-প্রগতির এক প্রধান স্বর্ণ যুগ, তার স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণে তিনি এমন একাগ্র নিষ্ঠায় আত্ম-নিয়োজিত হতে পারতেন না। এ কথা এখানে বিবৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে যে, ব্যক্তিজীবনের ধর্মাচরণে তিনি নৈষ্ঠিক হিন্দু হলেও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনিশ শতকের অনেক উচ্চ শিক্ষিত নাগরিক বাঙালী যেমন বাইরে হিন্দু ধর্মের প্রথাসিদ্ধ আচার-আচরণ মেনে চললেও ভিতরে-ভিতরে ছিলেন ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন তেমনি যোগেশচন্দ্র একালীন পরিবেশে জন্মেও বিগতকালীন ব্রাহ্মধর্মের সমাজ-উন্নয়নের আদর্শকে অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করতেন। লক্ষ্য করা যায়—উনিশ শতকের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ব্যক্তিওয়ারী যতো আলোচনা তিনি করেছেন তার একটা মোটা অংশই জুড়ে আছেন ব্রাহ্ম-নায়ক ও ব্রাহ্ম কর্মী—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ-মোহন, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী, মহেশ আতর্থী প্রমুখ। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি-জীবনে আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং প্রবাসী পত্রিকার সহিত সংযোগের প্রভাব তাঁর উপর সবিশেষ কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে এটা অনুমান মাত্র। এই সংযোগ-নিরপেক্ষ ভাবেও

তিনি অনুরূপ ভাবনা-ধারণায় উপনীত হতে পারতেন। তাঁর অনুসন্ধানের প্রকৃতি আর সত্যের আবেগই তাঁকে উনিশ-শতকীয় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল, এইরূপ ভাবাই যুক্তিযুক্ত।

অন্যদিকে, 'ইয়ং বেঙ্গলে'র নেতাদের উপরেও তাঁর গবেষণার পরিমাণ কম নয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্তি-ওয়ারী আলোচনার প্রাবল্য। ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ তাবৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ডিরোজীয়দের কর্মকৃতির বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন অনন্য যত্নে। ডিরোজীয়-শিষ্যরা ছিলেন মনে প্রাণে র‍্যাডিকাল—বিদ্রোহের বাণীবাহক। তাঁদের আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে তিনি কখনই তাঁদের উপর এতদূর মনোযোগ আরোপ করতে পারতেন না। তাঁদের প্রাথমিক উচ্ছৃঙ্খলতার অবশ্যই তিনি সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের উত্তরকালীন দেশপ্রেমী সমাজব্রতী সত্তার নিশ্চয়ই তিনি সর্বৈব অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের ইতিহাস তিনি শুধু ঐতিহাসিকের কলমেই গ্রথিত করেন নি,—শ্রদ্ধাবান্ লেখকের কলমেও গ্রথিত করেছেন।

এই তথ্য কি তাঁর রক্ষণশীল প্রকৃতির নির্ণায়ক?

তবে এ কথা ঠিক যে, তিনি উনবিংশ শতার্দ্ধা-সংক্রান্ত তাবৎ জ্ঞাতব্য তথ্য অবিকৃত আকারে পরিবেশন করতে গিয়ে তথ্যাশ্রয়িতার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন, বিশ্লেষণের দিকে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারেন নি। এই কারণে তাঁর রচনা যতোটা সংবাদধর্মী হয়ে উঠেছে, ততোটা সমাজবিশ্লেষণাত্মক হতে পারেনি। যোগেশচন্দ্র যদি এরিক ফ্রোম, ম্যানহাইম সোয়েকিন প্রমুখ আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের ধরনে তথ্য-চয়নে ও তথ্যের বিশুদ্ধি সম্পাদনে অতিরিক্ত মাত্রায় স্থিতপ্রযত্ন না হয়ে সমাজ-প্রবাহের গতির দিকে অধিকতর নিবদ্ধদৃষ্টি হতেন এবং তদানীন্তন সমাজের ঝোক ও প্রবণতার রূপরেখাকে সমনোযোগে নির্দেশ করবার চেষ্টা করতেন তা হলে সমাজতাত্ত্বিক চর্চা হিসাবে তাঁর আলোচনা যে আরও বেশী সারবান হয়ে উঠত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, দুই বা তিন গবেষকের অন্যতম। তার উপর পুঞ্জীভূত তথ্যস্তূপ থেকে আগাছা বাছাই করে কেবল মাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলিকে

খুঁজে বার করতেও তাঁকে বড়ো কম সময় দিতে হয়নি। এই অত্যাবশ্যক প্রারম্ভিক কাজেই যদি তাঁর মূল্যবান সময়ের একটা মোটা ভাগ চলে যায় তা হলে তিনি সমাজ বিশ্লেষণের জন্য কতোটা সময় পেতে পারেন? তথ্যের ঝাড়াই-বাছাইয়েই যদি উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল তো সেই তথ্যকে অবলম্বন করে তত্ত্ব দাঁড় করাবেন তিনি কোন্ অবসরে? কাজেই তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাঁর রচনার অপূর্ণতা না থেকেই পারেনা। তবে এটা ঠিক যে, ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য তিনি অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তাঁর রচনাবলীর ভিতর। তথ্যের প্রতি আত্যন্তিক মনোযোগী হওয়ার দরুণ এবং সময়াভাবে ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে নিজে তিনি যে কাজ করে যেতে পারেন নি, সেই কাজের বরাত চাপিয়ে দিয়ে গেছেন নূতন প্রজন্মের ও ভবিষ্যতের গবেষক-লেখকদের উপর।

তাঁর রচনার অতিরিক্ত ব্যক্তি-ওয়ারী ঝোঁকও কোনো কোনো মহলে সমালোচনার কারণ হয়েছে। এটাকেও আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানোচিত বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার বিপরীত ধারা বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমালোচনার উত্তরে যোগেশচন্দ্রের সমর্থনে এই বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রে তিনি 'মহান্ সঙ্গে' রয়েছেন। এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবী ইতিহাসের গতিপথে ব্যক্তির ভূমিকাকে আজও খুব মূল্যবান মনে করেন এবং তাঁর ইতিহাসচর্চায় ব্যক্তিকে তিনি সবিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন বরাবর। ব্যক্তির উপর এই প্রাধান্য আরোপ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত আলোচনাপদ্ধতি নয় নিশ্চয়, কিন্তু এটাও যে ইতিহাসচর্চার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি তা অস্বীকার করা যাবে কোন্ উপায়ে? তাছাড়া, যোগেশচন্দ্র আমাদের দেশেও এ ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ পথিক নন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থ 'দি পোলিটিকাল থট অব দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরিঃ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ' আগাগোড়াই ব্যক্তিভিত্তিক আলোচনা-সম্বলিত একটি ইতিহাস-গ্রন্থ। এই বইটির অনুকরণে বাংলা ভাষায় দু-একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলিতেও নির্ভেজাল ব্যক্তি-ওয়ারী আলোচনারই প্রাধান্য। কখনও কখনও আলোচনার সুবিধার জন্য এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার জন্য এই পদ্ধতির শরণ নেওয়া হয়ে থাকে ইচ্ছাপূর্বক। কাজেই অভ্যাসটা অবৈজ্ঞানিকোচিত নাও হতে পারে।

পরিশেষে একটি কথা। যোগেশচন্দ্র বঙ্গীয় নবজাগরণে মধ্যবিত্তের ভূমিকাকে সমগ্র সমাজের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন। এটাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কিনা সন্দেহ। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিংবা মার্ক্সীয় পরিভাষা অনুসারে, 'বুর্জোয়াজি'র ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই এবং শতমুখে প্রশংসা করেও তাঁদের প্রশংসা শেষ করা যায় না সে কথাও ঠিক; কিন্তু তার থেকে এমন কথা নিশ্চয় বলা চলে না যে, "তাঁদের যাবতীয় কল্যাণকর্ম সাধারণ মানুষের জন্যই উদ্দিষ্ট হয়েছিল।...নেতৃবর্গ জাতীয় ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগে যে-সব কল্যাণকর্ম শুরু করে দেন তা তাঁরা কখনও কোন শ্রেণী বিশেষের জন্য করেন নি, সাধারণ মানুষের জন্যই করেছিলেন।" ('মুক্তির সন্ধানে ভারতঃ কংগ্রেস পূর্ব যুগ', পৃ. ৮৩)। মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা না করলেও এই জাগরণের কতকগুলি অপূর্ণতা ধরা পড়ে। যথা, এই জাগরণ ছিল মূলতঃ হিন্দু জাগরণ, এই জাগরণের পরিধির মধ্যে মুসলমান সমাজের স্থান হয় নি, অথবা তৎকালের মুসলমানেরা ক্ষোভে হোক অভিমানে হোক অথবা বিচার ভ্রান্তিবশতঃ হোক, ওই জাগরণের প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক কৃষকের জাগরণ ওটা নয়, ওই জাগরণ একান্তভাবেই শহরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল। বাংলাদেশে শ্রমিক-কৃষকের জাগরণ অনেক পরের কথা এবং যদি সে ঘটনার কাল নিরূপণ করতে হয় তো বলতেই হয় সেটা ঘটেছে বিশ শতকের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বে। উনিশ শতকে ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদের প্রাধান্য, ব্যক্তিবিশুদ্ধি তথা আত্মোপলব্ধির ধারণাটাই ছিল তখন সমধিক বলবৎ। সামূহিক মতবাদের তখনও নিতান্ত শৈশব দশা। তার পরিপুষ্টি ঘটে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ উত্তাল আলোড়নের দিনগুলিতে এসে। তখন থেকে ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য কমে গিয়ে সমষ্টিবাদের প্রসার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বাংলায় শ্রমিক-কৃষকের জাগরণ ওই বৃদ্ধির স্রোতমুখেই সংঘটিত হয়েছে, উনিশ শতকের বাংলায় শ্রমিক-কৃষকের জাগরণের অঙ্কুরও দেখা দেয় নি। ব্যতিক্রম শুধু নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টি। কাজেই মধ্যবিত্তের জাগরণকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জাগরণের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখাটা ঠিক দেখা বলে মনে হয় না।

যাই হোক, এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন, এর দ্বারা যোগেশচন্দ্রের গবেষণা-কর্মের বিশাল গুরুত্বের হেরফের হয় না। একটি বিশেষ মতভিন্নতার অজুহাতে তাঁর কাজের অশেষ মূল্যবত্তাকে খাট করবার বা চাপা দেবার কোনো উপায়ই নেই: তাঁর কাজ স্বমহিমায় ভাস্বর। এই অক্লান্ত সত্যনিষ্ঠ বাণীসাধকের স্মৃতিতে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করছি।

নবজাগরণের ঐতিহাসিক ঃ যোগেশচন্দ্র বাগল

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত উদ্‌ঘাটনে যাঁরা মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন মনীষী যোগেশচন্দ্র বাগল তাদের অন্যতম। যোগেশচন্দ্র বলেছেন খ্যাতনামা গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পন্থা অনুসরণ করে তিনি এ আয়াসসাধ্য ইতিহাস রচনার দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কোন যশ মোহ বা পুরস্কারের লোভে তিনি এ দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেন নি। শুধু মাত্র স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসের সত্য অনুসন্ধানে সমস্ত জীবনব্যাপী তার এই অক্লান্ত পথযাত্রা।

বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণ সুদূর ইতিহাসের সামগ্রী না হলেও তার সত্যিকারের পরিচয় ছিল বহুকাল যাবৎ আলো-আঁধারিতে আচ্ছন্ন। ব্রজেন্দ্রনাথ তার মৌলিক গবেষণার সাহায্যে স্বদেশের সেই গৌরবময় ইতিহাসের অনেক উল্লেখযোগ্য অংশ দিনের আলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। যোগেশচন্দ্রও ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত গবেষণার দুরূহ পথে অগ্রসর হয়ে নবজাগরণের ইতিহাস রচনাকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়েছেন। গবেষণার নতুন ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র তার "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থের নিবেদন-এ বলেছেন : 'সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী রিপোর্ট, সরকারী আনুকূল্যে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কার্যবিবরণ, মনীষীদের লেখা চিঠিপত্র, দিনলিপি, আত্মজীবনী প্রভৃতি আকর হইতে তথ্যাদি অনুসন্ধানপূর্বক বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকে নতুন আলোকপাত করার সুবিধা হইয়াছে। এই কাজটি দুইভাবে করা যাইতে পারে—প্রথম : মনীষীদের জীবনকেন্দ্রিক ; দ্বিতীয় : শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতাকেন্দ্রিক'।

মনীষী যোগেশচন্দ্র তার কয়েকখানি গ্রন্থে উপরে বর্ণিত দুই পথে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তার মধ্যে দুখানি গ্রন্থ বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। সে গ্রন্থ দুখানির নাম: 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' এবং 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'। এ দুখানি গবেষণাত্মক গ্রন্থে বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাস কী পরিমাণে রূপ পেয়েছে বর্তমান আলোচনায় তা দেখাবার চেষ্টা করা হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘর্ষে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এই নবজাগরণকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপ দিতে শুরু করেন শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন চিন্তাশীল মণীষী এবং কর্মবীর। এঁদের মধ্যে সকলেই যে বাঙালী ছিলেন তা নয়। কেউ ছিলেন অবাঙালী—ভারতীয়, কেউ কেউ ইঙ্গবঙ্গ, আবার অভারতীয় কোন কোন ইংরেজও উদার মানবহিতৈষণার প্রেরণায় বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের নবরূপায়নকার্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দুজন অক্লান্তকর্মী প্রতিভাধর পুরুষের নিঃস্বার্থ সেবায় ও যত্নে এ নবরূপায়ণ কার্য শুরু হয় তাঁরা হলেন রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শতাব্দী শেষে যে কর্মবীর এ নবরূপায়ণ কার্যকে বহুদূর এগিয়ে নেন তিনি হলেন যুগমানব বিবেকানন্দ। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' পড়তে গিয়ে এ তিনজন যুগস্রষ্টার কর্মকাণ্ডের অনুল্লেখ দেখে পাঠক প্রথমে একটু বিভ্রান্ত বোধ করে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' হস্তান্তরিত (Second-hand) উপকরণ-নির্ভর নবজাগরণের আলোচনা গ্রন্থ নয়। যে নানামুখী ব্যক্তিত্ব, উপাদান এবং উপকরণ বাঙালী-জীবনের মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে বিনষ্ট করে আধুনিক যুগের তোরণপ্রান্তে উত্তীর্ণ করে দিতে সহায়তা করেছিল উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। গ্রন্থের নিবেদন অংশে লেখক বলেছেন: 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নথিপত্র ঘাঁটিয়া রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আমাদিগকে পরিবেশন করেন। ইহার ফলে যে সব বিষয় ছিল আমাদের কাছে স্বল্পজ্ঞাত বা অস্পষ্ট তাহা যাচাই করিয়া লইবার দরুণ স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছে।' নবতর কোন তথ্যের অভাবে যোগেশচন্দ্র এ দুজন রেনেসাঁসের স্রষ্টার জীবন-কাহিনীকে তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহ বোধ করেন নি। একই কারণে বিবেকানন্দের জীবন এবং কর্মকাণ্ডকেও তিনি গ্রন্থভুক্ত করেন নি—এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

এ ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে লেখক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। এ কারণে শতাব্দীর শেষার্ধের বিবেকানন্দ-জীবন বাদ যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণের পরিচিতিতে সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন এ ভাবে: 'শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম অতি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র ও সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত তৎকালীন কাগজপত্রের সাহায্যে এই যুগের একটা যথার্থ রূপ ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তাহারই আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাঁহার সেই বহু আয়াস সাধ্য গবেষণার ফল। ব্রজেন বাবু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের যে দিকটা বাদ দিয়া গিয়াছিলেন, যোগেশ বাবুর যত্নে সেই দিকটি ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে; এই কারণে তিনি বাঙালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র।'

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে লেখক যে সমস্ত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত এবং কর্মের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা সকলেই যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন এমন নয়। আলোকিত রঙ্গমঞ্চে জনসাধারণের প্রশংসাধন্য না হলেও নেতৃত্বগৌরবহীন এ সমস্ত ব্যক্তি নীরবে নিভৃতে নিজেদের অনলস কর্মের দ্বারা সুষুপ্ত জাতির নবজাগরণের পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে যাঁদের জীবন ও কর্মের সবিস্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন: দ্বারকানাথ ঠাকুর; রামমোহন ঘোষ; রুস্তমজী কাওয়াসজী; ডেভিড হেয়ার; প্রসন্নকুমার ঠাকুর; হেন্‌রি লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও; তারাচাঁদ চক্রবর্তী; রসিককৃষ্ণ মল্লিক; রাধানাথ শিকদার; ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন; সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী; জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন; ভগবানচন্দ্র বসু; জেমস লঙ্‌। গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক বাঙালীর নবজাগরণে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার এবং আনন্দমোহন বসুর দানের পরিমান নির্ণয় করেছেন। এ ছাড়া নব্যবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অনুষ্ঠান-পত্রের প্রতিলিপি উদ্ধার করে দিয়েছেন। আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়ানজী পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত বোম্বাইয়ের অধিবাসী, ডিরোজিও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান,

ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন, বেথুন, জেমস লঙ্ ইংরেজ, বাকী সকলে বাঙালী। উক্ত অবাঙালী বা অভারতীয় ব্যক্তিরাও নিজেদের অবিচ্ছিন্ন কর্মকৃতির দ্বারা বাঙালীর নবজাগরণের সহায়ক হয়েছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে রামলোচন ঘোষ কিংবা ভগবানচন্দ্র বসুর মত ব্যক্তি লোকলোচনের অন্তরালে থেকে নিজেদের নীরব নিভৃত ও অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসের সাহায্যে বাঙালীর নবজাগরণকে বহুবিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিলেন। লোকস্মৃতি থেকে আজ তাঁদের নাম মুছে গেলেও, লেখকের মতে, নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁদের দান-ও কম নয়। যোগেশচন্দ্র সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক। বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস রচনায় তিনি ক্ষুদ্র তুচ্ছ উপাদানকেও বাদ দিতে চাননি। রেনেসাঁসের সুখপাঠ্য কাহিনী রচনা তার অভিপ্রেত ছিল না। আয়াসসাধ্য উপকরণ সংগ্রহের সাহায্যে ইতিহাসের সত্যরূপকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি পাঠকের সামনে।

গ্রন্থবর্ণিত বাঙালী, অবাঙালী এবং অভারতীয় বিদেশীর আন্তরিক প্রয়াসে বিগত শতাব্দীতে বাঙালীর ইতিহাসের নবরূপায়ণ কার্য কি পরিমানে অগ্রসর হয়েছিল যোগেশচন্দ্রের অনুসরণে এখানে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে লেখক প্রথমে উদ্‌ঘাটিত করেছেন রামমোহন-সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন ও কর্মবৃত্তান্ত। লেখকের মতে, ঐহিকতা রেনেসাঁসের একটি মূল প্রেরণা। ঐকান্তিক ভাববাদ এবং দারিদ্র্যের অভিশাপকে অতিক্রম করে জীবনে প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধিলাভের প্রয়াস রামমোহনের মত দ্বারকানাথের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালী যখন রাজানুগ্রহ এবং চাকরীর স্বপ্ন দেখছে, প্রবল ব্যক্তিত্বশালী বাঙালী দ্বারকানাথ তখন স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে বিজয়ী ইংরেজের সমকক্ষতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন—বাঙালীর এ আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত কর্মৈষনা নবজাগরণের ইতিহাসে একটি উল্লেখ মাইলস্টোন। অনেক লেখকের মত যোগেশচন্দ্রও মনে করেন, '১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিঅম বেণ্টিঙ্কের ইংরেজী শিক্ষা প্রচারমূলক ঘোষণা অপেক্ষা ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার ঠাকুর কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।' কথাটির তাৎপর্য হলো—নীতি হিসেবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ জাতির মানসসম্পদ

বৃদ্ধির যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি দ্বারকানাথের স্বাধীন কর্মোদ্যমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার নিষ্ক্রিয় স্বদেশবাসী অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। এক কথায়, পুরুষসিংহ দ্বারকানাথ বহুকাল-লালিত বাঙালীর তরল ভাববাদী জীবনদৃষ্টিকে আধুনিক জগতের বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালী-মনের হীনমন্যতা দূরীকরণেও সহায়ক হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে বাঙালী-মনকে আধুনিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করবার প্রয়াসও রেনেসাঁসের ইতিহাসে দ্বারকানাথের বিশিষ্ট দান। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রথম যুগে দ্বারকানাথের বিশিষ্টতম দান বোধহয় স্বদেশবাসীর মনে আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রথম উদ্বোধন। শুধু মাত্র পাশ্চাত্যকে জানবার আগ্রহে দ্বারকানাথ সেই কূপমণ্ডুকতার যুগেও এত আয়াসসাধ্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছিলেন এবং প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মানসিক রাখীবন্ধন কার্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। মনীষী ম্যাক্সমূলার দ্বারকানাথের এই উদার ও বহুমুখীমানসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এ দেশের শিল্পবিপ্লবেও প্রথম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন দ্বারকানাথ। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যাকে জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত করবার প্রয়াসে দ্বারকানাথের আপ্রাণ প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনেও দ্বারকানাথের দান অসামান্য। দ্বারকানাথই সে যুগের বিখ্যাত বাগ্মী এবং উদারনৈতিক মানবতাবাদী জর্জ টম্‌সনকে নব্যবঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—যাঁর অক্লান্ত উৎসাহে নব্যবঙ্গ গড়ে তোলেন এ দেশের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। দ্বারকানাথ সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত হলেও নবজাগরণের পথিকৃৎ এই উল্লেখ্য বাঙালী সম্পর্কে যাঁরা সর্বপ্রথমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যোগেশচন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবজাগরণের কর্মকেন্দ্র কলকাতা হলেও কলকাতার বাইরে শিক্ষাবিস্তার কার্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নবজাগরণকে প্রসারিত করতে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই জনের কথা উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে। একজন লালমোহন ও মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ, আর একজন আচার্য জগদীশ

চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। ঢাকায় সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠায় রামলোচন ঘোষের কর্মোদ্যম উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। কৃষ্ণনগরে কলেজী শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেও তার কৃতিত্ব অপরিসীম। ভগবানচন্দ্র বসুর কর্মজীবনে কুমিল্লায়, ময়মনসিংহে এবং বর্ধমানে থাকাকালীন তার শিক্ষা-বিস্তারও স্মরণীয়। কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু মেলার অনুসরণে ফরিদপুরে একটি জাতীয় মেলার উদ্যোগ করেন। এ ভাবে সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যমে বাঙালী-রেনেসাঁস শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে। মফঃস্বলে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস অনুল্লেখিত থাকলে বাঙালী রেনেসাঁসের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকতো—এ সত্য ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাঙালী মানসের দিগন্ত বিস্তারে সহায়তা করেন রুস্তমজী কাওয়াসজী। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পর তিনি খিদিরপুরে এক বিরাট জাহাজের কারখানা গড়ে তোলেন। তার জাহাজগুলি সুদূরপ্রাচ্য, এমনকি পাশ্চাত্যেরও কোন কোন স্থানেও যাতায়াত করতো। ব্যবসাক্ষেত্রে তার বিপুল প্রয়াস দেশবাসীর আত্মশ্লাঘা এবং আত্মপ্রত্যয় বাড়াতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। জীবনবীমা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকেও তিনি দেশবাসীকে আকর্ষণ করেন। এ ভাবে কাওয়াসজী জাতিকে বাস্তব এবং সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী হতে অনুপ্রাণিত করেন; স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দানে, দেশবাসীর মন থেকে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করবার অভিপ্রায়ে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে বিপুল দানে, নাগরিক জীবনের উন্নয়নে রুস্তমজী কাওয়াসজীর আন্তরিক প্রয়াস স্মরণধন্য। বাঙালীর নবজাগরণে ধণিক-বণিকের অকৃপণ দানও যে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল—এ সত্যের স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠিত হননি ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র।

যোগেশচন্দ্র লিখেছেন—কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বাংলা দেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের আবির্ভাব কাল হলো ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এ কালবৃত্তের মধ্যে যে সমস্ত বিদেশীয় ব্যক্তি বাঙালীর নবজাগরণে সহায়তা করেছিলেন তার মধ্যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার অন্যতম। হেয়ারের গুণমুগ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র এই মহাত্মার একটি চমৎকার জীবনী রচনা করলেও

যোগেশচন্দ্র সমকালীন সংবাদপত্র, সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতির সাহায্যে সে জীবনবৃত্তান্তকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। যে-কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবজাগরণের যুগে বাঙালী মনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মধ্যে হিন্দু কলেজ এবং স্কুল সোসাইটীর সঙ্গে হেয়ার সাহেব ছিলেন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। একাডেমিক এসোশিয়েশনের তিনি ছিলেন পরিদর্শক এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার পৃষ্ঠপোষক। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ বিদেশী মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন আচারে-আচরণে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে কিছু ভুল করলেও নতুন শিক্ষায় আলোকদীপ্ত নব্যবঙ্গ জাতিকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের তোরণপ্রান্তে উত্তীর্ণ করে দিতে সমর্থ। এই কারণে, বিদ্রোহী নব্যবঙ্গ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক রক্ষণশীল সমাজের হাতে লাঞ্ছিত হলে এ মাহাত্মা পরম ঔদার্যের সঙ্গে তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। হিন্দু কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারেও তিনি অসামান্য কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেই ব্যাপক ইংরেজী-চর্চার যুগে বিদেশী ইংরেজ হয়েও বাংলা শিক্ষা প্রচলনের জন্য তার প্রয়াস বিস্ময়ের বস্তু। মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ ব্রামলি, জেনারেল কমিটির সেক্রেটারী জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'—রিপোর্টে ও মন্তব্যে শিক্ষা-বিস্তারে হেয়ার সাহেবের তন্ময় সাধনার কথা উচ্ছ্বসিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষাবিস্তারে তদ্‌গতপ্রাণ এ মণীষীর আবির্ভাব না ঘটলে বাঙালীর রেনেসাঁস যে আরো বিলম্বিত হতো তা বলাই বাহুল্য।

যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন—প্রথম নবজাগরণের যুগে নতুন সাহিত্য স্বষ্টিতে যাঁদের অনুপ্রেরণা বাঙালী চিত্তের গভীরমূলে প্রভাব বিস্তার করেছিল ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন তাঁদের অন্যতম। আবৃত্তি সহকারে তাঁর সেক্‌সপীয়র এবং পোপের অধ্যাপনার উচ্চ মান সে যুগে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। অতুলনীয় অধ্যাপনার সাহায্যে তিনি এ দেশীয় ছাত্রদের মনকে ইংরেজী সাহিত্যের মর্মলোকে পৌঁছিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর নিকট সাহিত্য শিক্ষা লাভ করে মধুসূদনের মত প্রতিভাবান কবি বাংলা কাব্যে যুগান্তরের স্বষ্টি করেন। হিন্দু কলেজে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার,

আনন্দকৃষ্ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, জগদীশনাথ রায় জাতীয় জীবনের নব রূপায়নে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে খ্যাতিমান হন। মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে বাঙালী-রেনেসাঁসে যাঁরা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, যদুনাথ ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর দান বহুল আলোচিত হলেও যোগেশচন্দ্র এ মণীষীর জীবন এবং কর্মকৃতিকে গ্রন্থভুক্ত করেছেন—যেহেতু ভাবচেতনার ক্ষেত্রে এই তেজোদৃপ্ত মানুষটির বিশিষ্ট দানের উল্লেখ ছাড়া বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন শিক্ষিত বাঙালীর মনে আবেগময় স্বদেশপ্রেমের উদীপ্ত চেতনা সঞ্চার এবং যুক্তিবাদের ভিত্তি রচনা ডিরোজিওর অন্যতম অবদান। আকাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে তিনিই সর্বপ্রথম নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ করে দেন। ভাবশিষ্যদের মধ্যে সত্যকথনের সৎসাহস সৃষ্টি করে তিনি নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্যদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙালী-জীবনের নবরূপায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে গুরুর স্বপ্ন সফল করেছেন। তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভাববিদ্রোহীরা প্রাচীন সংস্কারলগ্ন বাঙালী জীবনকে আধুনিকতার পাদপীঠের ওপর প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ডিরোজিওর আকাডেমিক এসোসিয়েশন ১৮৩৯ সন পর্যন্ত সক্রিয় থেকে জীবনচঞ্চল নবশিক্ষার্থীর মনে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের বীজ ছড়িয়ে বাঙালীর নব জাগরণকে সার্থক করে তুলেছিল। বস্তুতপক্ষে, শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরূপ মুক্তবুদ্ধির চর্চা না হলে বহুযুগের সংস্কারান্ধ বাঙালী তাঁদের সংকীর্ণ মানসপরিধি অতিক্রম করে বহুমুখী জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে পারতো না। যোগেশচন্দ্র আরো দেখিয়েছেন, রামমোহনের সংস্কারকার্য সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকায় বৃহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। ডিরোজিওর শিষ্যসম্প্রদায় মুখ্যত সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে তারা সমাজের বৃহত্তর অংশকে জাগিয়ে তোলে। বঙ্গের রেনেসাঁসের ইতিহাসে ডিরোজিওর কৃতিত্ব এখানে।

যোগেশচন্দ্রের মতে, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনও বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় নাম। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর কর্মৈষণা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করেই ক্ষান্ত হন নি, ১৮৫১ সনে মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি উইল করে বিদ্যালয়কে দান করে যান। শিক্ষাসমাজের সভাপতি রূপে কলকাতার হিন্দু কলেজ এবং সরকারী বিদ্যালয়সমূহের, হুগলী কলেজের, কৃষ্ণনগর কলেজের এবং ঢাকা কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে ব্যাপক স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে সহায়তা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হলে এ দেশের উন্নতি সুনিশ্চিত হবে বলেই ছিল তাঁর ধারণা। কবিবর মধুসূদনকে বাংলায় কাব্য রচনা করতে তিনিই অনুপ্রাণিত করেন। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' গঠনে তাঁর প্রয়াস ছিল অক্লান্ত। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হিসেবে লোকশিক্ষা প্রসারেও তাঁর দান অপরিসীম। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন শিক্ষা বিস্তারে বেথুনের ক্লান্তিহীন প্রয়াস বাঙালীর নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল।

পাদ্রী জেমস্ লঙ্‌কে বাঙালীর নবজাগরণের একজন নিবেদিতপ্রাণ সুহৃৎ হিসেবে দেখিয়েছেন যোগেশচন্দ্র। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক এবং নীলচাষীদের দরদী বন্ধু হিসেবেই লোকে লঙ্‌কে জানে। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারে এবং ভাষার প্রসারকল্পে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নবজাগরণের ইতিহাসে তাঁকে অমর করবে। ভালো ভালো ইংরেজী গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ কার্যে তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী, 'অনুবাদক সমাজে'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'সংবাদ-সার' অসামান্য পরিশ্রমের ফল। এ ছাড়া ১৮৫৫ সনে প্রকাশিত তাঁর দুইখনি গ্রন্থ **Return of Authors and Translators of Vernacular Literature** এবং **Classified Catalogue**

of 1400 Bengali Books and Tracts—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে অপরিহার্য। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় লঙ্ সাহেব ছয় হাজার প্রবাদ সংগ্রহ, সংকলন ও অনুবাদ করে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তিনি বাংলা প্রবাদের ওপর ইংরেজীতে একখানি গ্রন্থ লেখেন। লঙ্-এর সারস্বত সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ, বিদেশের শিক্ষিত সমাজ এবং এ দেশের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটানো। বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক সভা (অনুবাদক সমাজ) ছাড়াও বহু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে উদারহৃদয় লঙ্ বাঙালীর মনোজগৎ সম্প্রসরণে অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দেন। বাংলা ভাষা সংস্কৃতানুগ পদ্ধতি ছেড়ে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে দেখে তিনি উল্লসিত হন। 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা'র উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন জেমস্ লঙ্। বাঙালীর নবজাগরণের আর একটি দিক লঙের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নীলদর্পনের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশক রূপে তাঁর বিচারের সময় বিচারপতি স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েল্স বাঙালী জাতিকে যে কটূক্তি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ সোচ্চার অভিব্যক্তি লাভ করে লঙের মাধ্যমে। বিদেশী হয়েও পাদ্রী জেমস্ লঙ্ বাঙালীর মনকে স্বদেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিমুখী করতে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। সে সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সে যুগের বাঙালী ক্রমশই বিদেশী অনুকরণের মোহমুক্ত হয়ে আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছিল—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আত্মবিস্মৃত বাঙালী নবজীবনের তোরণ প্রান্তে উপনীত হতে পেরেছিল।

ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী নবজাগরণের স্রষ্টাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় না হলেও যোগেশচন্দ্র একটি কারণে তাঁর জীবনীকে গ্রন্থভুক্ত করেছেন। সেই কূপমণ্ডুকতার যুগে ইংলণ্ডে গিয়ে শুধু মাত্র নিজের প্রতিভাবলে এই উল্লেখ্য বাঙালী চিকিৎসা-বিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে এদেশে এসে চিকিৎসা বিভাগের উচ্চতম মর্যাদাপূর্ণ পদে (আই. এম. এস.) অধিষ্ঠিত হন। তাঁর কৃতিত্বসমুজ্জ্বল জীবন বাঙালীর হীনমন্যতা দূর করতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল।

বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসের পটভূমি আলোচনায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানের কথাও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন যোগেশচন্দ্র। রামমোহনের বহু প্রগতিশীল কাজের সহযোগী হলেও সে যুগের এই উল্লেখ্য বাঙালী নিজে সর্বাংশে প্রগতিশীল ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল রক্ষণ-শীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। বস্তুত পক্ষে, নবজাগরণের স্থায়ী ভিত্তিও রচিত হয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্যগৌরবের সঙ্গে নতুন যুগের নবীন ভাবধারাকে গ্রহণ করার মধ্যে। সুষুপ্ত জাতির জীবনে নতুন চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রসন্নকুমার বহুমুখী কর্মপ্রবণতার পরিচয় দেন। 'গৌড়ীয় সমাজে'র কর্মসূচী প্রণয়নে উদ্যোগী হয়ে তিনি মৌলিক বাংলা গ্রন্থ রচনা এবং অন্যান্য ভাষা থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়নির্ভর অনুবাদ গ্রন্থ রচনার ওপর জোর দেন। নবযুগের প্রথম দিকক্বার 'ঝড় তুফানে'র যুগ শেষ হয়ে দেশে যখন গঠনমূলক কাজ শুরু হলো প্রসন্নকুমার ছিলেন সে যুগের অন্যতম নায়ক। সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশের বহুমুখী উন্নয়ন কার্যে তিনি যে অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় দেন তা তাঁকে স্মরণীয় করেছে। রামমোহনের সহযোগী হিসেবে তিনি 'বেঙ্গল হেরল্ড' এবং 'বঙ্গদূত' পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, নিজের সম্পাদিত 'রিফর্মার' (Reformer) পত্রিকায় তিনি অনেক প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত করেন: যেমন, ফারসীর বদলে আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা গ্রহণ, জাতীয় ঐতিহ্য-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা, জাতির পক্ষে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা প্রভৃতি। দেশবাসীর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত কোন কোন সরকার-সমর্থিত সম্পাদক কর্তৃক রাজদ্রোহজনক বলে অভিহিত হয়েছিল। সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন রামমোহনের যোগ্য সমর্থক, ইউরোপীয়দের এ দেশে বসবাসের স্বপক্ষে (Colonisation) যে আন্দোলন উপস্থিত হয় রামমোহন এবং দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি ছিলেন সে আন্দোলনের পুরোভাগে। ইউরোপীয় নাট্যশালার আদর্শে 'হিন্দু থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা প্রসন্নকুমারের সংস্কৃতি-প্রীতির পরিচায়ক, হিন্দু কলেজের গভর্ণর রূপে এ দেশে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারে তিনি অসাধারণ কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। ব্যাপক ইংরেজী-চর্চার যুগে বাংলা-চর্চার ওপর গুরুত্ব অর্পণ তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার

পরিচায়ক। হিন্দু আইন সংকলন এবং সমালোচনায় তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় দায়াবলীর তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর রচিত 'বিবাদ চিন্তামণি,' 'ব্যবস্থাপত্র' এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত আরো অনেক আইনগ্রন্থ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত বহুদর্শী পণ্ডিত কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থও তিনি পণ্ডিতদের সহায়তায় প্রকাশ করেন। নবজাগরণের প্রেরণায় প্রসন্নকুমার সেই অন্ধ অনুকরণের যুগে আমাদের ঐতিহ্যগৌরবকে স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন—এটা কম মনস্বিতার পরিচায়ক নয়। ভূম্যধিকারী সভা ও ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে তিনি জাতির স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-চর্চার জন্য তাঁর বিপুল দানও স্মরণযোগ্য।

যোগেশচন্দ্রের তথ্যভিত্তিক বিবরণে দেখা যায় যে, প্রসন্নকুমারের জীবন এবং কর্মধারার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের প্রথম যুগের উদ্‌ভ্রান্তি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। জাতীয় জীবনের নব রূপায়ণের অভিপ্রায়ে নেতৃবৃন্দের মননশীল চিন্তা নিয়োজিত হয়েছে গঠনমূলক কর্মপন্থার উদ্‌ভাবনে, ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে, বিদেশী ইংরেজের ওপর নির্ভরহীন স্বাধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতিষ্ঠায়। আমরা দেখেছি নব-জাগরণের এ বৈশিষ্ট্যগুলি শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন কর্মী এবং মনীষীর প্রচেষ্টায় প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

যোগেশচন্দ্র কয়েকজন ডিরোজিও-শিষ্য নব্যবঙ্গের তেজোদৃপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন যাঁদের স্বাধীন চিন্তা এবং বিচিত্র কর্ম বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। এঁদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী একটি বিস্ময়কর নাম। মুখ্যতঃ এঁরই প্রেরণায় নব্যবঙ্গের মধ্যে রাজনীতিচেতনার প্রথম সঞ্চার হয়—যে চেতনা পরবর্তীকালে শক্তি সংগ্রহ করে বাঙালীর নবজাগরণে পরম সহায়ক হয়েছিল। এই আশ্চর্য্য মানুষটির জীবনী নবজাগরণের ঐতিহাসিকদের রচনায় অস্পষ্ট ছিল। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন—শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' এঁর জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। বিমানবিহারী মজুমদার 'History of Political Thought from Rammohan' to Dayanand গ্রন্থে তারাচাঁদের রাজনৈতিক মতামত এবং কর্মাবলীর জন্য একান্তভাবে

নির্ভর করেছেন দ্বিভাষিক 'The Bengal Spectator' নামক পত্রিকার ওপর। এ ভাবে তারাচাঁদের জীবন-কথা ব্যক্তিগত ধারণা বা কিংবদন্তীর আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন তারাচাঁদের অনুজপ্রতিম সহযোগী এবং গুণমুগ্ধ। তিনি তাঁর 'ডেভিড হেয়ার' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর লিখিত তারাচাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত কয়েক সংখ্যা India Review পত্রে প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্দ্র সে বৃত্তান্তকে সব চাইতে প্রামাণ্য মনে করে তারাচাঁদের জীবনীকে অস্পষ্টতার জগৎ থেকে উদ্ধার করেছেন।

রামমোহনের ভাবশিষ্য এবং স্নেহধন্য তারাচাঁদ চক্রবর্তীর আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল নব্যবঙ্গের অনুকরণের বস্তু। বহু কর্মসংস্থায় ভালো কার্য পেয়েও স্বাধীনতা স্পৃহার জন্য কোথাও তিনি স্থায়ী হতে পারেন নি। তারাচাঁদ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আইন-জ্ঞান ছিল গভীর। কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থায়ী সভাপতি এবং রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি। টীকা-টিপ্পনী সহ পাঁচখণ্ডে 'মনুসংহিতা'র প্রকাশ তাঁর অক্ষয় কীর্তি। 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে'র তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। এ সমস্ত পত্রিকায় তাঁর প্রগতিশীল মতামত প্রকাশিত হতো এবং নব্যবঙ্গ তাঁর মত মেনে নিতেন। বাংলা দেশের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র উদ্দেশ্য-পত্র রচনায় তারাচাঁদ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্য-পত্রে যা ব্যক্ত হয়েছে তার প্রভাব, যোগেশচন্দ্রের মতে, কংগ্রেসের প্রথম যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৪৩ সনে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় রিচার্ডসনের প্রতি তাঁর তীব্র ঝাঁজালো মন্তব্য সে যুগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সরকার সমর্থিত 'ফ্রেণ্ড্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তারাচাঁদের রাজনৈতিক মতানুবর্তীদের 'চক্রবর্তী ফ্যাকসন' বা 'চক্রবর্তী চক্র' বলে ব্যঙ্গ করতো। বস্তুতপক্ষে, সে যুগের শিক্ষিত সমাজে রাজনীতি-চেতনার সঞ্চার হয় এই তেজোদৃপ্ত মানুষটির নেতৃত্বে। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে 'দি কুইন' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে তারাচাঁদ নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা অব্যাহত রাখেন। দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। যোগেশচন্দ্রের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমার্ধে রাজনীতিচেতনার জাগরণে, স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জাতীয় মর্যাদা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তারাচাঁদের দান অসামান্য।

যোগেশচন্দ্র ইংরেজীতে সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সুলেখক ও ডিরোজিও-শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। জাতীয় জীবনের উন্নয়নের উপায় হিসেবে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা চর্চার ওপর গুরুত্ব অর্পণ, বাংলাকে আদালতের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে আন্দোলনে তাঁর পোষকতা নব্যবঙ্গের মধ্যে রসিককৃষ্ণকে স্বাতন্ত্রচিহ্নিত করেছিল। 'পার্থেনন' এবং 'জ্ঞানোন্বেষণ' সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর সত্যানুরাগ ও মানসদিগন্ত প্রসারের চেষ্টা করেন। জুরি হিসেবে কাজ করবার সময় প্রচলিত সংস্কার অতিক্রম করে গঙ্গাজলের পবিত্রতা বিষয়ে শপথবাক্য উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে তিনি যে মন্তব্য করেন তা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সে যুগের নব্যশিক্ষিতের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত এবং উমাচরণ শেঠ পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ করে বাঙালীর সংস্কারমুক্তির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন-সংস্কার আন্দোলন, সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রসিককৃষ্ণের সক্রিয় কর্মোদ্যম সে যুগের বাঙালীর নবজাগরণে বেগ সঞ্চার করেছিল। কোন কোন বিষয়ে (যেমন অভক্ষ্য ভক্ষণ) বাড়াবাড়ির পরিচয় দিলেও রসিককৃষ্ণ ছিলেন নবযুগের সত্যান্বেষীদের প্রতীক।

যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন ডিরোজিওর শিষ্য রাধানাথ শিকদারের সত্যানুরাগ, চরিত্রের দৃঢ়তা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, মনস্বিতা, সাহিত্যচর্চায় প্রগতিশীলতা, সে যুগের নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে আত্মমর্যাদা এবং আত্মপ্রত্যয়ের গভীরতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এভারেস্ট্ গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয়ে তাঁর মনস্বিতা দেশী-বিদেশী সকলের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিল। সুযোগ পেলে বাঙালী-প্রতিভাও যে ইউরোপীয়দের মত মহৎ বিকাশ লাভে সমর্থ রাধানাথের সাফল্য তা প্রমাণ করল। ইংরেজ মেজিস্ট্রেটের বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত প্রতিবাদ সে যুগে শিক্ষিত সত্যান্বেষী বাঙালীর সাহসিকতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁর এই সাহসিক কাজ সে যুগের

শিক্ষিত বাঙালীর ভীরু মানসিকতা অপসারণে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মৌলিক প্রতিভার সাহায্যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে তিনি নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সাহায্য করলেন। 'মাসিক পত্রে' দেশ-বিদেশের পৌরুষ-বীর্যশালী চরিত্রের সহজ সর্বজনবোধগম্য আলোচনার দ্বারা তিনি জাতির চিত্ত থেকে বহুকাল সঞ্চিত ভীরুতা অপসরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে যে প্রগতিবাদী ভাবতরঙ্গ সে যুগের বাঙালীসমাজকে আলোড়িত করছিল, প্রবল ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে রাধানাথ সে আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তুলেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রাধানাথের বিস্তৃত জীবন আলোচনার সাহায্যে একটি সত্যের দিকে আলোকপাত করেছেন—সেটি হলো, এ ধরণের প্রবল ব্যক্তিত্বস্পর্শেই বাংলাদেশের নবজাগরণ নতুন শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে।

পরিশিষ্টে যোগেশচন্দ্র দুইজন মনীষী বাঙালীর জীবন-সাধনার উল্লেখ করেছেন—যা বাঙালীর নবজাগরণে নতুন শক্তি সৃষ্টি করেছিল।

বিজ্ঞান-চেতনা নবযুগের বাঙালীর মানস-পরিধি বিস্তারের একটি প্রধান লক্ষণ। ডকটর মহেন্দ্রলাল সরকারই সেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যিনি ১৮৭৬ সনে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'র প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর মনে বিজ্ঞান-চেতনা সঞ্চারের প্রয়াস পান। এই বৈজ্ঞানিক সংস্থা সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিজ্ঞানমুখী এবং সংস্কারমুক্ত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মহেন্দ্রলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির উল্লেখযোগ্য সদস্যরূপে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর যেমন জোর দিয়েছিলেন, তেমনি সংস্কৃত-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সমন্বিত জ্ঞান-চর্চাই পরবর্তীকালে বাঙালীর নবজাগরণকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মহেন্দ্রলাল শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, সমাজ-ভাবনায়ও তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী। সেই রক্ষণশীলতার যুগে নারীর বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে ষোল হওয়া উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন, জনশিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি চা-বাগানের শ্রমিকদের ("কুলী" বলার তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী) দুর্দশা মোচনের জন্য

বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এক কথায়, ডকটর মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব যাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বাঙালী নবজাগরণের পথে বহুদূর অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল।

পরিশিষ্টে উল্লেখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আনন্দমোহন বসু। বিলাতে অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেও ব্যবহারজীবীর জীবন গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অমূল্য জীবনের সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছিল স্বদেশ-সেবায় এবং দেশের যুব-মনে স্বাদেশিক চেতনা সঞ্চারে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর চৈত্র মেলায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি ছাত্র এবং যুবক সমাজের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁরই উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজে 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' বা ছাত্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই অনুরোধে উক্ত সভায় সুরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রসমাজের মনে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্টান 'ইণ্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠায়ও আনন্দমোহনের দান অসামান্য। আবেগময় স্বদেশ-চেতনার স্পর্শে আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের যুব সম্প্রদায়কেও গভীরভাবে আকর্ষণ করেন। বস্তুত পক্ষে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এই তীক্ষ্ম মনীষী এবং স্বদেশপ্রেমিক যুবক-সম্প্রদায়ের মনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তির পথ সুগম করে দেন। এই হিসেবে, যোগেশচন্দ্রের মতে, আনন্দমোহনও নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে গন্য হবার যোগ্য পুরুষ।

কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষনশীলতার পরিচয় দিলেও বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসে রাধাকান্ত দেবের দানও অবিস্মরণীয়। যোগেশচন্দ্র বলেছেন এ মনীষীর জীবনী পৃথক গ্রন্থভুক্ত করায় আলোচ্য গ্রন্থে তিনি স্থান দেন নি। ১৮৩০ সনে রামমোহনের বিলাত গমনের পর দীর্ঘকালব্যাপী এই জ্ঞানী-কর্মবীর বহুমুখী প্রগতিশীল কর্মধারার সঙ্গে জড়িত থেকে নবজাগরণের পথকে সুগম করেছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো রাধাকান্তের অনুপস্থিতি 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ করেছে মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ প্রসঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার যোগেশচন্দ্র আলোচিত বিষয়ের পুনরুক্তি না করে নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনায় অস্পষ্ট বা অজ্ঞাত উপকরণকে এ গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন।

॥ ২ ॥

আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বা 'ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত' রাষ্ট্রচেতনার ক্ষেত্রে রামমোহনের আবির্ভাব কাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার বিচিত্র কাহিনী। রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার ইতিহাস হলেও লেখক এ যুগবৃত্তের সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান—সব কিছুর প্রগতির কাহিনী এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন—জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত এই বহুমুখী আলোচনা ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি বলেছেন, 'ভাবতের মুক্তি সাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইহা নহে। ইহা ভারতীয় নবজাগরণের বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসের পথ-নির্দেশক মাত্র।' আলোচ্য গ্রন্থকে নবজাগরণের খণ্ডিত ইতিহাস বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য রায় বলেছেন, 'এই নবজাগরণের যুগ এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নতর সমাজে এই নবজাগরণের বিকাশ দেখা যায় নাই।' লেখক নিজেও অবশ্য এ গ্রন্থকে ভারতের নবজাগরণের সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে দাবী করেন নি। করলে তিনি 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—এরূপ নামকরণ অবশ্যই করতেন না। নবজাগরণ একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। একটা বিপুল ভাবপ্রেরণায় সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র—জাতীয় জীবনের সব কিছুর নবরূপায়নের মধ্য দিয়ে নবজাগরণ বা রেনেসাঁস সম্পূর্ণতা লাভ করে। যোগেশবাবু মুখ্যত রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামকে এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং নবজাগরণের বহুমুখী ইতিহাস না হলেও একটি দিকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। ভূমিকায় আচার্য রায় বলেছেন, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গনে বাঙালী যে পাপ করেছিল তারই অবদান এই রেনেসাঁস্। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্তক ও হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ ইহার পতাকাবাহী। যোগেশচন্দ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় জাগরণের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহনের রাষ্ট্রচেতনা দিয়ে শুরু করেছেন এবং ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বৃত্তান্তের উপর কাহিনীর যবনিকা পাত করেছেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতের মুক্তি সাধনার ইতিহাসকে

লেখক দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডে রামমোহন থেকে শুরু করে স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁ পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষী সুদীর্ঘ ৮৭ বৎসর ব্যাপী আন্দোলনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার যে ভাববীজ বপন করেছিলেন তার একটি সামান্য ইতিহাস সংকলন করেছেন লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডকে তিনি নাম দিয়েছেন—'কংগ্রেস যুগ।' ১৮৮৫ সনে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের কাল থেকে ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বহু চাঞ্চল্যকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের কংগ্রেস-পূর্ব যুগের রাষ্ট্রচেতনা এবং আনুষঙ্গিক আন্দোলন বর্ণনায় লেখক বিশ্বস্ততার দাবী করতে পারেন, যদিও কোন কোন স্থানে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। যেমন, জর্জ টমসনের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গের 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা এবং সে সোসাইটিতে জর্জ টমসনের রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায় সরকারী মহলের চাঞ্চল্যের বিবরণ তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। অথচ, এটি বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্তরে এমন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় যার বিস্তৃত পরিচিতির অবকাশ ছিল। এখানে বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু জর্জ টমসন এবং নব্যবঙ্গের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না।

যে-সমস্ত মানবতাবাদী ইংরেজ সে যুগে নিপীড়িত ও শোষিত ভারতবাসীর প্রতি পরম সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন জর্জ টমসন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং পার্লামেণ্ট সদস্য। দাসত্বপ্রথা বিলোপের জন্য তাঁর প্রবল আন্দোলন স্বদেশের উদারনৈতিক মহলে সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করে। আমেরিকায় এ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে একবার তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে ভারতবাসীর শোষণ ও পীড়নের সংবাদ তাঁর উদার অন্তরকে ব্যথিত করে। এ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে ইংলণ্ডে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের 'ভ্রাম্যমান সম্পাদক' (Travelling Secretary) নিযুক্ত হন এবং ইংলণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে অন্ততঃ ছয়টি শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবাসীর ওপর শাসক-সম্প্রদায়ের অন্যায়-অবিচার নিবারণে সচেষ্ট হন। ইংলণ্ডে প্রদত্ত ছয়টি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁর এই প্রচেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। একটি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি তাঁর ভারতহিতৈষণার

পরিচয় দেন। তাঁর ভারতপ্রীতির খবর ভারতবর্ষে পৌঁছালে শিক্ষিত বাঙালী কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ প্রথম বার বিলাত গেলে তিনি এই ভারতহিতৈষীকে ভারতবর্ষে আসবার আমন্ত্রণ জানান। টমসন তখন আমেরিকার দাসত্ববিরোধী আন্দোলন সেরে দেশে ফিরেছেন। দেহে মনে অত্যন্ত ক্লান্ত। তথাপি তাঁর স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে আসবার সুযোগ পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ১৮৪২ সনের শেষের দিকে দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় এলেন। দ্বারকানাথ নব্যবঙ্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। নব্যবঙ্গ তাঁর মতো একজন মানবতাবাদী রাজনৈতিক ব্যক্তিকে পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে শুরু হলো তাঁদের উদ্দীপ্ত রাজনীতি-চর্চা। বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ফৌজদারী বালাখানায় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) স্থাপন করে রীতিমত রাজনীতি-চর্চা এবং আলোচনায় তাঁরা মেতে উঠলেন। টমসনের আগমনের পূর্বেই নব্যবঙ্গ The Bengal Spectator নামক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি তাতে প্রতিফলিত করতে থাকেন। জর্জ টমসনের আগমনের পর এই পত্রিকা তাঁদের রাজনীতি-চর্চার মুখপত্র হয়ে উঠলো। জর্জ টমসনের বক্তৃতাগুলি পর্যায়ক্রমে এ পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পরবর্তীকালে রাজযোগেশ্বর দত্ত কর্তৃক গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। ঐ বক্তৃতাগুলি এতই চিন্তাশীল এবং ভাবাবেগপূর্ণ যে তাদের অন্তর্নিহিত মূল্য এখনও স্বীকৃত হবে। জর্জ টমসন সে যুগের ইংরেজ এবং ভারতীয় রাজনৈতিকদের মতো ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাসিত ভারতবাসীকে শাসক ইংরেজ জাতির সমপর্যায়ভুক্ত নাগরিক বলে মনে করতেন। তাঁর ভাবশিষ্য নব্যবঙ্গকে তিনি উপদেশ দিলেন, ভারতবর্ষের শাসক সরকার যদি ভারতবাসীর সঙ্গে ব্যবহারে সমদৃষ্টিবঞ্চিত হয় তা হলে নিয়মানুগ আন্দোলনের সাহায্যে ('agitation') সরকারী শাসনের প্রতিবাদ করবার স্বাধীনতা তাঁদের আছে। নব্যবঙ্গকে তিনি প্রথমে সরকারী শাসন-বিষয়ক তথ্যসন্ধান কার্যে ব্রতী হতে উপদেশ দেন। তথ্য অনুসন্ধানের পর সরকারী কোন কার্যবিধি যদি ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী বলে বিবেচিত হয় তা হলে সেগুলি প্রত্যাহারের জন্য গণ-আন্দোলন উপস্থিত করা তাদের

অবশ্যকর্তব্য বলে নির্দেশ দেন। টমসন পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি, আদালতে ব্যাপক উৎকোচ গ্রহণ, সরকার কর্তৃক ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বৈধ আন্দোলন ছাড়া ভারতবাসী কখনও স্বাধিকার লাভে সমর্থ হবে না। ভারতীয় সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার প্রতি জর্জ টমসন ছিলেন পরম শ্রদ্ধান্বিত। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে। সমকালীন সরকার-সমর্থক পত্রিকাগুলি টমসনের রাজনৈতিক বক্তৃতাকে রাজদ্রোহমূলক বলে অভিহিত করেন। তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে নব্যবঙ্গ সংঘবদ্ধভাবে যে রাজনীতি-চর্চা শুরু করেন তার তুলনা ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে, কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বহুকাল পর্যন্ত টমসনের নির্দেশিত কর্মপন্থা থেকে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। অথচ, টমসন বিদেশী এবং ভারতবর্ষে তাঁর অবস্থান স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল বলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাসে তিনি উপেক্ষিত। নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনও ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পায়নি। টমসনের রাজনৈতিক ভাবশিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিশেষ করে দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সেই রাজনৈতিক চেতনাহীনতার যুগে যে প্রখর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তার পরিচয় পরবর্তী যুগেও খুব সুলভ নয়। ফৌজদারী বালাখানার সভাগুলিতে রাজনীতি-বিষয়ক তাঁদের তথ্যপূর্ণ ও তেজোদৃপ্ত ভাষণ এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনা এখন পর্যন্ত পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যোগেশবাবু তাঁর 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থে নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার পরিচয়কে আরো বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করলে বাঙালীর রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রথম উন্মেষের ইতিহাস আরো সম্পূর্ণতা লাভ করতো।

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য। ডিরোজিও নব্যবঙ্গের মনে যুক্তিবাদ এবং আবেগময় স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করে নবযুগের সূত্রপাত করেছিলেন সন্দেহ নেই। যুক্তিবাদী নব্যবঙ্গকে সেজন্য বলা হতো **Derozian**। ডিরোজিওর পরে জর্জ টমসন নব্যবঙ্গকে আকর্ষণ করলেন বাস্তব রাজনীতি-চর্চার বন্ধুর পথে। এ কারণে টমসন নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকৃত।

খ্যাতনামা নব্যবঙ্গ ভোলানাথ চন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে টমসনের ভাবশিষ্যদের অভিহিত করেছেন Thompsonian বলে। টমসন শুধু তাঁর ভাবশিষ্যদের নয়, সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে রাজনীতি-চর্চার যে স্বাদ এনে দিয়েছিলেন তার স্থায়িত্ব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। টমসন এ দেশ ত্যাগ করবার পরও নব্যবঙ্গ তাঁর নির্দেশমত জমিদার-প্রজা, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য যে ব্যাপক কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে টমসন কর্মান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নব্যবঙ্গ জীবিকার সন্ধানে বিকেন্দ্রিত হওয়ায় সম্ভাবনাপূর্ণ এ সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চর্চার অকালে অবসান হয়। অকালমৃত্যু হলেও এ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চেতনা ও ভাবনা-কাহিনী ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পাওয়া উচিত।

কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতে রাষ্ট্রচেতনার জাগরণ ঘটেছিল মুখ্যত বাংলা দেশে। সে জাগরণের ইতিহাসকে যোগেশচন্দ্র গ্রন্থের 'কংগ্রেস-পূর্ব যুগ' অংশে নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন। বাঙালীর যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা রামমোহনের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে প্রথমে জন্ম লাভ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ তা ব্যাপকতা লাভ করে। ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গের প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয়—এ ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি অভ্রান্ত। তবে সে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হলে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পর্ব আরো সম্পূর্ণতা লাভ করতো—এ মন্তব্য পূর্বেই করা হয়েছে। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এ সভা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙালী রাজনীতি করতো ইংরেজের সহযোগিতায়। ভারতবর্ষীয় সভাই হলো ইংরেজ-সংস্পর্শহীন প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষা। ভারতবর্ষীয় সভা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের সঞ্চার করে, যার পরিনতিতে কংগ্রেসের উৎপত্তি। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসীর মনে তীব্র স্বাজাত্য-বোধের উদ্বোধনে কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং মহাকবি মধুসূদনের দানের কথা সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র। বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষে লেখক রাজনারায়ণ বসু এবং কেশবচন্দ্র সেন-এর অক্লান্ত প্রয়াসের

কথাও বিস্মৃত হন নি তিনি। তারপর যোগেশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন বাঙালীর জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষার কথা—যে স্বাজাত্যবোধের জাগরণে 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের চৈত্র বা হিন্দুমেলার ভূমিকা অসামান্য। এই বিবরণ যথোপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে তিনি একখানি গ্রন্থে ভারতের নবজাগরণে ঐ চৈত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত সবিস্তার উদ্‌ঘাটিত করেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' এবং জাতীয় নাট্যশালাও জাতির আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—তারও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন লেখক।

সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের তৃতীয় যুগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার বিশিষ্ট দানের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনাই ছিল এ সভার উদ্দেশ্য। এ সময় রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় চেতনার উদ্বোধনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বিশিষ্ট দানের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। মনীষী যোগেশচন্দ্র বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত প্রয়াসে এতদিনকার বহির্মুখী ভারতীয় রাজনীতি ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন ভারত-সভার প্রধান উদ্যোক্তা। ভারতবাসীর অন্তর্মুখী ভাবচেতনার উদ্বোধনে তিনজন ধর্মগুরু এবং একজন সৃজনধর্মী সাহিত্যিকের অবিস্মরণীয় দানের কথাও উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র। এঁরা হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের সাধনা মুখ্যত মানবতা-আশ্রয়ী হলেও সে সাধনা ভারতবাসীর ঐক্যমূলক চেতনায় গভীরতা এনে দিয়েছিল। যোগেশচন্দ্রের এ বিশ্লেষণের ভিতর আমরা একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিককে প্রত্যক্ষ করি, নবজাগরণের ইতিবৃত্ত রচনায় যিনি শুধু বহির্ঘটনাকে প্রাধান্য দেন নি—অন্তস্পর্শী ভাবচেতনাকেও যথাযথ মূল্য দিয়েছেন।

॥ ৩ ॥

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের উত্তরার্ধের নামকরণ করেছেন লেখক 'কংগ্রেস যুগ'। ১৮৮৫ সনে হিউম প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের

পর থেকে ১৯৪৭ সনে আগস্ট মাসে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়টিকে লেখক বলেছেন 'কংগ্রেস যুগ'। এ অংশের এরূপ নামকরণ কতটা সঙ্গত হয়েছে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে। এটা অবশ্য অস্বীকার করা যাবেনা একটা সুগঠিত সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে কংগ্রেস ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করেছে, বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মাযুগ ও অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করেছে এবং ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে বিপর্যস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি খণ্ডিত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতাও হস্তান্তরিত করেছে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছে। এই কারণে এই ঐতিহাসিক কালকে লেখক 'কংগ্রেস যুগ' আখ্যা দিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এরূপ নামকরণ করতে গিয়ে লেখক একটি ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেসের অসামান্য অবদান স্বীকৃত সত্য হলেও একই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিপ্লব আন্দোলনের ভূমিকাও কম উল্লেখ্য নয়। সম্প্রতি কোন কোন ঐতিহাসিক এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে দেশের ভিতর এবং বাইরে থেকে রাষ্ট্রশক্তিকে আঘাত করায় বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এ মত যুক্তিহীন বলে মনে হয় না। একজন মহান্ বিপ্লবীর চাঞ্চল্যকর সংগ্রাম-কাহিনী বর্ণনায় সত্যসন্ধ্য লেখক বলেছেন, কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে ভারতবাসী যে মার খেয়েছে সে ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের বীর বিপ্লবীরা জীবন তুচ্ছ করে সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর ব্রিটিশ শক্তিকে যে মার দিয়েছে সে ইতিহাস আমরা সম্পূর্ণ জানিনা। ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের ঐতিহাসিকের পবিত্র কর্তব্য সে অস্পষ্ট ইতিহাসকে দেশবাসীর সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলা। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্রের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এর প্রথম সংস্করণ যে বৎসর প্রকাশিত হয় (১৩৪৭ বাং/ ১৯৪০ ইং) তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লববাদের কাহিনী হয়ত বহুলাংশে অজানা ছিল। সরকারী নথিপত্র থেকে সে বিপ্লবের ইতিহাস সন্ধানও তখন সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তখনও থামেনি। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে পৃথক আলোচনার বিষয়ীভূত না করায় হয়ত দোষের কিছু হয়নি। কিন্তু এর

পরও এই জনপ্রিয় গ্রন্থটির আরও দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণেও যোগেশচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে গ্রন্থ মধ্যে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়ভুক্ত করেন নি। কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রসঙ্গত বিপ্লবী আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছেন। এটা লেখকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলেই মনে হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সন-এর আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত কালকে 'কংগ্রেস-যুগ' বলে অভিহিত করে লেখক ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। এ কাল-সীমার মধ্যেই ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর বন্ধন-অসহিষ্ণু দেশপ্রেমিকের অন্তরে সশস্ত্র বিপ্লববাদী রাজনীতি-দর্শন জন্মলাভ করে প্রসারিত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে ভারতবর্ষের ভিতর ও বাইরে থেকে আঘাত হেনে অত্যাচারী রাজ-শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সে চাঞ্চল্যকর ইতিহাস কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ১৩৬৭ বাং/১৯৬০ সনে 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বহু তথ্য তখন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রামাণিক তথ্যনির্ভর বহু গ্রন্থ তখন লিখিতও হয়েছে। সে সমস্ত তথ্য এবং গ্রন্থের আশ্রয়ে যোগেশচন্দ্র অনায়াসেই সে বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস নিয়ে স্বতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করতে পারতেন। এতে গ্রন্থটি লেখকের একদেশদর্শিতামুক্ত হতে পারতো. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্যাদাও রক্ষিত হতো। বর্তমানে যে আকারে তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম বর্ণনা করেছেন তাতে, মনে হয়, সে সংগ্রাম শুধুমাত্র কংগ্রেস-অনুপ্রাণিত। সুদূর প্রাচ্যে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেন সে ঐতিহাসিক সংগ্রামের যথাযথ বর্ণনা না দিয়ে যোগেশচন্দ্র 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এর (৩য় সংস্করণ) ৪৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' নামে একটি বাহিনী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল।' এটা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ. বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন—এটা ব্রিটিশ কূটনৈতিকদের অপপ্রচার মাত্র। যোগেশচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক বিচক্ষণ তথ্যসন্ধানী হয়েও ব্রিটিশ

কূটনৈতিকদের এ অপপ্রচারকে ঐতিহাসিক সত্য বলে কী করে মেনে নিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। শ্রীঅরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব সাধনা, অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টির বিপ্লবী ভূমিকা, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রাসবিহারীর মত মহাবিপ্লবীর অবিশ্রান্ত কার্যকলাপ, য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতের মুক্তি-কামনায় বিপ্লবী সংঘটন, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরে বিপ্লবী কর্মপ্রয়াস, বিপ্লবী বাঘা যতীনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বিপ্লবী যতীন দাসের শৌর্যময় আত্মত্যাগ, সহিংস সংগ্রামে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু বীর শহীদদের মৃত্যুবরণ, সর্বশেষে বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের সমান্তরালে দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিপ্লবী ইতিহাস রচিত হয়েছে তার সত্যাশ্রয়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না দিলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অথবা নবজাগরণের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়; বিশেষ করে, আজন্মবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ থেকে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনী, জার্মানীতে নাৎসী সরকারের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সামরিক বাহিনী এবং স্বাধীন 'আজাদ হিন্দ্' সরকার গঠন, রাশিয়ায় জার্মানীর পরাজয়ের পর সাবমেরিনের সাহায্যে সুদূর প্রাচ্যে গমন, যুদ্ধবন্দী ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তর, তাদের নিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ, সে যুদ্ধে বিপর্যয়, জাপানের পরাজয়ের পর ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে বিজয়ী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ এবং টোকিও যাত্রার পথে তাঁর বিতর্কিত মৃত্যু—এ সমস্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসী আন্দোলনের সমান্তরালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার স্বতন্ত্র-সম্পূর্ণ বিবরণ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ। যোগেশচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সে শৌর্যময় সংগ্রামের কাহিনীকে স্বতন্ত্র আলোচনার অঙ্গীভূত না করায় আলোচ্য গ্রন্থটি অনিবার্য ভাবে অসম্পূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে।

তবে কংগ্রেস-পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাসের বাস্তবসম্মত সংহত রূপদানে যোগেশচন্দ্র যে আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী জটিল ব্যাপার যে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করে

তার সংক্ষিপ্ত রূপদান করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যোগেশচন্দ্র বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রভাবে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশেষ করে, বিয়াল্লিশ সনের শেষ পর্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের অহিংস মতবাদ সাময়িক ভাবে অন্তর্হিত হয়ে কি ভাবে গণবিপ্লবে পর্যবসিত হলো —তার বিশ্লেষণে যোগেশচন্দ্র অনন্য সাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। যোগেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়েছেন - কংগ্রেসী আন্দোলনের এ পরিণতি আজন্মবিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের আপোসহীন স্বাধীনতাস্পৃহা এবং রাজনীতি দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এর ৪৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও আজাদ হিন্দ্ সরকার ফৌজের উদ্দেশ্য একই—ভারতবর্ষের অন্যনিরপেক্ষ অখণ্ড স্বাধীনতা।' ১৯৪২ সনের প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়—এ সত্যও স্বীকার করেছেন যোগেশচন্দ্র। বস্তুত পক্ষে, কংগ্রেস যখন আপোসপন্থী অহিংস মনোভাব বর্জন করে গণবিপ্লবের রক্তক্ষয়ী সর্বস্ব বিসর্জনের পথ বেছে নিল, তার অব্যবহিত কিছুকাল পরেই ভারতের বহুকাল-লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল—এ সত্যকে স্বীকার করে যোগেশচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম নিয়ে ইংরেজী ভাষায় বৃহদাকার বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এর মত সর্বসাধারণের বোধগম্য, সুখপাঠ্য, সীমিত পরিসরে লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই বিরল।

ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র

ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

উনিশ শতক ভারতীয় মনীষার পুণ্য মুহূর্ত। সমাজ ও শিক্ষায় নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত হল। এই পরিবর্তন একটি সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে জীর্ণ সমাজের মূলে আঘাত হানল। বাঙালী চিন্তায়-ভাবনায়, তার সামগ্রিক জীবনচর্যায় 'আপ্তবাক্যে'র উপর যুক্তি ও মননকে স্থান দিল। যুক্তিবাদের বন্যায় ও শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে স্নাত বাঙালীর সম্মুখে নূতন এক দিগন্তলোক প্রসারিত হল। নবজাগরণের এই বিচিত্র ধারা একটি সুসংহত রূপে বিকাশ লাভ করেছিল। কখনও ব্যক্তিগত, কখনও বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা এই নবজাগরণ আন্দোলনের মূল উপাদান সংগ্রহ করেছে। সে ধারার তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনায় যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর সুদীর্ঘ নিরলস সাধনার ফলশ্রুতি—এতাবৎ এক উপেক্ষিত সাধনার ইতিহাসের উন্মোচন। জীর্ণ কীটদষ্ট পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে তিনি সুদীর্ঘ কাল অচল নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দৃষ্টিশক্তি তাঁর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে শেষে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় তাঁর মানসনেত্র স্থির নিবদ্ধ দেখেছি, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিটি ছিল তাঁর কাছে ঋষিবাক্য :—'বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাংলার ভরসা নাই'। সে ইতিহাস রচনায় তাঁর আদর্শ পুরুষ ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। তথ্যের তুলাদণ্ডে তিনি প্রতিটি উপাদান যাচাই করে সংগ্রহ করেছেন, ইতিহাসের দুর্গম পথে তিনি ভাবুকতা বা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন নি, যা সত্য বলে বুঝেছেন অকপটে লিখে গেছেন। কারণ, মতবাদের ঊর্ধ্বে দেশপ্রেম ছিল তাঁর কাছে অধিক সত্য, এবং তাঁর দৃষ্টিতে অতীতের উন্মোচন ছিল দেশ সেবার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু অতীত তাঁর কাছে নীরস রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় মাত্র ছিল না, তা ছিল একটি যুগের, একটি সমাজের সামগ্রিক রূপের পরিচয়, তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার সাহিত্য, ললিতকলা, তার জীবনচর্যার বহুমুখী বিকাশের পরিচয়—যার মাধ্যমে অতীত পূর্ণ হয়েছে

বর্তমানে, পরিপূর্ণ হয় ভবিষ্যতে। ইতিহাস সেখানে তার রুক্ষ রূপ ছেড়ে সাহিত্য হয়ে ওঠে, তথ্য সেখানে বোধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাঙলায় এরূপ ইতিহাসের রচনায় ব্রতী হয়ে ছিলেন যোগেশচন্দ্র।

গত শতকের বাঙলার সংস্কৃতির গতিপথের উন্মোচনে যোগেশচন্দ্রের আর এক আদর্শ পুরুষ ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণে যোগেশচন্দ্রের রীতির মধ্যে নবীনতা ছিল। তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে তিনি ইতিহাস-সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন। সাহিত্যসেবী হয়েও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী। তাই গত দু শ' বছরের শিক্ষার ক্রম বিবর্তনের নিখুঁত বিশ্লেষণে তিনি অনন্য। ইংরাজের সংস্পর্শে এসে আধুনিক ভারতের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাঁর ধারাবাহিক রূপটি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে যে নতুন সংস্কৃতিগঙ্গার প্রবাহে ভারতের মৃত্তিকা শ্যামলতা লাভ করেছিল তার ফল লাভের কৃতিত্ব সর্বাধিক বাঙালীর এবং তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। স্যর উইলিয়ম্ জোন্স থেকে সুরু করে কতিপয় ভারতপ্রেমিক বিদেশীর গবেষণার ফলশ্রুতি-স্বরূপ ভারতের যে শাশ্বত রূপটির প্রকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের পার্থিব রূপটির সমন্বয় সাধন করে সে যুগের কতিপয় বাঙালী মনীষী চিন্তায় ও কর্মে নতুন ভাবগঙ্গার প্রবাহ এনেছিলেন। তাঁদের সেই কৃতিত্বের কথা বাঙালী বিস্মৃত হয়েছিল। গত দু শ' বছরের এই সব মনস্বীর কীর্তিকথা বহন করে কলকাতার বুকে কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যার একটা বিরাট অংশ কালের প্রবাহে কোথায় হারিয়ে গেছে তার খোঁজও আমরা রাখিনা; দু' চারটি যা আজও নির্বাণোন্মুখ স্তিমিত প্রদীপের মত জ্ঞানের আলোক শিখা জ্বালিয়ে রেখে চলেছে তার সম্বন্ধে বাঙালীর উদাসীন মমত্ব বোধই একমাত্র সম্বল। অথচ এই সব প্রতিষ্ঠানই ভারতীয় প্রগতির উৎসভূমি, কয়েকটি ত আন্তর্জাতিক শিক্ষা-দীক্ষার তীর্থভূমি। জাতীয়তাবোধের প্রতি বাঙালীর এই করুণ ঔদাসীন্য যোগেশচন্দ্রকে ব্যথিত করেছে। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার আশা নিয়েই যোগেশচন্দ্র সে যুগের বরণীয় পুরুষগণের কীর্তিকথা আমাদের শুনিয়েছেন, তাঁদের মহান কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রগুলির ইতিকথা 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' গ্রন্থটিতে বিধৃত করেছেন।

উক্ত গ্রন্থটির বিষয় নির্বাচনে যোগেশচন্দ্রের অদ্ভুত মননশীলতার পরিচয় আমরা পাই। তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা হ'তে শুরু করেছেন, যার প্রতিষ্ঠা, (১৭৮৪) হয়েছিল এশিয়ার 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যে-সব প্রতিষ্ঠানের কথা যোগেশচন্দ্র বলেছেন তাদের মধ্যে যেমন ভারতের ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য সম্পর্কিত সংস্থা-গুলির কথা আছে, তেমনই নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি 'কৃষি সমাজ' 'বোটানিক গার্ডেন', 'বিজ্ঞানসভা', 'মেডিক্যাল কলেজ' 'বিজ্ঞান কলেজে'র কথাও বিবৃত করেছেন। 'কলা-মহাবিদ্যালয়ে' উৎস সন্ধানেও তিনি ব্রতী হয়েছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির কথা বলতে গিয়ে কী রূপে 'সোসাইটি' ধীরে ধীরে বিজ্ঞানচর্চারও কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল তার কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনায় এসিয়াটিক সোসাইটি অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। পরে, 'নিদর্শন' সমূহের সংগ্রহ নিয়ে পৃথক 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে'র সৃষ্টি হল। এরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের এই মুখ্য কেন্দ্রটির কথা শুনিয়ে সে যুগের মনস্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন।

শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত শিক্ষা, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, কলাবিদ্যা শিক্ষা ও সব শেষে শিক্ষার বিস্তারে মুদ্রাযন্ত্রের দান ও তার ইতিহাস তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ মেলে। বিদেশীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বারানসীতে (১৭৯২) সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় (১৭৮১) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'এমন একদল পণ্ডিত ও মৌলবী সৃষ্টি করা যাঁরা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে পারবেন'। ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষার আলোকে উদ্বুদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই ছিলনা। ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিলাতী সিবিলিয়ানদের সংস্কৃত, আরবী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে তারা এদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শাসনকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করতে পারেন। মূল উদ্দেশ্য এই হলেও, ক্রমশঃ ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় ভাষা-চর্চার কেন্দ্ররূপে

পরিণত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের সহায়তায় আধুনিক বাঙলা গদ্যের গোড়াপত্তন এখানে হ'ল। উইলিয়াম কেরীর দান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যোগেশচন্দ্র বলছেন, পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলব্ধি করা এদের মারফৎ বিশেষ করে সম্ভব হ'ল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর নিকটও তার নিজস্ব সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল। এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যার মারফত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার প্রসার সহজসাধ্য হয়েছিল।

যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, ভারতবাসী নিজের দেশের প্রাচীন সম্পদের মূল্য যেমন বুঝতে শিখল, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মর্ম ও ভারতীয় প্রগতিতে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। রামমোহন রায় এ ব্যাপারে প্রথম প্রয়াসী হন, সঙ্গে যোগ দেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। যোগেশচন্দ্র যুক্তি ও তথ্যের আধারে রামমোহনের মূল্যায়ন করে বলেছেন "তাঁকে ভারতের মুক্তি সাধনার অগ্রদূতের সম্মান অবশ্যই দিতে হবে"। হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম জল্পনা রামমোহনের গৃহেই হয়েছিল। এই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের নব যুগের সূচনা ও 'নব্য বঙ্গ' শব্দটির প্রচলন হয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নব যুগের দ্বার উন্মুক্ত করার কৃতিত্ব আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত মনস্বীর, যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগেশচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যথা—রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মহারাজা তেজচাঁদ, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ ইত্যাদি। তিনি বলেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অজ্ঞাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের কথা, যাঁরা সমান আগ্রহে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের সামিল হন। প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের ভবনে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে সভা হয়, তাতে সেদিন পণ্ডিতপ্রধানদের পক্ষে একজন স্বদেশী বিদ্যার প্রতীক-স্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন। যোগেশচন্দ্র এই সামান্য ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, "ব্যাপারটি আপাত-দৃষ্টিতে সামান্য কিন্তু বস্তুতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সাহিত্য প্রভৃতির সম্যক্ শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নতি আমাদের করায়ত্ত হতে পারে"। এরই ফলশ্রুতি ঃ—হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা।

এ ছাড়া গত শতকের বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভার উৎপত্তি ও কার্যকলাপের বিবরণ প্রাচীন রিপোর্ট ও সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে যোগেশচন্দ্র গত শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দ্বার উন্মোচন করে গেছেন: আত্মীয় সভা (১৮১৫), সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা, (১৮৩২) বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা, ভূম্যধিকরী সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, (১৮৩৮), ভারতবর্ষীয় সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), স্কুল বুক সোসাইটি, দেশ হিতৈষী সভা (১৮৫১), ভারত সংস্কার সভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, গৌরব সম্পাদনী সভা, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, আত্মরক্ষা সভা প্রভৃতি। শুধু অতীতের এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের কথা আমাদের শুনিয়ে তিনি নিরস্ত হন নি, কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজ বসতি অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যিকা' গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় যুবকদের মননশীল সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কারণ, সাহিত্যকে লোকশিক্ষার অঙ্গ বলেই তিনি মনে করতেন।

শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসের কথাও শুনিয়েছেন। কলকাতার 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' রচনার সময় পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ একদিন তাঁকে শোনাচ্ছি, কলকাতা থেকে দূরে এক গ্রামের গ্রন্থাগারে তিনি এক সভায় গেছেন, সেখানে মধ্যাহ্নে বিশ্রামের সময় শুনছেন, আর নির্দেশ দিচ্ছেন কত প্রাচীন গ্রন্থের, পত্র-পত্রিকার। গল্পের ছলে বলে যাচ্ছেন সংস্কৃত কলেজের উৎপত্তির কথা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মহেশ ন্যায়রত্ন—এরূপ কত মনীষীর কথা, কত দুষ্প্রাপ্য রিপোর্টের কথা—যা আজকের দিনের গবেষকের অজানা। কতবার বলেছেন সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের কীর্তিকথা সংগ্রহ করার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালায় তিনি সংক্ষেপে সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলেছেন, অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধেও সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন পণ্ডিতদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা, নবীনকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ দানে তিনি ছিলেন সদাই উন্মুখ। কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বলেছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সংস্কৃত বাংলা ভাষা

ও সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক। বাংলা ভাষার অতি আধুনিকীকরণ তিনি বরদাস্ত করতেন না, মননশীল প্রবন্ধে ভাষার নিজস্ব রীতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভাষার ঠাস-বুনানী ও অর্থময়তা তাঁর রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। কিন্তু সাবলীলতা তার প্রধান অঙ্গ। গুরু গম্ভীর তথ্যের সঙ্গে প্রকাশের প্রসাদ গুণের এমন সমন্বয় আজকাল বিরল। তাই তাঁর রচিত ইতিহাস তথ্যভারে পঙ্গু নয়, তা' তথ্যকে বহন করে সচ্ছল গতিতে ধাবমান। ইতিহাসবিমুখ পাঠককেও তা আকর্ষণ না করে পারেনা। কারণ, ইতিহাসের কন্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করেও তিনি ছিলেন মূলতঃ রসিক সাহিত্যসেবী।

ব্যক্তিচরিত্র-চিত্র রচনায় যোগেশচন্দ্র

ডঃ ভবতোষ দত্ত

যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপনারত ঐতিহাসিক ছিলেন না। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রয়োজনে তিনি বাংলার ইতিহাস চর্চা করেন নি। তথাপি তাঁর আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণাকে অতিক্রম করে একালে কেউ কাজ করতে পারেন না। তাঁর স্বোপার্জিত ইতিহাস-জ্ঞান ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালিত গবেষণা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। তাঁর পদ্ধতি এবং আদর্শ একালের নবীন গবেষকদের দিক নির্দেশ করছে। তাঁর দেওয়া তথ্য নিয়ে নতুনতর কাজ হচ্ছে। যোগেশ বাগলের গবেষণা, বলতে গেলে, এ পর্যন্ত কোথাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে শুনি নি। তাঁর নিষ্ঠা, সত্যসন্ধানের ঐকান্তিক আগ্রহ যেমন এর কারণ, তেমনি তাঁর অনুসন্ধানের ভাবাবেগহীন নিরপেক্ষতা এর আর একটি কারণ।

যোগেশ বাগলের চর্চার বিষয় মূলত ছিল আধুনিক যুগের বাংলা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা বা বাংলার বাহিরের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকলেও সে তাঁর প্রধান অনুসন্ধান কেন্দ্র ছিল না। বাঙালির নতুন জীবন-চেতনা, নবীন অভ্যুদয় আমাদের যে কোনো কারো কাছেই গভীর ঔৎসুক্যের বিষয় হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে আমরা শুধু বিবরণ নয়, প্রত্যাশা করব গভীরতর প্রেরণার ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংস্কারের ছায়াপাত হয়। উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু উপকরণ নানাদিকে ছড়িয়ে আছে—স্মৃতিকথায়, সংবাদপত্রে, প্রতিবেদনে, চিঠিপত্রে, জীবনীগ্রন্থে, আরও নানা ভাবে। এগুলির থেকে বিশেষ বিষয় অবলম্বনে তথ্য-সংগ্রহ করে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে হয়। কিন্তু এ-রকম ইতিহাসে লেখকের একটা দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবেই। যদি নেহাৎ কুলিমজুরের কাজ না হয়, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনো মতেই এড়ানো যায় না। আধুনিক বাংলার এই মানসিক ইতিহাস রচনা একটা অত্যন্ত জটিল কাজ। এই ইতিহাসকে

অনেকে যথেষ্ট সহজ করে নিয়েছেন কয়েকটি বাঁধা ফরমুলায় ফেলে। মধ্যযুগীয় প্রবৃত্তি এবং আধুনিক প্রবৃত্তি, নীতিকে রক্ষা এবং নীতিকে অস্বীকার, পাশ্চাত্যকে গ্রহণ আবার তাকে সমালোচনা, ধর্মকে আঁকড়ে ধরা আবার তাকে ব্যঙ্গ করা—এই রকম বহু বিরোধী প্রবৃত্তির সমন্বয়ে আধুনিক বাঙালির মন গড়ে উঠেছে। রামমোহন-রাধাকান্ত থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের কর্মকীর্তির ফিরিস্তি দেওয়া সহজ, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সর্বসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ আনেন স্ববিরোধিতার তত্ত্ব, কেউ আনেন এক ও বহুর তত্ত্ব, কেউ সোজাসুজি লাইন টেনে নেন প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার স্বরচিত সংজ্ঞা দ্বারা। আধুনিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে যাঁরা প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এ বিষয়ে ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক। সুশীলকুমার দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের বাংলার সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করলেন। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুরনো বাংলার অনুসন্ধান ছাড়াও আধুনিক বাংলার এই জটিল ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে মন দেয়। তখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধ্যায় শেষ হয়েছে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস এই নতুন গবেষণা-বিষয়টিকে এক গভীর গুরুত্ব দিলেন। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দেশীয় সাময়িক পত্র, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস এবং সাহিত্য-সাধক চরিতমালা নতুন গবেষণাধারার প্রধান সূত্র রূপে বিরাজিত থাকল। এই বইগুলিতে উপকরণ সংগ্রহই মুখ্য। ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা তেমন প্রকট নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালীর কর্মকীর্তি সম্বন্ধে তা সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে, নৈতিক মূল্যবিচারে প্রণোদিত করে না। তাঁদের পরবর্তী গবেষকদের সঙ্গে পার্থক্য মূলত এখানেই। কে রক্ষণশীল, কে প্রগতিশীল, ব্রাহ্মধর্ম উচ্চতর ধর্ম, না পৌরাণিক হিন্দুধর্ম উচ্চতর, কে ন্যায় করল, কে অন্যায় করল—এ-সব বিষয়ে তাঁরা কোনো স্পষ্ট অভিমত দেন নি, কিংবা কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন নি। বরং নানা দিক দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে তাঁরা সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। ইতিহাসের গতিতে তাদের যেটুকু সংরক্ষিত হবার তা হয়েছে। বিচারের ভার কালের উপরেই তাঁরা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

যোগেশ বাগল ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের অনুবর্তী হয়েই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মানসিক অভিপ্রায় ও গঠনও ছিল তাঁদেরই মতো। তিনি বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। পুরনো বাংলার সমাজ-গঠনে লৌকিক সংস্কৃতির দান যেমন অবশ্যস্বীকার্য, আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির গঠনে তেমনি রাষ্ট্রশাসন, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নবশিক্ষা প্রভৃতির প্রভাব মুখ্যত বিচার্য। পুরনো বাঙালি সংস্কৃতি সমাজ-কেন্দ্রিক। সমাজের সামগ্রিক দানেই তা গড়ে উঠেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব অবশ্য মধ্যমণি রূপে বিরাজিত; কিন্তু তিনিও বাঙালির সহজিয়া সংস্কৃতির ঘনীভূত বিগ্রহ। আমরা পুরনো সমাজের নীতি-নিয়ম শাসন-অনুশাসনকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা ও অপ্রতিহত দৃষ্টিস্বাতন্ত্রের ফল বলে বর্ণনা করতে পারি না। কিন্তু আধুনিক কালে বাঙালি যে-সংস্কৃতি রচনা করেছে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও বহু মনীষীর যে সমারোহ গত দেড়শত বৎসরে রচিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। এঁদের প্রত্যেকের চিন্তা ও কর্মের প্রচণ্ড আবেগ, সীমাহীন প্রত্যয়, জ্বলন্ত আদর্শবাদ এবং লক্ষ্যে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন আধুনিক সমাজের নবরূপ-সাধনে সহায়তা করেছে। প্রত্যেকেরই চিন্তা-ভাবনাগুলি আলাদা আলাদা ভাবেই বিবেচ্য। হয় তো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের বিকাশই এর কারণ। সমাজের অখণ্ড দেহ আর আগের মতো নেই। এই নূতন সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে ব্যক্তিচরিত্র অবলম্বনেই বুঝতে হবে।

যোগেশ বাগলের গবেষণার আদর্শ থেকেই এ জিনিসটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে কয়েকটি ব্যক্তিচৈতন্যের স্বরূপে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন। তাই হয়েছে তাঁর চরিত-রচনা। তিনি যে ভাবে এ কাজ করেছিলেন সে-যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। যোগেশচন্দ্র তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন তথ্যভারসম্পন্ন ঐতিহাসিক। ব্যক্তি-চরিত্র চিত্রণে ভক্তি, না হয় বিচার এসে যাওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ভক্তি যেমন অন্ধতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে, বিচারও তেমনি ব্যক্তিগত প্রবণতা দ্বারা চালিত হতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বিচারপূর্ণ বক্তব্যেও মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবণতার সন্ধান পেয়েছিলেন। আবার একথাও সত্য, এই সহৃদয় বিচারেই শুষ্ক ঘটনাপুঞ্জ

তাৎপর্যবহ এবং সরল হয়ে ওঠে, প্রত্নতত্ত্ব হয় ইতিহাস। যোগেশচন্দ্র বাগল ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষকে যথাসম্ভব বর্জন করে চললেও চরিত-রচনায় কাজ করেছে তাঁর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা।

তাঁর রচিত চরিত গ্রন্থ আছে দুটি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা এবং বরণীয়। এ ছাড়া 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় এগারোটি জীবনী রচনা করেছিলেন। তাতে আছে রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, উইলিয়ম য়েটস, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সরলা দেবী চৌধুরাণী, শরৎচন্দ্র রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বইটিতে (২য় সং) দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি ষোলো জন মনীষীর জীবনকথা সংকলিত হয়েছে। 'বরণীয়' বইটি একটু অন্য ধরণের। এর ভূমিকায় তিনি বলছেন—

'বর্তমান পুস্তকখানি আমরা সাধারণ ভাবে যে অর্থে জীবনচরিত, আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বুঝিয়া থাকি ইহা সে পর্যায়ের নহে। গত পঞ্চাশ বৎসরে আমি পল্লী বাংলার এবং কতকাংশে শহর বাংলার যে সকল নামী ও অনামী অথচ সকলেই শ্রদ্ধেয় বঙ্গসন্তানের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ের কথাই নিজের জীবনকথা প্রসঙ্গে লিখিয়া রাখিলাম। পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন আমি শুধু মৃত ব্যক্তিদের কথাই এখানে প্রকটিত করিয়াছি। জীবিত এমন বহু ব্যক্তি এখনও রহিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন ও কর্মের ছাপ আমার উপর পড়িয়াছে যথেষ্ট।'

এই বইটি সাল তারিখ ও ধারাবাহিক তথ্য-সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের সংকলন নয়। যোগেশচন্দ্রের মনে যে-উন্নতচরিত্র ব্যক্তি স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন, তাঁদের স্মৃতি আলেখ্য। এতে হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত চরিত্র যেমন আছেন, চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, নিশিকান্তের মা প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচিত শ্রদ্ধেয় চরিত্রও আছেন। যোগেশ বাগলের এই রচনাগুলি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত্রের পরিপূরক উপকরণ হিসাবে গণনীয়— কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। 'বরণীয়ে'র লেখাগুলিতে একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুর আছে। শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা এতে প্রকট।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' এবং সাহিত্য-সাধক চরিতে যোগেশচন্দ্র শত বৎসর পূর্বের বাংলার মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত নানা লুপ্তপ্রায় উপকরণের সাহায্যে রচনা করেছেন। এই একশ বৎসরের অতিক্রমণে তাঁদের দান বাঙালির জীবনে নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে। তাঁদের জীবনীরচনায় যোগেশচন্দ্রকে সহজ পথ অবলম্বন করলে চলে নি। তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে-পদ্ধতি নতুন বললেও চলে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ সংকলন, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ ও সাজিয়ে মনীষীর পূর্ণরূপ দিয়েছেন। এ ধরণের প্রচেষ্টা যে বাংলায় কিছু নতুন তাতে সন্দেহ নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের চরিতকথা, রবীন্দ্রনাথের চারিত্র পূজা, বিপিন পালের চরিতচিত্র ভিন্ন জাতের বই। এগুলি ঠিক জীবনী নয়, মূল্যবিচার। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা চরিত সাহিত্যে' (১৯৬৪) চরিত-সাহিত্যের ঐশ্বর্য-যুগ (১৮৮১-১৯১৮) বলে সে যুগটিকে অভিহিত করেছেন সে যুগটি সত্যই বহু মূল্যবান্ স্মরণীয় চরিত গ্রন্থের প্রকাশ-কাল। এ সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর জীবনী রচিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, বিজয়কৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। এ-সব জীবনীর সঙ্গে যোগেশ বাগল-রচিত জীবনীর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। এ-সব জীবনীর উদ্দেশ্য ব্যক্তি-চরিত্র মহিমাকে ফুটিয়ে তোলা। এ-সব জীবনী রচনার উদ্দেশ্য খানিকটা নৈতিক। পারি-পার্শ্বিক সমাজকে জানবার মতো প্রচুর উপকরণ এ-সব গ্রন্থে সংগৃহীত; কিন্তু দক্ষ নাবিক যেমন উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জাহাজটিকে লক্ষ্যে নিয়ে যায়, এতেও তেমনি প্রতিকূল অথবা অনুকূল সমাজ-ঘটনা ব্যক্তি-রূপটির অন্তর্নিহিত মহিমাকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি ছোটো জীবনী লিখেছিলেন ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের নানা নৈতিক দুর্গতির মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার ধ্রুব লক্ষ্যটি অবিচল রেখেই লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন। মধুসূদনের জীবন ঘটনাবহুল। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বস্তুত মধুসূদনের জীবনীকারের মধুসূদনচরিত্র সম্পর্কে ধারণাকেই প্রমাণ করবার জন্য আছে যেন। জীবনীকারেরা ঘটনার বিকৃতি করেন নি সত্য, কিন্তু লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য। চরিত্র-গ্রন্থগুলি মূলত সাহিত্যরসসমৃদ্ধ; কারণ এর মধ্যে দিয়ে যেমন লেখকের তেমনি বিষয়ের সজীব হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়।

যোগেশ বাগল যে-জীবনী রচনা করেছেন তার প্রকৃতি ভিন্ন। তিনি ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়েই দেখেন। তাঁর লেখায় ভাবাবেগের স্পর্শ নেই। নৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর লেখায় নেই। ব্যক্তির অন্তর্জীবনের সন্ধানও তাঁর কাম্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ বিবর্তনই তাঁর লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনের কর্মকীর্তিতে তার পূর্ণতা সাধিত। সেই সূত্রে যোগেশচন্দ্র ব্যক্তির বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাপুঞ্জের উপরেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই সব ঘটনার যথাযথতা ও ঐতিহাসিক সত্যের নির্ণয়েই তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'নবরূপায়ণের কার্য মূলতঃ শুরু হয় শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া। পশ্চিমের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে বিভিন্ন বিষয়ে নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করি তাহা সমাজ মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখি ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা—প্রত্যেকটির বিস্তারেই মনীষিগণ নিরতিশয় তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগের শিল্পবিপ্লবকে স্বাগত করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নেও কেহ কেহ বিশেষ ভাবে তৎপর হন। জাহাজ শিল্প, রেশম, শর্করা, কয়লাশিল্পাদি, জীবনবীমা, সাধারণ বীমা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে চাশিল্প পর্যন্ত বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে ঐ সময় ভারত সন্তানেরা কেহ কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে অগ্রনী হন। এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।'

যোগেশ বাগলের রচিত জীবনীগুলির উদ্দেশ্য এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। পূর্বকার জীবনীর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিরূপ ফুটিয়ে তোলা, যোগেশচন্দ্রের জীবনীগুলির লক্ষ্য ছিল বাঙালির কর্ম-কীর্তির বিবরণ রচনা করা। এই জন্যই তিনি ব্যক্তির অন্তর্জীবনের দিকে কোনো জোর দেন নি। তাঁর জীবনীগুলি ঘটনার মালা মাত্র।

যোগেশ বাগলের প্রথম মুদ্রিত রচনা ছিল একটি জীবনী—রুস্তমজী কাওয়াসজী (১৭৯০—১৮৬৬)। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' রচনাকালে তাঁর সাকরেদি করতে করতে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়।

তখনই যোগেশচন্দ্রের এই শ্রেণীর রচনায় উৎসাহ আসে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের পার্শী ধনী ও দানবীর সম্পর্কে তিনি যে মৌলিক সূত্র এবং উৎস অবলম্বনে কাজ করলেন, তাঁর পরবর্তী কাজের পদ্ধতিও তদ্রূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বহু মনীষী এসেছেন, যোগেশ বাগল কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে মুখ্যত গবেষণা করেন নি। অবশ্য, তাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিধিতে এসেছেন অনেকেই, যেমন আনন্দমোহন বসু, ভগবানচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বইতে যাঁদের জীবনকথা প্রাধান্য পেয়েছে, তারা সকলেই ওই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মকালও প্রধানত ওই সময়ে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় অন্তর্ভুক্ত জীবনীগুলিও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ, এই যুগ থেকেই আহৃত। এঁদের মধ্যে অনেককেই আমরা নামে মাত্র জানি। হয়তো তাঁদের কীর্তির সুপরিচিত দিক্‌গুলিই জানি। কিন্তু এ-সব কর্মকীর্তির বিশদ বিবরণ আমাদের জানা ছিল না। কিংবা তথ্যগত সাক্ষ্যপ্রমাণও আমাদের কালে এসে পৌঁছায় নি। অধিকাংশই হস্তান্তরিত স্তরের (secondary) সংবাদ। যোগেশচন্দ্র যে-জীবনী রচনা করেছেন, তাদের কোনোটাতেই এই পদ্ধতির সংবাদ নেই। সমসাময়িক নথিপত্র ঘেঁটেই সত্য সংবাদটি আমাদের জানিয়েছেন।

বিশেষ করে গত শতাব্দীর পূর্ব ভাগের এই সব কৃতী পুরুষের পরিচয় ও বিবরণ প্রকাশ যোগেশচন্দ্রের স্মরণীয় কাজ। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর—এঁদের যে বিবরণ তিনি রচনা করেছেন বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় তার মূল্য স্থায়ী হয়ে থাকবে। প্যারীচাঁদ মিত্র ডেভিড হেয়ারের জীবনী লিখেছিলেন। এতদিন সেই জীবনী থেকেই আমরা হেয়ার এবং হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। যোগেশচন্দ্র হেয়ার সম্পর্কে নতুন তথ্য দিলেন। ভ্রম নিরসন করলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজের আধুনিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু প্রথমার্ধের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল অনেকটা অস্পষ্ট। নানা বাদ-বিতর্ক, পুরাতন-নতুনের দ্বন্দ্বে তখনও বাঙালি সমাজ স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নি। যোগেশচন্দ্র এই সময়ের মনীষীদের জীবনকথার মধ্যে দিয়ে সেকালের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রারম্ভিক ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে নব্যবঙ্গের কীর্তি-কাহিনীর সম্পর্কে গবেষণা। ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য উদ্ধার করেছেন, পরবর্তী গবেষকরা সেখান থেকেই পথ খুঁজে পেয়েছেন। আজকাল নব্যবঙ্গ, ডিরোজিও প্রভৃতি নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার যে-বিস্তৃত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, এবং একটি ব্যাপক কৌতূহল দেখা যাচ্ছে তার মূলে কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগল। নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের কাছে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র। তাঁদের অনমনীয় সত্যনিষ্ঠা এবং স্বাভাবিক কর্মপ্রতিভা আধুনিক বাংলার সূচনা-পর্বে কতখানি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যোগেশচন্দ্রের গবেষণাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। নব্যবঙ্গেরা শুধু উচ্ছৃঙ্খলতাই করেছিল —রাজনারায়ণ বসুর সেকাল-একাল থেকে এই ধারণাই চলে এসেছে। যোগেশচন্দ্রের তথ্যানুসন্ধান তাঁদের নতুন ভাবে আমাদের আছে উদঘাটিত করেছে। আমি যত দূর জানি পাদরী জেমস্ লঙ এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, মধুসূদনের শিক্ষক রিচার্ডসন সম্বন্ধেও যোগেশচন্দ্রের জীবনীই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এখন পর্যন্ত অনতিক্রান্ত। রিচার্ডসন অথবা ডিরোজিওর সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা আমাদের ধারণার প্রায় আমূল পরিবর্তন করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। নব্য ইংরেজিশিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়ক রূপে আমরা আজ আর তাঁদের স্মরণ করি না; নতুন গঠনমূলক চিন্তা ও মনোভাবের শিক্ষক হিসাবেই আজ তাঁরা আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়।

যোগেশচন্দ্র যে-কয়টি জীবনী রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে 'রাধাকান্ত দেব' এবং 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'—এই দুটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাঙালির চিন্তাধারায় এই দুজন দুই বিপরীত প্রবনতার পুরোধা। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের গবেষণায় কোনো পক্ষপাতিত্ব কোনো দিক দিয়েই প্রকাশ পায় নি। রাধাকান্ত দেব হিন্দুর প্রচলিত নীতি ও সংস্কারকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি রক্ষণশীল বলেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে দেখলে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-মহত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হয়, যোগেশচন্দ্র সেই দিকটিই বিশেষ ভাবে দেখিয়েছেন। রাধাকান্তের জীবনী রচনায় এমন

কতকগুলি উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি কোথায় আছে আমরা জানি না, যোগেশচন্দ্রও বলেন নি। তিনি উদ্ধৃতই করেছন। এগুলির সাহায্যে রাধাকান্তের বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর আধুনিকতা, সমাজকল্যাণকামিতা, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ, আরও নানাদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠে পূর্বতন ধারণার পরিবর্তন সাধন করিয়েছে। যোগেশচন্দ্রের এই মূল্যবিবেচনা যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রতিক কালে তার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব-মহিমা সম্বন্ধে অবশ্য কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তী-রচিত জীবনী ধর্মনেতার আধ্যাত্মিক চরিত্রটির ছবি এঁকেছে, যোগেশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে দেখেছেন সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে। দেবেন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবন, বিশেষ ভাবে তাঁর জীবনের পূর্বার্ধ, নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ তো শুধু একজন ব্রাহ্মনেতা নন, তিনি সমগ্র বাঙালি জাতির নবজাগরণ-যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি। যোগেশচন্দ্রের লিখিত জীবনী সেই দিক দিয়েই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এ ধরণের গুরুত্ব দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী সম্পাদনাতেও দেখা যায় না। এই জন্যই ১৯৬২ সালে মহর্ষির 'আত্মজীবনী'র নতুন সম্পাদিত সংস্করণে প্রায় তিয়াত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী 'মহর্ষির জীবনের আরও তথ্য' যোগেশচন্দ্রকেই সংকলন করে দিতে হয়েছিল। যোগেশচন্দ্রের সংযোজনের ফলেই মহর্ষির আত্মজীবনী নিভৃত জীবনকথা না থেকে উনিশ শতকের একজন প্রধান সমাজ-পুরুষের জীবনেতিহাস হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

গ্রন্থাগার ও যোগেশচন্দ্র

চঞ্চলকুমার সেন

শিক্ষার সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহ নিয়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে এসে ঐ-সব গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এ বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ আছে।

মুসলমান বাদশাহ ও নবাব এবং হিন্দু রাজা ও জমিদারদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের দিল্লীর রাজপ্রাসাদে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। হুমায়ুন প্রতিদিন তাঁর সময়ের বেশ কিছুটা গ্রন্থাগারে অতিবাহিত করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অভ্যাস থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার ও খুচরা টাইপ (moveable type) প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। ধর্ম-প্রচারক, রাজা-বাদশাহ ও জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে মুদ্রিত পুস্তক জনসাধারণের হাতে এসে পৌছতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিকল্পনাও ধীরে ধীরে রূপ পেতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান স্কুল-কলেজের কাঠামোর উপর ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব যেমন পড়েছে, ঠিক তেমনি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থার উপরেও এর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় সেই। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনা থেকেই এখানে গবেষণার সহায়তার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, শ্রীরামপুর কলেজের জন্ম হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রসারে এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে এবং শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এদের প্রত্যেকটির অঙ্গরূপে গ্রন্থাগার গড়া হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার ছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হল। মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে স্থাপিত হতে থাকে আরো অনেক গ্রন্থাগার।

যোগেশচন্দ্রের সামগ্রিক গবেষক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থাগার জগতের প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার, পল্লীর গ্রন্থাগার এবং ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়েও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন যোগেশচন্দ্র। গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং শিক্ষা ও গবেষণায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি আবার গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের সহায়ক বিষয় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসও লিখেছেন। সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত শ্রীসরস্বতী পত্রিকায় তাঁর "মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। (শ্রীসরস্বতী ১ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা ও ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) শ্রীসরস্বতীতে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সরস্বতী প্রেসের অনুমতি নিয়ে ঐ প্রবন্ধগুলির প্রথম চারটি গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষাতেও যোগেশচন্দ্র কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখেন এবং কয়েকটি বইও প্রকাশ করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট ইংরাজী দৈনিক Hindusthan Standard-এ তাঁর 'National Library in making প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের

১লা ফেব্রুয়ারী ঐ পত্রিকাতেই তাঁর 'The National Library' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ তাঁর "Romances of Bengali type' প্রবন্ধটিও Hindusthan Standard পত্রিকায় বেরোয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে All India Printers' Conference উপলক্ষে All India Printers' Conference Exhibition, 1954 নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকায় 'Book illustrations in Bengal in the Early 19th Century' নামে যোগেশচন্দ্রের একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের ইংরাজী ভাষায় লেখা প্রবন্ধের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছনে সে গুলি হচ্ছে—"জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্মকথা," "জাতীয় গ্রন্থাগারের পঁচিশ বৎসর", "জাতীয় গ্রন্থাগারের তৃতীয় পর্ব" ও "জাতীয় গ্রন্থাগারের রূপান্তর,"—এই চারটি প্রবন্ধই যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩৫৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮-র প্রবাসীত প্রকাশিত হয়। "জাতীয় গ্রন্থাগার" নামে তাঁর আর একটি প্রবন্ধও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮ই মাঘ, ১২৫৯ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

এই প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করে ১৩৭১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "বঙ্গ সংস্কৃতির কথা" গ্রন্থে "জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা" নামে যোগেশচন্দ্র একটি ৫৪ পৃষ্টার পরিচ্ছেদ সংযোজন করেন। এই প্রসঙ্গে ঐ বইয়ের নিবেদনে তিনি লিখেছেন ঃ—

"আমি প্রথমেই জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা স্বরূপ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাস প্রদান করিয়াছি। কার্লাইল সত্য সত্যই বলিয়াছেন—গ্রন্থাগার বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁহার কথার গূঢ়ার্থ এই যে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিবিধ বিদ্যাচর্চারকেন্দ্র, এক একটি গ্রন্থাগারও সেইরূপ বিভিন্ন বিদ্যা অনুশীলনের আধার, অর্থাৎ ইহার মাধ্যমে যাবতীয় বিদ্যা আলোচনা ও গবেষনার সুযোগ আমরা প্রাপ্ত হই।"

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্টের সভাপতিত্বে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে নীচের প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়—

'That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation that shall be open to all ranks and classes without distinction, and

sufficiently extensive to supply the wants of entire community in every department of literature.

এই উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে যে অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্ট এবং সমাচার দর্পণের সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে যে দুজন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রূপে আমরা দু'জন বিখ্যাত বাঙ্গালীকে দেখতে পাই—একজন সুসাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্যজন বিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ্ বিপিনচন্দ্র পাল। প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাব-গ্রন্থাগারিক (Sub-Librarian) পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন।

যোগেশচন্দ্র তাঁর 'জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা' প্রবন্ধমালায় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রূপান্তরণের ইতিহাস তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই ইতিহাস তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হবার সময়কার বিবরণ অবশ্য তাঁর দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নি।

১৩৬২ বঙ্গাব্দের মন্দিরা পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় "গ্রন্থাগার ও গবেষণা" নামক প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে 'শব্দ কল্পদ্রুম' রচয়িতা রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"পচিশ বৎসর পূর্বে আমরা যখন রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগারে যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই ইহার ভগ্নদশা। ইহার পূর্বে কোন কোন সুধী ব্যক্তি এখানে যাতায়াত করিতেন কিন্তু তাঁহারা এখানকার এতাদৃশ উপকরণপ্রাচুর্য সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না। গ্রন্থাগারটি প্রধানত এক বেয়ারার তত্ত্বাবধানে থাকিত। সপ্তাহান্তে দ্বার খুলিয়া সে ঝাড়পোঁচ করিত।

গ্রন্থাগারিকও একজন ছিলেন। কিন্তু হাজিরা পর্যন্ত। তিনি একবার দেখা দিয়াই বড়শির ছিপ হস্তে প্রাঙ্গনের পুষ্করিণীতে মাছ করিতে চলিয়া যাইতেন। আমরা পুরাতন বই-পত্রাদি ঘাঁটিয়া চলিয়া আসিতাম। গ্রন্থাগারিকের বড়শির ছিপ কিন্তু অবিরাম মৎসকুলকে আকর্ষণ করিয়া চলিত।"

আশ্বিন, ১৩৬৩-র মন্দিরায় যোগেশচন্দ্রের আর একটি প্রবন্ধ "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার" প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে পাঠকদের পাঠাভ্যাস ও স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারের দুরবস্থার কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"স্কুলের উচ্চতম চারি শ্রেণীতে এবং কলেজে বালক-বালিকা অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশজন পড়ে ধরিয়া লইতেছি। এই সংখ্যক্ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক'জনা পাঠ্যাতিরিক্ত বই পড়ে, বা পাঠ্যবই পরীক্ষার সময় ছাড়াই-বা ক'জনা অধ্যয়ন করিয়া থাকে? বিশেষ করিয়া একটি ছাত্রের কথা বলিতেছি। সে কলিকাতার এক নামজাদা দীর্ঘকালস্থায়ী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আজ সাত বৎসর পড়িতেছে। এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে বর্তমান লেখকের কিঞ্চিৎ যোগ রহিয়াছে। বিদ্যালয়টিতে উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে আমি সুখী হইতাম। দু'তিনটি আলমারীর দু'তিনটি তাকে সামান্য কয়েকখানি বই ছাড়া বিশেষ কিছু দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। উক্ত ছেলেটিও এই সাত বৎসরের মধ্যে দু'তিনখানির বেশী বই লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ বালকটি যে পড়াশুনায় নিতান্ত অমনোযোগী একথাও বলা যায় না।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে যোগেশচন্দ্র যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"স্কুল কর্তৃপক্ষ কি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এখনো লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন বা অনুভব করেন বলিয়া মনে হয় না।"

যোগেশচন্দ্রের "পল্লীর গ্রন্থাগার" প্রবন্ধটি আশ্বিন, ১৩৬৪-র মন্দিরায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে পল্লীর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"অনেক পল্লীতে বিভিন্ন উপলক্ষে গিয়াছি। এড়েদ'র (এঁড়িয়াদহ) গ্রন্থগারটিও বেশ সুন্দর। সেখানেও কিছু কিছু পুঁথি রহিয়াছে দেখিলাম। মজিলপুর, জয়নগর, বারুইপুর—এসব স্থানেও গ্রন্থাগার আছে—এক একটি

গ্রামে এক নয়, বহু। সব কটিরই যে শ্রীছাঁদ ভাল তা বলিনা, তবে চেষ্টা খুব মহৎ।"

মাকরদ'র গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ একবার হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার সমিতির বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সেই উপলক্ষে যোগেশচন্দ্র মাকরদয় যান। এ সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"মাকরদ'র সম্মেলনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। রাজনৈতিক সম্মেলন বাদে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনও যে এইরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এ ধারণা আমার ছিলনা। এটি জাতির পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ।"

যারা সাহিত্য-চর্চা করেন এবং গবেষণা করেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করেন—একথা আমরা জানি। যোগেশচন্দ্রও তাঁর লেখার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়েছেন এবং পড়াশুনো করেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি কখনো কখনো অংশ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। এখানকার গ্রন্থাগারটি বাঙ্গলাদেশের একটি গৌরবের বস্তু। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে যোগেশচন্দ্র সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁর সংগৃহীত ৬২১ খানা পুস্তক ১৩৭১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে তিনি দান করে দেন। যোগেশচন্দ্রের বাসস্থান নব বারাকপুরে রামকৃষ্ণ পাঠাগার নামে যে পল্লী গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই তিনি তার সভাপতি ছিলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার জন্য তিনি বহুবার বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। ১৯ ৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগেশচন্দ্রকে পরিষদের আজীবন সম্মানিত সদস্য রূপে বরণ করা হয়। এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ এম, আর, রঙ্গনাথন, অপর দু'জন সুসাহিত্যিক ও গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল ও হরিহর

যোগেশচন্দ্রের শিশু-সাহিত্য

প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্র বাগল একান্তই গবেষক-সাহিত্যিক, উনবিংশ শতকের সার্থক ইতিহাসকার। সে ক্ষেত্রেই তার খ্যাতি। তবে, ছোটদের জন্য তিনি কম লেখেন নি। শিশুদরদী ছিলেন বলেই, মনে হয়, শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রবেশ। বাংলা শিশু-সাহিত্যে যোগেশচন্দ্রের নাম উপেক্ষা করার মতো নয়। কাজেই তার রচিত শিশু-সাহিত্যর কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করি।

পৃথিবীর সব দেশের মতই বাংলা শিশু-সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে দুটি ধারা নিয়ে। তার একটি হচ্ছে লোক সাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথা ও ছড়া, অপরটি হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত শিশু মনোপযোগী গল্প। বাংলা শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর এল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগে। বাংলা ও বাঙালী বিদ্যাসাগরের কাছে বিপুল ঋণী। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটিকেও তিনি সমৃদ্ধ করে একে মর্যাদার আসন দান করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনের নানা ঘটনা ও যা শিশুদের পক্ষে অনুকরণীয় ও কল্পনা বিস্তারে সহায়ক তা উপজীব্য করেছিলেন শিশুদের জন্য রচিত তার কাহিনীগুলিতে। তবে, তার রচিত শিশু-সাহিত্যে সাহিত্য-গুণ থাকা সত্ত্বেও নীতি-প্রচার অতি মাত্রায়,সোচ্চার।

বাংলা শিশু-সাহিত্য তৃতীয় স্তরে উপনীত হল রবীন্দ্রনাথের কালে। বাংলা শিশু-সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভেঙ্গে গেল তার হাতে; কী পদ্যের মাধ্যমে, কী গদ্যের মাধ্যমে হাস্যরসের উজ্জ্বল কিরণে শিশু-চিত্ত স্নান করিয়ে তাদের চিত্ত-বিনোদন করে তাদের রসানুভূতি যেমন জাগ্রত করলেন, তেমনি তাদের কল্পনার বিস্তৃতি-সাধনেও সহায়তা করলেন।

বাংলা শিশু-সাহিত্যর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন আর-ও কতো কতো সুলেখক, যথা—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর ঈশপের গল্পের টেকনিকে শিশুদের জন্য গল্প লিখলেন। রবীন্দ্র-যুগের শিশু-সাহিত্যকদের মধ্যে আর একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভা

হলেন সুকুমার রায়। শিশু-উপযোগী হাস্য-কৌতুক সৃষ্টিতে তার জুড়ি মেলা ভার। সুনির্মল বসু ও লীলা মজুমদারের (রায়) রচনায় তারই সার্থক অনুসরণ পরিলক্ষিত। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এদের দান অমূল্য।

তারপর এল শিশু সাহিত্যের চতুর্থ স্তর বা আধুনিক যুগ। এখনকার শিশু-সাহিত্যকদের দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে, নর-নারী নির্বিশেষে একদল পাঠক-সাধারণের জন্যই গল্প-উপন্যাস-কবিতা রচনা করেও কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিচিত্র রচনায় ব্রতী হয়ে শিশু-সাহিত্যর ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন, যথা—অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, অজিত দত্ত, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, নীহার রঞ্জন গুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ লেখকগণ। আর এক দল লেখক একান্তই শিশু-সাহিত্য রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এক কথায়, এদের যথার্থ আনন্দ শিশু-সাহিত্য সৃষ্টিতেই। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনির্মল বসু, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুখলতা রাও, বিশু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক-লেখিকাগণ। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগলকে স্বভাবতই প্রথম শ্রেণীভুক্ত করতে হয়। তাঁর সাহিত্যক জীবনের প্রথম ভাগেই অবশ্য তাঁর অধিকাংশ শিশু-সাহিত্যকর্মগুলি রচিত হয়েছে। এবং, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে অর্থাৎ খ্রীঃ ১৯৫৮-৬৯-এ, (বাংলা ১৩৬৬-১৩৬৭) শিশু-সাহিত্য পত্রিকা 'মৌচাক' ও অন্যান্য পত্রিকায়ও ছোটদের জন্য তার কিছু লেখা বের হয়েছিল।

যোগেশচন্দ্র ছোটদের রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শোনান নি। তাদের সামনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী গল্পচ্ছলে তুলে ধরেছেন। এই দিক থেকে তিনি বিদ্যাসাগর-পন্থী। এই পদ্ধতিতে শিশু-মনকে ইতিহাস পাঠে আগ্রহী করা সম্ভবপর হয়। তার এই সত্যবোধ ছিল যে, ছোটবেলা থেকেই ইতিহাস ঠিক মত না জানলে অর্থাৎ ইতিহাস জ্ঞান না জন্মালে জাতির ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন করা ও উজ্জ্বল করে গড়া সম্ভবপর নয়। একমাত্র ইতিহাস জ্ঞানই আমাদের বর্তমান কার্যক্রমকে নির্ভুল করতে পারে, আর বর্তমানের কার্যক্রম নির্ভুল হলেই ভবিষ্যৎ হতে পারে নিরাপদ ও

নির্বিঘ্ন। সেই বিশ্বাসের আলোকটি দিয়ে কিশোরদের জীবন আলোকিত করার অভিপ্রায়েই, বোধ করি, তিনি শিশুদের জন্যও এই ধরণের রচনা লিখেছিলেন। যোগেশচন্দ্রের কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সাহসীর জয়যাত্রা' (১৯৩৮), 'জগৎ কোন্ পথে' (১৯৩৯), 'মার্কিন জাতির কর্মবীর' (১৯৪১), 'জাতির বরণীয় যাঁরা' (১৯৪৩), বীরত্বের রাজটীকা (১৯৪৩), সংকল্প ও সাধনা (১৯৪৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'জগৎ কোন্ পথে' গ্রন্থখানির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'আজকের দিনে মানুষ শত চেষ্টা করলেও অন্য জাতি থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে না। জগতের এক দেশের সমস্যা অন্য দেশকে ভাবিত করে তুলেছে অবিরত। ভারতবর্ষ পরাধীন,* শক্তিহীন, সবই ঠিক, কিন্তু তাকেই এখন অন্য দশজনের সঙ্গে সমান তালে চলতে হচ্ছে। আবার নিজেকে শক্তিমান ও স্বাধীন করতে হলেও দশজনের খবরাখবর রাখতে হবে। এ সব কারণে দেশ-বিদেশের বর্তমান অবস্থার কথা জানা একান্ত আবশ্যক।' (*গ্রন্থখানি রচনার সময় ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল।)

সত্যই তো, আজ শুধু ঘরের কথা জানলে চলবে না। আমাদের দেশের ইতিহাস জানার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধেও জ্ঞানের আবশ্যক। 'আজকের দিনে এ-প্রয়োজনীয়তা বেশী করেই অনুভূত হচ্ছে। আফগানিস্থান, ইরাণ, আরব, শ্যাম আমাদের অতি কাছে, অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশরক্ষা প্রভৃতি নানাদিক থেকে এদের মূল্য তো কম নয়।' বালকেরা যাতে এ বিষয়ে সচেতন ও কুতূহলী হয় সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে লিখলেন 'জগৎ কোন্ পথে'।

এই গ্রন্থের 'জাগ্রত ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধে ছোটদের কাছে আজকের দিনে বিজ্ঞান কতখানি উন্নত হয়েছে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ছোটদের সামনে। 'লণ্ডন হতে টোকিও বা মেলবোর্ণ এই পনের বিশ হাজার মাইল পথ তিন দিনে যাওয়া যায়, এ কথা কি কয়েক হাজার বছরে কেউ কল্পনা করতে পেরেছে?' এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক চেহারার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—'ভারতবর্ষের এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি চিরন্তন ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। যুগে যুগে দেশের

উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, তথাপি এই ঐক্যবোধ কেউ নষ্ট করতে পারেনি। আজকের দিনের বিজ্ঞান এই ঐক্যবুদ্ধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের দেশ তো তারাই গড়বে। বিবিধের মাঝে ঐক্য স্থাপনই হবে সে গড়ার অন্তিম লক্ষ্য। সে-কথা অতি সহজ সুন্দর ও মিষ্টি করে বলেছেন এই রচনায়। এখানে তার কিছু অংশ উল্লেখ না করে পারছিনা। "তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও পড়ছ। এই ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হিন্দু-বৌদ্ধযুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ যুগ—একে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব চলেছে। আজ ইংরেজী উনচল্লিশশো উনচল্লিশ সাল। এখন আমরা কোথায় এসে পৌছেচি? এর নির্দেশ ইতিহাসের কাছে জিজ্ঞাসা কর—সে বলতে পারবে। জাতির জীবনের পূর্বাপর যোগসূত্র এতে তোমরা পাবে। আজকের দিনের কথা কিন্তু তোমাদের বিশদভাবে জানতে হবে, কেননা ভবিষ্যৎ তো তোমরাই গড়বে।"

যোগেশচন্দ্রের 'বীরত্বের রাজটীকা' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'বীরত্ব' কথাটি একটি ব্যাপক অর্থে তিনি প্রয়োগ করেছেন। যুদ্ধ শৌর্য-বীর্য প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র বটে, কিন্তু জীবনের অন্য বহু ব্যাপারেও নানাভাবে বীরত্ব প্রদর্শিত হয়ে থাকে। রাজ্যশাসনে ও পালনে, বহু হিতকর্মে, দানে-সেবায় যে-সব কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে তাও কম বীরত্বব্যঞ্জক নয়। সেই বীরত্বব্যঞ্জক নানা কাহিনী এই গ্রন্থে তিনি ছোটদের উপহার দিয়েছেন।

এই গ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প তাপসী রাবেয়া। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তো কথাই নেই, আমরা—বয়স্করা—তাপসী রাবেয়ার চরম সহিষ্ণুতায় বিস্ময়ে হতবাক্ না হয়ে পারি না।

তাঁকে আমরা দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। বাইরে থেকে তাকে একান্ত গভীর ও খুবই রাশভারি লোক মনে হতো। কিন্তু এই কাঠিন্যের অন্তরালে যে একটা শিশুমন সযত্নে লালিত হতো তা তার সংস্পর্শে এলেই অনুভব করা যেত। দৃষ্টিহীন অবস্থায় নববারাকপুরের শিশু ও কিশোররা তার বাহন হবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ এ অবস্থায় ছেলেরা বিরক্ত হয়ে এড়িয়ে চলে। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের বেলায় তার উল্টোটি ঘটতে দেখেছি। শিশু ও কিশোররা তাকে নিজেদের একজন

মনে করতে পারতো, তারা আনন্দে তাঁর সঙ্গে মিশতো। এই চারিত্র গুণ দুর্লভ বলেই মনে করি। যোগেশচন্দ্রের চরিত্রে এর সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি সার্থক শিশু সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন। যোগেশচন্দ্র কিশোর-কিশোরীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতেন। তিনি তাই তাদের উপযোগী করে বীরাঙ্গনা নারীদের বীরত্বের কাহিনী লিখেছেন। কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের কাছে এক-একটা দেশের ভৌগোলিক চেহারাও তুলে ধরেছেন। ইতিহাস ও ভূগোল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটা না জানলে অন্যটার সম্যক্ জ্ঞান হতে পারে না। তাই ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র সুযোগমত কিশোরদের মনোযোগ ভূগোলের দিকে আকৃষ্ট করতেও যত্ন নিয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্। 'তোমরা কি কেউ আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়েছ? যদি এখনও না পড়ে থাক, বড় হলে নিশ্চয়ই পড়বে। এই আরব ছিল ধনধান্যেভরা, দেশ-বিদেশের বণিকের যাতায়াতে সরগরম। কত রাজা-রাজড়া ছিলেন সেখানে। তাঁদের কীর্তিকাহিনীই বা কত। দিগ্বিজয়ে বের হতেন তাঁরা এখান থেকে। তোমরা পরে এসব জানতে পারবে।'…

'মধ্য আরব মরুময়। তরুলতাবিহীন প্রান্তর। যা কিছু জনপদ, তাতে জলকষ্ট ভীষণ। পল্লীবাসীরাও বড়ই দরিদ্র। এই মরু অঞ্চলেরই এক পল্লীতে ইসমাইল নামে একজন বৃদ্ধ বাস করতেন।'

তাপসী রাবেয়ার উল্লেখ পূর্বে করেছি। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বলেছেন—'বিখ্যাত নগরী বসরা। এরই এক ধনীগৃহে নৈশভোজন। গভীর রাত্রি, পণ্ডিতরা পানাহারে রত, গৃহস্বামী স্বয়ং সব দেখাশুনা করছেন। দাসদাসীরা মদ্যমাংস পরিবেশন করছে। এমন সময় একজন খেতে খেতে অন্য জনকে সুধালে, দেখুন মাংস ছাড়িয়ে এই অস্থিগ্রন্থি বের করেছি। এতো পশুর অস্থিগ্রন্থি। মানুষের অস্থিগ্রন্থি কিরূপ? গৃহস্বামী কর্তৃক আগন্তুকদের বাসনা ও কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাবেয়ার উপরই এই নৃশংস কাজ চালানো হোল। কয়েকজন লোক রাবেয়াকে ঠেসে ধরল। তারপর তার পা থেকে একটির পর একটি মাংসপেশী কেটে অস্থিগ্রন্থি বের করতে লাগল। সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা! পশু ও মানুষের অস্থিগ্রন্থির যখন পরীক্ষা চলছিল তখন এক ব্যক্তি দু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে বলে ফেললে, 'ভগবান, তোমার কী লীলা!' রাবেয়ার এই চরম সহিষ্ণুতা যোগেশচন্দ্র যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন

তাও লক্ষ্য করার মতো; কাহিনীর বর্ণনা পড়তে পড়তে আমাদের মন চলে যায় রাবেয়াকে ঘিরে বসরায়, চোখের সামনে ভেসে উঠে ঈশ্বর-চিন্তায় সমর্পিতপ্রাণ তাপসী রাবেয়ার যোগিনী মূর্তি। "বীরত্বের রাজটীকা" গ্রন্থে এমন কত অসাধারণ নারীর কথা বলা হয়েছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত যোগেশচন্দ্রের প্রচুর লেখা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার হদিস করা সহজ কথা নয়। ভাগ্যক্রমে মৌচাকের কিছু লেখা অধ্যাপক শ্রীপূর্ণেন্দু বসু আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এই লেখাগুলির একটু বিশদ আলোচনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই লেখাগুলি পুস্তকাকারে কোন দিন যদি প্রকাশিত না হয়, তা হলে তো কালের গর্ভে তা বিলীন হয়ে যাবে। তাই এখানে এগুলির একটু বিশেষ আলোচনা করব।

'মৌচাকে' ছোটদের জন্যে লিখতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতিচারণ করেছেন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার ফেলে-আসা জীবনের অনেক কথাই বলে ফেলেছেন। শিশুসাহিত্যে এও এক ধরণের নতুন টেক্‌নিক্। এমনি করে গল্পের মধ্যে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে তিনি আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন। তাঁর এই আলাপচারিতা অনেকক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যোগেশচন্দ্রের এই লেখাগুলির মধ্যে তাঁর গুরুমশাই, গ্রাম, সমাজ, গ্রামীন মানুষের আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার প্রভৃতি অনেক কথাই এসে পড়েছে। তাঁর এ লেখাগুলি গ্রামের গন্ধে ভরপুর।

যোগেশচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন কেটেছে পূর্ব বাংলার পল্লীজননীর ক্রোড়ে। এই পল্লীর দুঃখ-কষ্ট, তুচ্ছতা এবং স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও একটা প্রাণৈশ্বর্য ছিল। যোগেশচন্দ্রের হৃদয়ে তা দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামের প্রতি তার টান পক্ষপাতিত্ব দোষে হয়তো দুষ্ট, কিন্তু সে দোষ মার্জনীয় বলেই মনে করি। যোগেশচন্দ্রের এই পল্লীপ্রীতি তার শিশুরচনার ছত্রে ছত্রে বিচিত্র সৌরভ ছড়িয়ে আমাদেরই মনটাকে মাতোয়ারা করে তোলে।

রূপকথার মূল্য তিনি ভোলেন নি। প্রথমেই তাঁর 'রূপকথা শোনো' গল্পটির কথায় আসা যাক্। গল্পের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন—'রূপকথা শুনতে কার না ভাল লাগে? তোমরা নিশ্চয়ই ঠাকুরমা-দিদিমার কাছে রূপকথা শুনে থাকবে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপকথার বিখ্যাত বই। 'ঠাকুরদাদার ঝোলা'ও তো বেরিয়েছে।

লালবিহারী দের 'ফোক্ টেলস্ অফ্ বেঙ্গল' থেকে নানা রূপকথা এক মাস্টারমশাই গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার পূর্বে কয়েকদিন ধরে পড়ে শোনাতেন। বড় ভাল লাগত। সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা, কথা শেষে আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল ইত্যাদি ছড়া; এগুলি তন্ময় হয়ে শুনতাম। রূপকথা বা গল্প-কাহিনী পড়ার চেয়ে শোনায় যেন বেশী আনন্দ। তাই বলে তোমরা পড়া বন্ধ করো না। আজকাল স্কুলপাঠ্য বই পড়ানোর চাপে মাস্টার মশাইরা 'আউট বুক' পড়ে শোনাবার সময় হয়ত খুবই কম পান। বর্তমানের নূতন পরিবেশে ঠাকুরমা-দিদিমাদেরও পাওয়া যে মুশকিল!'

এই লেখাতেই যোগেশচন্দ্র তার নিজের চেনা বৃদ্ধ রাইচরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন—'আমাদের বাড়ীতে চার সরিক, কিন্তু তিন গৃহস্থ; এক সরিক ভিন্ন বাড়ীতে থাকতেন। বৃদ্ধ রাইচরণ এক সরিকের আত্মীয়। আমরা তাঁকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। লম্বা চেহারা, কৃষ্ণকায়, চোখ দুটি কোটরগত, চুলগুলো কাঁচাপাকা। চেহারা দেখে আমাদের মনে ভয় হতো না সত্যি, তার কারণ গল্প বলে তিনি আমাদের মন ভিজিয়ে রেখেছিলেন। বৃদ্ধ রাইচরণ আমাদের বাড়ীতে হামেশা আসতেন। তিনি এলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যেত। সকালে এলে ভাবতাম কখন সন্ধ্যা হবে; সন্ধ্যায় এলে তাঁর খাওয়া-দাওয়া শেষ হবে কখন তার জন্য আমরা অধীর হয়ে উঠতাম।' এমনি করে লেখক গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তার সঙ্গে স্মৃতির টুকি-টাকি থেকে কত কথাই না বলেছেন। কিন্তু এগুলি গল্প হলেও সত্য বৃত্তান্ত। যোগেশচন্দ্র যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। অবশ্য দেখার যোগ্যতা ও লেখার শক্তির এমন সুসমঞ্জস সম্মিলন কমই দেখা যায়।

'মৌচাকে'র আর একটি স্মরণীয় গল্প 'সাঁতার কাটা।' যোগেশচন্দ্র বাগল এ গল্পে ছোটদের কাছে সাঁতার সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তুলছেন। সাঁতারকাটা না জানলে কি বিপদে পড়তে হয় সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে যে স্টাইল ব্যবহার করেছেন তার প্রশংসা করতেই হয়। সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি শিশু-মনকে জয় করেছেন। এ-গল্প থেকে কয়েকটি লাইন তুলে না ধরলে আমার মনে হয় যোগেশচন্দ্রের শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আমার এ বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে

যাবে। গল্পকার লিখেছেন—'এ তো কলকাতা নয়, নদী নালার দেশ,* সাঁতার কাটা না শিখলে হয়? ··· ··· আমাদের পাঠশালা যে বাড়ীতে সে বাড়ীতে বিধবার একমাত্র ছেলে, নাম তার গজা। বয়স এমন কিছু নয়, মাত্র দশ-বার। কি কাজে মা তাকে পাঠিয়েছিলেন পাশের গাঁয়ে। ··· ··· সাঁকো পার হবার সময় পা ফস্কে গিয়ে, কি ধর্ণা থেকে হাত সরে গিয়ে সে জলে পড়ে। সাঁতার জানত না গজা। সে জলে ডুবে মারা গেল। এ-খবর যখন মার কাছে গিয়ে পৌছল, তখন তার কি অবস্থা হ'ল তা সহজেই বুঝতে পার। সে কি কান্না, কি মর্মভেদী চিৎকার! কয়েকমাস যাবৎ পাগলের মত হয়ে গেল। পাঠশালার সামনে এসে ডাকত—গজা, গজা! গজাকে খুঁজতে এ-পাড়া ও-পাড়া করতে লাগলো তার মা।'

লেখাটির মধ্যে লেখক করুণরসের সঞ্চার করেছেন। ঘটনাটি যখন আমরা পড়ি, তখন গজার মায়ের প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মন ভরে ওঠে।

লেখকের 'দশরা'র পরে' আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পে লেখক অতীত স্মৃতির রোমন্থন করে শিশুদের কাছে তাঁর জীবনের বাল্যকালের ঘটনা তুলে ধরেছেন। এ-সম্বন্ধে এই গল্প থেকে একটি জায়গা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। লেখক বলেছেন—'আমরা গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে একটা বড় কর্তব্য সমাধা করেছি, এমন বোধশক্তি তখন আমাদের জন্মায়নি। প্রত্যেক বাড়ীতে বয়স্কদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলে নারকেল নাড়ু পাব এই ছিল আমাদের তখনকার প্রধান আকর্ষণ। কাপড়ের টোপর পুরে সন্দেশ কুড়োতাম। যারা একটু বেশী চতুর তারা কলাপাতা দিয়ে ঠোঙা মত করে তাতে সন্দেশ পুরত। কত আর খাব। কয়েকটা খেয়ে বাকী সব বাড়ী নিয়ে আসতাম পরে খাব বলে। এইভাবে পাড়ায় পাড়ায় ধুম পড়ে যেত।' একেবারে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন যোগেশচন্দ্র। সহজ, সরল ভাষায় এত অল্প কথায় এই ছবি রচনা তাঁর বিস্ময়কর রচনা শক্তিরই পরিচায়ক।

'মৌচাকে' শিশু-সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগলের এমনি আরও কত রচনা ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে 'দ'শরা বা নিরঞ্জন উৎসব', 'মৎস্য-শিকার',

---

* প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, নদীবহুল 'বরিশাল' যোগেশচন্দ্রের জন্মস্থান।

'খোল বা আড়ং', 'কৃষিকাজ', 'নবান্ন', 'আলপনা', 'আশ্বিনের ঝড়', 'সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত', 'নৌকা বাওয়া', 'কালবৈশাখী' "নতুন চোখে দেখা" * প্রভৃতি গল্পগুলিও শিশুদের মনোরাজ্যে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। গল্পকার বিশেষ করে 'নতুন চোখে দেখা' গল্পটির মধ্যে যে টেকনিক অবলম্বন করেছেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। গল্পকার বলেছেন—'তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। যতীনবাবু আমাদের বাংলা পড়াতেন। তিনি আসলে কিন্তু অঙ্কের শিক্ষক। অঙ্কে আমার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না। যতীন্দ্রবাবুর শিক্ষায় অঙ্কেও আমার মতি হয়।·········যতীনবাবুর বাংলা পড়ানোর কথা একটু বলি। আমাদের পাঠ্য বই ছিল 'সাহিত্যের রত্নমালা'। সেরকম বই এখন আর দেখি না। 'বঙ্গের রত্নমালা' বইখানিও বেশ ভাল। · ...যতীন্দ্রবাবু এই বইয়ের রচনাগুলির অনেকটা আমাদের পড়িয়েছিলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে 'পিরিয়ড' বা ঘণ্টা, সময়টা এমন কিছু বেশী নয়। তবে পড়ায় যখন মন না বসে তখন এ-ও কিরূপ দীর্ঘায়ত বোধহয় তোমরা সকলেই বুঝতে পার। পড়ায় যতীন্দ্রবাবু এরূপ কৌতূহলের উদ্রেক করতেন যে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তার পড়ানো শুনতাম; ঘণ্টা পড়লে তিনি চলে যেতেন, আক্ষেপ এই—কেন এত শীঘ্র সময়টা কেটে গেল। সীতারামের উদয়গিরি ললিতগিরির কথা, কপালকুণ্ডলার নবকুমারের কথা যেন হৃদয়ে গেঁথে গেল'।

দীর্ঘজটিল বাক্যের ব্যবহারে শিশুদের মন হাঁপিয়ে ওঠে এবং তাতে গল্পরস আস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সেজন্যে গল্পকার যোগেশচন্দ্র ছোট ছোট সরল বাক্যের মাধ্যমে যতীন্দ্রবাবুর কথা শিশুদের কাছে তুলে ধরেছেন। গল্পের ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ। বাক্যগুলি ছোট, সাবলীল; কথাবার্তা খুবই ঘরোয়া ধরণের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। গল্পের কাঠামো আটসাট। গড়ন নিটোল। ঘটনার বিন্যাসে পাঠকের চমক লাগাতেও তিনি নিপুণ। আচমকা গল্পের বাঁক ফিরিয়ে পরিণতি টেনে আনার কাজটা খুব সহজ নয়; অথচ তিনি এ দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন বেশ কয়েকটি গল্পে। ছোটদের জন্যে তাঁর লেখাগুলিতে শিশুদের তথা কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অপার দরদে-ভরা তাঁর মনটি স্পষ্টই বুঝা যায়।

---

* একটি তালিকা গ্রন্থপঞ্জীর পরিপূরক রূপ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে।

জীবনীর ভেতর দিয়ে তত্ত্বকথা প্রকাশ করবার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। কিন্তু জীবনীর আসল উদ্দেশ্য জীবনকে চিনিয়ে দেওয়া। যোগেশচন্দ্র ছোটদের জন্যে রচিত 'মার্কিণ জাতির কর্মবীর' ও 'বিদ্যার্থী মনীষী যাঁরা'—এই বই দুখানিতে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি ছোটদের আরও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জীবন শুধু তত্ত্ব নয়। জীবন-বনস্পতির মূল রয়েছে শৈশবে। তাই মনীষীদের জীবনের শৈশবকালীন ঘটনার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। আর কে অস্বীকার করবে এ কথা—'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'

যোগেশচন্দ্র ছোটদের জন্যে লেখায় রাক্ষস-খোক্কসের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বরং তাদের প্রকৃত মানুষ হবার সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর 'সকালে শোয়া, সকালে ওঠা', 'কর্মই পূজা' প্রভৃতি লেখাগুলি পড়লে এ-কথা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। 'সকালে শোয়া, সকালে ওঠা'—শীর্ষক রচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'তোমরা যদি সকালে শোও আর সকালে ওঠ তাহলে তোমরা স্বাস্থ্যবান হবে, ধনবান হবে আর হবে জ্ঞানবান। তিনটি তোমরা একসঙ্গে হতে পারবে।

...... তোমরা প্রত্যেকে একবার ভেবে দেখ কে কতখানি পালন কর এই কথা। রাত্রে যদি তোমরা সকালে শুতে যাও, তবে উঠতেও হবে সকালে। ... ... জগতে মহান ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখতে পাবে এই নিয়মটি পালন করলে কাজ করা যায় বিস্তর। ... . দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাত ন'টার পরে আর দেখা যেত না। সভাসমিতিতেই হোক, জ্ঞানীগুণীদের মজলিশেই হোক, তিনি ন'টার পরই সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তেন। উঠতেন আবার অতি ভোরে। ... ... তোমরা ব্রাহ্ম মুহূর্ত কথাটা কি শুনেছ? আমরা রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা প্রসঙ্গে এই শব্দটির উল্লেখ বহুবার শুনেছি। ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ছেলেমানুষ বলে রেহাই পেতেন না। তাকে প্রতিদিন পিতার নির্দেশে ঐ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠতে হত। তিনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য সেরে পিতার সঙ্গে প্রার্থনায় বসতেন। পরে মুগুর ভাঁজতেন, কুস্তি লড়তেন, পরে পাঠে বসতেন।' বাস্তবিকই যোগেশচন্দ্র এ ধরণের লেখার মাধ্যমে

শিশুদের সত্যিকারের বড় হবার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর শিশু-সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। যোগেশচন্দ্রকে কেউ-ই শিশু-সাহিত্যিক বলেন না, কিন্তু এই বিভাগে তাঁর স্থানটি অবহেলার নয়, বরং একটি সম্মানিত আসনের দাবি তাঁর আছে।

বিংশশতকের চোখে ঊনবিংশ শতক

ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

রামমোহন রায় যদিচ সারাজীবন বিপুল পরিশ্রমে বেদান্ত উপনিষদের বিস্মৃত শ্লোক ও তদীয় বঙ্গানুবাদ এদেশীয় জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন, তথাপি ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের অতিপরিচিত নাম সম্রাট অশোকের বিচিত্র কীর্তিকাহিনী তাঁর পক্ষে জেনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি অশোকের অস্তিত্বের কথা তাঁর কতখানি জানা ছিল তাও গবেষণার বিষয়। কেবল অশোকের কীর্তিকাহিনী কেন তিনি পদব্রজে তিব্বতে বা ভূটানে (হয়ত বা) গিয়েছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশিখর যে হিমালয়ের এই অংশেই আছে সে-খবরও তাঁর জানবার কোনো উপায় ছিল না। মহেঞ্জদাড়োর সভ্যতার কথা তো রামমোহন কেন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউই নাম পর্যন্ত শোনেন নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানদৈন্যের পরিচয় দেবার জন্য বা তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁদের জ্ঞান বহির্ভূত তথ্য-তালিকা প্রণয়ন আমার উদ্দেশ্য নয়, গত একশো বছর ধরে আমাদের ইতিহাস-চেতনা কতখানি ব্যাপ্ত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের অনিবার্য জ্ঞান-পরিসীমা উল্লেখ করতে হল। বস্তুত পক্ষে, প্রিন্সেপ সাহেবের অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার, রাধানাথ শিকদারের জরীপ বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎখনন কার্যের পূর্বে উপরে বর্ণিত তথ্যগুলি আমাদের নজরে আসা কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। এই ইতিহাস-চেতনা বা দেশ-জ্ঞানের পটভূমিকা কীভাবে তৈরি হল? রামমোহনই সেই প্রথম মানুষ যিনি অতীত ভারতবর্ষের দিকে সশ্রদ্ধ গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। রামমোহনের প্রধান অন্বিষ্ট ছিল অতীতের ভারতের ধর্মদর্শন ও সমাজপ্রথা। প্রাচীন ভারতের যে-সম্পদের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তুচ্ছ করে দেখা চলে না। রামমোহন যে-দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্র ও সমাজপ্রথাকে

দেখলেন তা ছিল উদার, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত। এই নির্মোহ বিচারশীল অনুসন্ধান প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল এবং সেই বিচারে রামমোহনই উনিশ শতকের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ।

স্বদেশ ও স্বজাতির অতীতকৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাতির আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে, কর্তব্য বোধকে জাগ্রত করে। রামমোহন জাতির চিত্তে সেই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের সূচনা করেন। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, যথার্থ বিচারশীলতার অভাবে এই আত্মবিশ্বাস সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য এবং রামমোহন-পরবর্তী কালে সেই মোহাচ্ছন্নতা অতীত ভারতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে অনুদার অহংকারে নামিয়ে নিয়ে এসেছে বারে বারে, তার অনুস্মৃতি আজকের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায় সংকীর্ণ ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যে এবং সেই খানেই আমরা রামমোহনের উত্তরাধিকারের যোগ্যতা হারিয়েছি।

রামমোহন আত্মবিশ্বাসের সূচনা করেছিলেন মাত্র—সেই কর্তব্য বোধকে জাগরূক রাখতে ও আত্মবিশ্বাসকে সমৃদ্ধ করতে যে নিরন্তর জ্ঞানসাধনা ও তথ্য অনুসন্ধান অব্যাহত রাখতে হয়, সৌভাগ্যক্রমে গত একশো বছর ধরে তার অভাব ঘটে নি। উনিশ শতকের মধ্য ভাগে যখন একদিকে 'বিদেশের রীতিনীতি, বিদেশের কাব্যস্মৃতি, / অধ্যয়ন দিবস যামিনী' তারই পাশে শুরু হয়, ভারতের পূর্ব কীর্তি করহ স্মরণ/রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?' কিন্তু 'কেমনে সুখের দিন, অনন্তে হইল লীন? / আর কি তা আসিবেনা ফিরি? / কোথায় প্রতাপশালী, প্রচণ্ড মার্তণ্ডাবলী, / অস্ত গেল ধরায় আঁধারি?' এ জাতীয় ছন্দোবদ্ধ হা হুতাশে নয়, 'ক্ষণতরে ক্ষমা দাও, নয়ন মিলিয়া চাও, / উঠ উঠ দিন যায় বয়ে। / এই বেলা ভাঙ্গ ঘুম, ভারতে লেগেছে ধূম, / উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায়।' যাঁরা 'নিষ্কাষিয়ে জ্ঞান অসি, বিনাশিয়ে ভ্রমরাশি, / দেশের উন্নতি দিকে যায়।' এই জ্ঞান অসি নিষ্কাষিত নব্যসম্প্রদায়ের বহু পরিশ্রমেই ভারতের অতীত অন্ধকারের দিগন্তে ধীরে ধীরে আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বহু বিস্মৃত তথ্য আবিষ্কৃত হল, বহু তত্ত্ব নূতন দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হল। উনিশ শতকের এই জ্ঞান চর্চাকেই নবজাগরণ, বা রেনেশাঁ বলা হয়ে থাকে। এই কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ ভূমিকা ছিল তথ্যসংগ্রহব্রতী গবেষকবর্গের।

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতেই পারা যায় না উপনিষদ্ থেকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত তথ্যগুলি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেলে আমরা আজ কোন্ অন্ধকারে বাস করতাম।

বিগত একশো বছরের ইতিহাস-চর্চার ছিল দুটি প্রধান দিক—তথ্য সংগ্রহে নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠা আর তত্ত্ব বিশ্লেষণে নির্মোহ মেধা। দ্বিতীয় পর্যায়টি প্রথম কর্ম-কাণ্ডের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। উনিশ শতকের নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী গবেষককুল অতীত ভারতের বহু তথ্য, পুঁথি, পাথর-ও ধরণীগর্ভ ঘেঁটে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, যার ফলে অতীত ভারতের অনেকখানি, যা অন্ধ ভক্তিতে শালগ্রাম শিলার মতো বিগ্রহ জ্ঞানে পূজিত হত, আমাদের কাছে অতি পরিচিত ঘরের চেনা জিনিস হয়ে উঠল। আজ কত অনায়াসে সিন্ধু-সভ্যতা, অশোক, হর্ষবর্ধন বা ওই জাতীয় নামগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়ে গেছে। এই তথ্য সংগ্রহের সূত্রে আমাদের মধ্যে এক অতীত অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি ও বিশ্লেষণশীল ঐতিহাসিক-দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটল এবং সেটাই আমাদের পরমলাভ।

এই সুস্থধারা বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মোটা-মুটি ভাবে অব্যাহত থাকলেও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাববাদী জাতীয়তাবাদের উন্মত্ত নেশায় আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা ক্রমেই অবৈজ্ঞানিক সংস্কারবাদী ঐতিহ্যসর্বস্বতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। যার ফলে উনিশ শতকের নবজাগরণের ধারাটি বহুলাংশে ঐতিহ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে পর্যবসিত হতে চলল। নবলব্ধ বিচারশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির পরিবর্তে অহেতুক ভক্তিজাত বিগ্রহীকরণ এবং 'অতীতে ভারতে সবই ছিল আর সবই ভালো' এই জাতীয় এক মনোভাব আমাদের মন আর চোখকে আধুনিক জগতের বিপুল প্রগতির প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক নিরর্থক আত্মসন্তুষ্টির সংকীর্ণতায় ডুবিয়ে রাখল। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই অল্পবিস্তর ঘটছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যাশ্রয়ী হলেও, তাঁর শেষ পর্যায়ের অতীত প্রীতিজনিত উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয়ে অনেকে পুনরুজ্জীবনবাদের স্রোতে গা ভাসিয়েছিল। এর ফল হল মারাত্মক। আমরা ভক্তিভরে বন্দেমাতরম্ গাইলাম, কিন্তু ডিরোজিওকে ভুললাম। হিন্দু মেলার সূত্রে প্রাচীন ভারতের জয়ধ্বনি মণ্ডিত অজস্র

জাতীয় সংগীতের উৎস খুলে গেল, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তকে যথার্থ মর্যাদায় তুলে ধরলাম না। গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটক শুনে চোখের পাতা ভিজে উঠল, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণা চোখে পড়ল না। এই ভাবে আমরা রামমোহনের উত্তরাধিকার থেকে দূরে সরে যেতে থাকলাম। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকের চোখে ভালো ঠেকে নি। তিনি যখন নব্যবিজ্ঞানের জন্মভূমি পাশ্চাত্য জগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বললেন 'পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার / সেথা হতে সবে আনে উপহার' তখন কেউ কেউ মনে করলেন সর্বজ্ঞানের আকর ঐতিহ্যময় ভারত আবার কোন্ দুঃখে পশ্চিমের দ্বারস্থ হতে যাবে, কবি নিশ্চয়ই পশ্চিমী মোহের আবর্তে পড়েছেন। তবে সমাজ ইতিহাসে কোনো একটি ধারাই নিরঙ্কুশ একাধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, তাই যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যাশ্রয়ী গবেষণার ধারা ক্ষীণভাবে হ'লেও এই শতকেও অব্যাহত থাকল। এই ধারাটিকে অব্যাহত রেখে যাঁরা আমাদের চেতনাকে সংকীর্ণ অহংকারী জাতীয়তাবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাঁরা আমাদের কাছে স্মরণীয়। এঁরাই আমাদের জাতীয়চেতনার তরল উচ্ছ্বাস ও দেশজ্ঞানের সরল অনুসন্ধিৎসার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

বিংশ শতকে এসে আমরা এক নতুন গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করলাম। উনিশ শতকে আমরা প্রাচীন ভারতকে নানাভাবে খুঁজেছি, সেই সূত্রে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। উনিশ শতকের এই জ্ঞানান্বেষণের বিপুল সমারোহ অচিরে নিজেই ইতিহাসের গবেষণাবস্তু হয়ে দাঁড়াল। বিশ শতকে আমরা ক্রমেই অনুভব করতে লাগলাম যে, ঘরের কাছের উনিশ শতকের বহু তথ্যও ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে উদ্ধার করতে হবে। বিশ শতকে তার ফলে এক উনিশ শতাব্দীয় বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল। এঁদের প্রধান কাজ হল উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, বিবরণী ঘেঁটে নানা সভা-সমিতি নানা সামাজিক উদ্যোগের তথ্য উদ্ধার করা।

এই গবেষণা নিছক অবহেলায় ভুলে-যাওয়া তথ্য খুঁজে বের করবার আয়োজন নয়। এই উনিশ শতকের সংবাদ সংগ্রহ ক্রমেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। উনিশ শতকের খবর আমরা যত বিশেষভাবে পাচ্ছি

ততই বর্তমানের দুর্গতি ও নানা সমস্যার স্বরূপ আমাদের কাছে আরও বেশি স্পষ্ট হচ্ছে এবং তা থেকেই যথার্থ সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। উনিশ শতকের নানা উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বহু পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী ধারা, সেগুলির সামগ্রিক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সার্থক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গত শতকের যে-সব মানুষকে আমরা মহাপুরুষ বলে মেনে নিয়েছি, তাঁদের সম্বন্ধে মুগ্ধ ভক্তির প্রবণতা আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। প্রশ্নকে সর্বদাই সজাগ রাখতে হবে, নইলে ইতিহাস কখনোই সঠিক বা সম্পূর্ণ হবে না—এবং এই জিজ্ঞাসু মন ততই তৃপ্ত হবে, যত নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। আমাদের মধ্যে এক অনৈতিহাসিক ভক্তিসর্বস্ব মন আছে, কোনো স্বীকৃত মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেই সেই মন ভীত সংকুচিত হয়ে পড়ে। মনে করে এই বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেল। অনেক সময় রাষ্ট্রশক্তিও এই অনৈতিহাসিক ভক্তিসর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রশ্নোন্মুখ প্রবণতাকে স্তব্ধ করতে চায়। কিছুকাল আগে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ডঃ অমূল্য চন্দ্র সেনের বইয়ের প্রসঙ্গ অনেকেরই মনে আছে। সে গ্রন্থের তথ্যাশ্রয়ী প্রতিবাদ আজও চোখে পড়ল না, কিন্তু বইটিকে পাঠকের চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হল। এটা দুর্লক্ষণ। সম্প্রতি রামমোহন নিয়ে যে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে, তাতে অনেকেই তথ্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন—এটা অতি সুলক্ষণ। আলোচনা হোক, তথ্য অনুসন্ধান চলুক। নইলে রামমোহনকেও পাব না, ইতিহাস-চেতনাকেও হারাব।

উনিশ শতক সম্বন্ধে, বস্তুত সমগ্র অতীত সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন যত অব্যাহত থাকে ততই মঙ্গল, ততই আমরা নিজেদের ভালো করে বুঝতে পারব—কার আশীর্বাদ আর কার অভিশাপ যে আমাদের আজকের এই অবসাদ নিয়ে এসেছে সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

উনিশ শতকের নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ আধুনিক ভাষায় যাকে বুর্জোয়া সমাজ বলা যেতে পারে, তাঁদের আন্দোলন, আয়োজন, সংগঠনের অনেক খবর আমাদের সামনে এসেছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ গবেষকদের কঠোর পরিশ্রমে। তথ্যান্বেষী গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—গবেষক কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে বসে থাকতে পারেন না। তাঁকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে যেতে হয়, তাঁর সংগৃহীত তথ্য

তাঁকে যা বলাবে তাই বলতে হয়। কিন্তু এ কাজে এক বড় বাধা হয় আমাদের আজন্ম লালিত সংস্কারগুলি। জনশ্রুতি ও লোকবিশ্বাস পরম্পরায় আমাদের মনের মাঝে যে সংস্কার বাসা বেঁধে থাকে, ইতিহাসের গর্ভ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনেক সময় তাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে থাকে, তখনই গবেষকের নিষ্ঠার পরীক্ষা. আজন্ম লালিত সংস্কারের সঙ্গে নব সংগৃহীত তথ্যের। এ ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র প্রমুখ গবেষকেরা যে নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টির ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে নতুন নতুন তথ্য এলে পুরাতন ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে পারে—ইতিহাস চর্চায় তা হতেই পারে, কিন্তু পুরাতন ধারণার মধ্যে কোনো বিশেষ মতলব বা অভিসন্ধি ছিল তা প্রমাণিত হলে গভীর পরিতাপের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস ব্রজেন্দ্রনাথ বা যোগেশচন্দ্রকে নিয়ে সেই জাতীয় পরিতাপের কোনো কারণ ঘটবে না কোনোদিন।

উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজের খবর আজ আমাদের অনেকখানি জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আরও একটি কাজ বাকি রয়ে গেছে -তা হল তলাকার মানুষের আন্দোলন ও সংগঠনের কথা। এ কাজটিতে যোগেশচন্দ্র বা তাঁর সমধর্মীরা বিশেষ হাত দিয়ে যেতে পারেন নি। যোগেশচন্দ্র বার বার এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, তাঁর শারীরিক অপটুতা তাঁকে বেশি দূর এগোতে দেয় নি, বিশেষত তাঁর দৃষ্টিক্ষীণতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তবে সম্প্রতিকাল কিছু কিছু প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। সমাজের এই অংশের এক বিরাট আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাস আমাদের উদ্ঘাটিত করতে হবে। সেখানেও যেন আমরা যোগেশচন্দ্র প্রমুখের অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং নির্মোহ নিষ্ঠা অনুসরণ করতে পারি। তাহলেই আমরা যোগেশচন্দ্রের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে পারব এবং উনিশ শতককেও যথার্থভাবে জানতে পারব।

ব্যক্তি-পুরুষ যোগেশচন্দ্র বাগল

কানাইলাল দত্ত

বিদগ্ধ সমাজে যোগেশচন্দ্র বাগল একটি অতি পরিচিত নাম। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তিনি চারণের ন্যায় উনবিংশ শতকের বাংলা ও বাঙালীর কর্মকথা আমাদের শুনিয়ে আসছেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম-সমাজ সংস্কার, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়াসের যে বিস্ময়কর বিকাশ বাঙালী জীবনে ঘটেছিল তারই তথ্যনির্ভর অথচ রোমাঞ্চকর ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র। বিদেশী শাসকের অনীহা ও উপেক্ষা এবং আমাদের অনাদর এবং আত্মবিস্মৃতির অভিশাপে নিকট অতীতের অতি প্রয়োজনীয় সেই ইতিহাসের আবার অবলুপ্ত হতে বসেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করেছে আমাদের আত্মসচেতনতাও তত বেড়েছে। এই সচেতনতা আত্মবিশ্বাসের দ্বারা স্থিতিশীল হয়। বাঙালীর অতীত সুকৃতির কথা এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ শুরু করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র তাঁর সার্থক উত্তরসূরী।

যোগেশচন্দ্র সাংবাদিক রূপেই কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন। মুখ্যতঃ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ এবং স্বল্প পরিমাণে দেশ সাপ্তাহিকের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক খবরাখবরের মূলধারা ধরেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার চলতে হয়। প্রতিদিন শত শত সংবাদ তৈরি হচ্ছে। তার মধ্য থেকে সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় গুটি কয়েক মাত্র খবর বেছে নিতে হয়। সংবাদ বাছাই কাজটির উপরই সাময়িক পত্রের উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। সার্থক সাংবাদিক ভিন্ন সুচারুরূপে এই কাজটি করা যায় না।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামত ও পরিবেশিত তথ্যাদির মূল দায়িত্ব লেখকের। তথাপি কাগজের আদর্শ রক্ষার্থে মতবাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মর্যাদা ও সুনামের জন্য তথ্যাদির যাথার্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। দক্ষ সাংবাদিকের ন্যায় যোগেশচন্দ্র সুচারুরূপে এই কাজটি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন। বিদগ্ধ সমাজে প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে

প্রকাশিত তথ্যাদি সাধারণত বিনা বিতর্কে গৃহীত হতো। প্রবাসীর মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। চলতি সমস্যা সম্পর্কে প্রবাসী কি বলেন তা জানবার জন্য বহুজনে সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা—সাংবাদিকপ্রবর শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এজন্য নিশ্চয়ই সর্বাধিক। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ কাজে যোগেশচন্দ্র সহ প্রবাসীর অন্যান্য সহকারীদের অবদান কম নয়। কিন্তু গবেশক যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিপুল খ্যাতির আড়ালে আজ সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত ম্লান ও বহুলাংশে বিস্মৃত।

বাঙলা ও বাঙালীর কর্মকথাকে বাদ দিয়ে আমাদের লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বিদ্যার্থী থেকে পণ্ডিতজন পর্যন্ত প্রায় সকলকে কোন-না-কোন সময়ে যোগেশচন্দ্রের রচনাবলীর শরণ নিতে হয়। সুতরাং কালক্রমে সুধীজনেরা গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়নে উদ্‌যোগী হবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমি এখানে তাঁর গবেষণা পদ্ধতির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণার বিশিষ্ট পদ্ধতি এই। আমাদের সমাজে যা কিছু ঘটে, তার পিছনে ব্যক্তি-মানুষের বিপুল ও বিস্ময়কর অবদানটি বর্তমান সময়ে তেমন গুরুত্বসহকারে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। সাধারণত, ঘটনাবলীর ঝোঁক বা প্রবণতা বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যোগেশচন্দ্র বোধ হয় ব্যক্তি-মানুষের কর্মকৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। প্রতিভাবান্ ও কর্মদক্ষ মানুষের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমসাময়িক ঘটনা প্রভাবিত হয়। সেগুলি নতুন আকার ধারণ করে এবং নূতনতর মূল্য লাভ করে। সেজন্যই যোগেশচন্দ্র এক-একজন মানুষের জীবন ও কর্মকথাকে কেন্দ্র করে সে-যুগের নানা আন্দোলন ও বিবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিয়েছেন।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি খুবই অর্থবহ। যোগেশচন্দ্র তাঁর শেষ জীবনের বাসস্থান নব বারাকপুর সমবায় পল্লীতে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনদের নিয়ে একটি সাহিত্য-চক্র গড়ে তোলেন। এটির নাম দেন তিনি সাহিত্যিকা। এই সংস্থার কাজকর্ম উপলক্ষে বারংবার তাঁকে বলতে শুনেছি, আমরা জনতা চাই না, জন চাই। এটা জনতার যুগ।

প্রতি পদক্ষেপে জনগণেশের দোহাই পাড়া তো ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো, এক-দুই জন মানুষ যাঁরা নেতৃত্বে থাকেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই জনতার সিদ্ধান্ত বলে প্রচারিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি ক্রান্তিকারী চিন্তা কোন-না-কোন ব্যক্তির মাথায় প্রথমে আসে। সেই চিন্তাকে কর্মে রূপান্তরিত করার পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যিনি সৃষ্টি করেন এবং অনুগামী সংগ্রহ করেন, তিনি নেতা। এদের দ্বারাই দেশ সমৃদ্ধ হয়, জাতি বড হয়। সুতরাং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। যোগেশচন্দ্র সেই ব্যক্তি-মানুষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গবেষণায়। যাঁরা স্বীকার করেন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানুষ গড়ে ওঠে, তাঁরা একথায় ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন মানুষ ঘটনা সৃষ্টি করে, তাঁরা এর দ্বারা আশ্বস্ত হবেন বলেই আশা করি।

যোগেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে আমি খাঁটি মানুষ ও জ্ঞানতাপস শব্দদু'টির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু তাঁর পদপ্রান্তে বসেই আমি এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি। যোগেশচন্দ্রের মধ্যে সত্যিকার একজন খাঁটি মানুষ ও জ্ঞানতাপস মূর্ত ছিল। গীতায় দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে দৈবী অবস্থালাভের যোগ্য মানুষের গুণাবলীর উল্লেখ আছে। এই ২৬টি গুণের অনেকগুলি আমি যোগেশচন্দ্রের প্রতিদিনের আচরণে দীর্ঘদিন ধরে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছি। কেবল আমি কেন? যাঁরাই তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বগুণে স্বাধীনতা আন্দোলন কালে দেশবাসীর চরিত্র উন্নত হয়েছিল। গান্ধীজি নির্দেশিত একাদশ ব্রতধারী মানুষের সংখ্যা তখন অগুন্তি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ, ভয়বর্জন, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি ব্রত পালনের দ্বারা সাধারণ মানুষের চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বাংলার বীর্যময় প্রকাশে এই চরিত্রশক্তি আরও দৃঢ় হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র ও সমসময়ের অনুরূপ মানুষের চরিত্র এর সাক্ষ্য বহন করছে। তখন বিত্ত-কৌলিন্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি; বোহিমিয়ান যৌবনের বিপথগামী হওয়ার সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সমাজে বিদ্যা ও চরিত্রের সমাদর ছিল।

সর্বোপরি যোগেশচন্দ্রের আধারটি ছিল খাঁটি। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' কথাটা তো আর কথার কথা নয়। খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমার কল্যাণে আজকের সমাজে একপ্রকার অর্ধশিক্ষিত মানসিকতার প্রাবল্য ঘটেছে। ফলে শ্রদ্ধা প্রায় অবলুপ্ত। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ভাঙচুর, খুনজখম, চরিত্রসঙ্কট। এই রকম সমাজে যোগেশচন্দ্রের ন্যায় আত্মসমাহিত প্রচারকুণ্ঠ পণ্ডিতের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমাজকে তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে সমাজ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে নি, যথোপযুক্ত মর্যাদাও দেয় নি। তিনি অবশ্য তার জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পরন্তু আমরা কেউ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি অসন্তুষ্টই হতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সাহেব। তিনি, স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় যোগেশচন্দ্র একযোগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের নিকট থেকে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক পেনশন পান। স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার শুধুমাত্র কয়েকটি টাকা পেনশন মঞ্জুর করলেই যোগেশচন্দ্রের প্রতি কর্তব্য করা হলো এ আমরা মনে করতে পারি নি। সেজন্য আমাদের ক্ষোভ ছিল। যোগেশচন্দ্র তা জানতেন। কিন্তু সরকারের এই সামান্য কাজটুকুর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তিনি আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই বোধ করি দুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে তাঁকে দেখিনি কোনদিন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন যোগেশচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাভোগ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নির্লোভ ত্যাগব্রতী এই মানুষটির নির্মল চরিত্রের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধাতারা অনেকেই তাঁর অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করলে একটা মন্ত্রী নেহাৎকল্পে একটা রাজ্যপাল বা অনুরূপ কিছু সহজেই হতে পারতেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে বলতেন—দেশ আপনার যোগ্যতার সমাদর করল না, তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদুহাস্য সহকারে

অনুচ্চকণ্ঠে বলতেন—কেন, এই তো বেশ আছি—দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করি, মাইনে পাই, অন্নবস্ত্রের কষ্ট নেই—আবার কি চাই। বেশ তো আছি। গল্পটা শুনেছিলাম যোগেশচন্দ্রেরই মুখে। আত্মসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন ছিলেন যোগেশচন্দ্রের আদর্শ।

অসুস্থ হয়ে যোগেশচন্দ্র হাসপাতালের ফ্রি বেডে ভর্তি হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী ব্যয়ে কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হলে তিনি স্বস্তি বোধ করেন নি, কেবিনে গিয়ে সরকারের ব্যয় বাড়াতে রাজি হন নি। পরে অবশ্য আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে তিনি কেবিনে যান। যতটুকু না নিলে জীবন রক্ষা হয় না তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশি তিনি সম্ভবত কখনও গ্রহণ করেন নি। এমন একজন মানুষ সম্পর্কে যত যত্ন করেই লিখি না কেন, সেই চরিত্র-মহত্ত্ব ও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলবার সাধ্য আমার নেই। যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের বহু পূর্বে লেখা সুধীজনের কয়েকখানা পত্রাংশ দিয়ে আমি আজ স্মৃতি তর্পণ শেষ করব। এই সব চিঠি-পত্রে যোগেশচন্দ্রের চরিত্র কিঞ্চিৎ সত্য স্বরূপে প্রকটিত হবে। অপরের লেখা চিঠি পত্রই জীবন-চরিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকৃত। যোগেশচন্দ্র এই সব চিঠি-পত্র কখনও রাখেন নি। অকস্মাৎ সামান্য কয়েকখানা চিঠি আমার হাতে আসে।

যোগেশচন্দ্র নানাভাবে নবীন গবেষকদের সাহায্য ও সহায়তা দান করতেন। বহুজনে দেশী-বিদেশী গবেষকদের তাঁর নিকটে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকারের ২৬।৯।৫১ তারিখের একখানি চিঠিতে পাই :

"এইটি কালিকা কানুনগোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেন, M. A. সে Lord Canning 1858-1862 (যুদ্ধ বাদ) গবেষণা করিতেছে, Ph. D থিসিস লিখিবার জন্য। আমার বাসায় থাকে এবং আমার গ্রন্থগার হইতে বই লইয়া নোট করে। বঙ্গে নবজাগরণ সম্বন্ধে বই ও খবর আপনার হাতে আছে। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিবেন ও সাহায্য দিবেন।"

এই পর্যায়ে আরও চিঠি আছে। আচার্য যদুনাথের বাড়িতে বসে যে ছাত্র কাজ করছেন তাঁকে তিনি নিজেই পাঠাচ্ছেন যোগেশচন্দ্রের নিকট—এটা জানবার পর আশা করা যায় এ পর্যায়ে আর কোন চিঠির উদ্ধৃতির আবশ্যকতা নেই।

যোগেশচন্দ্রের নিকট অনেকে চিঠি লিখে গবেষক পাঠাতেন তা নয়। অনেক সময় মুখে মুখে নির্দেশ শুনে অনেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। কলকাতার বাইরে থেকেও গবেষক আসতেন। এই রকম একটি পত্রের অংশ নিচে দিলাম। লিখছেন জনৈক J. R. Ahmed তাং ৬।১।৫৩।

"I am a research scholar preparing my thesis for Ph. D. degree from the Punjab University. The subject of my thesis is Genesis of Indian struggle for freedom in the days of the East India Co. from 1757 to 1857. I went to see Dr. Jadunath Sarkar, the well-known historian, to seek some aid and guidance, He directed me to contact you and he gave me your address"

যোগেশচন্দ্রের অর্জিত তথ্যাদি তিনি অকপটে অপরকে ব্যবহার করতে দিতেন। এমন কি পুস্তক বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হবার আগেই দিয়ে দিতেন অনেক ক্ষেত্রে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাতি শ্রীঅনিল শীল কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কিছু তথ্যের তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাক্রমে এ দেশে আসেন। তখন তিনি যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করেন। যোগেশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সানন্দে অনিল শীল মশায়কে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। শীল মশায় ধন্যবাদ দিয়ে লিখলেন: "I have received the manuscript—it will be returned on the 20th Feb. 1961." নির্মোহ জ্ঞান-সাধক না হলে এমন করে পাণ্ডুলিপি কেউ অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন না।

কেবল সংগৃহীত তথ্যই যোগেশচন্দ্র যে দিতেন তা নয়। অপরের জন্য খুঁজে পেতে নানা সাল তারিখ ও তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছেন এমন কথা আমার জানা আছে। এই পর্যায়ে রাজশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিঠি মাত্র উদ্ধৃত করব।

দশই জুন ১৯৫৫ তারিখে ৭২ নং বকুল বাগান রোড থেকে রাজশেখর বসু মহাশয় লিখছেন—"প্রীতিভাজনেষু, রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে

ট্রাস্ট ডীড রচনা করেছিলেন তাতে এক জায়গায় যেন আছে—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন, যদি তাঁদের বেশ পরিচ্ছন্ন হয়। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তবে এই সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি আমাকে লিখে জানাতে পারেন কি? প্রবাসীর জন্য 'আশ্রমিক সমাজ' প্রবন্ধ লিখছি, তারই জন্য দরকার।"

যোগেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন ও রিজিওনাল রেকর্ড কমিশনে পশ্চিম বঙ্গের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতেও যোগেশচন্দ্র গৃহীত হন। এ সবই তাঁর ঐতিহাসিক বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু কোন রকম স্বীকৃতির পরোয়া না করেই কত মানুষকে যে তিনি সাহায্য ও সহায়তা দান করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এ বিষয়েও তিনখানার সামান্য সামান্য উদ্ধৃতি দেব। এর থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি ঐতিহাসিক বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য সুধীজন বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। অন্য আর একটি বিষয়ও এর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে; তা হলো—সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের দিন-দিন প্রচেষ্টায় নীরবে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়তা দান। এই ঔদার্য আজকের সমাজে সুলভ নয়।

বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৩ তারিখে লিখেছিলেন:

"Dear Mr. Bagal,

Perhaps you know I am a member of the Editorial Board set up by the Govt. of India for writing a history of the Freedom Movement. I think you have already been in touch with Sri S. M. Ghosh, who is the Secretary of the Board. I will like to have a talk with you in this matter ....."

রাজ্য সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে স্মারকলিপি পেশ করেন তার রচয়িতা ছিলেন স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহ। এজন্য তিনি যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের নিকট থেকে নানা বিষয়ে

বিশেষ সাহায্য নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ভবন থেকে ২৫শে মার্চ, ১৯৫৪ তারিখে তিনি যোগেশচন্দ্রকে লিখছেন :

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি।

১) অমৃতবাজারের কপি যে পাইতেছি না। তাহার পুরা textটা আপনার কাছে আছে কি? সেই editorial-এর textটা চাই, পাইলে quote করিয়া দিতাম। কোথায় পাইব?

(২) Govt Resolution 1905 দেখিয়াছি। তাহাতে Risleyর উল্লেখ আছে। সেইজন্য Risleyর letterএর textটা পড়িতে চাই। কোথায় পাইব?

(৩) দেখিতেছি Risleyর Proposalএর জবাবে মাদ্রাজ সরকার linguistic unityর কথা তুলিয়াছেন। বাংলা সরকার কি বলিয়াছিলেন? ছোটনাগপুরের বেলায় খালি commercial consideration-এর কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহারা linguistic argument-এর কথা কি তোলেন নাই? সেই জন্য সেই memorandum দেখিতে পারিলে ভাল হইত। কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৪) Town Hall conference against partition 11. 1. 1905—তাহার proceedings পাইব কোথায়? আপনার কাছে extract টোকা আছে কি?

এই material গুলি যদি আপনার নিকট থাকে, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত। সোমবার তো দেখা হইতেছে॥"

প্রাচ্য বাণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সংস্কৃতপ্রেমী শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী চট্টগ্রামের মানুষ। তিনি এক সময় ঠিক করেন চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করবেন। সেজন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। যতীন্দ্রবিমলের উপর তথ্য সংগ্রহের ভার পড়ে। এই কাজেও যোগেশচন্দ্র সহায় হতে পারেন এই ধারণায় ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে ১৯৫৩ সনের ২৮শে জুন তারিখে যতীন্দ্রবিমল যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে আছে :

"আমার বিশ্বাস আপনি বিভিন্ন বিষয়ে এত সন্ধান করেন যে, আপনার

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়েও কিছু জানা থাকা সম্ভব বা কোন্ কোন্ পুস্তক বা পুঁথিতে এ বিষয়ে সংবাদ জানা যেতে পারে তাও আপনি বলতে পারবেন।”

যোগেশচন্দ্র বহুজনকে হাতে ধরে লেখা শিখিয়েছেন। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস হরি সাহার বাজারের উপরকার ফ্লাটবাড়ীতে যোগেশচন্দ্রের পাশেই থাকতেন। তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেকগুলি বই আছে। এর গোড়ার দিকের প্রচুর লেখা যোগেশচন্দ্র আগাগোড়া সংশোধন করে দিতেন। অনেকদিন দেখা গেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুনর্লিখিত হয়েছে। পরের দিকে রামনাথের লেখায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। যোগেশচন্দ্রের নিরন্তর উৎসাহেই তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হন—এ কথা বহুজনেই জানেন। স্বর্গত যাদুকর পি. সি. সরকার ঐ রকম আর একজন লোক। সুদূর লণ্ডন থেকে তিনি যোগেশচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ২০শে আগষ্ট, ১৯৫৩ তারিখে লিখছেন:

“জীবনে কোনদিনই আপনাদের কথা ভুলিবার নয়। আপনি আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া এবং সংবাদ ছাপাইয়া আমাকে প্রথম জীবনে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।…লণ্ডন হইতে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য এই যে, আমি আপনাদের কথা বিদেশে বসিয়াও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।”

যোগেশচন্দ্রের বন্ধুভাগ্য ছিল। নানা সুখে-দুঃখে যারা তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন, তাঁর সান্নিধ্য কামনা করতেন এমন খ্যাতিমান্ লোকের সংখ্যাও বিস্তর। যোগেশচন্দ্রের নিকটে এলে বিক্ষুব্ধ-আর্ত-পীড়িত মানুষ শান্ত হয়ে ও শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন। সুখ-দুঃখের বোধ তাঁকে পীড়িত করতে পারত না, তাঁর মনের জোর ছিল সীমাহীন। এমন কি শারীরিক অপটুতাকে পর্যন্ত এই জোরে তিনি মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকার করে চলেছিলেন।

বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ২৪শে মে, ১৯৫২ তারিখে যোগেশচন্দ্রকে লেখেন, “জীবনে বন্ধুলাভ সহজে হয় না। অথচ আপনার মত একজন বন্ধুলাভ করে যদি আমি নিজ দোষে তা হারাই তবে তা সত্যই আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য।”

যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। আমরা দেখেছি পরলোকগত সজনীকান্ত দাস ও রামপদ

মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা গান্ধীবাদী নেতা শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, নারায়ণ চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতের মানুষের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব ছিল। সে সব ঘটনার কেন্দ্রস্থলে থেকেও যোগেশচন্দ্র তাঁর চরিত্রের নির্মলতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করতেন। এ এক দুর্লভ চরিত্রগুণ।

ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক যোগেশচন্দ্রকে বিচলিত করতে পারত না, এ কথা পূর্বে বলেছি। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যোগেশচন্দ্র পুত্রশোক পান। এই উপলক্ষে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি বিশেষ অর্থবহ।

"প্রিয়বরেষু,

যোগেশবাবু, দুঃসংবাদ জানতাম না। আজ সকালে সজনীকান্তের নিকট জ্ঞাত হলাম। কাল টেলিফোনের সময় হয়তো আপনার অজ্ঞাত মনেও তৃষ্ণা থেকে গেছে। বন্ধুর প্রীতিসান্ত্বনা এই বিয়োগতাপ কাতরতার মধ্যে এক বিন্দু শীতলতা এনে দেয়।

সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। ভগবান্ আপনাকে সান্ত্বনা দিন।"

এই চিঠিতে যোগেশচন্দ্র কি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন তার ছিল না, সে কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারাশঙ্করের মর্মবেদনা প্রকাশের জন্য ঐ চিঠি না লিখে তিনি পারেন নি। তিনি যে যোগেশচন্দ্রের সজ্জন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের সভায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র।

তোমাকে চেনেনা যারা আজ তারা চিনুক তোমারে,
তব স্মৃতিখানি যেন ফুল হয়ে ফুটে রয় বাণীর দুয়ারে।
—কালীপদ চক্রবর্তী
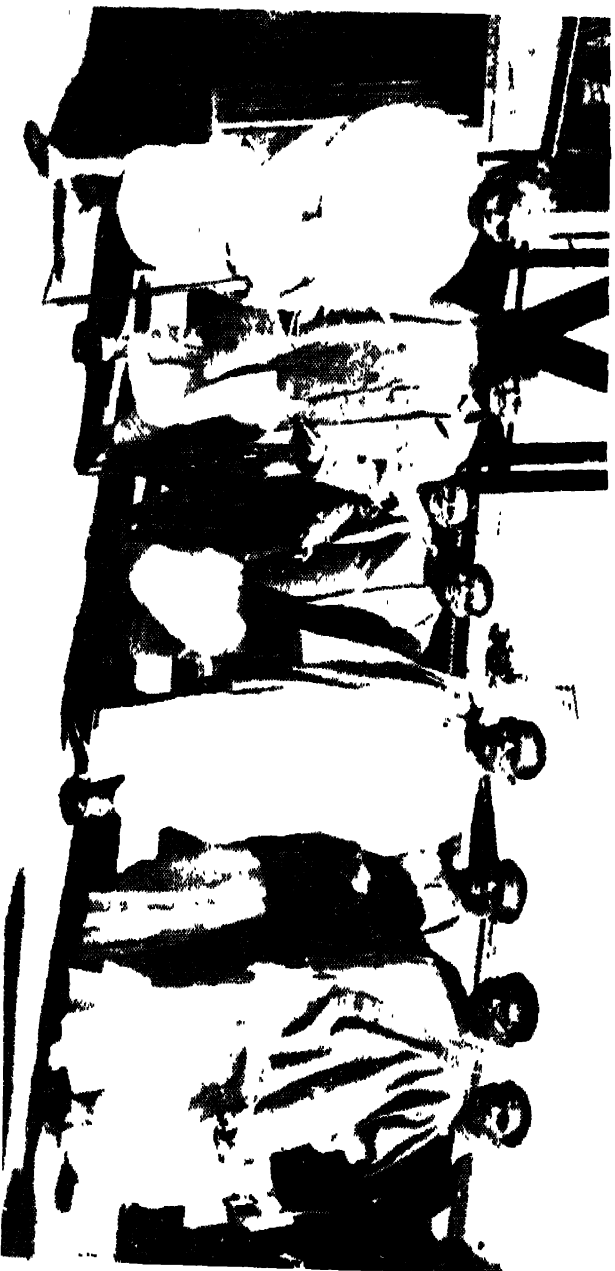
১৯৩৮-এ কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলনের পথে র স্টশনে ে
বাম দিক হইতে—অতুল গুপ্ত, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, অনাথনাথ বসু, প্রি রঞ্জন সেন
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল ও অন্য এব

জীবনকথা
ও
প্রসঙ্গ

জীবনকথা

কানাইলাল দত্ত

বরিশাল জেলার চলিশা গ্রামে যোগেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস। ১৯০৩ সনের ২৭ মে তিনি মাতুলালয় কুমিরমড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগবন্ধু বাগল ও মাতা তরঙ্গিণী দেবী। স্বগ্রামের পাঠশালায় যোগেশচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। রামচরণ দে নামে জনৈক বিকলাঙ্গ কিন্তু ছাত্রবৎসল নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন। 'বরণীয়' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র তাঁর পিতৃদেব ও এই প্রথম শিক্ষাগুরু সম্পর্কে বিশেষ আবেগ ও শ্রদ্ধা সহকারে লিখেছেন। প্রবন্ধ দুটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে সমসময়ের যুগ-মানসিকতা অভিব্যক্ত হয়েছে। বাঙালীর সমাজজীবনের কয়েকটি মূল্যবান স্কেচ বা নক্শা আছে এই বইখানিতে। যেমন—নিশিকান্তের মা।

যোগেশচন্দ্র কদমতলা জর্জ হাই স্কুল (বরিশাল) থেকে ১৯২২ সনে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯২৪ সনে বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. ও ১৯২৬-এ কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেও পারিবারিক অসুবিধার জন্য পড়া শেষ করতে পারেন নি। কামাখ্যাচরণ নাগ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি সুখ্যাত শিক্ষাব্রতিগণের নিকট যোগেশচন্দ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। শ্রেষ্ঠ ও সৎ শিক্ষক ভিন্ন ভাল ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরি হতে পারে না। যোগেশচন্দ্রের জীবনে এই শিক্ষকগণের প্রভাব যে কী বিপুল তা তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ও অনবদ্য ভাষায় নানা প্রবন্ধে (অধিকাংশ 'শিক্ষা' পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং স্মৃতিকথায়—'জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে' (প্রকাশের অপেক্ষায়) লিপিবদ্ধ করেছেন।

যোগেশচন্দ্রের কর্মজীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। তবে ক্ষেত্রটি ছিল একান্তই

অনুকূল। অন্যত্র হলে, এ কথা নিশ্চয় করে বলা চলে, যোগেশচন্দ্রের বিকাশ বিঘ্নিত হত। ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যু পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক রূপে কর্মে প্রবৃত্ত হন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা হেতু ১৯৬১ সনে তিনি এই পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। মধ্যে চার বছর 'দেশ' সাপ্তাহিকে সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এই 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী-মডার্ণ রিভিয়্যুতেও তিনি বহু সুধীজনের সঙ্গে কাজ করবার অবকাশ পান। ইতিহাসগতপ্রাণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস, বিখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সহকর্মী ছিলেন যোগেশচন্দ্র। এখান থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে আচার্য যদুনাথ সরকার, ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, কথাসাহিত্যিক এবং চারুশিল্পীর নাম প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের বহুজনের সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্রের বিকাশে এঁদের প্রভাব কম নয় বলে আমার ধারণা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যাহাদের দেশের ইতিহাস নাই, তাহাদের কিছুই নাই।...একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতিটাকে রাশ টানিয়া রাখে; নীচ হইতে দেয় না।" রাজনীতি ও অর্থনীতির সীমানার মধ্যেই সাধারণতঃ প্রচলিত ইতিহাসের আনাগোনা। সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসায় ও নৃত্যগীতাদি বিবিধ কর্মের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বিধৃত এবং তার সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন—তৎকালীন বাংলাদেশে এ কথাটার তেমন স্বীকৃতি ছিল না বললেই চলে। বাঙালীর সবচেয়ে বড় গৌরবের যুগ—ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু যুগান্তকারী ঘটনা যোগেশচন্দ্রের সময়েই গালগল্পের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে যোগেশচন্দ্র আপনাদের সহজাত প্রেরণাবশে ধূলি-ধূসরিত ইতিহাসের আকর উদ্ধার করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর চমকপ্রদ ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন। বর্তমান সময়ে

এই ক্ষেত্রটিতে অনেকেরই পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাচ্ছে ; কিন্তু সেদিন ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ ছিলেন।

প্রায় ৫০খানি বাংলা ইংরেজি গ্রন্থে যোগেশচন্দ্রের সাধনা ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া প্রায় চার শতাধিক গবেষণামূলক বাংলা ইংরেজি প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকার স্তম্ভে আত্মগোপন করে রয়েছে।

যোগেশচন্দ্র দেশাত্মবোধ থেকেই বাংলা ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা শুরু করেন। তাঁর বিশিষ্ট বইগুলি যদি বাংলায় না লিখে তিনি ইংরেজিতে লিখতেন তবে তিনি আজ নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী হতেন। এ সম্ভাবনার কথা তাঁর অজানা ছিল এ কথা মনে করার কোন যুক্তি নেই। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগই তাঁকে মুখ্যতঃ বাংলা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখতে অনুপ্রাণিত করে, এ কথা আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। প্রসঙ্গতঃ যোগেশচন্দ্রের রচনারীতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি সাধুভাষায় লিখতেন। সহজবোধ্য প্রচলিত এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জিত শব্দ তিনি ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ সরল বাক্য ছাড়া তিনি লিখতেন না। এর জন্য ভাষার সাবলীলতা ও প্রসাদগুণ বেড়েই যায়। এ বড় সহজ কথা নয়। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকও তাঁর পরিণত বয়সের লেখা পড়ে বুঝতে পারেন। দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে পাণ্ডিত্য প্রকাশের এবং ভাষাকে ওজস্বিনী করার ঝোঁক নেই এমন লেখকের সংখ্যা বিরল। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর, যতটা জানি, সহজ সহজ শব্দ ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই রকম ভাষা আমি দেখেছি। গান্ধীজীর কাছে কোন লেখা নিয়ে গেলেই তিনি বলতেন—সংক্ষেপ কর। যোগেশচন্দ্রের মধ্যে এ-গুণটিও সর্বাধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকলেই তবে লেখা সংক্ষেপ করা সহজ হয়। অন্য কোন উপায় নেই।

যোগেশচন্দ্র ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনের দু-একটি কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শেষের দিকে মৃত্যুর নয় বছর আগে তিনি দৃষ্টিহীন হন। আমরা তাঁকে পড়ে শোনাতাম। অনবধানতাবশতঃ কখনও যদি সাল তারিখ ভুল পড়ে ফেলেছি বা বইতে ভুল ছাপা থাকে অমনি তিনি তা ধরে ফেলতেন। কোন একটি তথ্য কোন্ বইয়ের কোন্‌খানটায় আছে

তা তিনি প্রায়ই বলে দিতে সমর্থ হতেন। একখানা ডায়েরিতে তিনি লোকজনের ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখিয়ে রাখেন। দেড়শোর বেশী নাম ছিল তাতে। অধিকাংশ নামের ক্রমিক নম্বর তিনি বলে দিতে পারতেন।

যোগেশচন্দ্র নিজে তখন লিখতে পারেন না। অপরে তাঁকে পড়ে শোনান। তিনি মুখে বলেন। তাই লিখে নিয়ে কয়েকখানি মূল্যবান বই হয়েছে। প্রবন্ধ যে কত হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বহু পাণ্ডুলিপির শ্রুতিলিখন করেছে বর্ত্তমান লেখক। কোন প্রবন্ধ দুবার লিখতে হয় নি। রোজ এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টার বেশী সময় এজন্য তাকে দিতে হয় নি। তার মধ্যে যেটুকু হয় তাই লিখে বন্ধ করে রেখে এসেছি। পরের দিন সেখান থেকেই শুরু করা হত। শেষ বাক্যটি মাত্র শুনে নিয়ে তিনি নতুন করে বলতে আরম্ভ করতেন। পারম্পর্গ কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। মুখস্থ বলে যাবার ধরনেই তিনি বলতেন। এ খুবই অসাধারণ ব্যাপার। জীবনে কি কঠিন শৃঙ্খলাবোধ থাকলে দু-চার পৃষ্ঠা করে শ্রুতি দিয়ে পাঁচ-সাতখানা বই এবং শতাধিক প্রবন্ধ লেখানো যায় তা বোধ হয় যথার্থভাবে অনুমানও করা যায় না।

সারস্বত সাধনায় একান্ত একনিষ্ঠ না হলে যোগেশচন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হত। তিনি জীবনভোর এই একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁকে বলতে শুনেছি—Learning is a zealous mistress। জীবনের আরও পাঁচটা কাজের সঙ্গে ভাগ করে জ্ঞানের সাধনা করা যায় না। যোগেশচন্দ্র জ্ঞানের সাধনা করতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি বোধ হয় সুবিচার করতে পারেন নি। নিজের দেহের ওপরও অবিচার করে তিনি চক্ষুহারা হয়েছিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় বিদ্যাদেবী তাঁকে তখনো ছেড়ে যান নি।

মুখে মুখে বলে তিনি রচনা করেছেন কলকাতার সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাস। ইংরেজিতে লিখিত এই ইতিহাস কলা মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষ জয়ন্তী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। জয়ন্তী গ্রন্থখানির (পত্রিকা আকারের) ৬৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে যোগেশচন্দ্রের এই ইতিহাস। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ডিরোজিও (প্রকাশিতব্য) প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থও এই সময় রচিত হয়েছে।

সাহিত্যের মত একটি দুরূহ বিষয়ে পর পর তিনটি বক্তৃতা করেন তিনি। এর পূর্বে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতামালা 'বিদ্যাসাগর পরিচয়' নামে সজনীকান্ত দাস পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। অনলস ও সার্থক গবেষণা কর্মের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগেশচন্দ্র সরোজিনী বসু (১৯৬৩) স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার এবং শিশিরকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্তির কথাও প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে।

বঙ্গভারতীর সেবাতীর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের। সেই যে কবে ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের নেতৃত্বে পরিষদ পুনর্গঠনের যুগে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, আমৃত্যু সে যোগ ছিন্ন হয় নি। মৃত্যুকালে তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি। মধ্যে কিছুকাল গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরিষদ পরিকল্পিত ভারত-কোষের তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক এবং লেখক। স্বাধীনতার পর পশ্চিম বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য যে কয়টি কমিটি সরকারী উদ্যোগে গঠিত হয়েছে, যোগেশচন্দ্র তার প্রত্যেকটিতেই ছিলেন। একবার তিনি ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাঁচ বৎসরের অধিককাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। Dictionary of National Biography-র সংকলয়িতারাও যোগেশচন্দ্রের শরণ নিয়েছেন। রিজিওনাল রেকর্ডস কমিশনেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র জীবনভোর যে সব অমূল্য গ্রন্থরাজি ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলেন চোখ হারাবার পর তা সবই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেছেন। এর বহু পূর্বে অবশ্য তিনি কলকাতা স্কুল সোসাইটির হস্তলিখিত কার্যবিবরণ সহ কিছু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকাও পরিষদকে দেন।

সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের কথা পূর্বেই বলেছি। অনুরূপ-ভাবে বেথুন স্কুল ও কলেজের ইতিহাসও ঐ কলেজের শতবর্ষ গ্রন্থের মধ্যে বন্দী রয়েছে। এটি কোন একটি স্কুল বা কলেজের ইতিহাসই মাত্র নয়; এ হল দেড় শত বৎসরের নারী-শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভিত্তিক ইতিহাস। বেথুন স্কুল কলেজ শতবর্ষ গ্রন্থের আড়াই শত পৃষ্ঠার মধ্যে যোগেশচন্দ্রের ইংরেজি-বাংলা রচনাই দেড় শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী। জাতীয় গ্রন্থাগার,

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, সমাজবিজ্ঞান সভা, ভারতবর্ষীয় সভা প্রভৃতি মূল্যবান রচনাগুলি এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। এই ধারার কিছু বই অবশ্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েকখানি এই :—'জাগৃতি ও জাতীয়তা', 'জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ', 'বাংলার নবজাগরণের কথা', 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ-নারী', 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা'। সভা-সমিতি-প্রতিষ্ঠানের কথা আছে 'বেথুন সোসাইটি, 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি', 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' এবং 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ চতুষ্টয়ে।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' ও 'ভারতের মুক্তি সন্ধানী' বই দুখানিতে স্বদেশের হিতকামী ও মুক্তিপ্রয়াসী দেশী-বিদেশী মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বিধৃত হয়েছে। এই সব জীবনীই সত্যকার স্বদেশের ইতিহাস। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কিছু কর্মী মানুষের কথা আছে যোগেশচন্দ্রের 'বরণীয়' গ্রন্থে। বাংলার জনশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা (বিশ্বভারতী) গ্রন্থত্রয় ক্ষুদ্র হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার আগেকার বাংলাদেশের শিক্ষাবিষয়ক আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' বইখানিও স্মরণীয়। সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার 'রাধাকান্ত দেব', 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'রাজনারায়ণ বসু', 'রামকমল সেন', 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়', 'আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ', 'অযোধ্যানাথ পাকড়াশী', 'হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন', 'উইলিয়ম ইয়েটস', 'জন ম্যাক', 'মধুসূদন গুপ্ত', 'সরলা দেবী চৌধুরাণী', 'শরৎচন্দ্র দত্ত' প্রভৃতি রচনা সুধীজন কর্তৃক আকর গ্রন্থরূপেই ব্যবহৃত হয়।

তাঁর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম তিন বছরের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে সংকলন করে তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' নামে একখানা বই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রকাশ করেন। বইখানি তখন খুব আদৃত হয়। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ বঙ্কিম-রচনাবলী ও রমেশ-রচনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধ খণ্ডদুখানি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচনাসহ পূর্বেই প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইংরেজি খণ্ড (সমগ্র ইংরেজি রচনা) প্রকাশিত হয়েছে। রমেশ রচনাবলীও বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদিত ও বহু তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

যোগেশচন্দ্রের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর মধ্যে History of Indian Association, Woman's Education in Eastern India এবং Peasants' Revolution in Bengal গ্রন্থগুলিও বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। জামসেদপুর (টাটা) লৌহখনির আবিষ্কারক বলে কীর্তিত প্রমথনাথ বসুর ইংরেজি জীবনচরিতও যোগেশচন্দ্র রচনা করেছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা বইখানিতে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লেখেন।

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যোগেশচন্দ্রের কিছু অবদান আছে। ভূত পরী বা রাক্ষস খোক্ষসের গল্প অবশ্য তিনি শোনান নি। 'সাহসীর জয়যাত্রা', 'বীরত্বের রাজটিকা', 'জগৎ কোন্ পথে' ইত্যাদি গ্রন্থ আজও শিশুদের উদ্দীপ্ত করে। শিশুদের পত্রিকা মৌচাকে তাঁর অনেক রচনা ছড়িয়ে আছে।

যোগেশচন্দ্র শেষ জীবনে কলকাতা থেকে দূরে নববারাকপুরে প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছেন। বন্ধু ও অনুরাগীজনেরা অবশ্য অনেকেই মধ্যে মধ্যে এসেছেন। সস্ত্রীক এসেছিলেন দিল্লী প্রবাসী নীরদচন্দ্র চৌধুরী, এসেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু; তা ছাড়া এসেছেন অনেক জিজ্ঞাসু ও গবেষক। সকলের জন্যই তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। নিজের আহৃত তথ্যাদি—কত দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকের অনুলিপি, কত প্রতিষ্ঠানের অপ্রকাশিত হস্তলিখিত কার্যবিবরণের নকল—তিনি নির্বিচারে বিলিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও কোন গোপনীয়তা নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদির জন্য ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও কোন কোন গবেষক তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য এসেছেন, পেয়েছেনও। প্রসঙ্গতঃ, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু শীলের কথাটা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মধ্যম পুত্রের সন্তান। তাঁর মা হলেন অষ্ট্রীয়ান। তিনি ব্রিটেনের নাগরিক। গত শতাব্দীর শেষের দিক্‌কার ভারতে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের উপর গবেষণা করে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর একটি বইও নাকি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর গবেষণার তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য দু-তিনবার কলকাতায় আসেন এবং প্রতিবারই যোগেশচন্দ্র স্বভাব-সুলভ উদারতাবশতঃ বহু অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত কাগজপত্র তাঁকে

দেখতে দেন। হিন্দুমেলার ইতিহাস (১ম সং) বইখনি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নিয়ে শ্রীযুক্ত শীল কাজে লাগিয়েছেন বলে যোগেশচন্দ্রকে জানান।

মার্কিন দেশ থেকেও কেউ কেউ যোগেশচন্দ্রের কাছে এসে প্রযোজনীয় তথ্যাদি নিয়ে গেছেন। ডক্টরেট থিসিসের জন্য বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা তাঁর কাছে এসেছেন।

সংগ্রাহক ভিন্ন অন্য কেউ আহৃত তথ্যাদি যথোপযুক্তভাবে সাধারণতঃ কাজে লাগাতে পারেন না। তাই কত তথ্য যে যোগেশচন্দ্রের চোখের অভাবে আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। ইতিহাস গল্প নয়। এর চর্চার জন্য একেবারে মূলে যাওয়া দরকার। যোগেশচন্দ্র প্রায়ই বলতেন—Go to the source. I have gone to the source। এই সোর্স বা মূলে যাওয়ার কোন সোজা সড়ক নেই। দীর্ঘ দিন ধরে বিচিত্র ও ক্লেশকর অনুসন্ধানের পর হয়তো বা কোন একটি ঈপ্সিত তথ্য মিলতে পারে। এই ধৈর্য, এই অধ্যবসায় এবং পাণ্ডিত্য নিয়ে কোন দেশেই ভূরি ভূরি মানুষ জন্মগ্রহণ করেন না। আমাদের পরম সৌভাগ্য জাতীয় জীবনের একটি ক্রান্তিকালে ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের মত ইতিহাসগত প্রাণ দুটি মানুষ বাঙ্গালীর নব-জাগরণের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিহাস সত্যস্বরূপে না জানলে জাতির ভবিষ্যৎ কখনই নির্বিঘ্ন হতে পারে না। একমাত্র ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের বর্তমান কার্যক্রমকে নির্ভুল করতে পারে, আর বর্তমানের কাজকর্ম নির্ভুল হলেই ভবিষ্যৎ হবে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। তাই ইতিহাস হল একটি অতিশয় গুরু বিষয়। ঐতিহাসিকগণ জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করেন। যোগেশচন্দ্র সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঐহিক সমৃদ্ধির সঙ্গে মানবদেহের শ্রেষ্ঠ রত্ন চক্ষুদুটিকে দেশমাতৃকার পাদমূলে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন।

যোগেশচন্দ্র ৬ই জানুয়ারি, ১৯৭১ নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। একজন খাঁটি মানুষ চিরতরে বিদায় নিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে যাদেরই বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তারাই স্বীকার করবেন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মনুষ্যত্বের এমন মণিকাঞ্চন যোগ কদাচিৎ ঘটে।

বংশ-পরিচিতি

ভূপেশচন্দ্র :—জীবিত।

শৈলবালা :—জীবিত।

উষারাণী :—জীবিত।

জগবন্ধু বাগলের ২ বিবাহ। যোগেশচন্দ্র প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাকী সন্তানরা দ্বিতীয় পক্ষের।

পত্নী বংশ-পরিচিতি

গুরুচরণ বসু (পিতামহ)

|

হরেন্দ্র নাথ বসু (যোগেশচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়)

|

শান্তি সুধা অমিয়প্রভা টুলুরাণী মনুরাণী রবীন্দ্রনাথ বসু

শান্তিসুধা :—মৃতা

অমিয়প্রভা :—৺ যোগেশচন্দ্রের স্ত্রী। জীবিতা।

টুলুরাণী :—জীবিত।

মনুরাণী :—মৃত।

রবীন্দ্রনাথ :—জীবিত।

প্রসঙ্গ

[জহরলাল নেহরু এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলার বরণ্যে পুরুষদের অনেকেই যোগেশচন্দ্রের পুস্তকগুলির ভূমিকা লিখেছিলেন। এখানে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য যদুনাথ সরকার এবং আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত তিনটি গ্রন্থের ভূমিকার অংশবিশেষ এবং আচার্য মেঘনাদ সাহা-কৃত একটি গ্রন্থের সমালোচনার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সঃ]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত "মুক্তির সন্ধানে ভারত"এর ভূমিকার কিয়দংশ :—

"যোগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপন্যাসপ্লাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশচন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন।·········'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ভারতবর্ষের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসের কাঠামো মাত্র। জাতির জীবনে এক শত বৎসর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্তীপথ স্থির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এই ধরণের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট। বিগত এক শত বৎসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, ধর্মে, লোকাচারে, এক কথায় জাতির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই যে পরিবর্তন ইহারও একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেসাঁসের ইতিহাস।

× × × × ×

আমাদের দেশের 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' এখনও পুরাপুরি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয়না—এখনও ইহার প্রয়োগ ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর সমন্বয়ে রাষ্ট্র-

বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রীয় তথ্য আলোচনা করিতে হইলে এগুলি বাদ দিয়া শুধু যদি রাজনৈতিক বিষয়সমূহেরই অবতারণা করা হয়, তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বলা চলে না, কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যোগেশচন্দ্র এই কথা বিস্মৃত হন নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।"

যোগেশচন্দ্র যে কয়টি গ্রন্থ ইংরেজিতে রচনা করেছিলেন, সেগুলির একটি **"Women's Education in Eastern India. (The First phase)**

বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার। কিয়দংশের উদ্ধৃতি মাত্র এখানে।

"·········the story of these pioneer examples and the features of each benevolent Soceity for promoting female education in Bengal during those eventful thirty years is told with full documentation and exact details in the present book. It is a piece of sound historical work and a source indispensable to every student of social and cultural development. The information has been patiently dug out of many a forgotten, many a dark mine and presented here with admirable literary skill.........."

বরেণ্য বিজ্ঞান-সাধক মেঘনাদ সাহা 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ :

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাগলের গবেষণা পাঠক সমাজের সুবিদিত। বর্তমান সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনের কথা এই পুস্তকে তিনি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং সাধারণ ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র সকলেরই উপযোগী এই গ্রন্থ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতের যোগসাধন বস্তুতঃ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তনের দ্বারা। কিন্তু ঐ সোসাইটি সমাজের উচ্চতম

অংশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। কলিকাতায় সরকারী উদ্যোগে ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং তাহার ১৮ বৎসর পরে বে-সরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপনের দ্বারা উক্ত যোগসূত্র জন সাধারণ্যে প্রসারিত হয়। ক্রমে উহা ভারতীয় যুবজনের চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া জীবনের নানা কর্মে স্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত করে। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সর্ব বিষয়েই উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দল গঠিত হয় এবং সবদিকই উৎকর্ষ লাভ করে। পাশ্চাত্য জীবনে রাজনীতির প্রভাব অমেয়। ভারতীয় যুবকগণ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ভারতের দুঃখভার লাঘবের নিমিত্ত রাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তোলেন। রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্য বাংলা ভাষা প্রকাশিকা সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দশকে হিন্দু মেলা, ৭ম দশকে ইণ্ডিয়ান লীগ এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ভারতবর্ষে রাজনীতিক চিন্তা ও কর্মের একটা ধারাবাহিকতাই রক্ষা মাত্র করে নাই, বিস্তৃত ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ট্রেডিশানের উপরে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং ইহাকেই ভারতীয় কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি বলা চলে। শ্রীযুক্ত বাগল এই যুগের অল্পজানা ঘটনাগুলির মুগ্ধ বিবরণ দিয়াছেন এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দ্বিতীয় খণ্ডে। W. C. Bonerji-র সভাপতিত্বে ৫৪ বৎসর পূর্বে বোম্বাইতে মাত্র ৭২ জন সদস্য লইয়া যে কংগ্রেসের সুরু তাহা এখন দেশজোড়া জনপ্রতিষ্ঠান, ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্বদেশের পূর্ণ স্বরাজ। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যোগ হইতে সময়ে সময়ে সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশেষ যত্নশীলতার সহিত এ সকলও এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে স্বদেশী আন্দোলনের গতি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য উপদলের কার্যাবলী যথোচিত স্থানে যথোপযুক্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। সহানুভূতিহীন ধনতন্ত্রবাদীদের দ্বারা বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া গঠনতন্ত্রের স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও Govt. of India Act, 1935-এর মধ্যে জনপ্রিয় সরকারের বীজ নিহিত ছিল। শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে এই আইনের ফলে।

বিচক্ষণতার সহিত পরিচালনা করিতে পারিলে ইহার দ্বারা দেশহিতের পথ প্রশস্ত করা যাইত, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশের অভ্যন্তরে এ-যাবৎ সুপ্ত অশুভ শক্তির সক্রিয়তার জন্য ইহা সম্ভবপর হয় নাই। ইহাও শ্রীবাগলের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ১৯৩০ সন পর্যন্ত ঘটনাবলীর তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়াছেন। দেড়শত বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস-সম্বলিত এই পুস্তকখানি রচনার দ্বারা দীর্ঘদিনের অভাবমাত্র বিদূরিত হয় নাই, বঙ্গভাষাকেও ইহা সমৃদ্ধ করিয়াছে। কোন প্রকার ভণিতা না করিয়া সরল ভাষায় এই পরিচ্ছন্ন বিবরণ সাফল্যের সহিত প্রকাশের জন্য আমি গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করি। × × (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

—— * ——

জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ

[আচার্য সুনীতিকুমার যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে অনেক লিখেছেন, তার বহু গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশ করেছেন এবং তাকে নানাভাবে সাহায্য-ও করেছেন। এখানে, যোগেশচন্দ্রের "**কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র**" গ্রন্থটির যে ভূমিকা তিনি লিখেছেন তার প্রায় সর্বাংশ উদ্ধৃত করা হল।]

"প্রস্তুত (কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র) পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর অন্যতম দান। বিগত শতক ও এই শতকের প্রথম পাদ ধরিয়া ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির যে ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার গঠনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব সর্ববাদিসম্মত। ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপের মনন-শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টার সহিত পরিচয়ের সুযোগ ভারতবর্ষের তিনটি অঞ্চলের লোকেদের পক্ষে সর্বপ্রথম ঘটিয়াছিল,—বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা (এবং বাঙ্গালা)। কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এমন কয়েক জন মনীষী ও চিন্তানেতার আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহাদের চেষ্টায় ও আগ্রহে আধুনিক ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মোড় ফিরিয়া গেল ভারতবর্ষ মধ্যযুগের বাতাবরণ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক যুগের দিকে গতিপথ গ্রহণ করিল। ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ করিল এবং এই রূপের মুখ্য কথা হইতেছে, ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য এবং সকলের কল্যাণবহ, তাহার সংরক্ষণ; এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-কলা-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ

হইতেই আমাদের পক্ষে যাহা কিছু শুভঙ্কর ও গ্রহণযোগ্য হইবে সাদরে তাহার গ্রহণ ও আত্মসাৎকরণ। এক কথায়, যোগ ও ক্ষেম, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর যোগ, ও ভাল যাহা আছে তাহার রক্ষা দ্বারা ক্ষেম বা কল্যাণ-সাধন। এইভাবে আধুনিক ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা পুষ্টিলাভ করিয়াছে; এবং এই কার্য সম্পূর্ণ করা এখনও হয় নাই, ইহা এখনও চলিতেছে। ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী এদিকে সাধনা করিয়াছে,—চিন্তা ও কর্মদ্বারা জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের এই আদর্শকে—ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী ও বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত করিবার আদর্শকে—রূপায়িত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে।

এই সাধনা, এই চেষ্টা ও শ্রম বাঙ্গালী কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফলবান্ করিতে পারিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দুই চারিটি ইংরেজ মনীষী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় প্রথম স্থাপিত হয় ও কার্য্যকর হয়, দু-দশটি ইংরেজ ও বাঙ্গালীর সহযোগিতায় গঠিত হয় এবং কয়েকটি কেবল বাঙ্গালীরই আগ্রহে ও কর্মচেষ্টার ফলে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। সমস্তগুলিই কলিকাতাতেই স্থাপিত হয়। এই প্রকারের প্রায় ত্রিশটি মুখ্য প্রতিষ্ঠানের কথা গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের সহিত এ যুগের বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের মানসিক প্রগতির ইতিহাস অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া আছে। এইগুলি একাধারে বাঙ্গালীর মানসিক স্ফূর্তির এবং কর্মের উৎস ও প্রকাশভূমি। এগুলির পূর্বকথা ভুলিলে চলিবে না, যদিও সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিতজন এগুলির কথা ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্য সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতির প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে—যেমন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় সংগ্রহালয়, কলিকাতা (ও সমকালীন অন্য দুইটি) বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কতকগুলির দ্বারা বিজ্ঞানের পত্তন ও উন্নতি এই দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, এবং অন্য কতকগুলির দ্বারা, Humanities বা Humanistic Studies অর্থাৎ "মানবিকী বিদ্যা।"—ও স্বকীয় বিশিষ্ট ভারতীয়তার আধারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের বইখানি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এবং বহুদিন ধরিয়া এই বইখানি প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। নিজের জাতির কৃতিত্ব

সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, আত্মবিশ্বাস ও কর্ম্মস্পৃহা শক্তি লাভ করে না। আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মসমীক্ষার সাধন এই বইখানি মানসিক জীবনে ও সমাজ সেবার এবং শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে শক্তি আনিয়া দিতে সাহায্য করিবে, ইহাই হইতেছে এই বইয়ের মুখ্য সার্থকতা। এতদ্ভিন্ন যে-সকল মনীষীর চেষ্টার ফলে আধুনিক কালে বাঙ্গালীর গৌরব-বাড়িয়াছে, বাঙ্গালীকে সত্য সত্য রক্ষা করিতে যাঁহাদের সাধন কার্য্যকর হইয়াছে, শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু সেই সমস্ত বরণীয় ও স্মরণীয় মহাপুরুষদের কথাও প্রসঙ্গতঃ আমাদের শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইবার সুযোগ আমাদের দিয়াছেন এবং আংশিক ভাবে আমাদের ঋষিঋণ—পরিশোধ করিবার কথা দূরের বস্তু—স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। × × ×"

যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন

যোগেশবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল না। তথাপি তাঁর সঙ্গে আমি একটা পরম আত্মীয়তার যোগ অনুভব করতাম। তিনি যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে। মুখ্যত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসকার তিনি। আজকের ছাত্র শিক্ষক গবেষকদের তার শরণ না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে নিরভিমান সরলতা, এবং বিনয় তাঁর মধ্যে ছিল তার কোন তুলনা নেই। তার পোষাক-পরিচ্ছদ, তার আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে একটা সচ্ছন্দ সরলতা ছিল।

কি কঠিন অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর গবেষণা কার্য করেছেন এবং সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান সাধারণ্যে বিতরণ করেছেন তা অনেকেই অনুমান করতে পারবেন না। তাঁর মত একজন গবেষককে শুধু মাত্র উদরান্নের জন্য গলদঘর্ম হতে হয়েছে। জীবিকার শ্রমের পর বিদ্যাচর্চার পরিশ্রম করেছেন তিনি বহু বর্ষ ধরে। এই উভয় শ্রমের ভারে তার সুগঠিত স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে এটা গভীর লজ্জা ও দুঃখের কথা। তবে সান্ত্বনা এই, তখন দেশ পরাধীন ছিল। স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকার এই কলঙ্কমোচনে কিঞ্চিৎ যত্নশীল হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে সাহিত্যিক পেনসান এবং মৃত্যুর পূর্বেকার অসুস্থতাকালে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে একটি জাতীয় কর্তব্য করেছেন।

যোগেশবাবুর কৃতির কথা পণ্ডিতজনেরা আলোচনা করবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। সে কথা বলবার অবকাশ এখানে নেই। তবে একটা কথা বলতে হবে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিককার অনেক কথা আমি যোগেশবাবুর লেখা থেকে জেনেছি।

যোগেশবাবুর বিদ্যানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক - এই প্রার্থনাই করি।

নব বারাকপুর ও যোগেশচন্দ্র

হরিপদ বিশ্বাস

নব বারাকপুর আজ প্রায় চল্লিশ হাজার নর-নারীর বাসভূমি হয়েছে। সকলেই এখানে পূর্ব বাংলার মানুষ। নানা পরিবেশ থেকে আমরা এসেছি। সকলের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এক নয়। ফলে উদ্বাস্তু জীবনের প্রারম্ভিক দুর্যোগ কাটতে না কাটতেই আমাদের অনৈক্য যথেষ্ট নগ্নরূপে প্রকটিত হয়ে ওঠে। নানা স্তরে বিবিধ স্বার্থের (জমির সীমানা থেকে রাজনৈতিক মতবাদ সব কিছু এর মধ্যে পড়ে) সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। সেই সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত সঙ্কটে যৌথ সমাজ-সেবার উদ্যোগে বিকৃতি দেখা দিয়েছে, ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে অনেকের। এই প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নব বারাকপুরের ইতিহাসে গঠন-কার্যের এবং লোক-সেবার তথা সমাজ-সংগঠনের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকজন বড় মানুষকে আমরা সহযোগীরূপে পেয়েছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সেই দুর্লভ জনসমষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বাগল।

বলা বাহুল্য, সর্ব বিষয়েই যোগেশচন্দ্র আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন। চরিত্র-গৌরবে, পাণ্ডিত্যের গভীরতায়, স্বদেশভক্তির প্রগাঢ়তায় এবং স্বজাতি সেবার আকুতিতে তিনি আমাদের সকলকে অতিক্রম করে বহু ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। করুণার দৃষ্টিতে দেখে দয়া করার একটা সহজ প্রবণতা সমকালীন সমাজের রেওয়াজ হয়েছে। যোগেশচন্দ্র তা করেন নি। তিনি আপন ঔদার্যে হয়ে উঠেছিলেন আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী ও হিতকর্মের বান্ধব।

স্বদেশভক্ত ইতিহাস-সচেতন নর-নারী বহু বর্ষ যাবৎ ভক্তিবিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রকে স্মরণ মনন করবেন। বৃহত্তর সমাজে তিনি জাতীয় নবজাগরণ ও মুক্তি সাধনার ইতিহাসকাররূপে বন্দিত। সেই সীমার বাইরেও যোগেশচন্দ্রের অন্য একটি পরিচয় আছে। বড়

বেশি মানুষ তা জানেন না, কারণ যোগেশচন্দ্র ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিজ সাধনার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও ধ্যানস্থ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দৃষ্টিশক্তিহীনতা তাঁর এই অখণ্ড সাধনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আর এরই কিছুকাল পূর্ব থেকে আমরা যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। উদ্বাস্তু মানুষের অমানুষিক দুঃখ তাকে বিচলিত করেছিল। সর্বাধিক উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন উদ্বাস্তু ক্ষেত্রে মানবতার অপমৃত্যু দেখে। এখানে আমরা বোধকরি সমব্যথী ছিলাম। তাই খুব সহজেই যোগেশচন্দ্র আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে ওঠেন। এ আমাদের গৌরব; আমাদের গর্ব। এই গৌরব ও গর্ববোধই ভাবীকালে নববারাকপুরের জীবনে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

নব বারাকপুর সৃষ্টির পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না। পঞ্চাশ সনের দুর্যোগের দিনে ভিটে-ছাড়া অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্য কিছু পূর্ব-পরিচিত নর-নারীকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার মানবিক প্রেরণায় আমরা কয়েকজন এখানে সামান্য সেবা-কাজ সুরু করি। সেই সেবা কার্যে নানা-ভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দান করেছিলেন আমার কর্মক্ষেত্রের কর্মীবন্ধুদের সমবায় সমিতি সৃষ্ট উদ্বাস্তু সেবা তহবিল (Refugee Relief Fund of D.A.G.P.&T Co-operative Credit Society Ld., Calcutta). এ কাজের অন্যতম সহায় ছিলেন বন্ধুবর অমর দত্ত। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এই লোকটি আপিসের কাজেই নিঃশেষ হয়ে যান নি। ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীরূপে আর্তসেবা ও জনসেবার প্রতি অমরের সহজাত আকর্ষণ ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ কিছু মাত্র কম ছিল না। এই সুযোগে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রমুখ দেশকর্মী এবং যোগেশচন্দ্র বাগল প্রভৃতি সুখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আপিসের বিজয়া সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য অমর যোগেশচন্দ্রকে একাধিকার আহ্বান করে আনেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা অনুষ্ঠান সুরু করতে পারতাম না। তাই যোগেশচন্দ্রকে বেশ খানিকটা সময় আমাদের সঙ্গে গল্প-সল্প করেই কাটাতে হতো। আমার টেবিলের পাশে অনেকগুলি খালি চেয়ার থাকত, তার একটিতে যোগেশবাবুকে বসিয়ে দিয়ে অমর ব্যস্ত হয়ে পড়তেন অনুষ্ঠান সুরু করার

বন্দোবস্ত করতে। এখানে বলে রাখা দরকার কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র সময় রক্ষা করে চলতেন। অন্ধ অবস্থাতেও কোন সভা-সমিতিতে তিনি দেরি করে এসেছেন বলে মনে পড়ে না। অন্যেরা দেরি করে এলে তিনি ব্যথিত হতেন এবং যত বড় লোকই তিনি হোন না কেন তার জন্য অপেক্ষা করা তিনি সমীচীন মনে করতেন না। সে কথা থাক। পুরনো কথায় ফিরে আসি।

আমার ঐ আপিসেই আমি যোগেশচন্দ্রকে প্রথম দেখি। আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ অর্থাৎ যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার বৃত্তি ও ব্যসনের কোন মিল ছিল না; তাই আলাপ দু'চারটে সৌজন্যমূলক সাধারণ ভদ্রোক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তাঁর অতি সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অহমিকাশূন্য অমায়িক মধুর ব্যবহার বহু জনের মতো আমারও বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই প্রথম দর্শনেই। সে দিন যেমন দেখেছিলাম জীবনান্তকাল পর্যন্ত তেমনিই দেখেছি। একখানা সাধারণ ধুতি, একটি পাঞ্জাবী এবং কাপড়ের এক জোড়া জুতা ছিল তার বেশবাস। পরে জেনেছি কেবল পোষাকেই নয়, আরাম-আয়াসের প্রতিও তার কোন আকর্ষণ ছিল না।

চোখের দেখায় মানুষকে আর ক'দিন মনে রাখা যায়! যোগেশচন্দ্রকে আমি প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন তাঁকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে। শরণার্থীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের 'তথাকথিত' স্বার্থকে বিঘ্নিত করেছিলেন আন্দামান উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার প্রস্তাব নিয়েই নানা টাল-বাহনা চলে দীর্ঘকাল। এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সাংবাদিকদের একটা ভূমিকা ছিল। এই সময় যোগেশচন্দ্র সরকারী নীতি সমর্থন করতে পারেন নি। উদ্বাস্তর ব্যাপারে সরকারী কথা ও কাজের মধ্যে যথেষ্ট গোঁজামিল ও ব্যবধান থাকতো। যোগেশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন এবং দীর্ঘ পত্রাকারে সেই প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেশচন্দ্রের চিঠিখানি আমি অমরকে দেখাই। অমর বলেন যোগেশচন্দ্র নিজেই উদ্বাস্তু, তবে অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য পুনর্বাসনের কথা চিন্তা করতে পারেন না। আমি তখন অমর মারফত তাঁকে নববারাকপুরে আহ্বান করি। এই সূত্রে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং অচিরেই তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেই বন্ধুত্ব

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর যোগেশচন্দ্রের ঔদার্যের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি অসীম ঔদার্যে ক্ষমা করেছেন। নিজের শ্রম ও সাধনা দিয়ে আমাদের অক্ষমতাকে বরাবর ঢেকে দিয়েছেন, নববারাকপুরের সামগ্রিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তুলেছেন।

উনিশশো বায়ান্ন সালের মার্চ মাসে যোগেশচন্দ্র নববারাকপুর সমবায় হোমসের সদস্য হয়ে পাঁচ কাঠা বাস্তু জমি কেনেন। তখন তিনি কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের হরি সাহার বাজারের দোতলায় তুখানা ছোট্ট ঘরে বসবাস করছেন। নানা পারিবারিক অসুবিধা, বিশেষ করে একটি পুত্র বিয়োগের তুর্টিনার জন্য বাড়ি শেষ করে নববারাকপুরে আসতে তাঁর দেরি হচ্ছিল। সর্বকনিষ্ঠ এই পুত্রটির অকাল বিয়োগের খবর পেয়ে অমরকে নিয়ে আমি তাঁর হরি সাহার বাজারের বাসায় যাই। ঐ পরিবেশে তাঁর পক্ষে আর একদিনও থাকা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা হলো। আমি তাঁকে নব বারাকপুরে একটা বাড়ি ঠিক করে দেই। অনতিকাল মধ্যে শঙ্করপুকুরের পাড়ে এক বাড়িতে তিনি সপরিবারে উঠে আসেন। সেখানে থেকেই তিনি তাঁর বর্তমান বাড়ি নির্মাণ করান, সম্ভবতঃ বৎসর খানেকের মধ্যে নিজের বাড়িতে উঠে আসেন।

হরি সাহা বাজারের শ্বাসরোধবাড়ী অসহ্য পরিবেশ থেকে খোলামেলা নববারাকপুরে এসে যোগেশচন্দ্র যেন নব জীবন লাভ করেন। তাঁর কাজকর্ম ও কথাবার্তার মধ্যে এটা সহজেই ধরা পড়তো। গোড়া থেকেই জায়গাটি তাঁরও ভাল লেগেছিল। অদৃষ্টকে কেউ এড়াতে পারে না, তবুও তার স্ত্রীর ধারণা হয়েছিল এক বছর আগে নব বারাকপুর আসতে পারলে হয়তো পুত্রটিকে অকালে হারাতে হতো না। নানা কথা হতো আমাদের। যোগেশবাবু আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন মুসলমান গ্রামের পুকুরের নাম শঙ্করপুকুর হলো কেমন করে? কোন উত্তর আমার জানা ছিল না। তবে এখানেই যে উদ্বাস্তরা প্রথম এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তা তাঁকে জানিয়েছিলাম। ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের তৎকালীন সভাপতি হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডের মনীন্দ্রনারায়ণ রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন—'যোগেশবাবু সব জিনিসের একেবারে গোড়া থেকে সুরু করেন।

সোর্স বা মূলে না গিয়ে বিরত হন না। এখানেও (নব বারাকপুরে) তিনি গোড়া থেকে সুরু করছেন।' একটা প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে যোগেশচন্দ্র ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

যোগেশচন্দ্রকে পেয়ে আমাদের শক্তি বেড়ে গেল। নব বারাকপুরের কোন কাজ বিনা বাধায় হয় নি। প্রতিবন্ধকতা কখনো বাইরে থেকে এসেছে; কখনো বা ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। লোককল্যাণ-কর্মের দস্তরই বুঝি এই। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে জমি সংগ্রহই কঠিনতম কাজ। সরকারের সাহায্য ভিন্ন এ কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সরকারী উচ্চতম মহলে সহানুভূতির অভাব ছিল। জমি সংগ্রহ ও অধিগ্রহণ বিষয় নিয়ে তৎকালীন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমান কানাইয়ের তীব্র বাদানুবাদ হয়। ফলে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। যোগেশচন্দ্র কথাটা জেনেই কানাইকে সঙ্গে করে নিজেই একবার বিমলবাবুর সাথে তার বাড়িতে দেখা করেন এবং সমগ্র অবস্থাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। ফলে একটা অবাঞ্ছিত অবস্থা সহজেই মিটে যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে কেন্দ্র করেই বিমলবাবুর সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়। স্টেটস্ রিঅর্গানাইজেশন কমিশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের স্মারকলিপি রচনার মুখ্য দায়িত্ব ছিল বিমল সিংহ মহাশয়ের। শুনেছি এর প্রায় যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য তথ্য যোগেশচন্দ্র তাকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তাই বিমল বাবুর নিকট যোগেশচন্দ্রের কথাবার্তার ভার ছিল খুবই। যোগেশচন্দ্রের বাড়ির সামনেই হয়েছে নববারাকপুর রেল ষ্টেশনটি। যোগেশবাবু স্বভাবতঃই একটু বেশি উল্লসিত হয়েছিলেন। রেল স্টেশন নিয়ে সেই সুরু থেকেই বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার বাস্তব উদাহরণ এই সময় প্রথম প্রত্যক্ষ করি। সাত নং রেল গেটে ষ্টেসনটি সরিয়ে দেবার জন্য নিউ বারাকপুরের এক শ্রেণীর নেতৃবর্গ আন্দোলন করতে থাকেন। তারা কেউ কেউ দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করেন। এ সব দেখে যোগেশচন্দ্র একদিন মন্তব্য করেছিলেন—এই স্টেসনটি নববারাকপুরের ক্ষেত্রে ভগীরথের গঙ্গাবতরণের ন্যায় কল্যাণকর বিবেচিত হবে। কথাটা যে সত্য তা তো আমরা এখন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি।

স্টেশনটি চালু করা নিয়ে রেল দপ্তরের দুর্বুদ্ধির জন্য মধ্যমগ্রামের সঙ্গে

আমাদের একটি একান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বিরোধ দেখা দেয়। রেল কোম্পানির বড় বড় মাথাওয়ালা অফিসারদের ধারণা হলো মধ্যমগ্রাম স্টেশনের যাত্রীদের একাংশই যখন নব বারাকপুর স্টেশন ব্যবহার করবেন, তখন অর্ধেক গাড়ি মধ্যমগ্রাম ও বাকি অর্ধেক গাড়ি নববারাকপুর থামলেই চলবে। অর্থাৎ যে গাড়ি মধ্যমগ্রাম ধরবে সেটা নব বারাকপুর থামবে না আর যেটা নববারাকপুর থামবে সেটা মধ্যমগ্রামে দাঁড়াবে না। এ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা কিছুতেই রেল কর্মচারীরা বুঝতে চাইলেন না। তারা গো ধরে বসে রইলেন। ফলে নব বারাকপুর স্টেশনটি চালু করার প্রশ্নেও অনিশ্চয়তা দেখা দিল। এর একটা ফয়সালার জন্য রেল দপ্তরে একটি বৈঠক বসে। মধ্যমগ্রামের নেতৃত্ব করেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী চিত্ত বসু। যোগেশচন্দ্র ছিলেন আমাদের পক্ষে। মধ্যমগ্রামের সঙ্গে কোন রকম বিরোধ বা বৈরিতা সৃষ্টির আমরা বিরোধী তাতে স্টেসন হোক চাই না হোক। যোগেশচন্দ্রের এই প্রারম্ভিক উক্তির ফল ভাল হয়েছিল। একখানা মাত্র গাড়ি নিয়ে স্টেসনটি উদ্বোধন করতে আমরা স্বীকৃত হই। আমাদের ক্ষোভ ছিল অনেক, কিন্তু মধ্যমগ্রামের পক্ষে ঐ একখানা গাড়ি ছেড়ে দেওয়াও যে কম ঔদার্যের পরিচায়ক নয় এ বোধও আমাদের জাগ্রত ছিল। যোগেশবাবুর হস্তক্ষেপের ফলে সমগ্র ব্যাপারটার দৃষ্টিকোণ বদলে গিয়েছিল।

অনেক বাধা-বিপত্তির পর আমাদের প্রথম কলেজটি যখন হলো, তখন পরিচালক সভায় স্থান পাবার জন্য বিচিত্র সব দাবিদার আর বিচিত্রতর তদবিরের জোয়ারে আমরাই ভেসে যাবার মত হলাম। সে কথা যাক্। আমরা বার বিঘা জমি দিয়েছি, প্রথম কিছুকাল কলেজ করার জন্য বাড়ি দিয়েছি, কি না করেছি—অথচ পরিচালক সমিতির বেলায় আমরা নস্যাৎ হয়ে যাব এটা মেনে নিতে পারলাম না। আমরা যে তালিকা দিয়েছিলাম, তার প্রথম নামটি ছিল যোগেশচন্দ্র বাগলের। একদিন গিয়ে শুনি দৃষ্টি-হীনতার দোহাই দিয়ে তার নামটি কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটা নাম জোড়া লাগাতে আমাকে অনেক দৌড়ঝাপ করতে হয়েছিল। শিক্ষা দপ্তরের সহানুভূতিশীল অফিসারদের বাইরে এ ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ডেপুটী রেজিষ্ট্রার নব বারাকপুরের শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

কলেজের নাম বদলের সময়ও অনুরূপ কিছু ঘটনা ঘটে। আমরা প্রস্তাব করেছিলাম—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম শতবর্ষে স্থাপিত হয়েছে বলে আমাদের কলেজের নাম করা হোক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ। আজকাল ছেলেরা আচার্যের নামটিও উচ্চারণ করে না। বলে APC কলেজ। অতএব নাম বদল না করলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এবার যারা এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এগিয়ে এলেন তারা কৌশলে প্রচার করে দিলেন—খুলনার মানুষ নব বারাকপুর গড়েছে, আচার্যের বাড়িও খুলনায়, সেই জন্যই কলেজের নাম করা হচ্ছে তাঁর নামে। আর প্রকাশ্যে বলা হলো আচার্যদেবের নামে যাদবপুরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন আছে, তখন তাঁর নামে দ্বিতীয় একটি কলেজ করার বিশেষ যৌক্তিকতা নেই। এমনি করে শেষে বলা হলো কলেজটির নাম মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের নামে হোক। অশ্বিনী দত্তের বাড়ি বরিশাল। সমসময়ের বাঙালি সমাজ তাঁর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। যোগেশচন্দ্রের বাড়িও ছিল বরিশাল জেলায়। তিনি অশ্বিনীবাবুর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ছিলেন, তাঁর প্রতি ভক্তিও ছিল প্রগাঢ়। তৎসত্ত্বেও যোগেশচন্দ্র সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নি। যোগেশচন্দ্রের সমর্থন না পেয়েও চক্রান্তকারীরা তাদের প্রস্তাবের অনুকূলে সরকারী সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে আমি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে নামকরণটি মঞ্জুর করাই। তিনি সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করে আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ এই নাম করে দেন। তাঁকে আমরা কলেজের নামকরণ উৎসবে আসবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আসতে না পেরে যে শুভেচ্ছা বাণীটি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে জনসাধারণের অবগতির জন্য মুদ্রিত করে দিলাম।

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL
Calcutta
The 8th June, 1962

MESSAGE

I send my best wishes on the occasion of the renaming of the New Barrackpore College after Acharya Prafulla Chandra Roy. May the ideals of austerity and devotion to learning of this great son of Bengal inspire the students in the long years to come.

Sd/- B. C. Roy

নববারাকপুরের অন্যান্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র জড়িয়ে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যোগেশচন্দ্র এর সভাপতি ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় আমাদের সীমাবদ্ধ সঙ্গতির মধ্যেও এটি একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগাররূপে গড়ে উঠছে। পুস্তক নির্বাচনে ও নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে তিনি যে সব নির্দেশনা রেখে গেছেন, সেগুলি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সস্তা গল্প উপন্যাস কেনা নিষেধ। পাঠাগারে রাজনৈতিক সভা-সমিতি বা হাল্কা গান বাজনার আসর বসতে দেওয়া হয় না।

রবীন্দ্র শতবর্ষে আমরা একটি রবীন্দ্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হই। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের সঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির আলোচনা-কেন্দ্ররূপে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা আগ্রহী হই। প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্মী অভাবে আমাদের সে স্বপ্ন সফল হয় নি। তবে বাড়িটি নির্মাণ করে ছোট্ট একটি গ্রন্থাগার সেখানে স্থাপিত হয়েছে। এই ভবনের শিলান্যাস করিয়েছিলাম যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন—স্বগ্রামে নিগৃহীত হয়ে যীশু বলেছিলেন—ধর্ম প্রবক্তারা নিজের দেশে সম্মানিত হন না।

নব বারাকপুরের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরালে একদা হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষত সৃষ্টির সুপরিকল্পিত আয়োজন তাকে ব্যথিত করত। তিনি বলতেন নব বারাকপুরের উন্নতির গতিটা একটু শ্লথ হলে আন্দোলনের বিকৃতিটা এত মর্মান্তিক হতে পারত না। প্রয়োজন অনুভূত হবার আগে—আমরা অনেক জিনিস পেয়েছি বলে তার যথার্থ মূল্য দিতে পারি নি। আর তা পারিনি বলেই শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও যত্নশীল হইনি। এর থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল অর্থ-সংস্থানহীন সংস্থা গড়তে পারলে দলাদলি কমে আসবে। অর্থ-সংস্থানহীন মানে টাকাকড়ি শূন্য নয়। কাজের জন্য যে-টুকু অর্থ প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা হবে না। অর্থ অপেক্ষা শ্রম সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে সমর্থ হই নি। সে পরিবেশ গড়ে তোলার যোগ্যতা আমাদের নেই, সময়টাও বোধ করি অনুকূল নয়। আগামী দিনে নব বারাকপুরের দায়-দায়িত্ব যাদের হাতে পড়বে, সেই অনাগত কর্মী বন্ধুদের নিকট প্রত্যাশা করুক তারা যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তটিকে বাস্তব রূপ দিতে যত্নশীল হবেন।

প্রায় সব বিষয়েই যোগেশচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল। গীতা বলেছেন সংশয়ঃ আত্মা বিনশ্যতি। কোন ব্যাপারেই তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এর থেকেই অসীম আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি কাজে এই সংশয়হীন আত্মবিশ্বাস সহজেই লক্ষ্য করা যেত। পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের সময়নিষ্ঠা ও সংশয়হীন আত্মবিশ্বাসের দ্বারাও আমরা যেন প্রভাবিত হই। তা হলেই তাঁর স্মরণ মনন কল্যাণকর হবে।

যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর নববারাকপুরের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় করা হয়েছে। আরও বহু জনে তাঁর স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে নানা উদ্যোগে ব্রতী হয়েছেন দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। বৃহত্তর বঙ্গ সমাজে কি হবে জানি না, তবে নব বারাকপুর যতদিন থাকবে যোগেশচন্দ্রের নামও ততদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। নব বারাকপুরের মানুষ গুণীজনকে শ্রদ্ধা জানাতে কখনো কুণ্ঠিত হয়নি, আর আমার বিশ্বাস এই জন্যই নব বারাকপুর অনন্যসাধারণ।

সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র

গৌতম সেন

সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র—এ তাঁর জীবনের একটি বড় অধ্যায়। যে খ্যাতি তিনি জীবনে অর্জন করেছেন তাঁর মূলে কিন্তু এই সাংবাদিক জীবন। অথচ সাংবাদিক হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। ভাগ্য তাঁকে এই পথে নিয়ে আসে। অবশ্য, লেখার অভ্যাস তাঁর বরাবরই ছিল। তিনি ঐতিহাসিক। তাঁর রচনা ছিল মুখ্যত উনবিংশ শতকের ইতিহাস-বিষয়ক।

একবার একটি প্রবন্ধ নিয়ে তিনি রামানন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যুর' সম্পাদক। সম্পাদকীয় রচনায় তাঁর খ্যাতি এ যুগেও বিরল। যোগেশবাবুর প্রবন্ধ প'ড়ে তিনি খুসী হলেন, বললেন, এ বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ বড় একটা কেউ লেখেন না। আপনি নিয়মিত লিখুন।

যোগেশ বাবু নিয়মিত লিখতে লাগলেন। একদিন রামানন্দ বাবু বললেন, আপনি প্রবাসীতে আসবেন?—আসুন। যোগেশ বাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি প্রবাসীর চাকরি গ্রহণ করলেন।

রামানন্দ বাবুর নির্দেশক্রমে যোগেশ বাবু নিয়মিত প্রুফ দেখতে লাগলেন। এ বড় কঠিন কাজ। নিষ্ঠা না থাকলে এ কাজ করা যায় না। নির্ভুল ছাপা কাগজের গৌরব।

এর পরই সুরু হ'লো আসল কাজ—সংবাদ সংগ্রহ। কোথায় কোন্ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বা সংবাদ পত্র আছে—খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হবে। এই সংবাদ কুড়িয়ে আনাই হ'লো সাংবাদিকের দুরূহ কাজ। এ সকলে পারেও না, করেও না। ফাঁকি দিয়ে কখনো বড় কাজ হয় না।

যোগেশ বাবু সন্ধান পেলেন উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেদের বাড়ীতে আছে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুরাতন কাগজ। যোগেশ বাবু প্রবাসীর কাজ বজায়

রেখে নিয়মিত সেখানে যাতায়াত সুরু করলেন। যোগেশবাবু আহার-নিদ্রা ভুলে গেলেন। এখানেও সেই নিষ্ঠা। রামানন্দ বাবু এতটা আশা করেন নি। বললেন, আমি মুগ্ধ হয়েছি আপনার কাজ দেখে। লেগে থাকুন, এতে আপনার প্রবন্ধ লেখারও সুবিধা হবে। অনেক উপকরণ পাবেন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে। সত্যিই তাই। যোগেশ বাবু অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলেন এই মুখুজ্যে বাড়ী থেকে। যা তাঁর উত্তর জীবনে বহু কাজে লেগেছে। অবশ্য এ ছাড়াও তিনি নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জয়নগর মজিলপুরে যাতায়াত করতেন।

যোগেশ বাবু বলতেন, এ সময় কি কম পরিশ্রম করেছি আমি? এজন্যে আমি রামানন্দ বাবুর কাছে ঋণী। তিনি আমার সাংবাদিক-জীবন গ'ড়ে তুলেছেন।

রামানন্দ বাবু প্রায়ই বলতেন, সমালোচনা করা বড় দুরূহ কাজ। সাংবাদিক হ'তে হ'লে তাকে নির্ভীক হতে হবে। মুখ চেয়ে সমালোচনা স্তুতিরই সামিল। আপনি জানেন বোধ হয়, আমি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও কিছু লিখেছি—যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবাসীর এবং আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এজন্যে প্রথমটায় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এটা সব সময় মনে রাখবেন, সাংবাদিককে পরমুখাপেক্ষী হ'লে চলবে না। সমালোচক হবেন স্পষ্ট বক্তা। আমাদের দেশে এটারই অভাব। তিনি বলতেন, সংযম হচ্ছে লেখার বড় গুণ। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই লিখবো, তার অতিরিক্ত নয়। ওজন-করা কথা লেখা লেখকের বড় গুণ। লেখার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস থাকবে না, অবান্তর কথাও নয়। এ সংযম অভ্যাস-সাপেক্ষ।

আজ রামানন্দ বাবু নেই, যোগেশ বাবুও নেই, কিন্তু আজও দেখতে পাই—কত বড় বড় পণ্ডিত রামানন্দ বাবুর সম্পাদকীয় পড়বার জন্যে বা মাল-মশলা সংগ্রহ করবার জন্যে প্রবাসী-অফিসে আসেন। তাঁরাই বলেন, এতো অমূল্য সম্পদ আর কোথাও নাই।

যোগেশ বাবুর মধ্যেও দেখেছি, তাঁর এই রচনা-কৌশল। লেখার মধ্যে তাঁর কি অপূর্ব সংযম। কোথাও অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, অতিরঞ্জন নেই। তাঁর এই সম্পাদকীয় লেখাটি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

"ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানদের আর একটি দাবী এই যে, সর্বত্র লোক সংখ্যার অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে সরকারী চাকুরী দিতে হইবে এবং তাহা ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে দিতে হইবে। অবশ্য তাঁহারা ইহা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বলিয়াছেন। ইহাতে, ন্যূনতম যোগ্যতা বিশিষ্ট মুসলমান চাকরেদের অর্থ প্রাপ্তি ঘটিবে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক চাকরে ও চাকরেদের পরিবারবর্গ ছাড়া খুব বেশী সংখ্যক অন্য মুসলমানদের মঙ্গল হইবে কি? মুসলমান অমুসলমানকে লইয়া যে সমগ্র জাতি, তাহার মঙ্গল হইবে কি? যোগ্যতম লোকদিগকে কাজ দিলেই দেশ সুশাসিত এবং ক্রমশঃ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। বর্তমান সময়েই দেখা যায়, নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে মুসলমানদিগকে চাকরী দিবার নিয়ম থাকা প্রযুক্ত মুসলমানরা সামান্য শিক্ষা পাইয়া চাকরী পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি হইতেছে না। ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে শতকরা ৫৫টি চাকরী বাঙালী মুসলমানেরা পাইলে মুসলমান সমাজে শিক্ষার দুর্দশা বাড়িবে বই কমিবে না।

অযোগ্যতর মুসলমানের পরিবর্তে যোগ্যতর অমুসলমান কেন চাকরী পাইবে না, তাহার উত্তর কোন ন্যায়শাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যাইবে না। সকল রাষ্ট্রেই ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতা থাকা উচিত। কিন্তু যোগ্যতর অমুসলমানকে বাদ দিয়া অযোগ্যতর মুসলমানকে কাজ দিলে তাহার মানে এই হইবে যে, রাষ্ট্র মুসলমানকে বেশী পছন্দ করে, অতএব যে সহজে চাকরী পাইতে চায়, তাহার মুসলমান হওয়া উচিত।"

যোগেশবাবুর ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। এ সচরাচর দেখা যায় না। সাংবাদিক জীবনে তাঁর এই শক্তি অনেক কাজে লেগেছে। এ কথা রামানন্দ বাবুও স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, 'এ ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। যা আমার নেই।'

প্রবাসী অফিসে তাঁর এ পরিচয় বহুবার পেয়েছি। 'প্রবাসী' প্রায় ৮০ বছরের কাগজ। এত পুরোনো কাগজ আর নেই। প্রাচীন লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন হ'লে তিনি মুখে মুখে বলে দিতেন—অমুক সালের অমুক মাসের প্রবাসী দেখুন। 'প্রবাসী খুলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই! প্রতিটি লেখা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। ছবি সম্বন্ধেও তাই। এত

ছবির ব্লক আর কোথাও নাই। পুরানো ছবি ছাপতে হ'লে যোগেশ বাবুই বলে দিতেন, এ ছবি অমুক সালের অমুক মাসে বেরিয়েছে।

এই 'ব্লক ডিপার্টমেণ্ট'টি অতি পুরানো বেয়ারা পরশুরামের হাতে ছিল। এই পরশুরাম অতি বাল্যকালে রামানন্দ বাবুর আশ্রয়ে আসে। সেই থেকেই সে এ-কাজে নিযুক্ত। প্রবাসী ছিল তার প্রাণ—এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতি সে সহ্য করতে পারতো না। সে সকলেরই প্রিয় ছিল। আমাদেরকেও সে ভালবাসতো। প্রয়োজন হ'লে তিরস্কারও করতো। যোগেশবাবুই কি কম বকুনি খেয়েছেন। বলতো, আর কেন, বয়স হয়েছে ছেড়ে দিন না। যোগেশবাবু হাসতেন। অদ্ভুত ছিল এই পরশুরাম। সেই পরশুরাম একবার দেশে গিয়ে ৩ দিনের জ্বরে মারা গেল। আজও তার কথা সময় সময় মনে হয়।

একবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আসে যোগেশচন্দ্রের। বক্তৃতা দিতে হবে পাঁচদিন। এই পাঁচটি বক্তৃতা খাতায় লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করতে হবে। এই নিয়ম।

যোগেশবাবু তখনও সম্পূর্ণ অন্ধ হন নি। আন্দাজে লিখতে পারতেন, কিন্তু পড়তে পারতেন না। এজন্যে কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে সাহিত্য পরিষদে গিয়েছি। মাল-মশলা সংগ্রহ করতে সে সময় অনেক বই ঘাঁটতে হয়েছে। অবশ্য তিনিই বলে দিতেন, আমি খুঁজে বের করতাম। লিখবার প্রয়োজন হ'তো না, কেবল শোনাতাম। তারপর অফিসে এসে সেইগুলো লিখে ফেলতেন। অনেক পরিশ্রম ক'রে খাতাগুলি শেষ করলেন। অবশেষে দাখিল করে এসে নিশ্চিন্ত হলেন।

এর প্রায় একমাস পরে বক্তৃতা দেবার দিন স্থির হ'লো। যথা সময় তাঁর সঙ্গে আমিও গেলাম। হল ঘরে লোকসংখ্যা প্রচুর—অবশ্য ছাত্রই বেশী।

যথাসময়ে তাঁকে তাঁর আসনে নিয়ে যাওয়া হ'লো। ৫ খানা খাতা তাঁর টেবিলে রাখতেই তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না—আর এর প্রয়োজনও নেই, আমি এমনি বলবো।

বক্তৃতা সুরু হ'লো। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যেন বই পড়ছেন! প্রত্যেকটি ঘটনা সন তারিখ দিয়ে অনর্গল ব'লে চললেন। এইভাবে তিনি একটি ঘণ্টা বললেন। সকলেই অবাক হ'য়ে গেলেন—এই অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি দেখে।

এইভাবে তিনি পাঁচটি দিন সমানে বক্তৃতা দিলেন।

জানি না, এ শক্তি তিনি কোথা থেকে পেলেন! ঐশ্বরিক শক্তি ভিন্ন আর কি বলবো! জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা শুনেছি। কিন্তু সে শোনা কথা। এবার অসাধারণ শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলাম।

রবিবাসরে যোগেশচন্দ্র

সন্তোষকুমার দে

(সম্পাদক : রবিবাসর)

'রবিবাসর' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৩৬ সালে- এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে। তার ঠিক এক বছর আগে ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৫ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল—

সাহিত্য সঙ্গত

"গত পরশু ২৮শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্রা" গৃহে সাহিত্য সঙ্গতের উদ্বোধন হইয়াছে। সভায় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।...

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, কোন বাঁধাধরা নিয়মে গুরু গম্ভীর সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি আলোচনার জন্য 'সঙ্গত' প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার স্থায়িত্ব হইবে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে সেরূপ সভাসমিতির অভাব নাই, অভাব আছে মজলিশের। মজলিশে দশজন একত্র হইয়া নিতান্ত সাদাসিধা সহজভাবে কথাবার্তার প্রথা পূর্বে এ দেশে ছিল, কিন্তু এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এটি আমাদের চাই, সাহিত্য সঙ্গতের উদ্দেশ্য তাহাই হওয়া উচিত।"......

'রবিবাসর' রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত সেই মজলিশি প্রকৃতির জন্য এই সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর কাল বেঁচে আছে। রবিবাসরেরও অধিনায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং একমাত্র রবিবাসরেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই সদস্য ছিলেন।

রবিবাসরের মত আর একটি সাহিত্য সভার সঙ্গে রবি-সংযোগ ঘটেছিল তার নাম—"খামখেয়ালী সভা"। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় খামখেয়ালী সভা সম্পর্কে অনেক তথ্য বলে গেছেন। রবিবাসরে পক্ষকাল অন্তে এক রবিবার সায়াহ্নে কোন সদস্যের

গৃহে অধিবেশন বসে, খামখেয়ালী সভার-ও কোন সদস্যের গৃহে মাসে একবার মাত্র অধিবেশন বসত। ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বলেন্দ্র নাথ, দীপেন্দ্র নাথ, গগনেন্দ্র নাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র নাথ, সুধীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্র নাথ, নীতিন্দ্র নাথ ও সত্যপ্রসাদ এই সভার সদস্য ছিলেন। আর ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দের বড ভাই কবি মনোমোহন ঘোষ, ত্রিপুরার মহারাজা মহিমচন্দ্র বর্মা, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, সন্তোষের মহারাজা প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, কবি অক্ষয় চৌধুরী, অভিনেতা অক্ষয় মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় সাহিত্য আলোচনা, রচনা পাঠ, আবৃত্তি, গান প্রভৃতির সঙ্গে প্রচুর ভোজ্যবস্তুরও আয়োজন থাকত, রবিবাসরে এখনও রসনার রসাস্বাদনের ব্যবস্থাটা থাকে।

বিদ্বৎজন সমাগম, আত্মীয় সভা, পূর্ণিমা সম্মেলন, উৎকেন্দ্র সমিতি প্রভৃতি প্রাচীন সংস্থা থেকে সুরু করে হাল আমলের আমাদের কালের উজ্জয়িনী, চলোর্মি, উত্তর ভারতী, আহ্বান, সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি কত সাহিত্য-সভা ও মজলিশের কথাই শোনা যায়;—প্রমথনাথ বিশী এই বিষয়টি নিয়ে একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য রবিবাসরের একটি অধিবেশনে আমাকেই অনুরোধ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আমি যে মনীষীর নামটি তৎক্ষণাৎ উল্লেখ করেছিলাম, তিনি হলেন—যোগেশচন্দ্র বাগল, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস তাঁর মত আর কে জানতো?

যোগেশচন্দ্র বাগল রবিবাসরের সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু অনেকবার তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে রবিবাসরে এসেছেন। "প্রবাসী" অফিসে তাঁর সহকর্মী বন্ধু ছিলেন কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। তিনি রবিবাসরের সভাকবি নামে খ্যাত ছিলেন, রবিবাসরের প্রতিটি অধিবেশন সুরু হত তাঁর একটি কবিতা দিয়ে। প্রথম দিকে কিছু কাল তিনি রবিবাসরের সম্পাদকের দায়িত্বও বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার মত ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবিবাসরের সদস্য এবং কিছু দিন সম্পাদক ছিলেন। তিনিও প্রবাসী অফিসের কর্মজীবনে যোগেশচন্দ্রের

সহকর্মী বন্ধু ছিলেন। এই দুই বন্ধুর টানে যোগেশচন্দ্র রবিবাসরের সদস্য না হয়েও অনেকবার অধিবেশনে এসেছেন। তাই তাঁর স্মৃতিকথায় (জীবন নদের বাঁকে বাঁকে) রবিবাসরের প্রসঙ্গে অনেকখানি লিখেছেন বলে অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের নিকট শুনেছি।

রবিবাসরের অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বর্গত রাজশেখর বসু বা রসসাহিত্য স্রষ্টা 'পরশুরাম'। রাজশেখর বসুর মৃত্যুর পর 'বসুধারা' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে 'রবিবাসর' প্রসঙ্গে যা লিখেছেন এখানে তা উল্লেখ করি :

"রবিবাসর' পুনর্গঠিত হইয়া জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে। দাদা জলধর সেন সর্বাধ্যক্ষ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী বা কর্মসচিব। পার্শীবাগানের আড্ডাধারী বহু সভ্য রবিবাসর-এ আসিয়া যোগ দিলেন।···

'রবিবাসর' প্রতিপক্ষে একবার করিয়া এক একজন সভ্যের বাড়ীতে বসে।·········একবার আগড়পাড়ায় ইহার একটি অধিবেশন হইল।·········ঐ অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমরা একযোগে শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে চাপি। ঐ দলেও ছিলেন অন্যান্যদের মতো বাংলাসাহিত্যের 'রসরাজ' পরশুরাম। যথাসময়ে অধিবেশন হইল। কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা "সাহিত্য ও আর্ট" শিরোনামায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার পর যে আলোচনা চলে তাহাতেও অল্পভাষী রাজশেখর যোগদান করিয়াছিলেন। রাজশেখর বাবু রবিবাসরের আরও কোন কোন অধিবেশনে যোগদান করিয়া থাকিবেন। তবে এইবারের অধিবেশনে তাঁহার যোগদানের কথা আমার স্মৃতিপটে জল জল করিতেছে।"

যোগেশচন্দ্র এর পরেও রবিবাসরে এসেছেন এবং আমার বাড়ি খুলনা জেলায় মূলঘর গ্রামে ছিল শুনে আমায় সস্নেহে একটি মজার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত আচার্য যোগেশচন্দ্র বাগলের পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করি :

তখনও খুলনা জেলায় কোন কোন অঞ্চলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে বরিশাল শহরে যেতেন। তখনও কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্ত বেঁচে। একবার ছাত্রদের তিনি পরীক্ষার হলে বসিয়েছেন। বরিশালের জেলাশাসক জনৈক ইংরেজ এসেছেন পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন

করতে। ঘুরতে ঘুরতে দেখেন একটি ঘরে ছাত্রেরা বসে পরীক্ষা দিচ্ছে—কোন পাহারার ব্যবস্থা নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিস্মিত হয়ে অশ্বিনীকুমার দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অন্যান্য হল-ঘরে যখন গার্ডের ব্যবস্থা আছে এই একটি ঘরে কোন গার্ড নেই কেন?

অশ্বিনী কুমার দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন—They are Mulghar boys, Sir. অর্থাৎ মূলঘরের ছাত্রদের সততায় তাঁর এমন নির্ভরতা আছে যে তিনি তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য কোন গার্ডের ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করেন নি। *

ঘটনাটার উপর যোগেশচন্দ্র এতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, দেবজ্যোতি বর্মনের সম্পাদনাকালে তাঁর যুগবাণী পত্রিকাতে একটি নিবন্ধেও এই কাহিনীটির উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

* লেখক মূলঘর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। সঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে যোগেশচন্দ্র বাগল

সনৎকুমার গুপ্ত

১৮৯৪, ২৯ এপ্রিল (১৩০১ সাল, ১৭ই বৈশাখ) 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই আট দশক ধরে অগণিত সাহিত্যপ্রাণ বাঙালী পরিষদের সেবায় এগিয়ে এসেছেন—পরিষৎও নিজের বাহু বিস্তার করে এই সব স্নেহপ্রাণ সেবকদের সাধ্যমতে সেবা ও প্রীতি বিনিময়ে আকৃষ্ট করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণে পরিষদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিরলস সাহিত্য সেবার মাধ্যমে পরিষৎকে সেবাব্রতের একনিষ্ঠতায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। পরিষদের অলৌকিক আকর্ষণের কথা জানতে হলে, আগে পরিষৎকে জানতে হবে।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে বাঙালী আত্মচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হলে নিজেদের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে সচেষ্ট হলেন। এটিকে অ্যাকাডেমির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করলেন কয়েকজন উত্তর কলকাতার ছাত্র-স্থানীয় ব্যক্তি। ৮ শ্রাবণ, ১৩০০ সালে (২৩ জুলাই, ১৮৯৩) বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হলো। স্থান হল শোভাবাজারের রাজা (তখন কুমার) বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাসভবন কলিকাতার ২।২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে।

"একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বনপূর্বক বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধনই" ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস 'পরিষৎ'—পরিচয়ে' যা লিপিবদ্ধ আছে, তা থেকে জানা যায়ঃ

"অ্যাকাডেমী অফ লিটারেচারের কার্যকলাপে এইরূপ ইংরাজি বহুলতা দেখিয়া···আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়।···প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌ নাম পরিগৃহীত হয়। ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে পরিষদের স্থাপনা হয়; ···১৩০৬ সালের শেষভাগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—এই

এগার জন সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্র সম্পাদক শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়; ঐ পত্রে পরিষদের কার্যালয় কোনো সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার…অনুরোধ ছিল।…পরিষদের কার্যালয় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়।

মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর…হালসী বাগান রোড ও অপার সারকুলার রোডের সংযোগ স্থানে ৩৩ ফুট দীর্ঘ ৬৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখিয়া দিলেন।"

১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় এখানকার নতুন বাড়িতে আনীত হয় ও ২১ অগ্রহায়ণ গৃহ প্রবেশ উৎসব হয়। এই উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন; "বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য পরিষৎরূপে আমাদের দর্শন গোচর হইল ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হোক, বাঙালীর কীর্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক, অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিতেছি।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষৎ অর্থে বুঝেছিলেন, "দশজনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষদ হইবে, দুইজনে করিলে হইবে না।

পরিষদের জীবনের আশি বছরের মধ্যে প্রথম চল্লিশ বছর এর প্রাথমিক গঠনে চলে যায়। প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত; সহকারী সভাপতি—নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদক—রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে পরিষদের সংগঠন করেন।

বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনা, গবেষণা প্রচার, বিলুপ্ত সাহিত্য সম্পদ উদ্ধার ও সংরক্ষণ ছিল পরিষদের মূল উদ্দেশ্য। সেইজন্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষ আনলেন একাধিক নিরলস কর্মী ও সেবকবৃন্দ। এই সব কর্মী সৎচিন্তা ও নিরলস কর্মপ্রবাহ ও নির্লোভিতার মাধ্যমে বহু বছর পরিষদের সেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন, কেউ কেউ অমরতার প্রসাদও পেয়েছেন।

পরিষদের সূচনা থেকে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও বিবিধ গবেষণামূলক সাহিত্য-রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। নিজস্ব ভূমির উপর নির্মিত হলো দুটি সারস্বত মন্দির। তার মধ্যে রয়েছে প্রদর্শনশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার। প্রথম চল্লিশ বছরের সংগঠনের মধ্যে পরিষৎ ফলে-ফুলে, রূপে-রসে একটি সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করলো। এই সব সংগঠকদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে

ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, কান্তরঞ্জন রায়, প্রভৃতি। এঁদের পরবর্তী হলেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ সরকার, রাজশেখর বসু, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুন্সী আবদুল করিম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

বিশ্ব-অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে ১৩৩৯-৪০ সালে পরিষৎ এক সঙ্কটের মধ্যে পড়েন। তখন এর অবস্থার রূপান্তরের জন্য পরিষদের কর্মপদ্ধতির এক পরিবর্তন হলো। এর মূলে ছিলেন দুটি সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁরা পরিষদের কর্ণধার রূপে এগিয়ে এলেন। এঁরা দুজন হলেন—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। পরিষৎকে পরিচালনায় ঐক্যভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটি জোটে আবদ্ধ হলেন। এই জোটের ব্যক্তিরা কোন-না-কোনো ভাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবাসী—মডার্ন রিভিউ—বিশাল ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তখন ছিলেন প্রবাসী—মডার্ন রিভিউর কর্মী। তিনি-ও পরিষদের সাধারণ সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন ১৩৪৪ সালে। এই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের বিবিধ কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যোগেশচন্দ্রেরও পরিষদের মতো সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে সংযুক্তির প্রয়োজন ছিল। পরিষদের মাধ্যমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে দেশের সাহিত্য সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হলো, নিরলস নিরহঙ্কার নির্বিবাদী যোগেশচন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্যে ও গবেষণামূলক রচনায় বৃহৎ সাহিত্য গোষ্ঠী ও অভিজাত ব্যক্তিগণের দ্বারা অচিরে সমাদৃত হলেন।

পরিষৎ সদস্যগণের নির্বাচনে যোগেশচন্দ্র ১৩৪৯ সালে সর্বপ্রথম পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন। পর বৎসর (১৩৫০-৫১ সালে) গ্রন্থাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে যোগেশচন্দ্র পরিষদের প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। পরিষৎ পত্রিকা ও প্রকাশন সংক্রান্ত কর্মে ক্রমে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার স্বীকৃতি

হিসাবে ১৩৬৪ সালে তাঁকে পরিষদ কর্তৃক রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (এবং অপর বহু পত্র পত্রিকায়) গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লেখার জন্য তিনি পরিষদের বাহিরেও সংবর্ধিত হন। পরিষৎ প্রকাশিত 'ভারতকোষে'র উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য-ও তিনি ছিলেন এবং এই কোষ গ্রন্থের জন্য বহু প্রবন্ধাদি-ও লিখেছেন।

যোগেশচন্দ্র প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল অর্থাৎ ১৩৪৯ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৩৭৮) অবিচ্ছিন্ন ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে নানা ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর পরলোক প্রাপ্তিতে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিতে ও সাধারণ অধিবেশনে শোক প্রকাশ করা হয়। সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত যে শোক-প্রস্তাব তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হয় তার প্রতিলিপি এরূপ:

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্যপ্রেমী ও শিক্ষাব্রতীদের এই সভা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করছে। বাগল মহাশয়ের শ্রম, নিষ্ঠা, মনন ও অনুসন্ধিৎসা গবেষণার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়েছে। বিশেষত উনিশ-শতকের বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাগল মহাশয়ের গবেষণার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এদেশে শিক্ষা, জাতীয় আন্দোলন, সমাজ-বিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্রের মনোজ্ঞ রচনাসম্ভার এক নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে।

পরিষদের সঙ্গে বাগল মহাশয়ের বড় নিকট ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্য-সাধকদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী এবং বেথুন সোসাইটীর ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক আলোচনা পৃথক পৃথক গ্রন্থকারে বাগল মহাশয় কর্তৃক রচিত হয়। পরিষৎ থেকেই এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

দীর্ঘকাল তিনি পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি-রূপে তিনি পরিষদের বহুতর সেবা করেছেন। তাঁর অভাব দীর্ঘকাল ধরে গভীর ভাবে অনুভব হবে।

যে স্বভাবসরল বিদ্যাপথচারী দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের সুখ-দুঃখের অংশ ভাগী ছিলেন আজ তাঁর অন্তিম পদপ্রান্তে আমাদের শ্রদ্ধার প্রণাম অর্পিত হোক।"

পরিশিষ্ট : ১॥ সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন সম্মানীয় পদ

সহকারী সভাপতি : ৭৪ বর্ষ থেকে ৭৮ বর্ষ পর্যন্ত

গ্রন্থাধ্যক্ষ। ৫০ এবং ৫১ বর্ষ।

সহকারী সম্পাদঁক : ৪৯ বর্ষ ; ৫২ বর্ষ থেকে ৫৬ বর্ষ পর্যন্ত

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য

৪৯।৫২, ৫৬।৫৭ থেকে ৭৩ বর্ষ

পরিশিষ্ট : ২॥ প্রকাশিত গ্রন্থ

বেথুন সোসাইটী, মাঘ ১৩৬৭

পরিশিষ্ট : ৩॥ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংখ্যা	চরিত্রগ্রন্থ-নাম	প্রকাশকাল	
২০	রাধাকান্ত দেব	কার্তিক	১৩৪৯
৪৫	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রাবণ	১৩৫১
৪৯	রাজনারায়ণ বসু	পৌষ	১৩৫২
৭২	রামকমল সেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	পৌষ	১৩৫৫
৯৫	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	আশ্বিন	১৩৬৩
৯৬	উইলিয়ম ইয়েটস জন ম্যাক মধুসূদন গুপ্ত	ফাল্গুন	১৩৬৩
৯৭	কেশবচন্দ্র সেন	ভাদ্র	১৩৬৫
৯৮	উমেশচন্দ্র দত্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ	ভাদ্র	১৩৭০
৯৯	সরলা দেবী চৌধুরাণী শরৎচন্দ্র রায়	ফাল্গুন	১৩৭০
১০০	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়		১৩৭১
১০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	পৌষ	১৩৭১

পরিশিষ্ট : ৪॥ ভারতকোষ

প্রথম খণ্ড : অবলা বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী,
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, আলবার্ট হল,
ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ,
ইয়ং বেঙ্গল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
উমেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড : কাওয়াসজি রুস্তমজি, কাঙাল হরিনাথ,
কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র,
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,

তৃতীয় খণ্ড : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
গৌরদাস বসাক, গৌরমোহন আঢ্য,
জর্জ টমসন, আলেকজাণ্ডার ডাফ,
উইলিয়াম ডানিয়েল, উইলিয়াম ডিগবি,
টমাস ডানিয়েল, এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও,
তত্ত্ববোধিনী সভা, তারাচাঁদ চক্রবর্তী,
তারানাথ তর্কবাচস্পতি

চতুর্থ খণ্ড : জাঁ আঁতোয়ান দুবোয়া, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর,
রাজা নবকৃষ্ণ, প্যারীচরণ সরকার,
প্রমথনাথ মিত্র, ফেডারেশন হল

পরিশিষ্ট : ৫॥ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রবন্ধ-নাম	বর্ষ	সংখ্যা
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭	১
শিক্ষা-বিস্তারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৫০	৩
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০	৪
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	৫১	১-২
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	৫১	৩-৪
গৌড়ীয় সমাজ	৬০	১
ঐ (উত্তর)	৬০	১
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৬২	৪
বেথুন সোসাইটী	৬৩	১-৪
ঐ	৬৪	১-২
ঐ	৬৫	১-৪
ঐ	৬৬	৩
আচার্য যদুনাথ সরকারের বাংলা রচনাবলী	৬৫	১

——— * ———

সরকারী কলেজ অব্ আর্টসের শতবার্ষিকী গ্রন্থের লেখক যোগেশচন্দ্র

ইন্দু রক্ষিত

চিঠি পাঠিয়েছিলাম অনুরোধ জানিয়ে আর নূতন উৎসাহ নিয়ে। উৎসাহের কারণ এমন একটি কাজের ভার এলো যার দায়িত্ব বহনে আনন্দ, পালনে তৃপ্তি। তারো উপর আরো একটু ছিল; এ কাজে তাঁর সহায়তা অপরিহার্য। অবশ্য সবই নির্ভর করছিল ঐ জবাবটির উপর। সুখের কথা, এসেও গেল সে জবাব অবিলম্বেই, আর সম্মতি জানিয়েই।

অনুরোধটি ছিল খ্যাতনামা গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের কাছে। রাষ্ট্রীয় চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের (সাধারণে যাকে আর্ট কলেজ বলে) স্মারক গ্রন্থটির জন্য যদি তিনি লিখে দেন বিদ্যায়তনটির সেই শতবর্ষ পরিক্রমার ইতিহাস। তা তিনি ঐতিহাসিক, খাটি ঐতিহাসিক, তিনি তো ইতিহাস-পাগলই। সত্য উদ্ঘাটনের আনন্দটুকুর স্বাদ যে তিনি গেছেন পেয়ে; অরাজী হনই বা কী করে? বরং নতুন উদ্দীপনায় দুলেই তো উঠবে তাঁর মন। তেমনটিই দুলে ছিল মন ঠিকই ইতিহাস-পাগল এই বাগল মহাশয়ের। অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে এই উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ হতে পেরে তেমনটি পরিচয়ই তো পেয়েছিলাম তাঁর অন্তঃকরণের। আর তাই-ই তো বলবো এই অনুরোধ পৌঁছনোর কালে যদিও তিনি পুরোপুরিই দৃষ্টিহীন, কলম চালনায় অক্ষম, একান্তই পরনির্ভর, তবু এই দায়িত্বকে দিলে না পাশ কাটাতে তার সেই খাটি ঐতিহাসিকের মন।

ঐতিহাসিকের কারবার যা বিগত তা নিয়েই। যা আর ফিরে পাওয়া যাবে না, যাকে আর চোখ মেলে দেখে নেওয়া যায় না, সেই অতীতকে তার স্বরূপে আজকের মানুষজনের মানস চোখের সামনেটিতে তুলে ধরে দেওয়া,—এই হলো কাজ তাঁর। তবে কথা, বিগতের সেই হারিয়ে-যাওয়া রূপটিকে ফিরে-গড়া বড় সহজও তো নয়! দিকে দিকে ছড়িয়ে-পড়া, টুক্‌রো টুক্‌রো আর এলো-মেলো তার মাল-মশলাগুলো চিনে চিনে খুঁজে নেওয়া সাদা

চোখের দৃষ্টিতে কুলোবারও নয়। তার জন্য চাই আরো সত্যদর্শনের এক অন্তর্দৃষ্টি। সে অন্তর্দৃষ্টি যোগেশচন্দ্রের চিরদিনই ছিল সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল।

জবাবে একটি কথা ছিল,—"নাম শুনে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।" তা হবার হয়তো কথাও। এই আর্ট কলেজে অধ্যাপনার অনেক আগে নিজেরই যখন সেখানে আমার অধ্যয়নের প্রায় শেষ অধ্যায়, এবং শিল্প জগতে আর শিল্পী-সমাজে প্রবেশের পথটি পেতে স্বভাবতই যখন আগ্রহী আমি, সেই তখন,—নিজের কতটুকু কৃতিত্ব জানি না, সেই অভিলষিত পথটি আমার অনেকটাই করেছিল সুগম 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ রিভিউ', (Modern Review) পত্রিকা দুটি। যোগেশচন্দ্র তখন ঐ দুটি পত্রিকার সম্পাদনা দফ্তরে। কিন্তু মাঝে বেশই কিছুদিনই কর্ম-কাণ্ডে আমার রীতিমত ভাঁটাই পড়েছিল। সৃষ্টি কার্যের ছিল না তেমনটি প্রাচুর্য, যাতে সবার মুখে নামটি আমার ঘোরা-ফেরা করে। তবুও, শেষে যখন তিনি দৃষ্টিশক্তিহীনই, তখনো পত্রিকার চিত্র প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মানুষটিকে পুরোপুরি ভুলতে পারেন নি।

যে চিঠি পৌঁছলো জবাবে, বলার প্রয়োজন হয় না, তা দৃষ্টিহীন ঐতিহাসিকের আপন হস্তাক্ষরে নয়, স্বাক্ষরটুকুই তাঁর। পরে জেনেছি সে হস্তাক্ষর নব বারাকপুর নিবাসী শ্রীকানাইলাল দত্তের। অন্ধ যোগেশচন্দ্রকে প্রতিনিয়তই হয়েছিল একটি লাঠি ব্যবহার করতে। সে হয়েছিল এই ধূলোমাটির ধরণীর পীঠে চরণ পেতে পেতে চলতে ফিরতে। কিন্তু চক্ষুহীন ঐতিহাসিকের সত্যসন্ধানের সরণিতেও চরণ বাড়াতে হ'য়ে পড়ে প্রয়োজন উপযোগী একটি যষ্টির। সেই যষ্টিই ছিলেন এই কানাই দত্ত। যোগেশচন্দ্রের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত এই আর একজন গুণীর সাথে পরিচয় ও সদ্ভাব আমার আর একটি উপুরি লাভ। আর আমার নিজেরও তো, অন্ততঃ কিছুদিনেরও মতো তাঁর দ্বিতীয় বা তৃতীয় যষ্টি হবার হয়েছিল সৌভাগ্য লাভ। সে হয়েছিল এই ইতিহাস রচনার কাজে। স্মারক গ্রন্থ প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে একটি ইতিহাসনির্ভর ভূমিকা লেখার দায়িত্বও আমার উপর বর্তেছিল। ব্রতীও তাই হতে হয়েছিল আমাকেও, ইতিমধ্যেই, তথ্যাদির সন্ধানে। কিন্তু সেই সন্ধান-পথগামী হয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করি আমি সে পথযাত্রায় আরো যেন কোন অগ্রগামীর সুস্পষ্ট সব চরণচিহ্ন। কথাটি

পরিষ্কার করতে আগে বলি—এই কাজে শিক্ষাধিকারের বার্ষিক বিবরণী-- **D. P. I's Annual Reports** গুলো হলো এক একটি অমূল্য দলিল। আরো বলেনি একটি ছোট কথা।

এই ডি, পি, আই রিপোর্টকেই সূত্র ধরে করি আমার কাজের সুরু। কিন্তু খানিক এগিয়েই, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠায় পৌঁছে লক্ষ্য করি একটু অবাক্ চোখেই, যে আগেই এ সব তথ্যের অনেকই সংগৃহীত হয়েছে আরো বা কারো হাতে। সুস্পষ্ট চিহ্ন তার পেন্সিলের দাগে, আণ্ডারলাইনে, কখনো বা পেন মার্কেও। কিন্তু কে তিনি? পরে অবশ্য বুঝতে বাকি থাকেনি আমার অগ্রগামী সেই মহাজনই এই বাগল মশায় স্বয়ং। তখনো দৃষ্টি তাঁর অটুট, নিজ হাতেরই চিহ্নিতকরণ এ-সব। কিন্তু কি কারণে? আছে তারও কিছু ছোট ইতিহাস।

আসল ইতিহাসের অংশ,—কোলকাতা কলা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠা সরকার হাতে নেবার আরো দশ বছর আগে, ১৮৫৪ সালে। এ হয়েছিল—যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও, ইঙ্গ ও বঙ্গীয় উভয় পক্ষীয় কিছু সুধীজনের সাধু প্রচেষ্টার ফলে। সেই তারিখটি গণ্য করেই বর্তমান আর্ট কলেজের স্বর্গগত অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৫৪ সালেই শতবার্ষিকী পালনে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তখনই তিনি কলেজের পুরণো ভাঁড়াড় ঝেড়ে-ঝুড়ে কিছু পুরণো ছবি, লিথোগ্রাফ, কাঠ-ক্ষোদাই কাজ ইত্যাদি খুঁজে পেতে বার করে সাজিয়ে গুছিয়েও ফেলেছিলেন। আর তিনিই তখন বাগল মশাইকে অনুরোধ করে তাঁর হাত দিয়ে সুরুও করিয়ে দেন ইতিহাস রচনা। তাতেই বাগল মহাশয়ের এই তথ্যসন্ধানী অভিযান, এই সব রিপোর্টের অন্দরে তল্লাসী হানা, তাতে দাগ টানা, চিহ্নিত করন, চলে তথ্যের চয়ন তাঁর লেখনীকে খোরাক যোগাতে।

কিন্তু কোনো কারণে শতবার্ষিকী পালন সম্ভব হলো না তখন। তাই দশ বছর পরে সেই সরকারী হাতে চলে যাবার দিনটি হিসেবে রেখে ১৯৬৪ পর্যন্ত শতবার্ষিকী থাকে মুলতবী। তার ফলে, এদিকে বাগল মহাশয়ের এই ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব যদি বা তখন সমাপ্তপ্রায়, হলো অগত্যাই নীরব তাঁর লেখনী এই মুলতবীর ফলে। তাতে না হলো প্রাপ্তি তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণার অংশ মাত্র-ও, না পেলেন তৃপ্তির স্বাদ তা সম্পাদনার, যদিও দায়ী তার

জন্য শুধু সরকারই। পরে সংক্ষেপে আর বাংলায় তা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ পেলেও নিরর্থকই রইলো পড়ে মূলের সেই আংশিক ইংরেজী ইতিহাস অসম্পূর্ণ রূপ নিয়ে। অতএব, ১৯৬৪ র জন্য আমার এ অনুরোধ তারই জেরটানা সেই অপূর্ণেরই পূর্ণতা সাধনের পুনঃ প্রস্তাব।

এদিকে কালের বিধানে সেই দশটি বছরের ব্যবধানে ইতিহাসের পাতায় যোগ হোল অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিয়োগ এবং যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তির লোপ। রমেন্দ্রনাথ পেলেনই না সুযোগ শতবার্ষিকী পালনের, সব কিছুরই ওপরে তখন তিনি; আর যোগেশচন্দ্ররও, ঐ চোখ ক্ষোয়া যাওয়ার ক্ষোভটুকু ছাড়া দেখিনি কোনই অভিযোগ তাঁর প্রশস্ত অন্তরে। সব কিছু ধুয়ে মুছে নির্মল প্রশান্ত মনেই আবার হলেন উদ্যোগী এই ইতিহাস রচনায়।

এই শতবার্ষিকী প্রকাশনীকে সার্থক করার মূল্যবান আরো কিছু উপাদান ছিল হাতে। আর প্রথমে তা অঙ্গীভূত হবারই ছিল যদি বা কথা, শেষ অবধি সে স্মারক গ্রন্থে স্থান হলো না তার। ছিল থাকার কথা—(ক) প্রাক্তন সকল অধ্যক্ষের আর বিশিষ্ট শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী; (খ) শতবর্ষের বিশিষ্ট শতজন প্রাক্তন ছাত্রের পরিচয়-নামা—"Hundred in hundred years", (গ) অতীতের শিল্প-আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও শিল্পসংস্থার, আর কিছু আর্ট বিষয়ক পত্র-পত্রিকার কিছু সংগৃহীত বিবরণ; এবং (ঘ) আরো কিছু দুস্প্রাপ্য ছবি। এ ছাড়া তো ছিলই এই লেখকের লেখা সুদীর্ঘ ভূমিকা,—Introduction—(A Survey of its Hundred Years' Activities) এই শেষেরটি অবশেষে ১৯৬৯ সালের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ পায় কায়ক্লেশে, বিনা ছবিতে, দুটি পর্যায়ে। ভারত-শিল্পের ধারা করবেন যাঁরা অনুধাবন, জানবেনই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য যুগে ভাস্কর্য বলতে সবই ছিল প্রায় দেবমূর্তি রূপায়ণ। সে সব মূর্তির পাশ ঘিরে থাকতো কিছু পার্শ্বদেবতা, (accessory figures.)। মূল মূর্তিকে অলঙ্কৃত আর মহিমান্বিত করতেই তাঁদের সেখানে স্থান আর সারা কম্পোজিশনটিকে (composition) পরিপূর্ণ রূপ দিতে। নয়তো এঁদের বাদ দিয়ে একক মূর্তি শুধুই অঙ্গহীন। তেমনি, স্মারক গ্রন্থের প্রধান প্রবন্ধ যোগেশচন্দ্রের মূল সেই ইতিহাসকে মহিমান্বিত করার সুযোগ যদি থাকতো উল্লিখিত ঐ বিষয় ক'টির তবে স্মারক গ্রন্থও পেয়ে যেতো তার সার্থক পরিপূর্ণ রূপ।

চির শ্রদ্ধাভাজন যোগেশচন্দ্র তাঁর লেখা ইতিহাসে কয়েকবার আমার উল্লেখ করেছেন। একবার লিখেছেন—আমি এখন দৃষ্টিহীন, শেষাংশের তথ্য সংগ্রহে আমার বন্ধু শ্রীঅমুক আমাকে সাহায্য করেছেন তার যোগান দিয়ে। আমার অগ্রজতুল্য যোগেশচন্দ্র অনুজের উপর স্নেহবশতই রেখে গেছেন এই উদার স্বীকৃতি। এ তাঁর উদার হৃদয়েরই এক পরিচিতি।

আগেই বলেছি, আমি আমার সেই ভূমিকার জন্য নেমেছিলাম আগে হতেই তথ্য আহরণে। কিছু কিছু নোতুন উপাদানের সন্ধান মিলছিল-ও। তখনকার বিশিষ্ট শিল্পী অন্নদা বাগচী মশায়ের চরিত কথা 'অন্নদা জীবনী'র সন্ধান আমি পেয়ে দিয়েছিলাম বাগল মহাশয়কে, দিয়েছিলাম তাঁকে দুই শিল্প পত্রিকার বিষয়—শিল্প ও সাহিত্য আর একেবারে আদি 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলির কথা।' দিতে পেরেছিলাম এনে এমন আরো কিছু-কিছু তথ্য, আর দিয়ে হয়েছিলাম তৃপ্ত। পরেও আমি যে-সব নোট (note) নিয়েছি তার একটি কপি নিজের জন্য রেখে অপরটি দিয়েছি ভুলে তাঁর হাতে। কিন্তু আমার এ তথ্য অন্বেষণে প্রায়ই দিতেন বাগল মশায় এমন সব ইঙ্গিত, উপদেশ যারই বলে সহজেই হয়ে যেতো কার্য সমাধা। হতোও লাঘব শ্রমের, সময়ের। কোথায় গেলে মিলতে পারে আরো তথ্য, আরো উপাদান তারো উপদেশ দান ছিল যথাযথই। প্রতিটি ঘটনার প্রতিটি খুঁটি-নাটি খতিয়ে খতিয়ে তাঁর দেখাই চাই; দেখা চাই বর্ণনার সাথে সত্য ঘটনা মিলছে কতটা অথবা মেলেনা, মেলে কি না তার সাল তারিখ, সবেতেই ছিল সূক্ষ্ম নিরিখ তাঁর, আর প্রায় অভ্রান্তই বিচার। এই 'প্রায়' কথাটি প্রয়োগের কারণ, আমার ধারণায় কোন ঐতিহাসিকেরই সত্য নির্ণয়ণ একেবারে 'অভ্রান্ত' বলা যায় না, যেমন পারিনা বলতে কোন শিল্পসৃষ্টিই গেছে পৌঁছে সার্থকতার শেষ প্রান্তটিতে বা কোন সাধনাই গেছে পেয়ে পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ রূপে। সত্যের অন্বেষণে কোথাও কোন সীমানা মেনে নিয়ে তাতে পূর্ণচ্ছেদ টানা হ'লে তা হবে সত্যেরই অবমাননা। সে-ভাবে সত্যকে পেয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, নয়কো সম্ভব তা মহা-মনীষীর, ঋষি বা মহর্ষির। নয় অতএব ঐতিহাসিকেরও। এই মহাসত্যটি মেনে নিয়েও ঐতিহাসিকের মর্যাদার নেই কোন হানি, মেনে নিয়েই হতে পারবে স্বচ্ছন্দে গুণবিচার অথবা তাঁর মূল্যায়ণ। এবং সে মূল্যায়ণে বলতে

পারি ঐতিহাসিকদের প্রথম সারিতেই হতে পারবে যোগেশচন্দ্রের স্থান নিরূপণ। অবাক হয়েছি তাঁর বিদগ্ধতায়, হয়েছি চমৎকৃত তাঁর স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতায়, বিচার দক্ষতায়। তাঁর লেখা সে ইতিহাসে যা কিছু প্রশংসার তার পূর্ণ শত ভাগই তাঁর, আর যদিও থাকে কিছু ভুল-ত্রুটি, কিছু বা বিচ্যুতি, তবে তার সব দায়িত্বই আমার।

ঐতিহাসিকের জানা ভারত-ইতিহাস তেমন পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। উপাদানে অপ্রাচুর্যে মাঝে মাঝেই আবছা সে রূপ কখনো বা মিলিয়েই গেছে যেন ঘন কুয়াসার আবরণে। মোগল শাসন-শক্তির ক্রম অবসন্নতা আর প্রতিষ্ঠা লাভের কার্যে ইংরেজ শক্তির ধীর মন্থর অগ্রগতি, এর মধ্যের কালটি ইতিহাসের প্রায় শেষ অধ্যায় বর্তমান হতে বেশি দূরে নয়। তবু সে কালও নয় মোটে আলোকিত, দুই প্রভাবের প্রভাহীনতায় বেশ কিছু ঘোলাটে কালোই। আমাদের অতি-অতীতকে খুঁজে পেতে যতটা আঁধার ঠেলে হয়েছে এগুতে ঐতিহাসিককে, এই নিকট অতীত immediate past কেও স্বরূপে তার দেখে নিতে কিছু কম আঁধারের ফাঁড়ি হাতড়াতে হয়নি। সেদিনকার ইতিহাসের সেই আঁধার-পথ-বিচরণের চরণ-চিহ্ন চিনে করেছিলেন যাঁরা পথ-চারণ, যুগের পরিচয় করলেন স্বচ্ছতর সরিয়ে দিয়ে তার কুহেলীর গুণ্ঠন, যোগেশচন্দ্র ছিলেন এক মহাজন সেই অভিযাত্রী দলটির।

আজ খোঁজ মেলে এই নিকট অতীতেরই অন্ধকারে ইতিহাস আমাদের চুপিসারে এক নতুন পথে মোড় ফেরে। আর সেই মোড় ফেরার তেমাথাটি পায় সে খুঁজে পূব গগণের আলো-মাখা এই বঙ্গভূমেই। জনমন জেগে উঠে নব চেতনায় করেছিল সূচনা এই নতুন পথের ইতিহাস রচনার। আবার দৃষ্টিকে আরো একটু মেজে নিয়ে ধরি যখন, তখন আরো মেলে খোঁজ সেদিনের মুমূর্ষু সেই সমাজদেহে এনে দিয়ে প্রাণের স্পন্দন করলেন পত্তন যাঁরা নবযুগের ও নবজীবনের তাদের পুরোভাগে রয়েছে উজ্জ্বল যে রূপটি সে রাজা রামমোহনের। এবং সেই রামমোহনের যাঁর মতো বিরাট প্রতিভা কেবল ভারতে নয়, বিরল সারা বিশ্বের ইতিহাসে। কী ধর্ম. কী সমাজ-সংস্কার, কী শিক্ষা, কী স্বদেশচিন্তা, এমন কি ভাষা ও সঙ্গীতেও সংস্কৃতি এনে খুলে তিনি দিয়েছিলেন দ্বার বহুমুখী গতি-প্রগতির। কিন্তু তবুও যে বলতে হয়, এতোর ভিতরও রামমোহনের সেই সর্বস্তরের সংস্কৃতি আন্দোলনেরও মেলেনা কোন

সন্ধান সে দিনের সে ক্লিষ্ট-কলেবর শিল্প-সংস্কৃতির কোন পুষ্টি সাধনের, তার চেতনা দানের। বরং সে চেতনা দেখা গেছে অনেক পরে, মনীষী হ্যাভল আর এই সেদিন যার শতবার্ষিকী পালিত হলো সেই অবনীন্দ্রনাথের যৌথ উদ্যমে।

শিল্পের এই অবসন্নতার, প্রাণহীণতার কারণ ও কাহিনীর রয়েছে সন্ধান ইতিহাসেই। বাদশাহী শাসন যখন হতমান, রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতায় মনোজীবনে ঘট্‌লো জড়তা আর অস্থিরতা। তাতে যে পরিবেশ উদ্ভুত হলো তা পুরোপুরিই পরিপন্থী শিল্পচিন্তার। ফলে ক্রমেই শিল্পরুচি হ'ল নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। শুধু দিকে দিকে ছড়িয়ে-পড়া ছোট ছোট শিল্প-গোষ্ঠীর চেষ্টায় যে টুক তার ধিকি ধিকি ধমনী-প্রবাহ রইল তারই মাঝে কোথাও বা যেমন সুদূর হিমালয়ের কোলে কুলুতে কি কাংড়ায় যেন শেষবারের মতই মিলেছিল কিছু তার সজীবতার সাড়া। কিন্তু নবসংস্কৃতির পীঠভূমি এই বঙ্গভূমে নিথর তার প্রাণস্পন্দন ইতিমধ্যেই। টিকে থাকে শুধু লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ঐ পটুয়ার পাট। আসলে শিল্পসংস্কৃতি বলতে যা, তা তখন প্রায় আপন ঐতিহ্যহারা, শূণ্য মার্গেই তার ঘোরা-ফেরা। আর সেই শূন্যতার ফাঁকটুকু পেয়ে ঘট্‌লো অবাধ অনুপ্রবেশ ইংরেজের প্রভাবে পশ্চিমী শিল্পচিন্তার। তারই আওতায় তখন আবার সুরু নতুন করেই শিল্পচর্চা পুরোপুরি পশ্চিমের অনুসরণে অথবা অনুকরণে, আর আপন অতীতের পরিপূর্ণ বিস্মরণে। তবু এই নতুন শিল্প-আন্দোলন কিন্তু অস্বীকারের নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়েও ভারতীয় ইতিহাসেরই তা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'ল।

বিদেশী সংস্পর্শে গড়ে-ওঠা এ ধারার অনুপ্রবেশ ছড়িয়েছিল সারাটি দেশ জুড়েই। তবে তার বিশেষ এক কেন্দ্রস্থল এই শহর কোলকাতা আর কেন্দ্রবিন্দুটি এই শিল্প বিদ্যায়তন,—আর্ট স্কুল। এখানেই আবার তার নবচেতনার উন্মীলন, তার আবর্তন বা বিবর্তন এবং পরিবর্তনই। যোগেশচন্দ্র করলেন তারই ইতিহাস উন্মোচন। কিন্তু যোগেশচন্দ্র রচিত এই শিল্প বিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষত্ব এই যে একে ঘিরেই রয়েছে জড়িয়ে সে যুগের শিল্পধারার যা কিছু অনালোচিত ইতিবৃত্ত, অজ্ঞাত যা সাধারণে। তাই সে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ-কাহিনী সে যুগের শিল্পচিন্তার হ'ল প্রথম ও প্রামানিক ইতিহাস। বেশ আয়াসেই যোগেশচন্দ্র করছেন তা সম্পন্ন।

আমার চোখে যোগেশচন্দ্র

কালিদাস কাঞ্জিলাল

সেটা ছিল ১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়েছে কিনা সঠিক মনে নেই। তবে ঐ সালেই বর্মন ষ্ট্রীটের 'দেশ' পত্রিকার আপিসে যোগেশচন্দ্র বাগলকে আমি সর্বপ্রথম দেখি। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা 'প্রার্থনা' কবিতাটি যে দিন 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বের হয়, তার দিন দুই পরে কবি বিজয়লালকে একটা কবিতার খাতা দিতে গিয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গেও আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়।

দীর্ঘ চৌত্রিশটি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু সেই দিনের স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান।

বিজয়লাল ও যোগেশচন্দ্রের টেবিল ছিল প্রায় পাশাপাশি। বিজয়লাল আমার লেখার প্রশংসা করে যোগেশবাবুকে আমার কবিতার খাতা থেকে একটা কবিতা পড়ে শোনালেন। যোগেশবাবু কবিতা শুনে মহা খুশী। তখনই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ জমে গেল। এর আগেই 'প্রবাসী'তে এবং Modern Reviewতে যোগেশচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। সুতরাং ওঁর সঙ্গে আলাপ করে বেশ তৃপ্তি বোধ করেছিলাম। অধিকন্তু, যোগেশচন্দ্রের বিনয়মিশ্রিত স্মিত কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তাও আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। তারপর একটানা পনের বছর যাবৎ ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কারণ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কার্যসূত্রে আমাকে বাংলাদেশের বাইরেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়েছিল।

জীবনের যাত্রাপথে ঘুরপাক খেতে খেতে ১৯৫৬ সালে ঘটনাচক্রে নব বারাকপুরে এসে বাসা বাঁধি। যোগেশচন্দ্রও খ্রীঃ ১৯৫৭ থেকেই এখানে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ওঁকে প্রতিবেশী পাওয়া গেল। ১৯৬০-এ (জুনমাসে) যোগেশচন্দ্রের উদ্যোগে নব বারাকপুরে একটা সাহিত্য-চক্র গড়ে উঠল। এই সাহিত্য-চক্রের নাম 'সাহিত্যিকা'। যোগেশচন্দ্র সাহিত্যিকার

সর্বাধ্যক্ষ হলেন। সাহিত্যিকাকে অবলম্বন করে এই জনবহুল শহরতলি এলাকায় শুধু সাহিত্যের অনুশীলন বা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হল না, একটা সম্পূর্ণ নূতন লেখক-গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। কেউ কবিতায়, কেউ প্রবন্ধে, কেউ গল্পে, কেউ বা রসরচনায় হাতে-খড়ি দিয়ে হাত পাকালেন সাহিত্যিকার ছত্রচ্ছায়ায় বসে।

১৯৭২ সালের ৬ই জানুয়ারী পরলোক গমনের দিন পর্যন্ত যোগেশচন্দ্র সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। জীবনের শেষ বারোটি বছর সাহিত্যিকার কাজে প্রায় প্রতি দিনই বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করতে হত যোগেষচন্দ্রকে। সাহিত্যিকা হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রাণের প্রিয় বস্তু, তাঁর জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ যোগেশচন্দ্র ও তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি কিংবা তাঁর আদর্শবাদ সাহিত্যিকার ভেতর দিয়ে অনেকখানি রূপায়িত হয়েছে, এ কথা বলা চলে। যোগেশচন্দ্রের সত্তা, যোগেশচন্দ্রের মানসিকতা শুধু তার বিভিন্ন রচনাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমার বিচারে, 'সাহিত্যিকা'ও যোগেশচন্দ্রের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা।

এই উদ্বাস্তু সমবায় উপনিবেশ নব বারাকপুরে তিনি যখন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে এলেন, তখনই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। পরে একবারেই অন্ধ হলেন। সেই অন্ধ অবস্থায় এখানেও তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

যোগেশচন্দ্র জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতার অধিকারী ছিলেন। প্রায় পনের বছর তাঁর বাসস্থান থেকে কয়েক গজ দূরে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। শুধু সাহিত্যিকার সূত্রে নয়, এখানকার নানা ঘটনা ও নানা কর্মকাণ্ডের সূত্রে তিনিও আমার কাছে এসেছেন, আমিও তার কাছে গিয়েছি যখন—তখন। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির ওপর তাঁর সঙ্গে আমার অসংকোচে মত বিনিময় করার সুযোগ হয়েছে হামেসাই। তিনি বয়সে আর জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক উপরে হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা বন্ধুর সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। ভাই-এ ভাই-এ, বন্ধুতে বন্ধুতে যেমন খোলাখুলি আলোচনা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়, তাঁর সঙ্গেও আমার সেই রকম হয়েছে। ফলে, তাঁর চারিত্র বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের অর্গল আমার কাছে উপযুক্ত হয়ে গেছে বারংবার।

তাঁর যে সব বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে সেগুলির কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করি। যোগেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর মতো অকপট দেশপ্রেমিকও জীবনে আমি কম দেখেছি। এমন ভণ্ডামির লেশশূন্য সরল মানুষ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। কার্যোদ্ধারের জন্যে কাউকে তোষামোদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপ্রিয় সত্য কথনেও তিনি কখনও পিছপাও হন নি।

ছাত্রজীবনে তো বটেই, কর্ম জীবনেও তিনি ছাত্রের মতই পড়াশুনা করেছেন। তিনি শুধু একজন অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন না, একজন অতুলনীয় ধীশক্তিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান সমাজসেবকও ছিলেন। কর্মী হিসাবেও তাঁর স্থান ছিল অতি ঊর্ধ্বে। ইতিহাস-চর্চাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান পেশা, প্রধান নেশাও বটে। শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের তথা সারা বিশ্বের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর নিখুঁত বিবরণ দিতে তাঁর মোটেই ভাবনা-চিন্তা করতে হত না। সব ক্ষেত্রেই সাল-তারিখ তিনি নির্ভুল ভাবে বলতে পারতেন।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহীও ছিলেন বিলক্ষণ। দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হলে তাঁকে দুঃখ পেতে দেখেছি। তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। তাই, অনেক সময় চাঁদা তুলেও দুঃস্থ পড়ুয়াদের সাহায্য করতেন। কাউকে বই কিনে দিয়েছেন, কাউকে স্কুলের বেতনাদি দিয়েছেন।

আগেই বলেছি, যোগেশচন্দ্র স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। বিবেকের নির্দেশই ছিল তাঁর কাছে বড়। কে সন্তুষ্ট হবে, কে অসন্তুষ্ট হবে—তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি না হয় একলাই থাকব, তবু কাউকে তোয়াজ-তোষামোদ করতে পারব না।'

যোগেশচন্দ্র সব রকম কুসংস্কারমুক্ত বিলক্ষণ যুক্তিবাদী ছিলেন—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের সনাতন রীতি-নীতির ওপরও তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। আশ্চর্য এই, তিনি বিলক্ষণ আধুনিক ও প্রগতিবাদী হওয়া সত্বেও কোনও কোনও বিষয়ে যেন সেকেলে লোকের মতই ব্যবহার করতেন। বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝানোর জন্যে একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যোগেশচন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়। কিন্তু যেহেতু আমি

ব্রাহ্মণ, তিনি দেখা হলেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলতেন, 'প্রণাম'। 'নমস্কার' নয়—একেবারে 'প্রণাম'। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, কিংবা গুরুভক্তির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন যেন বিদ্যাসাগরী যুগের লোক। সুতরাং দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তিটাও যে বিদ্যাসাগরী যুগের মত হবে—তাতে আর আশ্চর্য কী! তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনাও প্রাচীন মতে হ'ত। অথচ যোগেশচন্দ্রের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি একদম ছিল না। তিনি গীতার উদার কর্মযোগের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। গীতা-পাঠ শুনতে খুব ভালবাসতেন তিনি। এদিকে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীও ছিলেন যোগেশচন্দ্র। অহিংসায় পূর্ণ আস্থা রাখতেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলনের জন্য গর্ব বোধ করতেন। সে তাঁর লেখা বই পড়লেও বোঝা যায়।

কোনও কোনও বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার দারুণ মতভেদ হয়েছে এক এক দিন। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক করেছি দুজনে। কিন্তু আশ্চর্য এই, তিনি কনিষ্ঠের ঔদ্ধত্য নিজ গুণে ক্ষমা করেছেন। বিন্দুমাত্র ক্রোধ, আক্রোশ বা অভিমান মনের কোনে জমিয়ে রাখেন নি। ক্ষমাশীলতা, ঔদার্য আর বন্ধু-বাৎসল্য তাঁর চরিত্রে অনুপম মাধুর্য দান করেছিল।

গবেষণামূলক রচনার জন্যে মূল্যবান মাল-মশলা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে বরাবরই অনেক পড়াশুনো করতে হত। অথচ দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে যে-সব পুষ্টিকর খাদ্যাদি খাওয়া দরকার, তা তাঁর জোটেনি। ফলে অকালেই তিনি অন্ধ হন। শেষ জীবনে সরকারি বৃত্তি যা পেতেন, তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় তা এতই কম ছিল যে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।

অন্ধ হয়ে জীবনের শেষ দশ বারো বছর তো তিনি স্বাভাবিক পূর্ণ কর্ম-শক্তি হারিয়েই বেঁচেছিলেন। তার জীবনের প্রধান দুটো কাজই (লেখা এবং পড়া) দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। তবু অনুলেখকের সাহায্যে এখানে বাসকালে যা-যা রচনা করে গেছেন, তা-ও অমূল্য সম্পদ।

"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা"র নূতন সংস্করণ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে ছাপা হয়ে যখন বের হল, আমি যোগেশবাবুকে বলেছিলাম, "বইখানার কপি রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্যে রাজ্য সরকারের দপ্তরে পাঠানো হোক। এই বই রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য"। উত্তরে যোগেশচন্দ্র

একটু হেসে বলেন, "বই পাঠিয়ে পুরস্কারের জন্যে তদ্বির আমি করতে পারব না। সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি কিছু করেন, করুন। পুরস্কারের জন্যে আমি লালায়িত নই"।

আমার প্রিয় ছাত্রী সিপ্রার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বড় ছেলে দীপুর বিয়ের ঘটকালি আমি করেছিলাম। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে যে জ্ঞান আমি লাভ করেছি, তা অমূল্য। এই উপলক্ষে যোগেশচন্দ্রের যে মহত্ত্ব, ঔদার্য্য আর সহিষ্ণুতার পরিচয় আমি পেয়েছি, তা ভোলবার নয়। বিয়ের কথাবার্তা কিছু দূর এগোতেই তিনি স্পষ্ট বললেন, "বিয়েতে পণ আমি নেব না। মেয়ের বাবাকে বলবেন বিনা পণেই আমি ছেলের বিয়ে দেব। আমি চিরদিন পণ প্রথার বিরুদ্ধে বলে এসেছি। এখন আমি নিজের ছেলের বিয়েতে পণ নেব?—না, তা হতে পারে না।" এমন ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে কাজের মিল আজকাল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। সিপ্রার বাবার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। পাত্র পক্ষ পণ চাইলে পণ দিতে তিনি পারতেন। কিন্তু যোগেশচন্দ্র আদর্শ ঠিক রাখবার জন্য নিজে অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের সমস্ত খরচ তিনি বহন করলেন। এরই নাম মনুষ্যত্ব। কথায় ও কাজে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়—এ রকম লোক আজকাল দেশে কয় জন পাওয়া যাবে?

নব বারাকপুরের যে-সব লেখক যোগেশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় লেখায় হাত পাকিয়েছেন, বিশিষ্ট গুণীজন বা পত্র-পত্রিকাদির সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা যোগেশচন্দ্রের ঋণ কখনও ভুলবেন,—এ রকম কোনও আশঙ্কা আমার মনে নেই।

গবেষক-লেখক হিসাবে যোগেশচন্দ্র সমগ্র বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজে শুধু পরিচিতই নন, শ্রদ্ধাভাজনও। নির্বিচারে সকলের সঙ্গেই তিনি মিশতেন, আলাপ করতেন, এবং প্রয়োজন বোধে অনেককে সৎ পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। নব বারাকপুরের আপামর জনসাধারণ তাঁকে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের জন্যে একান্ত আপনার জন মনে করেছে এবং এটুকু বুঝেছে যে কথা-বার্তায়, পোশাকে-পরিচ্ছদে অতি সাধারণের মত হলেও তিনি অসাধারণ।

পিতৃদেবের সঙ্গে যাঁদের দেখেছি তাঁদের কয়েকজন

প্রশান্তকুমার বাগল

"যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি"—মনীষীদের এই কথাটি আজকাল আর কেউ পালন করতে চায় না। একটু বয়স হলেই পড়াশুনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার একটা আগ্রহ সচরাচর সংসার জীবনে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নতুন কিছু জানা বা শেখার জন্য কোন বয়সের তারতম্য নেই। এর প্রমাণ পেয়েছি আমার পিতৃদেবের ক্ষেত্রে।

আমরা নব বারাকপুরে আসার পূর্বে আমরা হরি সাহার বাজারের উপরে দোতলায় দু'টি ঘর ভাড়া করে থাকতাম। একটি ঘর ছিল আমাদের পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট, অপরটি পারিবারিক অন্যান্য কাজের জন্য। 'এল' ব্লকে যে ঘরটি ছিল সেখানেই বাবা পড়াশুনা করতেন। আমরা ভাই-বোনেরাও পড়তাম ঐ ঘরেই। ঘরের মধ্যে কোন আসবাব-পত্র ছিল না। বাবার পড়াশুনার জন্য একটি টেবিল ও চেয়ার মাত্র, আমরা মাদুর পেতে পড়তে বসতাম। ঐ ঘরেই ছিল বই এর পাহাড়। বাবার পড়াশুনার জন্য ছিল বিভিন্ন বিষয়ের বহু বিখ্যাত ও দুষ্প্রাপ্য বই। বই রাখার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। ফলে মেঝেতেই সাজিয়ে রাখা হত বই এর স্তূপ। এত বই অনেকের বিস্ময় উদ্রেক করতো। ঐ ঘরেই আবার বসতো বাবা এবং তাঁর বন্ধুদের সাহিত্যের আসর। আমি তখন ছোট। পড়ার সময়টুকু ছাড়া বাকী সময় খেলাধূলায় কাটিয়ে দিতাম। বাবাকে দেখতাম সব সময় বই নিয়ে বসে থাকতে। অফিস থেকে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বাবা নিজের পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পড়ার প্রতি বাবার আগ্রহ ছিল অসীম। বই পড়া একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর। না পড়ে, না শিখে কখনই মৌলিক রচনা লেখা সম্ভব নয়। মার মুখে শুনেছি হরিঘোষ ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে আমরা থাকতাম সেখানে রাত ১১ টার পর আলো

থাকতো না। বাবা বাড়ীর পাশেই একটা গ্যাস লাইটে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনার প্রতি এমনি ছিল তাঁর একাগ্রতা। বাবা নিজেই আমাদের বলতেন "পড়, জান, তারপর লেখ।" ৩০ পাতা পড়ে ৩ পাতা লেখা সম্ভব কিন্তু ৩ পাতা পড়ে ৩০ পাতা লেখা সারহীন।"

হরি সাহার বাজারের উপরে যে দু'টি-ঘরে আমরা থাকতাম সেখানে দেখেছি বাবার কাছে বহু লোক আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে করতেন আলোচনা। অনেকের কথা আমার বেশ মনে আছে। কবি কৃষ্ণধন দে বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণ জ্যাঠার কাছে আমি পেয়েছি প্রচুর স্নেহ ও ভালবাসা। তিনি আমাদের বাড়ীতে আসার সময় প্রায়ই বাজার করে নিয়ে আসতেন। বড় বড় মাছ আমাদের বাড়ীতে আনতে অনেকদিন দেখেছি তাকে। খুব খেতে পারতেন তিনি। আমরা অবাক হয়ে যেতাম। বেশি বয়সেও তিনি ৩০/৪০ টা লুচি খেতে কোন কষ্ট বোধ করতেন না। বাবা কেষ্ট জ্যাঠার জন্য আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর চলতো সাহিত্য-আলোচনা। কেষ্ট জ্যাঠা সঙ্গে করে কবিতার বই নিয়ে আসতেন এবং অপ্রকাশিত কবিতাও নিয়ে আসতেন। আবৃত্তি করে কবিতা পাঠ করতেন। আমি উপভোগ করতাম। 'ব্যথার পরাগ' তাঁর নিজস্ব কবিতাগ্রন্থ। বেশ মনে পড়ে, তিনি বাবাকে এই গ্রন্থ থেকে বহু কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন। বাবাকে মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি "আমি কাষ্ঠ সাহিত্যিক কিন্তু আপনার কবিতা আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে।" কেষ্ট জ্যাঠার কবিতা আমি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতাম। বহু কবিতা তিনি লিখে গেছেন। কবিতা ছাড়াও, গল্প ও নাটক তিনি লিখতেন। তাঁর স্বরচিত একটি কবিতার অংশ স্মৃতি থেকে একটু উদ্ধৃত করছি :—

খোল বধূ, দ্বার খোল।
বিবশা ধরণী উতলা রজনী
মহুয়া ফুটেছে বনে—
আজিকার রাতে ঘুমায়োনা বধূ
পুরাতন গহ কোনে।……
……………… …
সাড়া দাও একবার—
চাঁপার গন্ধ হয়েছে নিবিড়,
খোল বধূ, খোল দ্বার।

বাংলা সাহিত্যের মরমী ও দরদী কবি কৃষ্ণধন দে আর ইহলোকে নেই। গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই অন্যতম নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী চিরবিদায় নিয়েছেন।

বাবার সঙ্গে যাঁদের দেখেছি সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যক রামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। রামপদ জ্যাঠাও আমাদের স্নেহ ও ভালবাসা দিয়েছেন প্রচুর। রামপদ জ্যাঠা ছিলেন ভ্রমণ-রসিক। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক বইগুলি পাঠক সমাজে আজও সমাদৃত। কোথাও ভ্রমণ করেই বাবার কাছে চলে আসতেন। আর শুরু হয়ে যেতো গল্প। আমিও শুনতাম ওদের গল্প। অত্যন্ত ভাল লাগতো। বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের প্রসঙ্গ তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করতেন তিনি। শুনতে খুব মজা লাগতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো কিন্তু একঘেয়ে লাগতো না। বাবা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, তিনিও সহজ ভাবে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহু ভ্রমণ-কাহিনী, উপন্যাস, গল্প তিনি লিখে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময় করেছেন। 'হিমালয় অভিযান', 'মাটির গন্ধ', 'কল্পনার রঙ' এবং সদ্য-প্রকাশিত 'সেই ঘর অন্য মন' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর সঙ্গে আমরা আলোচনা করতাম। নানা রকম গল্প বলে তিনি আমাদের আনন্দ দিতেন। রামপদ জ্যাঠা যদিও গোড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করেন নি। বাবাকে নিজের ভাইয়ের মতই মনে করতেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে বাবার সঙ্গে দেখেছি শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল মহাশয়কে। বাবার চাইতে বয়সে তিনি বড়। আমরা ভাই-বোনেরা তাঁকে জ্যাঠামণি বলেই ডাকতাম। মন্মথনাথের আলোচনাগুলি ছিল বিতর্কধর্মী। তিনি সাহিত্যসৃষ্টিগুলির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতেন। সাহিত্যের সারগর্ভ আলোচনাগুলিতে আমার আগ্রহ খুব কম হ'ত, কারণ সাহিত্যের সম্যক্ জ্ঞান তখনও হয়নি; তবুও মাঝে মাঝে আমি শ্রোতা হয়ে বসতাম। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এই মন্মথনাথ। আমি যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তিনি আমাকে সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন। বাড়ীতে এসেই আমাকে তিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলি

মুখস্থ বলতে বলতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় হওয়া যায় না।' বাবার কাছে বসে নিজে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিতেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে বাবাকে দেখেছি, তবে সুনীতিবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আসতে আমি কখনও দেখি নি। বাবার সঙ্গে সভা-সমিতিতে আমি তাকে প্রত্যক্ষ করেছি। সুনীতিকুমারের সঙ্গে বাবার কী কথাবার্তা হত তা বুঝতাম না। তবে দেখতাম দুজনেই যেন আত্মহারা হয়ে কথা কইছেন। অবাক হয়ে যেতাম। কী বলিষ্ঠ চেহারা! এত বয়স, তবু বার্ধক্যের ছাপ নেই। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ত। ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালে সুনীতিবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বাবা তখন নীলরতন সরকার হাসপাতালে শয্যাশায়ী। কথা প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু আপসোস্ করে বললেন -- 'জানেন যোগেশবাবু, আজকালকার আধুনিক লেখকগণ মাত্র একটা বই প্রকাশ করেই সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার পাবার জন্য ধরাধরি করে। অথচ আশ্চর্য, নানারকম পুরস্কার তারাই পাচ্ছেন। লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু হয়ে যায়।' বাবার সঙ্গে সুনীতিবাবুর আলোচনায় সর্বত্রই একটা মিল আমি প্রত্যক্ষ করতাম। বাবার কয়েকখানা বইয়ের ভূমিকাও তিনি লিখে দিয়েছিলেন এবং 'হিন্দুমালার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটির সমালোচনাও খবরের কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। বাবার পুস্তকাদি প্রকাশে সরকারী সাহায্য লাভ এবং এই ধরণের নানা ব্যাপারে অকৃপণ সহায়তা করেছেন নিজেই অগ্রণী হয়ে।

জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু মহাশয়কে আমাদের নব বারাকপুর বাসভবনে বাবার সঙ্গে হেয়ার স্কুলের জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। সত্যেনবাবু হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। হেয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠা তারিখ নিয়ে মতভেদ ঘটায় তিনি বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। কী গভীর আলোচনা! দুজেনেই তথ্যপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করলেন। দেড়শত বৎসর আগেকার ঘটনাগুলিকে বলে গেলেন বাবা অতি প্রাঞ্জল ভাষায়। বাবার স্মরণশক্তি শেষ বয়স পর্যন্ত এতটুকুও হ্রাস পেয়েছিল না। আমরা যারা এদের কথোপকথনের শ্রোতা ছিলাম, তাদের সকলের মনে হয়েছিল দেড়শত বৎসর পূর্বের ঘটনাগুলি যেন প্রত্যক্ষ করছি। সেই দিনটির স্মৃতি আমার কাছে আজও অটুট রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের মরমী ও দরদী কবি কৃষ্ণধন দে আর ইহলোকে নেই। গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই অন্যতম নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী চিরবিদায় নিয়েছেন।

বাবার সঙ্গে যাঁদের দেখেছি সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যক রামপদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে একজন। রামপদ জ্যাঠাও আমাদের স্নেহ ও ভালবাসা দিয়েছেন প্রচুর। রামপদ জ্যাঠা ছিলেন ভ্রমণ-রসিক। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক বইগুলি পাঠক সমাজে আজও সমাদৃত। কোথাও ভ্রমণ করেই বাবার কাছে চলে আসতেন। আর শুরু হয়ে যেতো গল্প। আমিও শুনতাম ওদের গল্প। অত্যন্ত ভাল লাগতো। বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের প্রসঙ্গ তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করতেন তিনি। শুনতে খুব মজা লাগতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো কিন্তু একঘেয়ে লাগতো না। বাবা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, তিনিও সহজ ভাবে বাবার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহু ভ্রমণ-কাহিনী, উপন্যাস, গল্প তিনি লিখে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময় করেছেন। 'হিমালয় অভিযান', 'মাটির গন্ধ', 'কল্পনার রঙ' এবং সদ্য-প্রকাশিত 'সেই ঘর অন্য মন' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর সঙ্গে আমরা আলোচনা করতাম। নানা রকম গল্প বলে তিনি আমাদের আনন্দ দিতেন। রামপদ জ্যাঠা যদিও গোড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করেন নি। বাবাকে নিজের ভাইয়ের মতই মনে করতেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে বাবার [illegible] শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল মহাশয়কে। বাবার চাইতে বয়সে তিনি [illegible] ভাই-বোনেরা তাঁকে জ্যাঠামণি বলেই ডাকতাম। মন্মথনাথের [illegible] ছিল বিতর্কধর্মী। তিনি সাহিত্যসৃষ্টিগুলির তীক্ষ্ণ সমালোচনা কর[illegible] সাহিত্যের সারগর্ভ আলোচনাগুলিতে আমার আগ্রহ খুব কম [illegible] কারণ সাহিত্যের সম্যক্ জ্ঞান তখনও হয়নি; তবুও মাঝে মা[illegible] শ্রোতা হয়ে বসতাম। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ জ্ঞানের [illegible] মন্মথনাথ। আমি যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে [illegible] সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন। বাড়ীতে এলেই [illegible]

মুখস্থ বলতে বলতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় হওয়া যায় না।' বাবার কাছে বসে নিজে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিতেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে বাবাকে দেখেছি, তবে সুনীতিবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আসতে আমি কখনও দেখি নি। বাবার সঙ্গে সভা-সমিতিতে আমি তাকে প্রত্যক্ষ করেছি। সুনীতিকুমারের সঙ্গে বাবার কী কথাবার্তা হত তা বুঝতাম না। তবে দেখতাম দুজনেই যেন আত্মহারা হয়ে কথা কইছেন। অবাক হয়ে যেতাম। কী বলিষ্ঠ চেহারা! এত বয়স, তবু বার্ধক্যের ছাপ নেই। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়ত। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালে সুনীতিবাবু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বাবা তখন নীলরতন সরকার হাসপাতালে শয্যাশায়ী। কথা প্রসঙ্গে সুনীতিবাবু আপসোস্ করে বললেন -- 'জানেন যোগেশবাবু, আজকালকার আধুনিক লেখকগণ মাত্র একটা বই প্রকাশ করেই সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার পাবার জন্য ধরাধরি করে। অথচ আশ্চর্য, নানারকম পুরস্কার তারাই পাচ্ছেন। লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু হয়ে যায়।' বাবার সঙ্গে সুনীতিবাবুর আলোচনায় সর্বত্রই একটা মিল আমি প্রত্যক্ষ করতাম। বাবার কয়েকখানা বইয়ের ভূমিকাও তিনি লিখে দিয়েছিলেন এবং 'হিন্দুমালার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটির সমালোচনাও খবরের কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। বাবার পুস্তকাদি প্রকাশে সরকারী সাহায্য লাভ এবং এই ধরণের নানা ব্যাপারে অকৃপণ সহায়তা করেছেন নিজেই অগ্রণী হয়ে।

জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু মহাশয়কে আমাদের নব ব্যারাকপুর বাসভবনে বাবার সঙ্গে হেয়ার স্কুলের জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। সত্যেনবাবু হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। [illegible] নিয়ে মতভেদ ঘটায় তিনি বাবার সঙ্গে [illegible] গভীর আলোচনা! দুজনেই [illegible] [illegible] প্রকার ঘটনাগুলিকে বলে [illegible] শেষ বয়স পর্যন্ত [illegible]

ছোটখাট মানুষ শ্রীনীরোদ সি. চৌধুরী। আকাশ-ছোঁয়া নাকি তাঁর পাণ্ডিত্য। কাগজে-কলমে বহু বিতর্কিত মানুষ। বাবার মুখে শুনেছি প্রবাসী অফিসে একই টেবিলে দু'জনে কাজ করেছেন। বিদেশ থেকে ডাফকুপার পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হন। বহু প্রসঙ্গে বাবার কাছে নীরদবাবুর কথা শুনেছি। তখন থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করার একটা কামনা আমার অন্তরে জন্মেছিল। কিন্তু নীরোদবাবু কলকাতায় থাকতেন না। ফলে, এ আশা অপূর্ণ ছিল। কয়েক বছর আগে কোন এক বিশেষ কাজে নীরোদবাবু কলকাতায় এসেছিলেন। দিল্লী থেকে প্লেনে নামলেন দমদম। সোজা নব বারাকপুরে আমাদের বাড়ীতে চলে এলেন। আমার পিতৃদেবের প্রতি তার কত গভীর প্রীতি ছিল তা এতেই বোঝা যায়। ঘড়িতে তখন দুপুর বারটা। বাবার সঙ্গে বহু আলোচনা করলেন। কলকাতার কাজ সেরে বিকেলেই আবার তিনি দিল্লী রওনা হয়ে যাবেন। আমার আশা পূর্ণ হল।

শুধু মাত্র ভারতবর্ষের নানা স্থানের শিক্ষিত ছাত্রগণই নয়, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশের ছাত্ররা ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাস জানবার জন্য বাবার শরণ হতেন। বাবা তাদের কৌতূহল সহজেই মিটিয়ে দিতেন। পূর্বেই বলেছি, বাবার স্মরণশক্তি সাধারণের মত ছিল না। কাজেই যে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য বই-এর মধ্যে প্রবেশ তার নিষ্প্রয়োজন ছিল।

আমাদের বাড়ীটা প্রায় সব সময়ই জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের আলোচনার একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরোয়া আলোচনায় বহু সাহিত্যিক মনীষীদের যাতায়াত ঘটতো আমাদের কলকাতা ও নব বারাকপুরের বাসভবনে। এঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, কালিকারঞ্জন কানুনগো, কুমারলাল দাসগুপ্ত, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বাবার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমার পিতৃদেবকে যে এই ধরণের উচ্চস্তরের মানুষেরা সত্যকারের শ্রদ্ধা-প্রীতির গ্রন্থিতে বেঁধেছিলেন তা অতি সত্য এবং তা আমাদের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।

যোগেশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্যিকা'

(নববারাকপুর)

জন্মকথা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৫০ সনে ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমা এলাকায় শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'নববারাকপুর' নামে একটি নূতন জনপদের পত্তন হয়। এখানে ক্রমশঃ বহু শিক্ষিত, সুধী, সজ্জন ব্যক্তি বসতি স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যরসিকও অনেকে আসেন। 'সাহিত্যিকা' প্রতিষ্ঠার দুই এক বৎসর পূর্বে এই জনপদবাসী সাহিত্যসেবীদের কাহারও মনে একটি সাহিত্যালোচনা কেন্দ্র স্থাপনের কথা উদিত হয়। স্থানীয় "নববোধন সেবা ও সাংস্কৃতিক সংঙ্ঘে"র তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যে পর পর দুইটি সভা আহ্বান করেন। প্রথম সভায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সভায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী কবিবর মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহার পর এইরূপ সভার অধিবেশন নানা কারণে আর হইয়া উঠে নাই। নব বারাকপুরে আরও দুই একটি সাহিত্য-সভার উদ্যোগ হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাহারও অবলুপ্তি ঘটে।

ইহার পর স্থানীয় সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণকে লইয়া একটি সাহিত্য-সভা গঠনের প্রয়াস স্তিমিত না হইয়া বরং ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল একদিন স্বগৃহে বসিয়া নব বারাকপুরের অধিবাসী নাট্যকার শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট এইরূপ একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়-তার কথা উত্থাপন করেন এবং উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে সার্থক আলোচনা হয়। নরেশবাবু তাঁহার বাড়ীতেই প্রথম সাহিত্যসভা সাগ্রহে আহ্বান করেন। এইরূপ একটি সভানুষ্ঠান করিতে হইলে প্রাথমিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। এই ভার স্বেচ্ছায় লন শ্রীবিমলকৃষ্ণ দেব। "বন্দে মাতরম্"-এর ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের জন্ম মাস আষাঢ়। এই মাসেরই প্রথম রবিবার ৫ই আষাঢ়, ১৩৬৭ দিবসে নরেশবাবুর বাসভবনে সভার অধিবেশন করা স্থিরীকৃত হয়।

অধিবেশনে যোগেশচন্দ্র বাগল সভাপতিত্ব করেন। সভায় সভাপতি ও আহ্বায়ক বাদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। কালিদাস কাঞ্জিলাল, কৃতান্তনাথ বাগচী (কলিকাতা), নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী দাস, পরেশচন্দ্র ধর, কানাইলাল দত্ত এবং বিমলকৃষ্ণ দেব।

প্রারম্ভে সভাপতি এই ধরণের একটি সাহিত্য সভার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। কালিদাস কাঞ্জিলাল ও বিনোদবিহারী দাস ইহার সমর্থনে কিছু বলেন। নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'মেঘদূতের জন্ম কথা' নাটকের প্রথম অঙ্ক, কালিদাস কাঞ্জিলাল ও কৃতান্তনাথ বাগচীর কবিতা পাঠ এবং শ্রীমতী পুতুল চক্রবর্তী ও কৃতান্তনাথ বাগচীর সংগীত প্রভৃতি দ্বারা সভার কার্য নিষ্পন্ন হয়। নিজ ভাষণে এদিনকার সভাপতি এই সভার নাম দেন 'সাহিত্যিকা' এবং উপস্থিত সকলেই এই নামে সম্মতি প্রদান করেন। তিনি এই অধিবেশন এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অধিবেশনে সাহিত্যিকার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পরে বরাবর অনুসৃত হইয়াছে; তবে মাঝে মাঝে ইহার কতকটা সংশোধন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন অধিবেশনে কিছু কিছু নিয়মও ধার্য করিতে হয়। সাহিত্যিকার ঐতিহ্য এই সব নিয়মাবলীর উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা অলিখিত 'গঠনতন্ত্র' বলিতে পারি। প্রথম অধিবেশন হইতে সভাপতি যোগেশচন্দ্র বাগল সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষরূপে আখ্যাত হইয়া আমৃত্যু এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

প্রথম অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ সাহিত্যিকার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করেন। পরবর্তী কোন কোন অধিবেশনে ইহা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম ও সপ্তম অধিবেশনে বর্ণিত উদ্দেশ্য এইরূপ :

"সাহিত্যিকা সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যানুরাগী সুধীজনের একটি মিলন কেন্দ্র। ··কবিতা-আবৃত্তি, রচনা পাঠ, সংগীত প্রভৃতি পূর্ণভাবে বা আংশিক

ভাবে সাহিত্যিকার কর্মসূচীর মধ্যে গণ্য হইবে।" (১ম অধিবেশন)। "……সাহিত্য আমাদের জীবন ও জীবন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় লইয়া। জীবনকে ভিত্তি করিয়া যাহা কিছু আলোচ্য বিষয় তদ্‌সমুদয়ই—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশিত হইতে পারিবে। তবে একটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সাহিত্যিকার সভ্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। সমসাময়িক ও স্থানীয় রাজনীতি, আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ এবং এই প্রকার বিতর্কমূলক বিষয় কোন রচনার মধ্যেই পরিবেশিত হইতে পারিবে না। তবে যিনিই যে কোন বিশিষ্ট দল বা মতবাদী হউন না কেন, মূল উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইহার সভ্য হইতে পারিবেন—(১ম, সপ্তম অধিবেশন)।

সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী রচিত না হইলেও সাহিত্যিকা যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে প্রয়োজনানুগ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল নিয়মের প্রধান প্রধান কয়েকটি এই :

১। প্রতিমাসে পূর্ব নির্দিষ্ট একটি রবিবারে সাহিত্যিকার কোন সদস্যের আহ্বানে তদীয় গৃহে ইহার অধিবেশন হয়। অধিবেশন কাল দুই ঘণ্টা হইতে আড়াই ঘণ্টা। প্রতি অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করেন। কোন কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারিলে বা অন্য কোন কারণ ঘটিলে তাঁহার মনোনীত কোন সদস্য সভাপতির কার্য নির্বাহ করেন।

২। স্বরচিত রচনা পাঠ যেমন কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা প্রভৃতি এবং মনীষীদের রচনা হইতে পাঠ ও আবৃত্তি প্রতিটি অধিবেশনের মূল কার্য বলিয়া গণ্য। পঠিত রচনার উপর কোন আলোচনা বা বিতর্ক চলে না। সভাপতি উপসংহার বক্তৃতায় সাহিত্যিকার বৈষয়িক আলোচনা প্রসঙ্গে রচনাদির সম্বন্ধেও সংক্ষেপে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। অধিবেশনে কণ্ঠ-সংগীত বা যন্ত্র-সংগীতও পরিবেশন করা যাইতে পারে।

৩। বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতিতর্পণ ও জন্মদিবসাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন সাহিত্যিকার একটি কার্য।

৪। অধিবেশনে পঠিতব্য রচনা অধিবেশন দিবসের অন্যূন ৫ দিন পূর্বে সর্বাধ্যক্ষের নিকট পেশ করিতে হয়। পঠিতব্য রচনা সর্বাধ্যক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের ক্ষেত্রে ইহা বর্তায় না।

৫। কোন বিতর্কমূলক বিষয়, সম-সাময়িক রাজনীতি বা মতবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা চলে না।

৬। সভায় পরবর্তী অধিবেশনের দিন তারিখ সময় ও আহ্বায়কের নাম ঘোষণা করা হয়।

৭। প্রাপ্ত-বয়স্ক (অন্যূন ২০ বৎসর বয়স্ক) ব্যক্তিরাই সাহিতিকার সভ্য হইতে পারেন। যে কোন সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যপ্রেমী বৎসরে অন্যূন ৫টি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিলে স্থায়ী সদস্য বলিয়া বিবেচিত হন।

৮। সভ্যবৃন্দের কোন নিয়মিত চাঁদা দিতে হয় না। তবে সাম্বৎসরিক উৎসব বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের জন্য সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে এককালীন দান হিসাবে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ লওয়া হয়।

৯। নূতন বছরের প্রথম অধিবেশনটি সাম্বৎরিক উৎসব রূপে প্রতিপালিত হয় এবং ঐ সভায় বিগত বৎসরের কার্যবিবরণ দাখিল করা হয় এবং এতে খ্যাতনামা কোন সাহিত্যি বা বিদগ্ধব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দান করেন।

১০। বহিরাগত সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যপ্রেমীরাও এই সভায় যোগদান করিতে পারেন।

১১। বৎসর মধ্যে ক্রমান্বয়ে অথবা অল্প ব্যবধানে তিনটি অধিবেশনে যোগদান করিলে অধিবেশন আহ্বানের অধিকার জন্মে।

এই 'সাহিত্যিকা' বস্তুত যোগেশচন্দ্রের সৃষ্টি। বহু লেখকের রচনাশক্তির বিকাশে ইহা সাহায্য এবং বহু সাহিত্য-রসিকের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে। নব বারাকপুরের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ইহা। ইহার প্রতিষ্ঠাবধি যোগেশচন্দ্র প্রাক্-মৃত্যুকালে কলকাতার হাসপাতালে থাকার দিনগুলি বাদে মাত্র ইহার ২টি অধিবেশনে অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা

রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল

দিলীপকুমার বিশ্বাস

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লার চিন্তায় যে সর্বতোমুখী নবসৃষ্টির প্রেরণা দেখা গিয়েছিল তার প্রভাব ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে। রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৪ কি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে) তাঁকে কেন্দ্র করে একটি জিজ্ঞাসু মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। এই গোষ্ঠীর মিলনের স্থান ছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়-সভা।' কালক্রমে রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিশিষ্ট মতামত যখন আলোচনা ও গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে সুপরিচিত হয়ে উঠল-তখন এঁদের কেউ কেউ শংকিত বা বিরক্ত হয়ে যেমন রামমোহনকে ত্যাগ করে গেলেন, তেমনি আরও অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অনুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগণ সমাজে যে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ভয়ের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সম-সাময়িক সাহিত্যে ও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় এর প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। নবযুগের ভাববিপ্লবের বুনিয়াদ এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন রামমোহন। এই নূতন চিন্তায় একটি অতিরিক্ত ধারা সংযুক্ত হয় মোটামুটি বিগত শতাব্দীর কুড়ি দশক থেকে। উক্ত নবপর্বের পশ্চাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা কার্যকরী হয়েছিল তা হল মুখ্যতঃ ২০ জানুয়ারী ১৮১৭ কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও গৌণত, ঐ বৎসর ৪ জুলাই 'স্কুল বুক সোসাইটি'র ও পর বৎসর ১ সেপ্‌টেম্বর 'স্কুল সোসাইটি'র আবির্ভাব। হিন্দু কলেজের শিক্ষা হিন্দুসমাজভুক্ত তরুণগোষ্ঠীর মনের মুক্তি ত্বরান্বিত ক'রে অতি অল্পকালের মধ্যে বঙ্গীয় ভাবরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। শেষোক্ত সংস্থাদ্বয় পরস্পরের পরিপূরকরূপে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, পাঠশালা-সমূহের উন্নতিসাধন, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে

সাধারণের উপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার যে উপযুক্ত পশ্চাদ্‌ভূমি রচনায় সহায়ক হয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়, যদিও বর্তমান প্রসঙ্গে এদের আলোচনার বাইরে রাখতেই হবে। জন্মের পরে হিন্দু কলেজ বেশ কিছুকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাপন করেছিল। পরে এর শিক্ষা ক্রমশঃ ছাত্রগণকে নবযুগের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত ক'রে তরুণ-সমাজে এক মানসবিপ্লবের সৃষ্টি করে। এই পরিবর্তনের মূলে ছিলেন এখানকার প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এঁর আয়ুষ্কাল স্বল্প,—মাত্র তেইশ বৎসর (১৮০৯-১৮৩১); হিন্দুকলেজে অধ্যাপনার কালও সংক্ষিপ্ত—মাত্র পাঁচ বৎসর (১৮২৬-১৮৩১)। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁর উদ্দীপনাময় শিক্ষা যুবমানসে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। এঁর সাক্ষাৎ-ছাত্র ও প্রভাব-পরিমণ্ডলভূক্ত তরুণ গোষ্ঠীই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'নব্য বঙ্গ' নামে ইতিহাসে সুপরিচিত। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' নামটি অনেক সময় সম্প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ হিন্দু কলেজের প্রাক্-ডিরোজিও ও উত্তর-ডিরোজিও যুগের কিছু প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিও এই অভিধা প্রয়োগ করেছেন। এই নামের প্রচলন ঠিক কবে থেকে হয়েছে জানা যায় না, তবে স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র বাগল উল্লেখ করেছেন, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে 'ইয়ং বেঙ্গল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ও ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল 'ডেভিড হেয়ার-স্মৃতিসভা'র এক অধিবেশনে 'ইয়ং বেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড্' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তা ছাড়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন তরুণ নায়ক কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রকাশিত এক পুস্তিকার নাম রেখেছিলেন 'Young Bengal—This is for you'। উল্লেখ্য যে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ং এই মণ্ডলী সম্পর্কে 'ইয়ং ক্যালকাটা' নাম ব্যবহার করেছেন। এক অর্থে এ নামকরণ সার্থক, কেন না ডিরোজিওর প্রভাব প্রধানতঃ তাঁর কলিকাতাস্থ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু কলেজের যে ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর শিক্ষায় বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭), চন্দ্রশেখর দেব (১৮১০-১৮৭০ ?), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৯৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(১৮১৪-৮৭), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), মাধবচন্দ্র মল্লিক, দিগম্বর মিত্র (১৮১৭-৭৯) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছিলেন ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী (ডিরোজিও অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ) তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র না হলেও তাঁর ক্লাসে যেতেন, বক্তৃতা শুনতেন ও ক্লাসের বাইরে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনায় সর্বদা যোগ দিতেন। এঁরা ছাড়া হিন্দু কলেজের পরবর্তী ছাত্রদলের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখকে ডিরোজিও সৃষ্ট ভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে সম্প্রসারিত অর্থে আমরা তাঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' আখ্যা দিতে পারি।

ডিরোজিওর বিদ্রোহী স্বরূপ ও তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠীর মনে তাঁর অসীম প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে প্রথমে মনস্বী অধ্যাপকরূপে তাঁর জীবনের নাতিদীর্ঘ পর্বটির কিছু আলোচনা আবশ্যক। ডেভিড্ ড্রামণ্ড্ প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলা একাডেমির মেধাবী ছাত্র হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হবার পূর্বেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন ; তাঁর রচিত ইংরেজি কবিতা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্বমাধুর্য, শিক্ষাদান-প্রণালীর স্বকীয়তা, ছাত্রবাৎসল্য, বিশুদ্ধ চরিত্র, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে ছাত্রসমাজের গুরু, বন্ধু ও সর্ববিধ জ্ঞানচর্চায় প্রেরণার উৎস করে তুলেছিল। তাঁর অন্যতম জীবনীকার টমাস এড্ওয়ার্ডসের ভাষায় : 'The teaching of Derozio, the force of his individuality, his winning manner, his wide knowledge of books, his own youth, which placed him in sympathy with pupils, his open, generous, chivalrous nature, his

humour and playfulness, his fearless love of truth, his hatred of all that was unmanly and mean, his ardent love of India ......his social intercourse with his pupils, his unrestricted efforts for their growth in virtue, knowledge and manliness produced an intellectual and moral revolution in Hindu society since unparalleled.' ডিরোজিওর শিক্ষাদানপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে—তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি তাঁর ছাত্রগণকে সর্বদা সর্ববিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার জন্য উৎসাহ এবং কোনও প্রচলিত সংস্কারকেই বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে গ্রহণ না করবার পরামর্শ দিতেন। একদিকে যেমন মননের ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসা ও বিচারের প্রাধান্য স্থাপন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—অপর দিকে সর্বপ্রকার শঠতা, ভণ্ডামী, মিথ্যাচরণ ও সামাজিক অবিচারের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে ছাত্রগণ যাতে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন, সে বিষয়েও তিনি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। তার অন্যতম কৃতী ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র সাক্ষ্য দিয়েছেন: 'Derozio appears to have made strong impression on his pupils as they regularly visited him at his house and spent hours in conversation with him. He continued to teach at home what he had taught at school. He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves—to be in no way influenced by any of the idols mentioned by Bacon to live and die for truth—to cultivate and practise all the virtues, shunning vice in every shape. He often read examples from ancient history of the love of justice, patriotism, philanthropy and self-abnegation, and the way in which he set forth the points, stirred up the minds of his pupils. Some were impressed with the excellence of justice, some with the paramount importance of truth, some with patriotism and some with philanthropy'।

ডিরোজিওর ছাত্রগণ কেবল কলেজে নয়, ডিরোজিওর গৃহেও সমবেত হয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং পাঠ্যবিষয় বা জ্ঞানালোচনা ছাড়াও ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শ নিতেন। গুরু ও শিষ্যগণের উদ্যোগে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য 'অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন'এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার অধিবেশনে দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গেরই আলোচনা হত, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, আস্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোনও বিষয়ই বাদ যেত না। এরই আদর্শে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকতায় আরও সাতটি বিতর্ক-সভা স্থাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ডিরোজিও যুক্ত হয়ে পড়েন। ডেভিড্ হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলেও ডিরোজিওর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ছাত্রসমাজ এখানেও তাঁর ভাষণ শুনবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এইভাবে ডিরোজিওর প্রেরণায় তাঁর তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী সর্ববিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করতে অভ্যস্ত হন ও সর্ববিধ ধর্মান্ধতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন। ক্রমশঃ তরুণ বয়সের ধর্মানুসারে এই প্রখর যুক্তিশীলতা তাঁদের বাক্যে ও আচরণে উগ্র নস্যাৎপ্রবণতারূপে প্রকাশ পেতে থাকে। হিন্দুসমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করে তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণ, সুরাপান, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অমর্যাদা প্রভৃতি এঁদের আচরণ রক্ষণশীল সমাজের আশংকা ও ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে সনাতনপন্থীগণ আতংকিত হয়ে নানা ভাবে এই স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রোধ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এঁদের চাপে ছাত্রগণের 'পার্থেনন্' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনামূলক সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দমননীতি ছাত্রগণের ডিরোজিও-সংসর্গ বন্ধ করতে পারেনি বা তাদের প্রগতিশীল মতামতের উগ্রতা বা সাময়িক উন্মার্গগামী মনোভাবও কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি। রক্ষণশীল সমাজ ও তার পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গ সম্পর্কে অর্ধসত্য ও মিথ্যায় মেশানো নানা নিন্দা-কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হলেন ও অভিভাবকগণের মধ্যে অনেকে আতংকিত হয়ে নিজ পরিবারভুক্ত ছাত্রগণকে কলেজ থেকে

সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে এই সংকটের কারণ গণ্য করে অধ্যক্ষসভার ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে আত্মপক্ষসমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই কলেজের অধ্যাপক থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পরে পদত্যাগ ভিন্ন ডিরোজিওর গত্যন্তর রইল না (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১)। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি পরিপূর্ণভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পূর্ব হতেই তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেট্' পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; পদত্যাগের পর তিনি প্রথম অল্পদিন 'হেস্পেরাস্' নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদনা ক'রে অতঃপর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'দি ইস্ট্ ইণ্ডিয়ান্' নামক দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জীবনেই তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ও তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ ('পোয়েম্স' ১৮২৭, 'দি ফকীর অফ্ জাংঘিরা' ১৮২৮) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর মৃত্যু হয়। কলেজত্যাগের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগে ছেদ পড়ে নি।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ছাত্রগণের মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ সাধনই শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বয়ং যুক্তিবাদী ছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপিত করা যেতে পারে আনুপূর্বিক ভাবে সেগুলি বিদ্যার্থীগণের সম্মুখে উপস্থিত ক'রে তিনি বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত রাখবার ও স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অনুপ্রেরণা দিতেন। সম্ভবতঃ তাঁর ছাত্রগণ সকলেই হিন্দুসমাজভুক্ত হবার কারণে তাঁর যুক্তিবাদী আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারসমূহ। এই আক্রমণবৈশিষ্ট্যের অন্য কোনও কারণ ছিল কিনা তা যথাস্থানে বিচার্য। অধিকন্তু, ডিরোজিওর আদর্শ ছিল নৈতিক সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা: যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তসমূহ আচরণের দ্বারা জীবনে রূপায়িত না হলে জীবনচর্যা সম্পূর্ণ হল না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই ধারণা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সুতরাং এঁরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সামাজিক আচারসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করতে বিলম্ব করলেন না; প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষায়: 'The convulsion caused by Derozio was great.

It pervaded almost the house of every advanced student. Down with Hinduism! Down with orthodoxy! was the cry everywhere.........The junior students caught from the senior students the infection of ridiculing the Hindu religion and where they were required to utter mantras or prayers they repeated lines from the Iliad. There were some who flung the Brahmanical thread instead of putting it on. The horror of the orthodox families was intensified—withdrawals of pupils took place'। এ ছাড়াও, ছাত্রদের আরও বহু প্রকার উগ্র অসংযত আচরণের তালিকা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী সমকালীন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগ্রহ করে : 'অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিতমস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাই গো, আমরা গরু খাই গো" বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, "এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি"—এই বলিয়া পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত'। এই হিন্দুধর্মবিরোধী মনোভাবের সংক্ষিপ্ত নির্যাস প্রকাশ পেয়েছে ৩ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় প্রকাশিত ডিরোজিও-শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিকের এবংবিধ উক্তিতে : 'If there be anything under Heaven that I or my friends look upon with most abhorrence, it is Hinduism'। বলা হয়ে থাকে হিন্দু কলেজের তদানীন্তন আবহাওয়া কেবল হিন্দুধর্ম নয়, কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই অনুকূল ছিল না—এমন কি খ্রীস্টধর্মের নয়। কিন্তু স্পষ্টত: এই মতসংঘাতের ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ যে পরিমাণ আহত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল খ্রীস্টধর্ম ও খ্রীস্টীয় সমাজ তা হয়নি। ডিরোজিও ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করেন নি; এর প্রমাণ মৃত্যুর পর তাঁর দেহ খ্রীস্টীয় পদ্ধতি অনুসারে খ্রীস্টীয় সমাধিস্থানেই সমাহিত হয়—নাস্তিক বা খ্রীস্টধর্মে অবিশ্বাসী ডেভিড্ হেয়ারের ক্ষেত্রে যার অনুমতি পাওয়া যায় নি। টমাস্ এড্ওয়ার্ড্স ও ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ডিরোজিওর এই দুই জীবনীকার

প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন, ডিরোজিও তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী মনোভাব সত্ত্বেও খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এড্ওয়ার্ড্সের ভাষায় 'Derozio lived in the faith and spirit of Christ, as he understood that faith and life'। তাঁর মৃত্যুকালে উপস্থিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীগণের মধ্যে ছিলেন খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক মিঃ হিল্ ও ডঃ জন্ গ্রান্ট্। দ্বিতীয়জন সাক্ষ্য দিয়েছেন;' It was a great consolation to his friends that shortly before he expired his last words were an appeal to the great Fountain of all Mercy, such as became of a dying Christian'। সুতরাং তাঁর ও পরোক্ষতঃ তার শিষ্যমণ্ডলীর প্রখর ও হিংস্র হিন্দুধর্ম সমালোচনার তুলনায় খ্রীস্ট্রধর্মবিরোধ যে স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য হবে না– সে আর আশ্চর্য কি? বরঞ্চ দেখা যায়, হিন্দুধর্মের এই নিগ্রহে খ্রীস্টীয় মিসনারীগণ উৎসাহিতই হয়েছিলেন এবং হিন্দুধর্মে স্খলিতবিশ্বাস কলেজ-ছাত্রগণকে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কলেজভবনের নিকটেই তাঁরা খ্রীস্টধর্মবিষয়ক বক্তৃতা-আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। ম্যাজ তাঁর ডিরোজিও-জীবনীতে স্পষ্টই বলেছেন' ·· ···it will be seen that "the moral lessons taught by Derozio" made the work of the Christian missionaries more easy of accomplishment'। সে যাই হোক, ছাত্রগণের আচরণের আতিশয্য ডিরোজিওর সম্পূর্ণ মনঃপূত ছিল কি না সন্দেহ। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষের অভিযোগের উত্তরে তিনি উইলসনকে যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর স্বাধীন চিন্তার জয়গানের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মনে যাই থাক, তাঁর শিক্ষার সাময়িক প্রতিক্রিয়াই যে এই ব্যাপক নস্যাৎপ্রবণতার জনক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই সঙ্গে তাঁর শিক্ষার সৃষ্টিশীল দিকটিকে বিস্মৃত হলে চলবে না। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অন্যায় অবিচার ও পাপের প্রতি ঘৃণা, বিশুদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ, উদার মানবপ্রীতি ও দেশপ্রেম ছাত্রগণের মনে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত তরুণগোষ্ঠী সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার দাবী করেন। অর্থনীতিতে তাঁদের আদর্শ ছিলেন অ্যাডাম্ স্মিথ; তাঁর প্রভাবে তারা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের পরিবর্তে অবাধ বাণিজ্যপ্রথার (free trade) প্রচলন

চেয়েছিলেন ও ভারতবর্ষে উন্নত শ্রেণীর ইউরোপীয়গণের বসবাস বা কলোনাইজেসন্ তাঁদের কাম্য ছিল (ইণ্ডিয়া গেজেট, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০)। এই ভাবে ডিরোজিও-সৃষ্ট যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় যে তরুণগোষ্ঠী গড়ে উঠলেন উত্তর-জীবনে তাঁরা অনেকেই জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে এমন একটি ধারণা ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে যে রামমোহন-সৃষ্ট প্রগতিশীল ভাবধারা এবং ডিরোজিও ও তৎপ্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রবর্তিত যুক্তিবাদী মানসিকতা দুই সমান্তরাল প্রবাহ; এরা কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ বা প্রভাবিত করে নি। কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেছেন রামমোহন যে নব চিন্তার প্রবর্তক তাকে বলা যেতে পারে 'রিফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কার; অন্যপক্ষে 'ইয়ং বেঙ্গল'-সৃষ্ট ভাববিপ্লব হল 'রেনেশাঁস' বা নব জাগরণ। এ নিছক ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে ধার করা বুলি—কিন্তু যে ভাবে এর প্রয়োগ করা হয়েছে তার থেকে এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যেন আধুনিক কালের ইয়োরোপীয় 'রেনেশাঁস" ও 'রিফর্মেশন' দুটি স্বতন্ত্র পরস্পরবিচ্ছিন্ন এমন কি পরস্পরবিরোধী ধারা! সাম্প্রতিক কালে ডিরোজিওর যে সকল স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে এমন কথাও উচ্চারিত হতে শোনা গেছে যে ডিরোজিও-শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণের রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত হবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, কেন না ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন যখন ইংলণ্ড রওনা হন তখন এঁরা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম নাকি তারাচাঁদ চক্রবর্তী। আরও বলা হয়ে থাকে 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীভুক্ত যুবকদল সকলেই এসেছিলেন সমাজের সাধারণ মধ্যবিত্ত স্তর থেকে যেখানে রামমোহনের সমকালীন অনুবর্তিগণ প্রায়শঃ ছিলেন উচ্চবিত্ত ভূস্বামী; এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীজাত আলোড়ন সমাজকে স্বভাবতঃ অধিকতর প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাসের সাক্ষ্যের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার অধিকাংশের এতই গরমিল যে সমস্ত সমস্যাটি একবার আদ্যোপান্ত ভাল করে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের জানতে ইচ্ছা হয়—রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পরের পরিচিত ছিলেন কিনা। রামমোহন ডিরোজিও অপেক্ষা প্রায়

সাঁইত্রিশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। অবশ্য বয়সের এই ব্যবধান তাঁদের পরিচয়ের পথে অন্তরায় নয়। রামমোহনের অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্যের সঙ্গেও তাঁর প্রায় ৩০।৩২ বৎসর বয়সের ব্যবধান ছিল; আর বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ১৩ বৎসর বয়সেই রামমোহনের এত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে রামমোহন তাঁর সঙ্গে করমর্দন না ক'রে বিলাতযাত্রা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ডিরোজিওর অন্যতম চরিতকার ম্যাজ বলেছেন রামমোহন ও ডিরোজিও পরস্পরের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন্ সূত্র থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা জানান নি। অপর জীবনীকার টমাস এড্ওয়ার্ড্স এ বিষয়ে নীরব। সে যাই হোক, রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু মৌলিক পার্থক্য যে ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিরোজিও ও তাঁর অনুবর্তিগণের দৃষ্টিতে রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগণ ছিলেন half-liberal বা আংশিক ভাবে প্রগতিশীল। ডিরোজিও স্বয়ং এঁদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন ৫ অক্টোবার ১৮৩১ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট্' তার খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন। ডিরোজিওর মন্তব্য এই রকম: "What his [Rammohan Roy's] opinions are neither his friends nor foes can determine. It is easier to say what they are not than what they are ·· Rammohan, it is well known, appeals to the Vedas, the Koran and the Bible holding them probably in equal estimation extracting the good from each and rejecting from all whatever he considers apocryphal ·····He has always lived like a Hindoo······His followers at least some of them are not very consistent. Sheltering themselves under the shadow of his name they indulge in licentiousness in everything forbidden in the Shastras, as meat and drink, while at the same time they fee the Brahmins, profess to disbelieve Hindooism and never neglect to have Poojahs at home" (এ. এফ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ্ কর্তৃক তাঁর **Social Ideas and Social Change in Bengal 1818—1835** গ্রন্থের পৃঃ ৪৩ থেকে উদ্ধৃত)। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও বিশেষভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আক্রমণ করেন

এই কারণে যে, মুখে তিনি নিজেকে রামমোহন ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবাদের অনুবর্তী স্বীকার করলেও স্বগৃহে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই নিয়ে সেকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু বাদানুবাদ হয় ও ১৯ অক্টোবর ১৮৩১ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'এ প্রসন্নকুমারের পক্ষে বলা হয় যে তাঁর গৃহে দুর্গাপূজানুষ্ঠানের হেতু এ নয় যে তিনি প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস করেন; তাঁকে অনিচ্ছা ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, কেননা প্রতি বৎসর পূজানুষ্ঠান করতে হবে এই সুস্পষ্ট সর্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রামমোহনের বিরুদ্ধে ডিরোজিওর অভিযোগ বিশেষ গুরুতর নয়। তিনি কেবল বলতে চেয়েছেন—ধর্মবিষয়ে রামমোহনের মতামত সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয়—তিনি সর্বশাস্ত্রের সারভাগকে সমান শ্রদ্ধা করেন ও অর্বাচীন অংশকে বর্জন করেন। আর একটি অভিযোগ, যা কিছু অদ্ভুত শোনায়, তা হল এই যে রামমোহনের জীবনযাত্রা হিন্দুরই মত। রামমোহন-গোষ্ঠীর অনেকের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—এঁদের মতে ও আচরণে মিল নেই; রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে এঁরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ সর্ববিধ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন ও প্রকাশ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, অথচ নিজ নিজ গৃহ-পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দিয়ে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা করেন না। রামমোহন ও তাঁর মণ্ডলীভুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে এখানে স্পষ্টতঃ পার্থক্য করা হয়েছে। রামমোহন স্বয়ং প্রতিমাপূজা ও তার সঙ্গে জড়িত আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন এবং সামাজিক ভাবেও এ-সকলে অংশ গ্রহণ করতেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের নিদর্শনটি তো এ-সম্পর্কে বিখ্যাত হয়ে আছে। অথচ বেদ-উপনিষদ্ প্রোক্ত ব্রহ্মবাদ ও একেশ্বরবাদের ভাবধারায় নিষিক্ত হয়ে তিনি নিজেকে প্রকৃত হিন্দু বলতে দ্বিধা করেন নি—এই উদার ব্রহ্মবাদই ছিল তাঁর নিকট হিন্দুধর্মের সারবস্তু। উল্লেখ্য যে, রামমোহন ও তাঁর অন্তরঙ্গগোষ্ঠীভুক্ত অনেকের আচরণগত এই পার্থক্য তাঁদের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ৭ কার্তিক, ১২৩৮ বঙ্গাব্দ (২২ অক্টোবর, ১৮৩১) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ' রক্ষণশীল 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকা থেকে এই মর্মে যা উদ্ধার করেছেন তা আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ

প্রণিধানযোগ্য : 'ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভাল রূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম পিতৃকর্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুনসী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসভায় ইঁহার সর্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে প্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺ দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটিতে ৺ দুর্গোৎসব ও ৺ শ্যামাপূজা ও ৺ জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে।' অর্থাৎ রক্ষণশীলগণের দৃষ্টিতে রামমোহনের সহযোগীগণ তাঁদের রামমোহন-সংসর্গ সত্ত্বেও কিছুটা ক্ষমার্হ, কেননা তাঁরা স্বগৃহে প্রচলিত পূজানুষ্ঠানসমূহ রহিত করেন নি কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ রূপে পাষণ্ড কালাপাহাড়, কেননা তিনি দৈবকর্ম পিতৃকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া বর্জন করেছেন। বাহ্যতঃ উগ্র প্রগতিবাদী ও উগ্র রক্ষণশীল পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক বিষয়ে সিদ্ধান্তগত আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। দুই দলই লক্ষ্য করেছেন রামমোহন ও তাঁর অধিকাংশ অনুবর্তীর মধ্যে জীবনচর্যার প্রভেদ; অবশ্য এর থেকে তাঁদের সমালোচনা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। ডিরোজিও-গোষ্ঠী সম্পর্কে রামমোহনের মতামত স্পষ্ট ভাবে জানবার সুযোগ আমাদের নেই। এঁদের চিন্তা ও কার্যক্রম দীর্ঘকাল অনুশীলন করবার সময় তিনি পাননি, কেননা ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে যোগদান ও ১৮৩০-এ রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রা। তবে ঈশ্বর-বিশ্বাস রামমোহনের জীবনে মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল—তাই তাঁর নিকট সন্দেহবাদ বা নাস্তিকতার তুল্য মহাঅনর্থ আর কিছু ছিল না। যে পৌত্তলিক উপাসনাকে তিনি কোনও ক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না-তাকেও তিনি অন্ততপক্ষে নাস্তিকতা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন।

এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব প্রায় মনীষী বেকনের মতই; যিনি বলেছিলেন: 'I would rather believe all the fables in the Legend and the Talmud and the Alkoran than that this universal frame is without a Mind'। সেই কারণে 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীভুক্ত অনেক তরুণের প্রতিভা তিনি স্বীকার ক'রে নিলেও—তাদের কারও কারও ধর্মবিশ্বাসহীনতা বা সর্বনস্যাৎপ্রবণতা যে তাঁর চিত্তকে ব্যথিত করবে তা স্বাভাবিক। তবে ডিবোজিওর সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে রামমোহন-গোষ্ঠীর মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর প্রতি এঁদের যে সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল না তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে। যথাস্থানে তা বিবেচ্য।

ডিরোজিও-কৃত রামমোহন-গোষ্ঠী সম্পর্কিত বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর কিছুটা সত্য ও কিছুটা রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবার স্বাভাবিক অক্ষমতাপ্রসূত। রামমোহনের দুর্ভাগ্য তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যাঁরা তার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিলেন, মনীষা, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবল, ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ রামমোহন অপেক্ষা অনেক নিম্নভূমিতে বিচরণ করতেন। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি তাঁদের যে আকর্ষণ ছিল না তা নয়—কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তা অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তা তাঁদের চরিত্রে ছিল না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিত্তোপার্জন, পার্থিব সুখভোগ, বিষয়সম্পত্তি,-সব কিছু বজায় রেখে যে শক্তি ও সময় উদ্বৃত্ত থাকত সেটুকু তাঁরা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে রামমোহনের অসাধারণ মনীষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নানা বৈষয়িক ও সাংসারিক ব্যাপারে পরামর্শের জন্যও তাঁর শরণাপন্ন হতেন। রামমোহনের মণ্ডলীভুক্ত সকলের আন্তরিকতা যে গভীর ছিল না তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রমাণ—রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের পর এঁদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করেন – মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক অর্থসাহায্য ও দরিদ্র পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিষ্ঠা ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরবর্তী দশ বৎসর (১৮৩০-১৮৪০) কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এর ভার গ্রহণ করবার পর উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এই সংঘে নবজীবন

সঞ্চার হয়। এমন কি, রামমোহনের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর সর্ববিধ কল্যাণকর্মের সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা ও ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন নি। রামমোহন স্বয়ং তাঁর আদর্শের জন্য যথেষ্ট দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন, আততায়ীর ভয়ে তাঁকে স্বস্ত্রস্ত থাকতে হত,—ও শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায় তাঁকে বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন এবং বেগতিক দেখলেই বিপজ্জনক নৌকাটি পরিত্যাগ করে যেতেন। এঁদের সম্পর্কে ডিরোজিওর বিরূপ সমালোচনা যে অনেক পরিমাণে যথার্থ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিরোজিও স্বয়ং ছিলেন এ বিষয়ে ভাগ্যবান। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর আদর্শবাদে কোনও ছিদ্র ছিল না। আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকারে দুঃখবরণে এঁরা কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। কিন্তু ডিরোজিও যেখানে half-liberal বলে রামমোহনের সমালোচনা করেছেন সেখানে তিনি রামমোহনের প্রতি সুবিচার করেন নি বা করতে পারেন নি। এর কারণ দুই মনীষীর নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত। ডিরোজিওর মানস মুখ্যতঃ বায়রণীয় রোমান্টিকতার প্রভাবে গঠিত—তাঁর দার্শনিক যুক্তিবাদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে তাঁর রোমান্টিক্ মনোভাব প্রতিফলিত। তিনি যে তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে রামমোহনের মত নানা ভাষায় বিভিন্ন ধর্মের মূলানুসন্ধান ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি দর্শনচর্চা যথেষ্ট করতেন কিন্তু তা সমকালীন ইয়োরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ ধারা—বেকন, হিউম, কাণ্ট্ ও সহজ জ্ঞানবাদী রীড্, ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট্ ও ব্রাউনের রচনায় যা প্রকাশিত। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীস্টীয় শাস্ত্রে তাঁর যে বিশেষ প্রবেশ ছিল তারও কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও জন্মসূত্রে পাওয়া খ্রীস্টধর্ম তিনি যে ত্যাগ করেন নি তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করে স্বীয় কাব্যে গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন বটে কিন্তু সে দেশভক্তিও অনেক পরিমাণে বায়রণীয় রোমান্টিক্ মনোবৃত্তিপ্রসূত। ভারতবর্ষীয় জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ রামমোহন যে

স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন ডিরোজিওর দেশভক্তি আন্তরিক হলেও তার মূল জাতীয় সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ করেনি তার মধ্যে উচ্ছ্বাসের ভাগ ছিল বেশী। তাই তাঁর ও তাঁর শিষ্যগণের শাণিত যুক্তিবাদের আক্রমণের প্রায় একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু-সমাজ। রামমোহন যেমন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দ্বারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সারভাগকে গ্রহণ ক'রে অর্বাচীন অংশকে বর্জন করেছিলেন এবং বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন যে ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া বিশ্বজনীন—প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসেই তা প্রতিফলিত,—সেই পর্যায়ের বিচারবুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ডিরোজিও ও প্রথম যুগে তাঁর শিষ্যগণ দিতে পারেন নি। তাঁদের নিকট হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুই ছিল অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয়—হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুই দেশের ও সমাজের অধঃপতনের কারণ। রামমোহনের পক্ষে এমন মত পোষণ করা কখনই সম্ভব ছিল না। তিনি সমাজের আমূল সংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু গভীর অনুশীলন ও প্রত্যক্ষ দেশপরিচয় হেতু নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি একটি মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন এবং এই কারণেই ডিরোজিও-গোষ্ঠীর সর্বনস্যাৎকারী মনোভাব তাঁকে কোথাও স্পর্শ করে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সংস্কারের প্রেরণা জন্ম নিলে তবেই সেই পরিবর্তন স্থায়ী হয়—সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মুহূর্তে চূর্ণ করলে বা নস্যাৎ করলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকস্মিক ছেদের প্রতিক্রিয়া জনমানসে শেষপর্যন্ত শুভকর হয় না—এই ছিল সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মর্ম। বহু বৎসর পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তী ভূমিকাস্বরূপ রামমোহন সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য করেছিলেন আজকের বিচারেও তার যাথার্থ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই: '…রামমোহন রায় এমন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। …তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়" এবং "আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"

এ জায়গায় ও আবার "তিনি যদি কেবলমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যোগ কোথায় তাহা তলাইয়া না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয় ভাবে সার্বভৌমিক হইতে পারিতেন না। এবং এখানেই আবার ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট্‌দের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। কারণ তাঁদের সার্বভৌমিকতা জাতীয় ঐতিহাসিক বিকাশের পথে ফোটে নাই। তাঁহারা সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তিতন্ত্রতাকে (Individualism) অধিনায়ক করিয়াছিলেন। রামমোহন সেই ব্যক্তিতন্ত্রতার কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাসনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন। কিন্তু শাস্ত্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ...দেশকালের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা সমাজ আকাশকুসুম মাত্র ; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ বা প্রাণহীন।" জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের অন্যান্য শাস্ত্রের মর্মবাণীর সঙ্গে সমন্বিত ক'রে সবটুকুকে যুক্তিবিচারের দ্বারা পরিমার্জিত করে গ্রহণ করবার মনোভাব বুঝবার মত অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি ডিরোজিওর ছিল না। তাই তাঁর দৃষ্টিতে রামমোহন 'হাফ্‌-লিবারেল্‌'। তাঁর অন্যতম অভিযোগ ছিল, রামমোহন হিন্দুর মতই জীবন যাপন করেন। স্বীয় মনীষার প্রাচুর্য সত্ত্বেও ডিরোজিও রামমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা বা দূরদৃষ্টির অধিকারী হন নি।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের কথা বাদ দিলে কিন্তু সকল প্রগতিশীল প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গের মতৈক্য ছিল। নব্যগোষ্ঠী শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথাসমূহের অবলুপ্তি, স্বাধীনচিন্তা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, অবাধ বাণিজ্যপ্রথার প্রবর্তন, ভারতে ইয়োরোপীয়গণের বসবাস বা 'কলোনাইজেসন'-এর সমর্থক ছিলেন (ইণ্ডিয়া গেজেট, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০)। এই আদর্শগুলির সব কটিই ইতিপূর্বে রামমোহনের চিন্তায় রূপ গ্রহণ করেছে। তাই স্বভাবতঃ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁরা রামমোহনের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে প্রতিফলিত দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত ও সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ীর নিকট সংগৃহীত একটি মনোরম কাহিনী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন-জীবনীতে প্রকাশ করেছেন (পঞ্চম সংস্করণ,

পৃঃ ৩৬৮ পাদটীকা)। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে সতীদাহ-বিরোধী আইন পাশ হলে যখন রামমোহন ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ বেণ্টিক্‌কে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করেন সেই সময় একদিন রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রদল কলেজভবনে বসে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন—বেণ্টিক্‌কে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের ইংরেজি রচনা রামমোহন রায়ের কি অ্যাডাম সাহেবের। এই সময় তাঁদের শিক্ষক ডিরোজিও উপস্থিত হলেন ও সব কথা শুনে কৌতুকমিশ্রিত তিরস্কারের ভাষায় তাঁদের বললেন: 'তোমরা মানুষ না এই দেয়াল? নারীহত্যারূপ এই ভীষণ প্রথা দেশ থেকে উঠে গেল, এতে তোমরা কোথায় আনন্দ করবে—না অভিনন্দন-পত্রের ইংরেজি ক'রে লেখনীপ্রসূত এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন ইংরেজিতে কিরূপ সুপণ্ডিত তা জানলে তোমরা ঐ রচনা অ্যাডামের বলে কিছুতেই মনে করতে না।' কাহিনীর উৎস উক্ত ছাত্রগণের সতীর্থ সমকালীন পূতচরিত্র রামতনু লাহিড়ী, সুতরাং এর সত্যতা সন্দেহাতীত। এর মধ্যে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদলের রামমোহনের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীর যাঁরা প্রতীকস্বরূপ তাঁদের কয়েকজনের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে রামমোহনের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও তাঁর ভাবাদর্শের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম অনুরাগের অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ, স্থিতধী ও যুক্তিনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রামমোহনের পরম অনুরাগী। রামমোহনের মৃত্যুর পরে ৫ এপ্রিল, ১৮৩৩, কলিকাতা টাউন হলে যে শোকসভার অনুষ্ঠান হয় সেখানে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বক্তা। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে এই উপলক্ষে তিনি বলেন: 'His like we will not see again. He arose amidst all horrors of superstition to proclaim that India was capable of much better things than his countrymen themselves at that time imagined......The perusal of the Vedas opened his mind and induced him to rej-ct superstition and to think of the future regeneration

and improvement of his country. Along this line he proceeded further and further, till he accomplished many of those things which has made his name so famous. No doubt most of my countrymen still object to Rammohun Ray on account of the pre-eminent part he took in the abolition of Suttee. He was almost alone in the cause of humanity'। এর পরে রসিককৃষ্ণ অগ্রসর হয়েছেন শিক্ষাবিদ্ রূপে রামমোহনের মূল্যায়নে: 'A point which Rammohun Roy had peculiarly at heart was the education of his countrymen. In this matter his opinions were very correct and forcible. He maintained at his own expense a school at which Hindoo Boys were taught.'। অতঃপর রসিককৃষ্ণ এই দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে এমন একজন মনস্বী শিক্ষাবিদ্‌কে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চক্রান্ত হিন্দু কলেজের সংস্রবে থাকতে দেয়নি—তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হতে পারত: 'Not being held in that respect in which he should have been held by his bigoted country-men, he was prevented from doing all the good which he could otherwise have done. I allude to his not being allowed to join an institution in which he might have been of the greatest service to his country. If he had been permitted his benevolent mind might have suggested many measures which might have done still greater benefit to his country'। হিন্দু কলেজ-পরিচালক-সমিতিতে রামমোহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার এক সুপরিকল্পিত রক্ষণশীল চক্রান্ত যে ক্রিয়াশীল ছিল তার সমসাময়িক প্রমাণ হিসাবে এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লক্ষণীয় যে, হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অনুপস্থিতি এই প্রতিভাশালী ডিরোজিও-শিষ্যের নিকট নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছে। সর্বশেষে রসিককৃষ্ণ বলছেন, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ যদিও অনেকদিক দিয়ে জঘন্য—ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক যা কিছু উৎকৃষ্ট সর্ত এতে সংযোজিত হয়েছে তা

রামমোহনের একক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল। ('He went to England and to his going there we are in a great measure indebted for the best clauses in the new charter, bad and wretched as the charter is……the few provisions that it contains for the good of our countrymen we owe to Rammohun Roy'।) রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সভায় যে সমিতি গঠিত হয় তার তিন জন ভারতীয় সদস্যের অন্যতমও ছিলেন রসিককৃষ্ণ; অপর দুইজন রুস্তমজি কাওয়াসজি ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্তু কেবল বাক্যে নয়, আচরণে ও চিন্তাতেও যে রসিককৃষ্ণ রামমোহনকে অনুসরণ করতেন তারও স্পষ্ট নিদর্শন আছে। রসিককৃষ্ণ কর্মজীবনে যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি আদালতে জুরীর কর্তব্য পালনকালে প্রকাশ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই উপলক্ষে তিনি আদালতের সম্মুখে ঘোষণা করেন—'I do not believe in the sacredness of the Ganges'। এটি সম্ভবতঃ ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। এর পনেরো বৎসর পূর্বে ১৮২০ সালে রামমোহন রায়ের জনৈক অনুবর্তী আদালতের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। জুলাই ১৮২০ সংখ্যা এসিয়াটিক জার্ণাল এই ঘটনার বর্ণনায় লিখেছেন: 'During the present sitting of the Supreme Court, a native in giving evidence on a case therein pending, refused to take the oath in the usual manner, viz. on the waters of the Gunga. He declared himself to be one of the followers of Rammohun Roy, and in consequence not a believer in the imagined sanctity of the river ....We understand that his simple affirmation was taken, as practised in England by the Society of Quakers'। রসিককৃষ্ণও আদালতে এই simple affirmationই দিয়েছিলেন। সাময়িক কালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই পূর্বদৃষ্টান্ত যে তাঁর সংস্কারমুক্ত মনকে প্রভাবিত করেছিল উভয় ঘটনার পারম্পর্য ও সাদৃশ্য বিচার করলে সে বিষয়ে বড় সন্দেহ থাকে না। রসিককৃষ্ণের উপর রামমোহনের ভাবাদর্শের প্রভাবের

দ্বিতীয় নিদর্শন তাঁর ধর্মমত। আদালতে প্রচলিত প্রথায় শপথ গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হলে—২০ ডিসেম্বর ১৮৩৪ সংখ্যা 'ক্যালকাটা কুরিয়র'এ প্রকাশিত সংবাদে লেখা হয় প্রচলিত শপথ গ্রহণে তাঁর আপত্তি এই কারণে যে কোনো ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। এর উত্তরে রসিককৃষ্ণ বিবৃতি দেন এক ঈশ্বরে তিনি গভীর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের নিকট তাঁর পবিত্র দায়িত্ব আছে এ বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। নিজ ধর্মমত কিছু বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার তিন সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য, 'What is the reason that People least agree in Religion ?' : 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নবম খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৮৬২, পৃঃ ৩১১ ; ৪০ সংখ্যা, অক্টোবর ৬, ১৮৬২, পৃঃ ৩১৭-১৯ ; ৪১ সংখ্যা, অক্টোবর ১৩, ১৮৬২, পৃঃ ৩২৬-২৮)। এই নিবন্ধ প্রসঙ্গে প্রতি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে তা এই : 'The following rough notes on religion left by the late Baboo Russik Krishna Mullick are the results of his enquiries and reflections for many years. These rough notes which he had no intention of publishing at least in the form in which they are presented, were written we believe between 1854 and 1855 at Burdwan without the aid of any works. In fact, he was totally ignorant of the publications by Chapman or of the works of Theodore Parker when he wrote the notes and the sentiments expresscd are entirely his own'। ধারাবাহিক এই দীর্ঘ রচনাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় রসিককৃষ্ণ তাঁর ধর্মানুশীলনে ও ধর্মবিশ্বাসে রামমোহনের দ্বারা—বিশেষতঃ রামমোহন রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুওয়াহিদিন্'এর বক্তব্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেখা যায় তিনি রামমোহনের মতই উদার সার্বভৌম একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাসী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ :

১. এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস মানুষের ধর্মজীবনের ভিত্তি ; এই বিশ্বাস মানুষের পক্ষে জন্মগত ও স্বাভাবিক ও এই বিশ্বাসের ভূমিতে সব মানুষই সমান।

২. বিভিন্ন দেশে ও কালে বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশধারা সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব হেতু কালক্রমে সকল ধর্মেই বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে প্রচুর কুসংস্কার হাস্যকর অন্ধ বিশ্বাসের খাদ মিশেছে। ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সত্যই গ্রহণীয়—আবর্জনার সামিল অন্ধ বিশ্বাস ও যুক্তিহীন আচার সর্বথা বর্জনীয়।

৩. ধর্মকে বিশুদ্ধ ও কুসংস্কারমুক্ত ক'রে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। ধর্মসংস্কার বা reformation এর এই একটিই পথ। যুগে যুগে বরণীয় লোকশিক্ষক ও ধর্মগুরুরা ধর্মের এই বিশুদ্ধীকরণ বা সংস্কারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন; মানবজাতির এঁরাই শ্রেষ্ঠ হিতকারী ও পথপ্রদর্শক। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত মহামানবগণের মধ্যে আছেন সোক্রাটিস, জরথুষ্ট্র, কনফুসিয়াস্, বুদ্ধ, ব্যাস, জনক, যীশুখ্রীস্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামমোহন রায়। রামমোহন সম্পর্কে রসিককৃষ্ণের উক্তিঃ 'In our own day, too, with what persevering energy——what persecution did a Rammohun Roy labour to point out what he deemed the true sense of the Hindoo Scriptures and hereby to extricrate them from the gross puerilities with which a self-aggrandizing priesthood had encumbered it.'

এখানে স্পষ্টতঃ লেখকের দৃষ্টিতে রামমোহন বুদ্ধ-যীশুখ্রীষ্ট-জরথুষ্ট্র-মহম্মদ পর্যায়েরই একজন লোকহিতৈষী ধর্মগুরু, অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম আধ্যাত্মিকতার অন্যতম প্রবক্তা ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। রসিককৃষ্ণের অধ্যাত্মদর্শনে রামমোহনের প্রেরণা যে ক্রিয়াশীল তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট্'-এ প্রকাশিত সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব সম্পর্কে বাগ্‌বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। এঁরা হিন্দু কলেজের ছাত্র, 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত ও ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাঁর অন্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্তর্গত। তারাচাঁদ ছিলেন নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয়—তাঁর নামযুক্ত ক'রে 'ফ্রেণ্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া' ঈষৎ বিদ্রূপভরে নব্যদলকে অভিহিত করেছিলেন 'চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শন্' নামে।

তারাচাঁদের কর্মকাণ্ড বিচিত্র ও বহুবিস্তারিত। তিনি ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র স্থায়ী সভাপতি, 'মেকানিক্স ইনস্টিট্যুট'এর কার্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য, 'বেঙ্গল বিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র অন্যতম সংগঠক, 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর', 'কুইল' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্‌লা, হিন্দুস্থানী, ফার্‌সী ও ইংরেজি ভাষাসমূহে সুপণ্ডিত, মূল 'মনুসংহিতা'র সম্পাদক ও এদেশে প্রগতিশীল রাজনীতি-চর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক। অপর দিকে, তারাচাঁদ ছিলেন রামমোহনের পরম স্নেহভাজন শিষ্য। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে ইনি ও চন্দ্রশেখর দেব রাম-মোহনের দুই হস্তস্বরূপ গণ্য হতে পারেন। এঁদেরই পরামর্শক্রমে অ্যাডামের ইউনিটেরিয়ান উপাসনাগৃহে নিয়মিত যাওয়ার পরিবর্তে রামমোহন সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার নির্বাহহেতু এক স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করেন ও ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়। ১২৩৫ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে) রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ৬ ভাদ্র ১২০৫ বঙ্গাব্দে (২৩ আগস্ট, ১৮২৮) অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশন উপলক্ষে আচার্যরূপে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে উপদেশ দেন তারাচাঁদই তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই সকল ঘটনাই রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা সূচিত করে। চন্দ্রশেখর দেবের সঙ্গেও রামমোহনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিও প্রথম যুগে ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত কিছু উপদেশাদির ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অগ্রহায়ণ, ১৭৯৪ শক সংখ্যায় প্রকাশিত 'Reminiscences of Rammohun Roy' শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি তাঁর গুরু রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরজীবনে খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামমোহনের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিমাপ করবার প্রশ্ন কোনও আধুনিক গবেষকের মনে উদয় হয় নি। কিন্তু তিনি স্বয়ং দৃঢ় ও দ্বিধাহীন ভাবেই রামমোহনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। প্রিভি কাউনসিল রক্ষণশীলগণের সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন-বিরোধী আবেদন অগ্রাহ্য করলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ক'রে ১০ নভেম্বর ১৮৩২ কলিকাতায় জোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মসমাজভবনে কলিকাতার ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়

নাগরিকবৃন্দের এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সতীদাহ বিরোধী সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছেদের নিমিত্ত তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করেন চন্দ্রশেখর দেব ও এর সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্যামলাল ঠাকুর ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংবাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত এই সভার যে বিবরণ ২৪ নভেম্বর ১৮৩২ সংখ্যা ইংরেজি-সংস্করণ 'সমাচার দর্পণ'-এ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে প্রকাশ: 'Baboo Chandra Sekhar Deb then moved that as the Raja had devoted much labour to this matter, thanks were likewise due to him. The motion was seconded by Baboo Shyamlal Thakoor and agreed to by all with great satisfaction. Sreejut Krishna Mohan Banerjee spoke at great length on this topic, and greatly enlarged on the zealous endeavours of the Raja for the abolition of the evil practices and customs of this country.'। দেখা যাচ্ছে রামমোহনের জীবদ্দশাতেই তিনি সতীদাহবিরোধী সংগ্রামের জন্য কলিকাতায় প্রকাশ্য জনসভায় অভিনন্দিত হয়েছিলেন ও এই অভিনন্দন প্রদানের ব্যাপারে দুই ডিরোজিও-শিষ্য চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণমোহন অগ্রণী। এই শ্রদ্ধা কৃষ্ণমোহন আজীবন পোষণ করে গিয়েছেন। 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে (জানুয়ারী-জুন ১৮৪৫) কৃষ্ণমোহন 'The Transition States of the Hindoo Mind' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই রচনার অন্তর্ভূক্ত তাঁর রামমোহনের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণ করেনি। মনে রাখতে হবে কৃষ্ণমোহন একাধারে ডিরোজিও-শিষ্য ও খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক—ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল না—বরঞ্চ সুস্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ: 'The name of Rajah Rammohun Roy cannot be unknown to any in Europe or Asia. Endowed with a vigour of mind and acuteness of intellect far above his age, this extraordinary personage sought to reform the faith and the worship of his countrymen by the introduction

of European ideas and customs and the translation and composition of religious tracts, not only in the vulgar dialect of Bengal, but also in foreign or what his predecessors would have designated the **Mletcha** vocables of English. This gave rise to a new era in native opinions. The **Brahma Samaj** which he established on the Chitpore road, tore up for the first time in India the sacred veil that had enveloped the Vedas. That which the primitive Brahmins had accounted too holy to be publicly exposed—into which the Sudra and the woman and even the unconsecrated or degraded Brahmin were forbidden to pry, was now read and translated to crowds of wondering hearers in the Vedantic chapel. Exposition of the ancient scripture which would have filled Manu and Vyasa with horror, were now boldly put forth as their true interpretation. A new picture of Hinduism was presented totally distinct from the old............Rammohun Roy's memory we cannot but venerate. A patriot and a philosopher—and that in the true sense of the words, he certainly was......... Possessed as he was of a moderate fortune the liberality with which he spent it in the service of his countrymen was a noble evidence of his regard for their improvement. His pecuniary sacrifices were only equalled by his sacrifice of his personal exertions. Never did a man labour more indefatigably as an amateur reformer. Never did we see a voluntary instructor of his species more untiring in his efforts to do good. Nor have we ever heard of an individual who could embody like Rajah Rammohun the thoughtful patience of a philosopher, the disinterested energy of a patriot and the courtesy and amiability of the

gentleman. It is impossible for us not to honour the memory of such a character .....he has conferred benefits which India can never forget. He has imparted an impetus to free enquiry which must sooner or later lead to the knowledge of truth. He has inflicted a blow upon the corrupt and superstitious fabric idolized by his countrymen which must eventually cause its destruction।' রামমোহন কি পরিমাণে তরুণ কৃষ্ণমোহনের চিত্তকে আলোড়িত করেছিলেন—এই বিবৃতিতেই তার প্রকাশ। সম্ভবতঃ রামমোহনের মণ্ডলীভুক্ত সমসাময়িকগণের মধ্যেও বেশী লোক রামমোহন সম্পর্কে এমন অকুণ্ঠ ও উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন নি।

মৃদুস্বভাব, বিনয়ী, মিষ্টপ্রকৃতি অথচ দৃঢ় চরিত্র শিবচন্দ্র দেব ডিরোজিওর অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ। ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি কলিকাতায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নিয়মিত যোগ দিতেন—ও উত্তরকালে বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সব কটি পর্বের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-নিয়ন্ত্রিত আদি ব্রাহ্মসমাজের তিনি সভ্য ছিলেন; পরে যখন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, শিবচন্দ্র বিবেকের অনুপ্রেরণায় কেশবের অনুগামী হন, শেষপর্যন্ত তাঁকে দেখা যায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তরুণ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণের বিদ্রোহের নায়করূপে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম সম্পাদক ও উত্তরকালীন সভাপতি। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শিবচন্দ্রের যোগাযোগের কথা স্মরণ রেখেই শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট রামমোহন-জীবনী প্রণয়ন-কালে এই পর্বের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য তাঁর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেছিলেন। কর্মস্থল মেদিনীপুর ও জন্মস্থান কোন্নগরেও শিবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—রামমোহনের জীবনদর্শনে সেই মুক্ত চিত্ত আশ্রয় পেল।

ডিরোজিও-মণ্ডলীর অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্যারীচাঁদ মিত্র (বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্বনামধন্য টেকচাঁদ ঠাকুর) গুরুর শিক্ষায় ও সাহচর্যে উদ্বুদ্ধ ও

অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও কখনও ধর্মবিশ্বাস হারান নি। তবে গুরুপ্রসাদে সর্বদা স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হবার যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন—তারই ফলে উত্তরকালে তাঁর জীবনদর্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতিমাপূজা ও লৌকিক আচারে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনি প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে তাঁর স্বরচিত 'On the Soul' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নিজের সাক্ষ্য এই: 'I was born in 1814 and was brought up as an idolator. I received my education at the Hindu College. I came in contact with a number of congenial friends with whom I had periodical discussions on metaphysics, theology, politics and other subjects. My desire to understand God and his Providence was earnest from my reading of standard works on those subjects and theistic and Christion authors, as well as Arya works in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there is but one God of infinite perfection. I became a theist or a Brahma'। তাঁর বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবের মত ছাত্রাবস্থাতে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু উক্ত ভূমিকায় যে Arya works in Sanskrit and Bengali-র প্রসঙ্গ আছে তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ যে রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্পাদিত ও অনূদিত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদি এর পরোক্ষ প্রমাণ প্যারীচাঁদের 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) প্রভৃতি গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। 'যৎকিঞ্চিৎ' আরম্ভ হয়েছে রামমোহন রচিত সুপরিচিত ব্রহ্মসংগীতের দুই পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দ্বারা:

'ভাব সেই একে—
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।'

'যৎকিঞ্চিৎ' গ্রন্থের উপসংহারে প্যারীচাঁদ ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'এই ধর্ম বিশ্বব্যাপক—স্বাভাবিক—শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে না। যদি কোন কারণবশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় স্বভাব জন্য

ঐশ্বরিক ভাব ধারণপূর্বক শ্রেণীনাশক ও সর্বব্যাপক অবশ্যই হইবে। দিবাকর পর্বতের পার্শ্বে উদিত হইলে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না কিন্তু পরে কে না দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত ভাবেতেই এই ধর্মের প্রকাশ—ইহার গতি অদ্রুত অথচ নিশ্চয়। প্রস্তরভেদী বারির ন্যায় ইহার কার্য আপনার আনুকূল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম যিনিই অবলম্বন করুন তাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্যই হইবে। এ ধর্ম সমুদ্রস্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদনদীস্বরূপ যত ধর্ম আছে তাহা কালেতে এই ধর্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্মই নিত্যধর্ম—এইই সত্যধর্ম—এইই ব্রাহ্মধর্ম।' এই প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১) শীর্ষক ব্রহ্মসংগীত পুস্তকখানিও বিবেচ্য। এটি প্রতিপদে রামমোহনের 'ব্রহ্মসংগীত' (১৮২৮) কে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষে প্যারীচাঁদের কোনও ভূমিকা ছিল না। ধর্মজীবনে আত্মোন্নতিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁর রচনাবলী স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়—আত্মাতে পরমাত্মার পূর্ণ উপলব্ধিকেই তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ জ্ঞান করেছেন। পরিণত বয়সে পরলোকচর্চা, থিয়সফি, যোগসাধন প্রভৃতি রহস্যময় মার্গের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আকর্ষণ দেখা গেলেও তিনি কখনও একেশ্বরবাদ ও ব্রহ্মবাদে বিশ্বাস হারান নি—যেমন পরিণত বয়সে যথেষ্ট পরলোকচর্চা করেও শিশির কুমার ঘোষ তাঁর বৈষ্ণবধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা অটুট রেখেছিলেন। ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার পরিপূরক রূপে রামমোহনের ভাবধারায় উত্তরণের আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুতরাং এই প্যারীচাঁদ মিত্র।

শান্ত, সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্তি রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কে খুব বেশী কিছু বলবার নেই। ইনি মনীষায় তাঁর সমকালীন সুহৃদ্‌বর্গ ডিরোজিওর অন্যান্য শিষ্যগণের সমকক্ষ না হলেও চরিত্রবলে, সত্যনিষ্ঠায় ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্থহীন আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, স্বভাবের মৃদুতাসত্ত্বেও, ইনি অগ্রণী। ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে সর্বপ্রথম (১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে) উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সমকালীন ব্রাহ্মসমাজে তখনও উপবীত বর্জন ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন সুরু হয় নি। এর পরে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে গেব্রিটির

উদ্যানে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সম্মিলনে ব্রাহ্মগণের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব আলোচিত ও সমর্থিত হয় ও সমসাময়িক ব্রাহ্মসমাজের অত্যগ্রসরদলভুক্ত রাখালদাস হালদার উপবীত ত্যাগ ক'রেও পিতার তৃপ্তির জন্য পুনরায় তা গ্রহণ করেন। উপবীত বর্জনের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এ-ব্যাপারে রামতনু লাহিড়ীই পথপ্রদর্শক। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেও ইনি সমাজের আভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষ থেকে সর্বদা দূরে থেকেছেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের মধ্যে এই অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটি সুনিশ্চিতরূপেই আর এক যোগসূত্র।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিও-শিষ্যগণের মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাধিক দুঃসাহসিক ও রোমান্টিক্ প্রকৃতির মানুষ। ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য এবং পারিবারিক মিত্র ও ডেভিড্ হেয়ারের প্রীতি ও আস্থাভাজন এই যুবক—তরুণ বয়সে কেবলমাত্র সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি; বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁর রোমান্স্ ও এর পরিণতিস্বরূপ উভয়ের সিভিল বিবাহ সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ জনচিত্ত-আলোড়নকারী ঘটনা। এই বিবাহ একাধারে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ। উত্তরজীবনে দক্ষিণারঞ্জন লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমত ও বিশ্বাসের এক বিবরণ রেখে গিয়েছেন তাঁর সুহৃদ্ রাজনারায়ণ বসু নিজ 'আত্মচরিত'এ। রাজনারায়ণের সাক্ষ্য 'দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ্ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন……দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদ্‌কে এত মান্য করিতেন, কিন্তু আমাদিগকে ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। …কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হওয়া কর্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন, তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে 'ওঁ' অংকিত তক্‌মা পরাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের ভার……নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির

করেন। যে দিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র উদ্‌ঘোষিত হয়, সেইদিন মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন বাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্যবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড লক্ষ্ণৌএ অবস্থান কালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন।' শেষোক্ত সংবাদটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সিপাহী-বিদ্রোহের প্রতি ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজের মনোভাব অনুকূলে ছিল না এবং ইংরেজ শাসনকে তাঁরা দেশের পক্ষে হিতকারী মনে করতেন। দক্ষিণারঞ্জন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। কিন্তু রামমোহনের ভাবধারা তাঁর চিত্তকে কি পরিমাণ অধিকার করেছিল রাজনারায়ণের সাক্ষ্য সে সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল।

তৎকালীন তরুণগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ডিরোজিও-শিষ্য রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল কিনা জানা যায় না—তবে রামমোহন-বন্ধু অ্যাডামের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ রামমোহন সম্পর্কে উভয়ের আলোচনা হত। তাঁর বন্ধু চট্টগ্রামের ডেপুটি কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে ২৪ নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখে এক পত্রে রামগোপাল লিখছেন: 'I have lately received a kind letter from Mr. W. Adam who is now living at Boston with his family. He sent me a United States Periodical containing a characteristic article from his pen defending the character and labours of Rammohun Roy from the attacks of a missionary traveller Mr. Malcolm.' (রামগোপাল সান্যাল A General Biography of Bengal Celebrities Vol. I. Calcutta 1889, পৃঃ ১৮০)। রামমোহন যে রামগোপালের চিত্তকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে রাজনারায়ণ বসুর রচনায়। রামগোপালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল অকুতোভয়তা ও সর্ববিধ প্রচলিত-আচার-বিমুখতা। রাজনারায়ণ একবার দুর্গাপূজার সময়ে রামগোপালের স্বগ্রাম বাঘাটিতে তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন বাড়ীর পূজায় রামগোপাল কোনও ভাবেই যোগ দিলেন না এক সর্বশেষে শান্তিজল গ্রহণ ছাড়া। তারপরেই তাঁরা রামগোপালের নিজস্ব স্টীমার 'লোটাস্'এ আরোহণ

ক'রে জলপথে বাঙলাদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। মহানন্দা নদীতে একস্থানে তাঁরা অত্যন্ত খরস্রোতের মধ্যে পড়েন যা ঠেলে স্টীমারের অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব হল। সবাই রামগোপালকে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। উত্তরে রামগোপাল বলেন: 'ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (boiler) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই তাহাতে ক্ষতি কি?' অতঃপর রাজনারায়ণের ভাষায়'·· ···স্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ······ঈশ্বরেচ্ছায় কোন প্রকারে পার হইল। ·· যেমন পার হইল অমনি রামগোপাল বাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়," কেবল "অন্যের" শব্দ পরিবর্তন করিয়া গান গাইতে লাগিলেন "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়".' দেখা যাচ্ছে পরম সংকটমুহূর্তে রামগোপালের চিত্তের ভয়শূন্যতার মূল প্রেরণা রামমোহনের ব্রহ্মসংগীত।

সম্প্রসারিত অর্থে যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীভুক্ত রূপে সচরাচর গণ্য হয়ে থাকেন, সেই কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলবার প্রয়োজন নেই। রামমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগী ও তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কিশোরীচাঁদ, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও স্বদেশী ভাবধারার জনক রাজনারায়ণ, রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির কীর্তিকলাপ সুপরিচিত। 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে (১৮৪৫) কিশোরীচাঁদ রামমোহন সম্পর্কে যে দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছিলেন তার জীবনী-অংশ ত্রুটিহীন না হলেও মূল্যায়ন-ভাগটি লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রণিধানযোগ্য। এই অংশ থেকে কিছু উদ্ধার ক'রে বর্তমান প্রসঙ্গে ছেদ টানা যেতে পারে: 'He was a man whose genius and energy under happier circumstances, might have achieved a complete moral revolution among his countrymen. He was by nature one of those who lead, not one of those who follow—one of those who advance, not one of those who are behind their age, ...The life of Rammohun Roy was commensurate with

one of the most important and stirring periods in the annals of this country. It embraces the commencements of that great social and moral revolution through which she is now silently but surely passing ...He helped to break the crust of that rigid and unbroken superstition which had braved the formidable attacks of the Buddhist and the fierce persecution of the Mahommedan. No native had before been enlightened and bold enough to do anything of the kind. He was the first who opened the eyes of his countrymen to the monstrous absurdities of their national creed. ..... The time is coming .....when the millions of Hindustan who now exhibit a heart-rending spectacle of the prostitution of all that is sublime in religion and divine in worship. shall be liberated from the thraldom of ignorance and bigotry and superstition—learn to love and obey and adore the one true and living God.'। এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদের বক্তব্য—রামমোহনের ধর্মমত সমস্ত শাস্ত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ও বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এর সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন Theophilanthropy বা ঈশ্বরবিশ্বাস ও লোকশ্রেয়সের সমন্বয়। অভিধাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে কিশোরীচাঁদ স্বয়ং অগ্রণী হয়ে স্থাপন করেছিলেন Hindu Theophilanthropic Society নামক সংস্থা। সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

ডিরোজিওর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী ও সাধারণ ভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণ যে রামমোহন সম্পর্কে কি পরিমাণ শ্রদ্ধাবান ছিলেন ও রামমোহনের ভাবাদর্শ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল ঐতিহাসিক তথ্যের আনুপূর্বিক আলোচনায় তার কিছু আভাস পাওয়া গেল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীর প্রথম যুগে রামমোহনের প্রতি উচ্চারিত 'হাফ্-লিবারেল' অভিধা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদকতা-প্রসূত সাময়িক উচ্ছ্বাসের বেশী আর কিছু নয়। এই সমালোচনার মধ্যে যেটুকু

সত্য আছে তা মুখ্যতঃ রামমোহনের কিছু কিছু অনুবর্তীর পক্ষেই সত্য। রামমোহন সম্পর্কে এই তরুণ-গোষ্ঠীর মনোভাবে আদি পর্বে যদিও কোনও বিরূপতা থেকেও থাকে (তারাচাঁদ, চন্দ্রশেখর, শিবচন্দ্র প্রভৃতির কথা মনে রাখলে তাও অবিশ্বাস্য মনে হয়) রামমোহনের জীবদ্দশাতেই, এমন কি তাঁর ভারতত্যাগের পূর্বেই, তা অপসারিত হয়েছিল এবং তার স্থান নিয়েছিল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। একথা কোন ক্রমেই মানা চলবে না যে রামমোহনের প্রভাবপরিমণ্ডলের মধ্যে এঁরা আসতে পারেন নি কেননা তাঁর কলিকাতা বাসকালে ও বিদেশগমনের সময়ে এঁরা সকলে ছিলেন অপরিণতবয়স্ক বালক। বয়সের ব্যবধান ভাবশিষ্য হবার পথে কোনও বাধাই নয়, এমন কি এর জন্য পরস্পরের ব্যক্তিগত সাহচর্য বা সমকালীনতা না থাকলেও কোনও অসুবিধা হয় না। সাম্প্রতিক কালে যদি কেউ নিজেকে প্লেটো, শংকর বা মার্ক্সের ভাবশিষ্য বলে চিহ্নিত করেন, তাহলে নিশ্চয় বোঝাবেনা যে তিনি উক্ত মনীষীদের সমক লীন বা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের অন্তরঙ্গ। ডিরোজিও-শিষ্যগণের কেউ বা রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তাঁর চিন্তা ও কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করবার উপযুক্ত মানসিক পরিণতি অল্প বয়সেই অর্জন করেছিলেন; আবার কারও কারও বা তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটেনি—কিন্তু তাঁর ভাবধারা তাঁদের চিত্তকে কালক্রমে অধিকার করেছে ও জীবনকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করেছে। বস্তুতঃ ইতিহাসের নির্ভুল সাক্ষ্য এই, যে এঁদের জগৎ ও রামমোহনের জগৎ পৃথক ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুটি স্বতন্ত্র পৃথিবী নয়, প্রগতির দুই ধারা এখানে পরস্পরের পরিপূরকরূপে ব্যক্তিগত স্তরে সম্পূর্ণ মিলেমিশে গিয়েছে। এদের একটিকে 'রেনেশাঁস্' ও অপরটিকে 'রিফর্মেশন্' আখ্যা দিয়ে পৃথক কল্পনা করা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছু নয়।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাড়াও আর একটি ঋণাত্মক ভূমিতে দুই গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের ছিল—সেটি হল রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক নিন্দা ও নির্যাতন। অবশ্য এখানে 'গোষ্ঠী' শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে একটু সতর্কতার, প্রয়োজন হবে। রামমোহন প্রায় আজীবন নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন কিন্তু কলিকাতায় যে মণ্ডলী তাঁর চারদিকে গড়ে উঠেছিল—তার অন্তর্ভুক্ত রামমোহনের বন্ধু বা পরিচিতবর্গকে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সামাজিক

নির্যাতন প্রায় স্পর্শ করেনি বলতে হবে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী বা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমসাময়িক হিন্দু সমাজে তাঁদের মর্যাদা হারান নি। তাঁরা অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাতে বজায় থাকে, সেজন্য স্বগৃহে প্রচলিত পূজাপার্বণের অনুষ্ঠানাদি বজায় রেখেছিলেন—যে জন্য রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' রামমোহনের তুলনায় তাঁদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দেন। অপর পক্ষে, রামমোহন বাল্যে গৃহ হতে বিতাড়িত, উত্তরকালে জননী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত ও সর্বধর্মের রক্ষণশীল প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক নিন্দিত ও নিপীড়িত। গোঁড়া মুসলমানসমাজ তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন, খ্রীস্টীয় বিরোধীগণ তাঁদের মুদ্রাযন্ত্রে তাঁর গ্রন্থাদি মুদ্রণ নিষিদ্ধ করেন—রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁর নিন্দাকুৎসায় পঞ্চমুখ হন, আদালতে তাঁর ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে মামলা উপস্থিত ক'রে বহুবার তাঁকে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেন ও সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন পাশ হবার পরে তাঁর প্রাণনাশের সুপরিকল্পিত প্রয়াস করেন। মামলাগুলি সবই ব্যর্থ হয়—কিন্তু রাধাপ্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত তহ্‌বিল তছরূপের অভিযোগটি রামমোহনকে এতই মর্মাহত করেছিল যে, তাঁর গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আদালতের নথিপত্রে এ-সবের যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে। গুপ্ত আততায়ীর ভয়ে তাঁকে কতখানি সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করতে হত তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা 'জন্ বুল্' পত্রিকা। লক্ষ্য করবার বিষয়, রামমোহনকে এই শত্রুতা মাত্র যে তাঁর দেশীয় বা ধর্মীয় বিরোধীগণের পক্ষ থেকে সহ্য করতে হয়েছিল তা নয়—ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীও এই বিরুদ্ধবাদী মনোভাবের ও চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন। বর্ধমানরাজের সঙ্গে রাধাপ্রসাদ রায়ের মামলা প্রসঙ্গে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষগণের একাংশের এই মনোভাব সমসাময়িক দলিলপত্রে অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত। ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছিল যে কর্ণেল জেম্‌স ইয়ং দার্শনিক জেরেমি বেন্থামকে লিখিত এক পত্রে এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই রামমোহন-বিরোধী মনোভাবের উৎপত্তি অবশ্যই ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর সার ফ্রেডেরিক হ্যামিলটনের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ঘটনা

থেকে। ইংরেজ রাজপুরুষের সম্মুখে দুর্বিনীত 'নেটিভ' কর্তৃক প্রদর্শিত অপরিসীম ঔদ্ধত্য তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তৃপক্ষ ক্ষমা করেন নি। রামমোহনদ্বেষী রক্ষণশীল হিন্দু-মনোভাবের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠানকালে 'অধ্যক্ষ-সভা' বা Board of Directors থেকে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তিহেতু রামমোহনকে বর্জনের ঘটনায়। সুবিখ্যাত হাইড্-ইস্ট-পত্রাবলীতেই এই বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত। এর তীব্র সমালোচনা করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৪-এ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রামমোহনের প্রথম স্মৃতিসভাতে—যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর, ১৮৩১ (৩০ আশ্বিন, ১২৩৮ বঙ্গাব্দ) সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ'-এ রক্ষণশীল-মনোভাবসম্পন্ন জনৈক হিন্দু এ-বিষয়ে উল্লাস প্রকাশ ক'রে এবংবিধ পত্র লিখেছেন: 'তাঁহার [রামমোহন রায়ের] আচার ব্যবহার হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎকালাবধি রামমোহন রায় হিন্দুদের ত্যাজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি। অনেকের স্মরণ থাকিবে যে পূর্বের চিফ্ জুস্টিস সর এড্‌বার্ড হাইড-ইস্ট্ সাহেব যখন হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগ্যবন্ত লোক উক্ত সাহেবের অনুরোধে এবং দেশের মঙ্গল বোধে অনেক অনেক টাকা চান্দা দিলেন ইহাতে হাইড্-ইস্ট্ সাহেব তুষ্ট হইয়া কলেজের নিয়ম করিয়াছিলেন তাহাতে এতদ্দেশীয় মহাশয়দের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ঐ পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধ্যে রামমোহন রায় গ্রাহ্য হইলেন না যে হেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে। দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় হিন্দুদের সমাজে গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে একজন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিলেন না—তাঁহাকে তদপদাভিষিক্ত করণাশয়ে সদর দেওয়ানী জজ্ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না।' এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখান থেকে ইংলণ্ডে পালিয়েও রামমোহনের নিষ্কৃতি ছিল না। ৩ নভেম্বর, ১৮৩২ সংখ্যা 'সমাচার-দর্পণ' সংবাদ দিচ্ছেন, গুজব রটেছে রামমোহন ইংলণ্ডে কোনও ইংরেজ রমণীকে বিবাহ করবার উদ্যোগ করেছেন। অতি সাধু উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা গুজব রটানো হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১

সংখ্যা 'ক্যালকাটা গেজেট' অনুসারে রক্ষণশীল পত্রিকা 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র এক লেখক ইংলণ্ড-প্রবাসে রামমোহনের অনুগামী ভৃত্যগণের নামগোত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ-ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল খুবই মহৎ—রামমোহনকে কোনও ভাবে জাতিভ্রষ্ট প্রমাণ করা। বস্তুতঃ দেশ ও সমাজ-সেবার মূল্যস্বরূপ রামমোহনকে আমৃত্যু এঁদের আক্রমণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শুধু তিনি নন, তাঁর কিছু কিছু বন্ধু ও শুভার্থীর ভাগ্যেও এই নির্যাতন জুটেছিল। 'সমাচার-দর্পণ'এর পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশটিতে দেখা যায় রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদেরও হিন্দু-কলেজ-অধ্যক্ষসভায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে একবার রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এ্যাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব উঠলে রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত দেব প্রবল আপত্তি জানিয়ে হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখেন (১৯ জানুয়ারী, ১৮৩২): 'For my part I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such on one that was once a Missionary, then a Vaidantic or disciple of Rammohun Roy and lastly an Unitarian'। এ্যাডামের সর্ববিধ যোগ্যতাসত্ত্বেও এই আপত্তির ফলে তাঁর চাকরী হয়নি। সতীদাহপ্রশ্নে রামমোহনের দল থেকে চাপসৃষ্টি ক'রে লোক ভাঙিয়ে নেওয়ার হীন চক্রান্তের নায়ক ছিলেন রক্ষণশীল দলের অপর প্রধান রামকমল সেন ও এ ব্যাপারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন হোরেস হেম্যান উইলসন। ইংলণ্ডে পোর্ট্‌ল্যাণ্ড সংগ্রহে রক্ষিত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের কাগজপত্রের মধ্য থেকে তাঁর সচিব ক্যাপটেন্ বেনসনকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের কোনও সময়ে লিখিত কলিকাতা শ্বেতাঙ্গসমাজের অন্যতম মুখপাত্র জেম্‌স ক্যালডারের একখানি তারিখহীন পত্রের (বয়ান পোর্টল্যাণ্ড সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি PW JF 451) সম্প্রতি বর্তমান লেখকের হস্তগত হয়েছে। তাতে ক্যাল্‌ডার লিখ্‌ছেন: 'I am sorry to say that Ramchandra Sarma—the Head Pandit of the College who is of Rammohun Roy's School and was expected to sign the address of the abolitionists has been prevailed upon to sign the anti-abolition Petition but I am afraid his real sentiments are with the

abolitionists. Ramcomul Sen is leading away all those connected with the College to oppose the abolition out of compliment to H. H. Wilson to whom he owes many things—I think it would be desirable for his Lordship to converse with Ramchandra Sarma on whose views on the Suttee question I shall let you know more on Monday'। কলেজ বলতে এখানে কলিকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও রামচন্দ্র শর্মা হলেন ঐ কলেজের অধ্যাপক রামমোহনের অনুবর্তী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ডিরোজিও ও স্থলবিশেষে তৎপ্রভাবিত 'ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একই রক্ষণশীল চক্র সমানভাবেই সক্রিয়। ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ থেকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয় নতুবা তাঁকে বরখাস্ত হবার অপমান সহ্য করতে হত। ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ অনুষ্ঠিত কলেজ-পরিচালকবর্গের এক সভায় ডিরোজিওকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার হিন্দুকলেজের পুরাতন কার্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে এই কলঙ্কময় দিবসে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা'র ৪১তম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যায় সেদিনকার অধিবেশনে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বিতাড়নের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন তিনজন—রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা একবাক্যে মতপ্রকাশ করেন যে তরুণ ছাত্রগণের শিক্ষক হবার পক্ষে ডিরোজিও অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তি (a very improper person to be entrusted with the education of youth) এবং হিন্দুকলেজ থেকে তাঁর অপসারণ একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু এঁরা সভায় এক স্মারকলিপি দাখিল করেন যার মধ্যে প্রয়োজন হলে ডিরোজিও-প্রভাবিত মেধাবী ছাত্রগণকে কলেজ থেকে বিতাড়ন ও সভা-সমিতিতে তাদের যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাবও ছিল। তবে সম্ভবতঃ ডিরোজিও-অপসারণ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করায় তারা এই নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত আর দু'একটি তথ্যের প্রতিও অধ্যাপক সরকার আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। এতে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে কলেজের পাঠক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে (নিয়মাবলী ১৩, ১৪, ১৬) এবং ডেভিড্ হেয়ারের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন আক্রোশের আভাসও এতে পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের প্ররোচনায় ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেও সভা স্বীকৃত হয় নি। হেয়ার এবং উইলসন ডিরোজিওর গুণমুগ্ধ হলেও নিরপেক্ষ থাকেন। উইলসনের পরামর্শে ডিরোজিও পদত্যাগ ক'রে বরখাস্ত হবার অপমান থেকে রেহাই পান। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সেদিনের অধিবেশনে একমাত্র সভ্য যিনি সাহস ও সততার সঙ্গে প্রথম থেকে ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন ও নির্ভীক ভাবে তাঁর অপসারণের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন তিনি রামমোহন-সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ডিরোজিওকে নির্দোষ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর অপসারণ আবশ্যক (necessary) মনে করেন নি কিন্তু কলেজ-পরিচালনের সুবিধার জন্য তিনি সরে গেলে ভাল হয় (expedient) এই জাতীয় মধ্যপন্থী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরকালে ডিরোজিওর শিষ্যবর্গও অনুরূপভাবে হিন্দু সমাজপতিদের আক্রোশের শীকার হন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজত্যাগের পর ডেভিড্ হেয়ারের পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর এই দুই শিষ্যের মনীষা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও বিতর্ক ছিল না। কিন্তু এঁরা সনাতনপন্থী বা আচারনিষ্ঠ নন—এই এঁদের অপরাধ। সুতরাং রাধাকান্ত দেব ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১-এ হুমকি দিয়ে ডেভিড্ হেয়ারকে পত্র লিখলেন: 'I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the Putuldanga School and consequently wish to know whether you are determined upon removing the outcasts from the school or retaining them to corrupt the Hindu pupils'.। অসহায় হেয়ার এঁদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও এঁদের রক্ষা করতে পারলেন না। রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনের চাকরী গেল। কর্মজীবনের এই নির্যাতন ছাড়াও 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত তরুণগণকে ব্যক্তিগত ভাবে আত্মীয়স্বজন ও সমাজের বিরূপতাও সহ্য করতে হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরতরে ও দক্ষিণারঞ্জন

মুখোপাধ্যায় সাময়িকভাবে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন; রসিককৃষ্ণ মল্লিককে আত্মীয়স্বজনের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ্য করতে হয়; রামগোপাল ঘোষ সামাজিক ভাবে স্বগ্রামবাসী কর্তৃক বর্জিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া রক্ষণশীল সাময়িক পত্রগুলির বিরূপ ও অশালীন আক্রমণতো ছিলই। এই তথ্যগুলি মনে রাখলে রামমোহন-ডিরোজিও ও ডিরোজিও-প্রভাবিত তরুণ-গোষ্ঠীর মধ্যে অভিজ্ঞতার রাজ্যে একটি সমভূমি আবিষ্কার করা কঠিন ঠেকবে না। একই শত্রুর বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রামে রত পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পার্থক্যসত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পেতে তাঁদের অসুবিধা বা বিলম্ব হয় না। রামমোহন সম্পর্কে রসিককৃষ্ণ বা কৃষ্ণমোহনের যে প্রশস্তি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এই আত্মীয়তার স্বর শোনা যায়। অবশ্য এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে এই রক্ষণশীল গোষ্ঠীর রামমোহন-নির্যাতন যত হিংস্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল—ডিরোজিও বা নব্যবঙ্গগণের বেলায় তা হবার উপায় ছিল না—কেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত প্রতিভাশালী যুবকগণ জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বমহিমায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও তাঁদের চরিত্র, কর্মদক্ষতা ও মনীষা সাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছিল। রক্ষণশীল সমাজের নিন্দা-কুৎসা এক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিষ্ফল হয়ে যায়।

রামমোহন, ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজপতিগণের যে নীতি আগাগোড়া এমন তীব্রভাবে সক্রিয় ছিল তার সমর্থনেও দু-একটি কণ্ঠস্বর সাম্প্রতিক গবেষণাক্ষেত্রে শোনা গেছে। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়ন-পর্বে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: 'রাধাকান্ত প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের মুখপাত্র হইয়া কলেজ রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে ডিরোজিওকে আহুতি দেওয়া হইল। ···· ···রাধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।' রামমোহন-শিষ্য অ্যাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রশ্নে রাধাকান্তের আপত্তি সম্পর্কেও যোগেশচন্দ্রের একই সিদ্ধান্ত। রসিককৃষ্ণ

মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে outcasts অভিযোগে চাকরী থেকে উচ্ছেদ করবার ব্যাপারে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি, সম্ভবত অপর দুটি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার পর তা বাহুল্য মনে করেই। ইদানীন্তন উনবিংশ শতকীয় নবজাগৃতির ইতিহাসে রাধাকান্তের ভূমিকাকে যাঁরা পুনর্মূল্যায়ন করতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ ডেভিড্‌ কফ্‌ ও ডঃ ভবতোষ দত্তের সিদ্ধান্ত অনেকটা অনুরূপ। ডঃ কফের মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর British Orientalism and the Indian Renaissance (১৯৬৯) গ্রন্থে। বর্তমান নিবন্ধে গ্রন্থকারের যুক্তিগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এর প্রতি পরিচ্ছেদে বস্তু-পরিচয় ও পরিপ্রেক্ষিত-চৈতন্যের এতই দৈন্য পরিস্ফুট যে সংশোধন ও সমালোচনা করতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে হয়। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তথ্যনিষ্ঠ—তিনি রাধাকান্তের জনহিতকর কার্যসমূহের সযত্ন ও নিপুণ আলোচনা করেছেন। 'ইতিহাস' পত্রিকা, 'কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর "রাধাকান্ত দেব' এ-বিষয়ে সত্যই সারগর্ভ আলোচনা। কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও-বিতাড়ন ব্যাপারে রাধাকান্তের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে যোগেশচন্দ্রের প্রতিধ্বনিই করতে শুনি: 'এ ক্ষেত্রেও রাধাকান্তকে দেখি সমাজ-নেতা রূপে। সমাজে যে ভাবে তিনি প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকে না সরিয়ে উপায় ছিল না।' এই যুক্তির সম্পূর্ণ তাৎপর্য সম্ভবতঃ শ্রদ্ধেয় নিবন্ধকার অনুধাবন করেন নি। এ প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই ওঠে—যে সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্য ডিরোজিওর মত প্রতিভাশালী শিক্ষক ও চিন্তানায়ককে বিসর্জন দিতে হয়, ছাত্রগণের স্বাধীন জ্ঞানচর্চার পথে বাধাসৃষ্টি করতে হয় · তা কি আদৌ সংরক্ষণের যোগ্য? এই যুক্তি শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করলে বলতে হয় রক্ষণশীল চক্র যতগুলি অবৈধ ও অনুচিত কাজ করেছিলেন—যেমন হিন্দু কলেজ-অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের প্রবেশে বাধাদান, রামমোহনের নামে নিন্দা-কুৎসা রটনা—এমন কি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা, ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগণ সম্পর্কে নানাবিধ অতিরঞ্জিত অসত্য ও অর্ধসত্য প্রচার—অ্যাডামের মত মনস্বী শিক্ষাবিদের হিন্দু কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদানে আপত্তি, রসিককৃষ্ণ-কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে অপসারণ—

সবগুলিরই দেশের ও সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষা করবার জন্ম প্রয়োজন ছিল—তা না হলে সমাজ-ব্যবস্থার সবটাই 'চোরাবালিতে হারিয়ে যেত'। স্বাধীন মত ও বিশ্বাস পোষণের মূল্যস্বরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে ও কালে বহু আদর্শনিষ্ঠ মনীষী কঠোর নির্যাতন বরণ করেছেন—প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। উপরের যুক্তি অনুসরণ করে এঁদের নির্যাতনকারীরাও বলতে পারতেন এবং বলেও এসেছেন যে রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলের জন্মই এঁদের পীড়ন বা হত্যা করা হয়েছে তা না হলে স্থিতাবস্থায় বিপর্যয় ঘটে সমাজ 'চোরাবালিতে হারিয়ে যেত'। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি কিন্তু মূল্যবোধের প্রশ্ন। প্রাচীনপন্থী দল সমাজের যে সব আচার ও সংস্কারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—যুগ-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা যে বহুকাল নিঃশেষিত, এই সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। রামমোহন-ডিরোজিও-নব্যবঙ্গের বিরোধিতা করা যে ইতিহাসের গতিরোধ প্রয়াসেরই নামান্তর এই বোধ রাধাকান্ত ও তাঁর সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ছিল না। রাধাকান্ত কিছু জনকল্যাণমূলক কর্মে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তারকর্মে, অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক আলোচনা করলে—তদানীন্তন সমাজোন্নয়ন পর্বে এই ভূমিকাকে কিছুতেই প্রগতিশীল বলা যাবে না। যুগ পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর কোনও স্পষ্ট ধারণা যে ছিল এমন প্রমাণ নেই। ধর্ম, সমাজ, এমন কি শিক্ষা সম্পর্কে কোনও গভীর চিন্তা যে তিনি করেছিলেন তার কোনও নিদর্শন কোথাও নেই। সতীদাহ প্রথা উঠে যাবার দীর্ঘকাল পরেও উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে উইলসনকে লিখিত ও ইংলণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল, সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত (পৃঃ ২০৯-২২০) দীর্ঘ পত্রে তাঁকে এই প্রথার জন্য হিন্দু হিসাবে গর্ব বোধ করতে ও এর উচ্ছেদের জন্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায়। বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তন-সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের প্রবলতম রক্ষণশীল প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনিই। ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের মৌলিক চিন্তা তাঁর থাকলে ইউনিটেরিয়ান অ্যাডামকে তিনি কখনও বৈদান্তিক বলে উল্লেখ করতেন না। অ্যাডাম রামমোহনের প্রভাবে খ্রীস্টীয় ত্রিত্ববাদ বা Trinitarianism পরিত্যাগ

ক'রে খ্রীস্টীয় একেশ্বরবাদ বা Unitarianism অবলম্বন করেছিলেন—কদাপি বৈদান্তিক হন নি। বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর বিরূপতাই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাধাকান্ত দেব বা রামকমল সেন নবযুগোপযোগী চরিত্র নন। এঁদের সমপর্যায়ের গোষ্ঠীপতি ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধ্যযুগেও বিরল ছিলেন না—যাঁরা দানপুণ্য করতেন,—টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষণে অগ্রণী হতেন, জ্ঞানী-গুণীকে বৃত্তি দিতেন, দীঘি কাটাতেন, ধর্মশালা ও এতিমখানা নির্মাণ করতেন,—অনেক সময়ে পণ্ডিতগণের সাহায্যে অধ্যয়ন, এমনকি স্বনামে গ্রন্থ রচনাও করতেন—আবার প্রচলিত বর্ণভেদ ও জাতিবিভাগকে সযত্নে রক্ষা করতেন—সর্ববিধ যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কারকে নির্বিচারে সমর্থন করতেন ও প্রশ্রয় দিতেন—স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতেন ও বিরোধীপক্ষের ধোপা-নাপিত বন্ধ করতেন। এঁরা গতানুগতিক মনোভাবের প্রতীক—নবযুগের প্রগতিশীল মানসিকতার সঙ্গে এঁদের তিলমাত্র সংস্রব নেই। একযোগে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থন ও সম্প্রসারণের ও সামাজিক ও ধর্মীয় অচলায়তন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ক'রে চললে যে হাস্যকর স্ববিরোধের সৃষ্টি হয় তা তলিয়ে দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি এঁদের ছিল না। নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা 'এনাক্রনিজ্‌ম্' ছাড়া আর কিছু নন। নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর দুই প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন তা রামমোহন-ডিরোজিও-সংক্রান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের যোগ্য প্রত্যুত্তর। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি রাধাকান্তের আচরণ প্রশংসনীয় হয় নি—পটলডাঙা স্কুলের শিক্ষকপদ থেকে যোগ্যতাসত্ত্বেও কৃষ্ণমোহনের অপসারণের জন্য রাধাকান্তের সংকীর্ণ মনোভাব ও অন্যায় জেদই সম্পূর্ণ দায়ী। তা সত্ত্বেও, ১৪ মে, ১৮৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রাধাকান্তের স্মৃতিসভায় কৃষ্ণমোহন শিক্ষাবিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা ক'রে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু রাধাকান্ত যে নবযুগের পটভূমিতে সম্পূর্ণ বেমানান এই কথাটি তিনি অতি ভদ্রভাবেই তাঁর ভাষণে নিবেদন করেছেন: 'To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his junior by more than half a century .... A man in this respect can only

be compared with his own contemporaries. Judged by such a standard the Rajah would certainly appear not behind but in advance of his equals in age.' অর্থাৎ—রাধাকান্ত নবযুগের উপযুক্ত প্রগতিশীল চরিত্র নন—আরও অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর অথবা তারও পূর্বে এই জাতীয় চরিত্রকে কালোপযোগী বিবেচনা করা যেতে পারত। যোগেশচন্দ্র বাগল ও ভবতোষ দত্ত—দুজনেই কৃষ্ণমোহনের ভাষণের এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন বটে—কিন্তু এটি যে ব্যাজস্তুতি সে কথাটি তাঁরা খুলে বলেন নি কেন বোঝা দুষ্কর। শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্রকে মন খুলে প্রশংসা করবার অভ্যাস যে কৃষ্ণমোহনের ছিল তা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত রামমোহন-প্রশস্তি পাঠ করলেই জানা যায়। কিশোরীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও-শিষ্য না হলেও সম্প্রসারিত অর্থে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামধেয়। রাধাকান্ত সম্পর্কে তাঁর উক্তিতে তিনি এতটা সংযমের পরিচয় দেন নি: The superstitious element which had been mild in his father Gopeemohun and torpid in his uncle Raja Rajkissen assumed in him an aggressive development. It is therefore not to be wondered at, that his attachment to the antiquated customs and usages of his country, was as devoted as his advocacy of educational measures was zealous. In him the argument had a stronghold that what had lasted a long time, must be right and was intended to last. The reverence for existing usages which is strong in human nature was stronger in Radha Kanta Deb. His belief in the wisdom of his ancestors was unlimited. Thus impressed he proved during the latter end of his life an anachronism.' * রামমোহন সম্পর্কে কিশোরীচাঁদের পরম শ্রদ্ধা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত রামমোহন বিষয়ক ইংরেজি নিবন্ধেই সবিশেষ প্রকাশিত। সুতরাং এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগও আছে। রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকান্ত-রামকমল-ভবানীচরণ প্রমুখ পরিচালিত রক্ষণশীল ধর্মসভাগোষ্ঠী। রামমোহন ও

* রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে কিশোরীচাঁদের উক্তি Calcutta Review 1867: ডঃ ভবতোষ দত্ত কর্তৃক তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

রাধাকান্ত সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন ও কিশোরীচাঁদের বিভিন্ন সময়ের উক্তিতে এই দুই পক্ষের প্রতি নব্য বঙ্গগোষ্ঠীর মনোভাবের পরিপূর্ণ বৈসাদৃশ্য প্রতিফলিত।

ডিরোজিওর শিষ্যগণ গুরুর নিকট যে মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন তার একটি হল স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অপরটি নৈতিক সততা। ডিরোজিও আর কিছুকাল জীবিত থাকলে কোন্ গঠনমূলক পন্থায় তাঁদের এই আদর্শগুলির প্রয়োগ করবার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দিতেন তা জানবার উপায় নেই। তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায় নব্যবঙ্গগোষ্ঠী ছাত্রাবস্থা থেকেই নানা সভাসমিতি সংগঠন ক'রে সেইগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত করেছিলেন। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) ও তার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত সাতটি সভা, শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত 'এপিস্টোলারি এসোসিয়েশন' বা 'পত্রালাপ-সমিতি', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন্ অফ জেনারেল নলেজ' (১৮৩৮) বিগত শতাব্দীর কুড়ির ও তিরিশের দশকে এই ভাবাদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র কর্ণধারগণ যথা—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এর পরিদর্শক ডেভিড্ হেয়ার—সকলেই ডিরোজিও ও রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তরুণগোষ্ঠী রক্ষণশীল ধর্মসভাপন্থীগণের তীব্র সমালোচক। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র রূপেই বর্ণিত সংস্থাগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—এদের উপযুক্ত সাধারণ সংজ্ঞা হল আলোচনা-চক্র বা study circle। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ এই সভাগুলি দিতে পারে নি—দেওয়ার সুযোগও এগুলির ছিল কিনা সন্দেহ। উদ্বুদ্ধ তরুণ মানস সর্বপ্রথম একটি ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি ও কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেল যখন ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের সঙ্গে এই সভার জন্মকাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রথম বয়সে স্বীয় ধর্মজিজ্ঞাসার কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীব্র মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন, সেই মুহূর্তে (সম্ভবতঃ ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের কোনও সময়ে) তিনি রামমোহন-সম্পাদিত 'ঈশোপনিষদ্'এর একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে

পান ও তার প্রথম শ্লোকটির ('ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' ইত্যাদি) মর্মার্থ অবগত হয়ে ঈপ্সিত শান্তি লাভ করেন। এর পরেই তাঁর উপনিষদ্ অধ্যয়ন, প্রচলিত হিন্দুধর্মে অনাস্থাসঞ্চার ও রামমোহন-প্রচারিত ব্রহ্মবাদ অনুশীলন—ফলে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সৃষ্টি। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী সংগঠন রূপে গড়ে তোলা। সভার ১৭৬৮ শকের (১৮৪৬-৪৭ খ্রীস্টাব্দ) 'সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-নিরূপণ-পুস্তক'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'কিয়ৎকাল হইতে এদেশে যথার্থ পরমেশ্বরের উপাসনা লুপ্ত হওয়াতে লোকসকল অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার কাল্পনিক ধর্মের অনুষ্ঠানে অনর্থক কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবিধ প্রকার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহার উপাসনাকেই পরম ধর্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন।······তদুপলক্ষে উপাসক-ভেদে পরস্পর দ্বেষ-ঈর্ষার বাহুল্য হইয়া উঠিল। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে পরস্পর ঐক্যতারও শিথিল হইল। ···এতদ্রূপ দুরবস্থা সময়ে সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি নানাবিধ শাস্ত্রের বিধিদর্শী হইয়া তদ্বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেন। ···তিনি এই বেদপ্রণীত একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে তজ্জন্য তাঁহার আত্মীয় কি অপর অনেকেই তাঁহার বিপক্ষতাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ম্লান না হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে যত্ন করিতে একদিনের নিমিত্তেও অনুৎসাহী হয়েন নাই। ···কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকো পল্লীতে এক ব্রাহ্মসমাজ তিনি স্থাপন করিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে ঐ সমাজে উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যান ও পরমার্থঘটিত সংগীতাদি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা বিশিষ্ট রূপে হইতে পারে। ···তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর আয়াসে কিয়ৎদিবস ঐ সমাজের কর্ম একপ্রকার নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মসমাজের এ প্রকার অবসন্নতা হইল যে পাঁচ ছয় ঊর্দ্ধ সংখ্যা আর সমাজে দৃষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ের আলোচনা বা আন্দোলন লুপ্তপ্রায় হইল। ···মহাত্মা রাজার সমকালবর্তী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন। এ দেশের কাল্পনিক

ধর্ম নিরাকরণপূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই এ সভার সংকল্প, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম এই ধার্য আছে যে "বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন"।' সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১ ভাদ্র, ১৭৬৬ শক (১৮৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্দ) সংখ্যায় ইংরেজিতে এই বিবরণের সার মর্ম দিয়েছেন: 'The members are fully aware of the extent to which the cause of religion was carried during the time of the celebrated Rammohun Roy But it is no less a fact that, in his lamentable demise, it received a shock from which it was feared it could hardly have recovered. The exertions of the Tuttuvodhini Society, however, have imparted renewed energies to the cause।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায় প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাদি কাজ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের কাজ সভা করবে। উভয় সংস্থার এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং অবশেষে ১৭৮১ শকাব্দে (১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভা তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে যায়। ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯—এই কুড়ি বৎসর বাঙলার নবজাগৃতির ক্ষেত্রে এই সভা ছিল বিভিন্ন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মিলনভূমি ও কর্মকেন্দ্র। এর সভ্যসংখ্যা একসময়ে আটশতেরও অধিক হয়েছিল—সে যুগের পক্ষে যা সত্যই বিস্ময়কর। ব্রাহ্মসমাজ-সংগঠন, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতের পুরাতত্ত্ব-চর্চা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ ও খ্রীস্টধর্মের প্রসাররোধ, জমিদার ও নীলকরগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকগণের পক্ষ সমর্থন, পরোক্ষ রাজনীতি-চর্চা, সাংবাদিকতা, বাঙলা সাহিত্য-চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর জীবৎকালে সভা সর্বদা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে দেশে এক প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। সভ্যদলের মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, লালা হাজারীলাল, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর

মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, প্যারীমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি। দেখা যাচ্ছে তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর প্রায় সব কজন প্রধানই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরম অনুরাগী হয়েও রামমোহন ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও এ দেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ ছিলেন এবং এই দুই ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে নূতন জীবনদর্শন গঠনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' জাতীয় জীবনে এই আদর্শকে রূপ দান করবার ব্রতই গ্রহণ করেন। সভার অনুসৃত মার্গেই স্বাধীনচেতা, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী ডিরোজিও-শিষ্যগণ জীবনদর্শনের নবমন্ত্র লাভ করেছিলেন ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ছাত্রজীবনে তাঁদের মনে যে মাদকতার সঞ্চার হয়েছিল তার ফলে অত্যন্ত সাময়িকভাবে এই গোষ্ঠীভুক্ত কেউ কেউ হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন—কেন না উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য তারুণ্যেরই ধর্ম। এতদিনে সে বিচ্যুতি সম্পূর্ণ অপসারিত হল—এবারে তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মস্থ হলেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে প্রকৃত সৃষ্টিশীল পর্বের এখন থেকে আরম্ভ।

এই সূত্রে উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে স্থাপিত Hindu Theophilanthropic Society (বা 'বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা') ও পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্-সমিতি' নামক সংস্থাদ্বয়ের আদর্শ ও কর্মপন্থাও পর্যালোচনার যোগ্য। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১০মে প্রথমোক্ত সভাটি নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর অন্যতম মুখপাত্র রামমোহনের ভক্ত ও উত্তরজীবনে রামপুর-বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সংগঠক কিশোরীচাঁদ মিত্র স্বগৃহে স্থাপন করেন। ১৮৪৬ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল। এর মাসিক অধিবেশনে পঠিত এক গুচ্ছ প্রবন্ধ একত্র Discourses read at the meetings of the Hindu Theophilanthropic Society Vol. I নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ লিখেছেন: 'The object of the "Hindu Theophilanthropic Society" is the cultivation of moral and religious feelings. It is, as the very name implies, to promote love to God and love to man. The Society aims at the extermination of Hindu idolatry and

the dissemination of sound and elevated views of God, Futurity, Truth and Happiness. Though it is established for the purpose of promoting moral and religious culture irrespective of any revealed form and only by the study of duties and destinies of man as revealed by his constitution and the power, wisdom and goodness of God as manifested in nature, still its basis is broad and unexceptionable enough to admit the cordial co-operation of every good man, no matter to what creed he may belong.'। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অনুশীলন, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ, মানবপ্রেম ও উদার অসাম্প্রদায়িকতা প্রমুখ আদর্শগুলির একত্র সমাবেশ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না - এই সভা স্থাপনের মূলে রামমোহনের আদর্শ ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে স্পষ্টতর প্রমাণ আছে। 'ক্যালকাটা রিভ্যু' পত্রে (চতুর্থ খণ্ড, ১৮৪৫, পৃঃ ৩৯১) প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' সংক্রান্ত তাঁর সুপরিচিত ইংরেজি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ স্পষ্টই বলেছেন ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের সমন্বয়ের আদর্শ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে রামমোহনের মধ্যে—তাঁর জীবনদর্শনের যদি কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয় তাহলে তাঁকে বলতে হয় Theophilanthrophist ; 'হিন্দু থিওফিলানথ্রোপিক সোসাইটি' সেই আদর্শ ই অনুসরণ করে চলেছে। সভার অধিবেশনগুলিতে যাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থেকে প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন বা আলোচনায় যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্-সমিতি' ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরস্থ বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যুগ্ম-সম্পাদক : কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। কার্যনির্বাহক সমিতির ও সাধারণ সভ্যবৃন্দের তালিকায় নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিত—যথা প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, দিগম্বর মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি। বিধবা-বিবাহ প্রচলন,

বহুবিবাহ-নিরোধ, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রচলিত উৎসবানুষ্ঠানগুলি থেকে নিষ্ঠুর ও অশালীন আচার-আচরণসমূহের অপসারণ প্রভৃতি কাজে এই সভার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এখানেও দেখি রামমোহন ও ডিরোজিওর ভাবধারা একই স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ ক'রে একই খাতে একই লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য সংস্থাদ্বয়ের জন্ম—একথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এ যুগের প্রগতিশীল মনন ও কর্মজগতের প্রেরণার প্রধান উৎস 'তত্ত্ববোধিনী সভা'—তার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে আদর্শ কার্যকরী—উক্ত সংস্থাদ্বয়ের পশ্চাতেও তাই। এমনকি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' যাঁদের উদ্যোগে ও যাঁদের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাঁদেরই আমরা দেখি 'থিওফিলানথ্রোপিক্ সোসাইটি' ও 'সুহৃদ্-সমিতি'র কর্মকর্তা ও সভ্যরূপে। এ যোগাযোগ আকস্মিক নয়। রামমোহন যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে নব্যবঙ্গগণের অনেকেই সেই জীবনচর্যা গ্রহণ করেছিলেন তা আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখা গেছে। বিগত-শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ডিরোজিও-প্রভাবিত তরুণগোষ্ঠী সচেতন ও সুপরিকল্পিত ভাবেই সাংগঠনিক ভিত্তিতে সেই আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করবার পন্থা অবলম্বন করেছেন। তত্ত্ববোধিনী যুগে দুই ভাবধারার সমন্বয়ের আদর্শ ই জয়যুক্ত হয়েছিল ও উত্তর কালে কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-শিবনাথ-বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের যুগকে জন্ম দিয়েছিল।

সমাজ সংস্কার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার সমাজ ছিল বদ্ধ জলাশয়ের মতো। পাঁচশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে বাঙালী হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার ভ্রান্ত তাগিদে চার পাশে প্রাচীর তুলে দিয়েছিল;—যেমন কোন কোন প্রাণী বিপদের ইঙ্গিত পেলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ক'রে রাখে খোলসের অন্তরালে। ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু একবার। চৈতন্যদেবের সময়। মুসলমান সভ্যতার সংঘাতে জাতিভেদ প্রথার ভিত্তি একটু টলে উঠেছিল। তারপর আবার সব স্থির, গতিহীন। শুধু বাংলার নয়, ভারতের সর্বত্রই হিন্দু সমাজের ছিল একই অবস্থা। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাব জনসাধারণের মানসিকতা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। মনের উদারতা যেখানে নেই সেখানে সহজেই কুসংস্কার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। টোলের তদানীন্তন শিক্ষা ছন্দ-ব্যাকরণ-স্মৃতির চর্চায় ছিল আচ্ছন্ন। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়ে দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বাংলা গদ্য তখনো সমৃদ্ধি লাভ করেনি, বই ছিল না বিভিন্ন বিষয়ের উপর। জনসাধারণ বইয়ের সাহায্যে তাদের চিন্তাধারাকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করবে এমন সুযোগ ছিল না।

মুসলমান সমাজে তখন পর্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের বেশ কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন পূর্বেও রাজার জাতি ছিল মুসলমান। সেই ভূমিকা পালন করবার জন্য মুসলমানসমাজকে খানিকটা ক্রিয়াশীল থাকতেই হতো। এর ফলে সামাজিক কুপ্রথার ফাঁস তখনো আঁট হয়ে লাগেনি।

কিন্তু প্রায় পাঁচশ' বছরের পরাধীন হিন্দুসমাজের অবস্থা ছিল অন্য রকম। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হিন্দুসমাজ অসংখ্য কুপ্রথা ও কুসংস্কারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ। সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশীদার নারীর উপর হতো

নৃশংস অত্যাচার। সতী, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন, স্ত্রী-শিক্ষায় বাধা, ইত্যাদি নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এ ছাড়া ছিল শিশুহত্যা, দাস প্রথা, চড়ক পূজায় আত্মপীড়নের নানাবিধ নিষ্ঠুর রীতি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলি, এবং কঠোর ছুঁৎমার্গ, প্রভৃতি। তাছাড়া, বেদ-উপনিষদের কথা ভুলে যাওয়ায় ধর্মের স্থান নিয়েছে আচার-অনুষ্ঠান এবং মিথ্যা জাঁকজমক। তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নানা ব্যভিচাব ও বৈষ্ণবদের আখড়ায় রাধা-কৃষ্ণের লীলার অনুকরণে বোষ্টম-বোষ্টমীদের স্থূল প্রেমের লীলা-খেলা সমাজে এক কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং নৈতিক অধঃপতন যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজের মঙ্গল এবং দেশের উন্নতিও সুদূরপরাহত। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে দুঃখের সঙ্গে রামমোহন ডিগ্‌বিকে লিখেছিলেন: "Hindus in general are more superstitious and miserable, both in performance of their religious rites, and in their domestic concerns, than the rest of the known nations of the earth."

রামমোহনের পরে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে সমাজের দুর্দশার কথা বারবার বলেছেন এবং কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করবার জন্য তৎপর হয়েছেন। সমাজকে কলুষমুক্ত করবার তৎপরতাই ঊনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে সমাজের অবস্থায় কোনো বেদনাবোধের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছে দেখা যায়। এই সমাজ সচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ সংস্কারে প্রথমে উদ্যোগী হন নি। কারণ কোম্পানীর নীতি ছিল এ দেশের অধিবাসীদের সমাজ এবং ধর্ম জীবনে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ না করা। কোম্পানী মূলতঃ ব্যবসায়ী, দেশ সুষ্ঠু ভাবে শাসন করে প্রজার মঙ্গল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ভারতে আসেনি। কোম্পানীর ডিরেক্টররা সাবধান হয়েছিলেন আরও একটি কারণে। তাঁরা ভারতে পোর্তুগীজ রাজত্বের ক্রমাবলুপ্তির

দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন পোর্তুগীজরা নিজেদের সামাজিক রীতিনীতি এবং সভ্যতা ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়েছিল বলেই তাদের সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমশঃ প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছিল। সুতরাং বাংলা দেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম সত্তর বছরে সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের জন্য কোনো নিষেধাত্মক কঠোর বিধি প্রণয়ন করা হয় নি। অথচ আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল ইংরেজ জাতির কাছ থেকে শুভ সমাজবোধ আশা করা স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু পরোক্ষ ভাবে ইংরেজ রাজত্ব আমাদের সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করেছে। প্রকৃত পক্ষে, ইংরেজের সংস্পর্শে না এলে এ বিষয়ে আমরা কবে যে সচেতন হতাম তার নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা সচেতন হয়েছি নানা ভাবে। কয়েকটি প্রধান কারণ এই :

(১) ইংরেজী শিক্ষা এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত ক'রে দিয়েছিল। আমাদের চিরাগত সংস্কার-পীড়িত মনে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে চিন্তাবিপ্লবের সৃষ্টি হলো। এতদিন যে জীবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার ক'রে চলেছি, সেই জীবন সম্বন্ধে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগল, ইচ্ছা হলো সবকিছু পাশ্চাত্যের নতুন আলোতে বিচার ক'রে দেখি।

(২) শিক্ষিত ইংরেজ কর্মচারীরা ভারত এবং তার ধর্ম ও সংস্কৃতি জানবার জন্য উৎসুক হয়ে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত ক'রে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ নতুন ক'রে আবিষ্কার ও প্রচার করলেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল থেকে জানতে পারলাম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস। প্রকৃত হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে এসেছি তা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হলো না। শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখলেন সমাজে ধর্মের নামে কত কুপ্রথা ও কুসংস্কার চলছে। প্রাচীন ভারতকে জানবার সুযোগ পাওয়ায় সমকালীন সমাজের কুপ্রথাগুলি সহজেই চোখে পড়েছে এবং তা দূর করবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

(৩) কোম্পানীর কাজকর্ম চালাবার তাগিদে কলকাতা এবং অপর কতকগুলি শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। এই শ্রেণীর লোকরা কমবেশি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আপিসে কাজ করবার জন্য এদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি হলো একটু নতুন ধরনের। এই প্রথম যোগ্যতা

স্বীকৃতি পেল। ব্রাহ্মণ হলেই চাকরিতে পদোন্নতি হবে না; যোগ্যতা যার থাকবে—যে জাতিই হোক না কেন—তারই হবে উন্নতি। এক ঘরে এক টেবিলে বসে কাজ করতে হবে। ছুঁৎমার্গের কথা ভাবলে চাকরি করা চলবে না। জাতি-বৈষম্যের মূলে পড়ল কঠোর আঘাত। মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবিদের পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ইংরেজী শিক্ষা এবং নতুন জীবনদর্শন সমাজে আনল নতুন আবহাওয়া। পুরনো, জীর্ণ সমাজকে ভেঙ্গে এক সজীব সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

(৪) সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম আঘাত এসেছিল খ্রীষ্টান পাদ্রিদের কাছ থেকে। নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য হিন্দু ধর্মের দোষত্রুটি বড় ক'রে দেখানো তাঁদের কর্তব্যের প্রায় অঙ্গ হিসাবেই দেখা হতো। সমাজের কুরীতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে এই সব বিরূপ সমালোচনা বিশেষরূপে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া, খ্রীষ্টান মিশনারিরা সমাজের স্থায়ী রূপান্তরে সহায়তা করেছেন শিক্ষা বিস্তারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে। স্কুল-কলেজ খুলেই তাঁরা কর্তব্য শেষ করেন নি। শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করবার জন্য বাংলা টাইপ ও পুস্তক মুদ্রণের কৌশল আবিষ্কার, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, ইত্যাদি নানাবিধ কাজ করেছেন তারা। বাংলা ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা সহজ ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছেন।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালীর চেয়ে মিশনারিদের প্রভাব কম ছিল না। কারণ, এঁরা সমাজের নীচু স্তরের মধ্যে কাজ করেছেন, বুঝিয়েছেন তাদেরই মাতৃভাষায়। বিদ্যালয়, ছাপাখানা, বই ও সংবাদ-পত্রের স্থায়ী প্রভাব পড়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উপর। এই প্রভাব সর্বত্র খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় নি। মিশনারিদের প্রচেষ্টা আমাদের জীবনকে সংস্কারবদ্ধ গণ্ডী থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা সব সময় যে শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কাজ করেছেন তা নয়। উইলিয়াম কেরি চাষের উন্নতির জন্য কত গবেষণা করেছেন; সতীদাহ বন্ধ করবার জন্য কত পাদ্রি সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেছেন; নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ফলে লঙ্ সাহেবের কারা-বরণ তাঁর বিচিত্র কর্মধারার একটি মাত্র উদাহরণ।

সতীদাহ নিষিদ্ধ করা ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য প্রথম সমাজ-সংস্কার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ব্রিটিশ পাদ্রি এবং কোম্পানীর কোনো কোনো কর্মচারী এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছিলেন। ব্রিটেনেও এই নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জনসাধারণের মন প্রস্তুত ছিল, সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার পরে যে একটি লিখিত আবেদন ছাড়া কোনো বিক্ষোভ হয়নি—এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু কোম্পানীর সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। প্রথম জজ পণ্ডিতদের অভিমত নেওয়া হলো যে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কি না। শাস্ত্রে যে-সব বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর সতী হওয়া নিষিদ্ধ, সরকার শুধু সেই সব নারী যাতে সতী হতে না পারে তার ব্যবস্থা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো রামমোহনও দেখিয়েছিলেন সতীদাহ শাস্ত্রানুমোদিত নয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সতীদাহ নিষিদ্ধ ক'রে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন প্রণয়ন করেন। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করবার সমর্থক হলেও আইন করাটা পছন্দ করেন নি। তাঁর অভিমত ছিল যে, "the practice (of Sati) might be suppressed, quietly and unobservedly, by increasing the difficulties and by indirect agency of the police".

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থা বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণ। বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অনুমোদনমূলক আইনটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয় অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর। সতীদাহ নিবারণের মতো নিষেধাত্মক আইন নিয়ে কোনো আন্দোলন হয়নি, কিন্তু অনুমোদনমূলক বিধবার পুনর্বিবাহ আইন নিয়ে হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

এর অল্পদিন পরেই আরম্ভ হলো সাতান্ন বিপ্লব। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার ফলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশ শাসকদের মনে নানা কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বিধবার পুনর্বিবাহ অনুমোদন ক'রে আইন-প্রণয়ন বিপ্লবের যে অন্যতম প্রধান কারণ সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইলো না। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক বলেছেন: "খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে বিধবা-বিবাহের আইন পাশ ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরা ক্ষেপেচে।"

সুতরাং বিপ্লবের পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ ক'রে প্রথমেই ভারতবাসীকে আশ্বাস দিলেন যে তাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো-ক্রমেই আঘাত দেওয়া হবে না। নতুন বিপ্লবের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার এই শর্তটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পালন করেছেন। তার ফলে, উনবিংশ শতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যা কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কারে সরকারের সাহায্য পাওয়া গেছে তা হয়েছে সাতান্ন বিপ্লবের পূর্বে। এর পরে সরকার সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে সহজে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। বিদ্যাসাগর সহজেই বিধবা বিবাহ অনুমোদক আইন পাশ করাতে পেরেছিলেন; কিন্তু সাতান্ন সালের পরে বহুবিবাহ নিরোধক আইন অনেক চেষ্টা করেও পাশ করাতে পারেননি, যদিও তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে বহু লোকের সমর্থন ছিল এবং জে, পি, গ্রাণ্ট তাঁকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সরকার তাঁকে এবং অন্যান্য আবেদনকারীকে জানালেন যে "legislation on the subject would only be mischievous if it were not in accordance with the feelings and practice of a large majority of the people"

সাতান্ন বিপ্লবের পরে যে দু'টি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা সরকারকে জনমতের চাপে গ্রহণ করতে হয়েছিল তা হলো 'বিশেষ ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি ১৮৭২' এবং সহবাস সম্মতির বয়স সংক্রান্ত আইন। একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বধূর শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি না হলে শেষোক্ত ব্যবস্থাটি আদৌ গ্রহণ করা হতো কিনা সন্দেহ। কত অসংখ্য কুসংস্কার ও কুপ্রথার বন্ধনে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার সেই সব বাধা দূর ক'রে আমাদের এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেননি। সুতরাং তাঁরা সভ্য সরকারের দায়িত্ব পালন করেননি। এ সম্পর্কে ব্রেইলস্‌ফোর্ড তার "সাবজেক্ট ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে মন্তব্য ক'রে বলেছেন:

"Nonetheless, our official policy was then as now, to interfere as little as possible with Indian institutions: it tolerated social customs injurious to health, notably child marriage, and accepted even untouchability as an immutable fact in an environment it dared not alter. Our courts, as time went on, took to administering Hindu law

with an almost antiquarian fidelity. The result of this attitude was unquestionably to stereotype the past in a land that never has discarded it with ease."

উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-প্রচেষ্টায় নারী প্রাধান্য লাভ করেছে, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষিত, সংস্কারপ্রয়াসী বাঙালীর দৃষ্টি স্বভাবতঃই প্রথমে পড়ত গৃহকোণে আবদ্ধ ও নির্যাতিত নারীদের উপর। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ অনুমোদন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, প্রভৃতি উদ্যোগ সংস্কার-প্রচেষ্টার এক বৃহৎ অংশ অধিকার ক'রে আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাজ করেছেন এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নারীর সমর্থনে শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে স্বাধীনতার পরে ভারতে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহজেই পেয়েছে; যে অধিকার ইংলণ্ডে আমেরিকায় অনেক সংগ্রামের পর পাওয়া গেছে।

নারীমুক্তির এই আন্দোলন প্রত্যেক পরিবারকেই স্পর্শ করেছিল। ছুঁৎমার্গবিরোধী আন্দোলন সমাজের সকল স্তরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। এই আন্দোলন অবশ্য এসেছে অনেক পরে। ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাতবিচার অগ্রাহ্য করত। কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠায় প্রয়োজনের তাগিদে জাতিভেদের কঠোরতা কিছুটা শিথিল হয়েছিল। রেল গাড়ী, স্টিমার, স্কুল-কলেজ, সভা, থিয়েটার, ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্র মিলিত হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছে; জাতিভেদের গোঁড়ামি এর ফলেও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। কেশব সেন ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু জাতিভেদের কলঙ্ক দূর হয়নি। কলকাতায় যখন ট্রাম চলতে শুরু করে, তখন প্রশ্ন উঠেছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত থাকবে কিনা।

দাস-ব্যবসায় ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ হবার অল্পদিন পরে এ দেশেও বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য কোনো আন্দোলন দরকার হয়নি। আন্দোলন দরকার হয়নি চড়কপূজার নিষ্ঠুরতা, অন্তর্জলি, গঙ্গাযাত্রা, প্রভৃতি কুপ্রথা বন্ধ করবার

জন্যও। প্রশাসনিক উদ্যোগেই ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বহু কুপ্রথা এখনো আমাদের সমাজে রয়ে গেছে।

কলকাতার নতুন নাগরিক জীবনের দু'টি অভিশাপ সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুরাপাননিবারণী সমিতি স্থাপিত হয়েছিল; নাটক, উপন্যাস ও পত্রিকার প্রবন্ধে এই দুটি কু-অভ্যাসের নিন্দাবাদ করা হতো।

বড় বড় কুপ্রথা, যা বহুদিন যাবৎ চলে আসছিল, তা বন্ধ করবার জন্য রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারকেরা এগিয়ে এসেছিলেন; সরকারও তাঁদের কাজে সহায়তা করেছেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর জীবনে অসংখ্য সংস্কারমূলক নতুন প্রশ্ন জেগেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। ইংরেজরা এ-দেশে আসবার পূর্বে এই সমস্যাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি।

সমুদ্রযাত্রা করলে জাত যায় কি-না—এই প্রশ্নটি নিয়ে উনিশ শতকের শেষ ভাগে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উদ্যোগে এই প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুধু কলকাতা বা বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরের পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছ থেকেও ব্যবস্থা সংগ্রহ করা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার নতুন উপকরণের আমদানি হলো। কিন্তু এ সব জিনিস ব্যবহার করা কি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত? চীনে মাটির বাসন কিংবা কলাই-করা পাত্রে খেলে কি জাত যাবে? আপিসের পোশাক পরে দুপুরে টিফিন খাওয়া কি বিধিসম্মত? এগুলি শুধুই তাত্ত্বিক সমস্যা ছিল না, সত্যি সত্যি জীবনের সমস্যা হয়ে উঠেছিল। রাজপুর-নিবাসী হরগোবিন্দ চক্রবর্তী কতকাতায় যখন ব্যাগ্‌সা কোম্পানীতে চাকরী করতেন, তখন রোজই তাঁকে প্যাণ্ট পরে কাঁচের গ্লাসে জল খেতে হতো। এই অপরাধে গ্রামের লোক তাকে একঘরে করেছিল, মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হয়ে উঠেছিল। এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হতে হতো। রাজা-জমিদাররা জনসাধারণের সুবিধার জন্য পণ্ডিতদের সভা আহ্বান ক'রে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য এ সব সিদ্ধান্ত প্রায়ই কুসংস্কার দূর করবার অনুকূল হতো না। তবু আলোচনা চলত এবং শেষ পর্যন্ত সভ্যতার নতুন উপকরণ ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

বড় বড় বিষয়ে আলাদা ক'রে বিচারের ব্যবস্থা হতো। কলকাতায় যখন প্রথম কলের জল সরবরাহ করা আরম্ভ হলো তখন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ ক'রে বিচারের ভার দিয়েছিলেন যে, কলের জল পান করা ধর্মসম্মত কি-না। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলের জল প্রবর্তনের প্রতিবাদে কলকাতা ত্যাগ করে কাশী চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তার কলেরায় মৃত্যু হয়।

শাস্ত্রের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছিল বলেই পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র সত্ত্বেও আধুনিক জীবনের উপকরণ বাতিল করা সম্ভব হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিদেশী খ্রীষ্টান পাদ্রিরা হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্য ত্রুটিগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছিলেন। চারপাশে সেদিন ধর্মের নামে যা চলত তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে লাগল। সেদিন রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটলে বহু প্রতিভাধর শিক্ষিত বাঙালী তরুণকে হিন্দুসমাজ হারাত।

রামমোহন মিশনারিদের পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বই পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ ক'রে প্রমাণ করলেন যে আসল হিন্দু ধর্মে পৌত্তলিকতা নেই, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুর সাধনা। যে সাধনা শিক্ষিত যুক্তিবাদী হিন্দু শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থের কিছু কিছু অংশ তিনি অনুবাদ করেছিলেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে। রামমোহন ধর্মকে যথাসম্ভব যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম থেকে তরুণদের দৃষ্টি ফিরেছিল হিন্দু ধর্মের প্রকৃত রূপটির দিকে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যে যুক্তিবাদ এনেছিলেন রামমোহন, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর সেই যুক্তির উপর নির্ভরতা। নারী সমাজে পুরুষের সমান অংশীদার, সুতরাং সে কেন পুরুষের কাছ থেকে অন্যায় অত্যাচার সইবে,—এই যুক্তিকে কেন্দ্র ক'রেই রামমোহন নারীকে সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। অন্য সবকিছু সমাজ-সংস্কারেই রামমোহনের প্রেরণা ছিল মূলতঃ যুক্তিবাদ।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের মূল প্রেরণা ছিল মানবপ্রীতি। তাই তিনি সংস্কারের জন্য ব্যবস্থা ক'রেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নতুন বিধি অনুসারে

যাতে কাজ হয় তার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং অর্থ ব্যয় করেছেন। বিদ্যাসাগর দূরে থেকে উপদেশ দেন নি, সংস্কারমূলক সকল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিজের ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন বিধবা মেয়ের সঙ্গে; বিধবাদের বিয়েতে উৎসাহ দেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে কত লোক তাঁকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে গেছে। তাঁর শেষ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল ঋণ করে বিতরণ করা এই টাকার দায়ে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনও তিনি নিজে করেছেন। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করবার সমর্থনে নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় তথ্য।

সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রটি এই: "আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি (১) কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব; (২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না; (৩) কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপাত্রে কন্যা দান করিব; (৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে পুনরায় তাহার বিবাহ দিব; (৫) অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না; (৬) এক স্ত্রী থাকিতে আর বিবাহ করিব না; (৭) যাঁহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে কন্যাদান কবিব না; (৮) যেরূপ আচরণ করিলে প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না; (৯) মাসে মাসে স্ব স্ব মাসিক আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিব; (১০) এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।"

বলা বাহুল্য, এই কঠোর প্রতিজ্ঞাপত্রে ১২৫ জনের বেশী স্বাক্ষর দেয়নি। তবে এই থেকে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কার ভাবনার মধ্যেও ছিল নারী ও অন্ত্যজের প্রতি দরদ। কেশবচন্দ্রের ছিল ধর্মাশ্রিত কর্তব্যবোধ। তারই প্রেরণায় তিনি সমাজের নানা বিভাগে সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। যদিও রামমোহনের যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি ক'রেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, তথাপি

কেশবচন্দ্র দেখলেন কতকগুলি অযৌক্তিক রীতি তখনও মেনে চলা হয়। আচার্যকে উপবীতধারী হতে হবে; অসবর্ণ বিবাহ চলবে না, ইত্যাদি প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট পাশ হলো। পরিবারের মেয়েদের সভায়-সমিতিতে যাবার রীতি প্রচলনের মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র।

দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতারা পুরণো রীতিতে বিশ্বাস না করলেও সংস্কার ধীরে প্রবর্তিত হোক, এই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। পইতা পরিত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, ইত্যাদি দ্বারা তাঁরা হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হতে চাননি। নিজের মেয়ের বিয়েতে কেশবচন্দ্র যখন পূর্বঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করলেন তখন তারই জের হিসাবে ব্রাহ্মসমাজে চরম বিভেদ সৃষ্টি হলো। এই বিরোধ দেখা না দিলে কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রচেষ্টার ফল আমাদের সমাজে ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিত।

সমাজ-সংস্কারে সরকারী সাহায্য নেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে দু'টি ভিন্ন মত ছিল। সতীদাহ নিষিদ্ধ করতে রামমোহন আইনের সহায়তা চাননি। তিনি ভেবেছিলেন, ধীরে ধীরে জনমত গঠন করে এই কুপ্রথা বন্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত। পশ্চিম ভারতে রাণাডে ও টিলকেরও ছিল এই অভিমত। টিলক বলতেন, বিদেশী সরকারের আমাদের সমাজ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করবার অধিকার থাকা উচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও আইনের সাহায্যে জোর ক'রে সামাজিক প্রথা নিষিদ্ধ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মতও ছিল অনুরূপ। "এইজ অব কনসেণ্ট বিল' সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ একদিন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং আইন করে সহবাস সম্মতির বয়স স্থির করবার দরকার নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে প্রস্তাবিত সংস্কার ব্যবস্থার সমর্থনেরও বিরোধী ছিলেন। যদি কোনো ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত মনে হয় তা হলে শাস্ত্রের সমর্থনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শাস্ত্রের দোহাই বিশ্বাসের দুর্বলতার চিহ্ন। সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ২৭শে জুলাই, ১৮৯২, তারিখের এক চিঠিতে বলেছেন: "My own conviction is that it is impossible to carry out social reformation regarding any particular practice, merely on the

strength of the Sastras without religious and moral regeneration along the whole line."

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অহেতুক কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাঁকে ডন কুইক্‌সটের সঙ্গে তুলনা করতেও বঙ্কিম দ্বিধা করেন নি। অথচ শুধু বিদ্যাসাগর নন, রামমোহন, রানাডে প্রভৃতি সকল সমাজসংস্কারকই শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করেছেন নিজেদের যুক্তির সমর্থনে। ধর্মাশ্রিত সমাজে এর প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রের নির্দেশ মনে ক'রে যে কুপ্রথা মানা হচ্ছে, শাস্ত্র থেকেই যদি প্রমাণ করা যায় সে ধারণা ভুল, তা হলে সহজেই সংস্কারকের উদ্দেশ্য সফল হবার আশা থাকে।

সমাজ-সংস্কারে যে আইনের প্রয়োজন নেই, এমন কথাও বলা যায় না। জনসাধারণকে দ্রুত উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা যখন নেই, তখন নিষ্ঠুর অমানুষিক প্রথাগুলি বন্ধ করবার জন্য আইন নিশ্চয়ই আবশ্যক। সতীদাহ আইন করে যদি বন্ধ করা না হতো তা হলে আরও কত বছর পর্যন্ত কত নারীকে সতীদাহ হতে হতো কে জানে? বিদ্যাসাগর যখন বহুবিবাহ বন্ধের জন্য প্রথম উদ্যোগী হন তার প্রায় একশ' বছর পরে, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, তা নিষিদ্ধ হয়। এই এক শতাব্দীতে কত নারীর জীবন বহুবিবাহের ফলে বিষময় হয়েছে তার হিসাব কে রেখেছে! একশ' বছর আগে এ আইন পাশ হলে অন্তত এই একটি কারণ থেকে উদ্ভূত বেদনা তাদের স্পর্শ করতে পারত না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে বাদ-প্রতিবাদ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাদ-প্রতিবাদে যুক্তিসঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেনি। এক দিকে ইয়ং বেঙ্গল সমাজের সকল প্রকার অর্থহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মদ, গোমাংস ইত্যাদি দম্ভ সহকারে খাবার মধ্যে প্রগতির সন্ধান পেয়েছে; আবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একদল হাঁচি-টিকটিকির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। রামমোহনের যুক্তিবাদ শতাব্দীর শেষভাগে ভক্তিবাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সতীদাহের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখতে পাননি; দেখেছেন স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছায় আত্মদানের মধ্যে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। বাঙালী গ্র্যাজুয়েট এবং ডাক্তাররা পর্যন্ত "এইজ অব কনসেন্ট" বিলের প্রতিবাদে মুখর হয়ে

উঠেছিল। রামকৃষ্ণদেবের ভক্তিবাদ শতাব্দীর শেষাংশে আমাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুক্তির আলোকে সমাজের কুপ্রথা বিচার ক'রে প্রতিকার করবার জন্য উদ্যোগী হবার উদ্যম আর ছিল না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্ব থেকে বাঙালীর জীবনে রাজনীতির সর্বব্যাপী প্রভাব শুরু হয়। তার ফলে, যেন ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, আমাদের যা-কিছু সব ভালো এ-রকম একটা মনোভাব প্রথমে এসে গিয়েছিল। সমাজ-সংস্কারের উদ্যম রাজনীতির পশ্চাতে স্থান পেয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল কনফারেন্সের কলকাতা অধিবেশনে শ্রোতা পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন কিছু শ্রোতা সংগ্রহ ক'রে আনায় সেবার বাংলার মুখরক্ষা পেয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিরাট সমাজ-বিপ্লব কিছু না ঘটলেও উল্লেখযোগ্য ও ইঙ্গিতবহ সামাজিক পরিবর্তন যে যথেষ্ট ঘটেছিল এ কথা অস্বীকার করা আজ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক কালে কোনো কোনো ঐতিহাসিক অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর এই পরিবর্তনকে অকিঞ্চিৎকর বলে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করেছেন।[১] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালী সমাজের অবস্থার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ঐ সমাজের তুলনা করলেই পরিবর্তনের গুরুত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। উনবিংশ শতকের সামাজিক বিবর্তন আলোচনার পটভূমি হিসাবে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার সমাজ-চিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার হিন্দু সমাজ ছিল নানা প্রাণহীন, মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক দাসত্ব, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব এবং প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এই সমাজকে এক বিশাল 'অচলায়তনে' পরিণত করেছিল, যেখানে মনের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, ন্যায় ও বিবেক-বোধ ছিল সুপ্ত এবং ধর্ম হয়েছিল শুধু আচার-নিষ্ঠায় পর্যবসিত।[২] জাতিভেদের প্রাচীর হিন্দু সমাজকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং সামাজিক সুখ ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে সৃষ্টি করেছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়।[৩] আহারাদির ব্যাপারে 'জাতে'র বিধি-নিষেধ গোপনে বহু হিন্দু ধনী-তনয়ই লঙ্ঘন করতেন তাঁদের ঘনিষ্ঠ বয়স্য বা পারিষদদের সাহচর্যে,[৪] কিন্তু প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ বা ভিন্ন 'জাতের' লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার আমাদের সমাজে ছিল অকল্পনীয়। সমাজে নারীর স্থানও ছিল অনেক ব্যাপারে অত্যন্ত হেয়, যদিও ধর্মের জগতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন শক্তির পূজারী, এবং মৌখিক ভাবে মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁরা

কোনো দিনই কার্পণ্য করেন নি। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন সমাজে খুবই সীমাবদ্ধ ছিল ;[৫] মধ্যযুগীয় হিন্দু স্মৃতিকারেরা ('দায়ভাগ', 'দায়তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকগণ) সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বহুলাংশে খর্ব করেছিলেন ;[৬] বাল্য-বিবাহ (মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮।১০ বৎসর বয়সে বা তারো পূর্বে) ছিল সমাজে সাধারণ নিয়ম ; উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে কুলীনদের বহুবিবাহ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতাধিক) বহু নারীর জীবনকে করে তুলেছিল অসহনীয় ;[৭] এবং বৈধব্যের যন্ত্রণা ছিল এতই নিদারুণ যে তাকে এড়াবার জন্যই বহু নারী সভ্যমৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে চাইতেন। যাঁরা তা' চাইতেন না, পাশবিক সতীদাহ-প্রথা তাঁদেরও অনেককে সহমরণে যেতে বাধ্য করত।[৮] কৌলীন্য প্রথার অসংখ্য বিধি-নিষেধ ও পণপ্রথার বহুল প্রচলনের ফলে বহু নারীর জীবনে স্বামী-সন্দর্শন কখনোই ঘটত না। এ ছাড়া গঙ্গাসাগরে শিশু-সন্তান বিসর্জন,[৯] পুরীতে জগন্নাথের রথচক্রে নিষ্পেষিত হয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণ,[১০] গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলির নামে মুমূর্ষু রোগীদের উপর অত্যাচার, চড়কের সময়ে সন্ন্যাসীদের অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন স্বীকার[১১], অর্থলোভে দাস-দাসী বিক্রয় ও দাস-দাসীর উপর শারীরিক উৎপীড়ন[১২] এবং পুণ্যার্জনের জন্য নরবলির মতো কুপ্রথার[১৩] প্রাবল্য এ কথাই প্রমাণ করে যে আজ হতে দুশো বৎসর আগে আমাদের সমাজে মনুষ্যত্ববোধের একান্তই অভাব হয়েছিল। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য আমাদের স্বাভাবিক নীতিবোধ ও মানবিকতা-বোধকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে রেখেছিল। দুর্গাপূজার মতো জাতীয় উৎসবেও ধনী হিন্দু-তনয়েরা সামাজিক ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। অপরিমিত মদ্যপান ও 'বাইজী'-নৃত্য এই উৎসবের প্রায় একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল ক'লকাতার ধনী হিন্দুদের গৃহে।[১৪] এ যুগের ইংরেজ-সংস্পর্শে-আসা ধনী হিন্দুদের বিকৃত রুচি ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে কোনো কোনো বিদেশী পর্যটক-ও মন্তব্য করে গেছেন।[১৫] ইতিপূর্বে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু সমাজকে কিছুটা আলোড়িত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ সমাজের বৃহত্তর অংশই এই আন্দোলনের গণ্ডীর বাইরে ছিল। তা ছাড়া, চৈতন্যদেব নিজে প্রেম-ভক্তির অধিকারে জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ অগ্রাহ্য করলেও আহার ও সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর অনুবর্তীরা আবার জাতিভেদ ও সমাজে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে নেন।[১৬] অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত অনেক নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ও (কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, বলরামী ইত্যাদি) জাতিভেদ ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেন[১৭], কিন্তু এঁদের প্রভাব বিরাট হিন্দু সমাজের অতি সামান্য অংশকেই স্পর্শ করে। সমাজের বৃহত্তর অংশ স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ এবং সনাতনী ঐতিহ্যকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করে চলত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলার এই ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দু সমাজ এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। এই পরিবর্তনের মূল কারণ যে বাংলা দেশে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা তা প্রায় নিঃসন্দেহ, যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এ কথা বলা ঐতিহাসিক বিচারে সত্য হবে না। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশে শুধু যে এক নতুন শাসন ও আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তা নয়, দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাতেও ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় নতুন কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি-রাজস্বের ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এই পরিবর্তনের সূচনাকারী ঘটনা হিসাবে বিশেষ স্মরণীয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বাংলা দেশে জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য নয়। মুর্শিদ কুলি খাঁ-ও বাংলা দেশে বড় জমিদারি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ হতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই পুরাণো ভূম্যধিকারী গোষ্ঠি বহুলাংশে লোপ পায়, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারকে খাজনা দেবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তার ফলেও বহু পুরাতন বড় জমিদারি নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর যে নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তাঁরা অনেকেই তাঁদের জমিদারিতে বসবাস করতেন না, জমির বা প্রজার অবস্থার উন্নতি করার ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। শহরে বসবাস ক'রে জমিদারির উপস্বত্ব ভোগ-ই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা যায়।[১৮] নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী ছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ক'লকাতায় এক দেশীয় দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি

শ্রেণীর-ও উৎপত্তি হয়। এঁরা ইংরেজ ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের টাকা ধার দিতেন, তাঁদের ব্যবসাপত্র দেখতেন এবং নিজেরাও নানা রকম দালালি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক'রে কালে প্রচুর বিত্তসম্পদের অধিকারী হন। প্রধানতঃ কায়স্থঃ ও সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই ভাবে দেওয়ান-বেনিয়ান মুৎসুদ্দির কাজ ক'রে ঐশ্বর্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং মতিলাল শীল ও রামদুলাল সরকারের মতো এঁদের কেউ কেউ যে খুব সামান্য অবস্থা থেকেই ক্রোড়পতি হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাণো জমিদারগুলি যখন নিলামে বিক্রয় হতে থাকে তখন এঁরা অনেকে সেই সব জমিদারি কিনে নিয়ে ভূম্যধিকারী হিসাবেও সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[১৯] ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। এর ফলে, আরো বেশি সংখ্যায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও নীলকর এ দেশে আসতে থাকেন, এবং পরিণামে তাঁদের সহায়ক দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে তখন এ দেশের নানা সরকারী অর্থভাণ্ডারে, বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ও আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৪) 'Carr Tagore & Company'র ব্যবসায়িক সাফল্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরে বাংলা দেশের এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু ছাড়া-ও বেশ কিছু পশ্চিম ভারতীয় (প্রধানতঃ মাড়োয়ারী) ব্যবসায়ী এবং কিছু অবাঙ্গালী মুসলমানেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা বিদেশী বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের দাবীর সমর্থক এবং ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে ইউরোপীয় মূলধন নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন।[২০] দুর্ভাগ্যের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালীদের প্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পায়, এবং সুদূর পশ্চিম ভারতের গুজরাটি, মাড়োয়ারি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা তাঁদের স্থান অধিকার করে। অধিকাংশ পুরাণো বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারের বংশধরেরা জমিদারে পরিণত হয়ে অলস শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করতে

থাকেন এবং পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় করতে অভ্যস্ত হন।[২১] নতুন ভূম্যধিকারী ও বড় ব্যবসায়ীরা যেমন ইংরেজ-শাসিত বাংলায় এক নতুন বাঙ্গালী অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচারী, মধ্যস্বত্বভোগী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকারী ও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের চাকুরে, কেরাণী এবং উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক-অধ্যাপক ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রয়ী লোকেদের নিয়ে বাংলা দেশে এক নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ-ও গড়ে উঠে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ইংরেজ শাসনের পূর্বে-ও এদেশে ছিল, কিন্তু ইংরেজ আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়ায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসারে এবং জাতীয়তা-বোধের জাগরণে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। বাংলার নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ প্রকৃত অর্থে ইংরেজ রাজত্বের সৃষ্টি, আবার ঐ রাজত্বের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে-ও এই সমাজের অবদানই বোধহয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[২২]

ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসাবে যেমন একদিকে নতুন জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলা দেশে গড়ে উঠেছিল এবং ফলে সমাজের কিছু লোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সন্দেহ নেই, তেমনি অপর দিকে ইংরেজ শাসনের এক বিরাট ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিশেষ ভাবে এ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর পড়েছিল, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। প্রথমতঃ, ইংরেজ শাসনের ফলে কোম্পানির ব্যবসায় ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ব্যক্তিগত লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাংলার বহু অর্থ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই যে বিনা মূলধনে, এ দেশের রাজস্ব হতেই, লাভের ব্যবসায় পরিচালনা করত তা নয়, কোম্পানির কর্মচারীরাও অনেকে অবৈধ উপায়ে, বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালিয়ে প্রচুর লাভ করত। এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই বাংলার নবাব মীর-কাশিম তাঁর মসনদ হারিয়েছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ঘোষণা করা হয় এবং তার ফলেও কোম্পানির প্রচুর অর্থাগম হয়। বাংলা দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে এই ভাবে চলে গিয়েছিল, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের

যতে, তাকে মূলধন করেই ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) সম্ভব হয়। আবার এই শিল্প-বিপ্লবের সহায়তা করবার জন্মই সম্ভবতঃ বাংলা দেশ ও ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থান হতে ইংলণ্ডে যে-সব পণ্য আমদানি করা হোত তার উপর প্রচণ্ড হারে শুল্ক বসানো হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই ব্রিটিশ যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক ভাবেই এ দেশের কুটির-শিল্প পশ্চাদপসরণ করতে থাকে ও কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে এ দেশে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ১৮৩৩-এর পর ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লবের চাপ ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশেষ ভাবে পড়তে আরম্ভ করে। বাংলার কুটির-শিল্পগুলি এই ভাবে ধ্বংস পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও গ্রামবাসীদের কৃষি-নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায়।[২৩] অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেও গ্রাম-বাংলার কৃষক-সমাজের আর্থিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল ছিল, কিন্তু পরের শতকে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি ও কুটির-শিল্পের বিনাশের ফলে জমির উপর চাপ অসম্ভব বেড়ে যায় ও গ্রামবাসীর দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠে। ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও নতুন বিচার ব্যবস্থা-ও দেশের বিত্তহীন লোকের অনুকূল ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Bengal Rent Act) প্রণয়নের আগে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও আমলাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ কোনো কার্যকরী বিধান ছিল না। ব্রিটিশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রচলন ও পঞ্চায়েতী বিচার-ব্যবস্থা লোপ পাওয়ার ফলে-ও গ্রামবাসীর যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়। গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেদের আর্থিক উন্নতির তাগিদে শহরে চলে আসার ফলে গ্রামের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে।[২৪]

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ-দেশে ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এক দিকে যেমন প্রাচীন অর্থনীতির বুনিয়াদ শিথিল হয়ে যায় ও গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি অপর দিকে এক নতুন জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে সমাজ-জীবনে এক নতুন গতির ও আধুনিকতার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই কার্ল মার্ক্স ভারতে ইংরেজ রাজশক্তিকে 'ইতিহাসের অ-সচেতন হাতিয়ার' ('the unconscious tool of history') বলে বর্ণনা করেছেন।

সমাজ-জীবনে যে নতুন গতি-সঞ্চারের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সে গতির সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ নগরকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ইত্যাদি বাংলা দেশের শহরগুলি ছিল প্রধানতঃ প্রশাসনিক তথা বাণিজ্যিক কেন্দ্র। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব হতে এই নগরগুলি আদৌ মুক্ত ছিল না। সমাজ-জীবনে কোনো নতুন গতি-সঞ্চারের শক্তি এই মধ্যযুগীয় নগরগুলির ছিল কিনা খুবই সন্দেহ। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে এই নগরগুলি তাদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের সূচনায় সারা বাংলা দেশে একমাত্র ক'লকাতাই ছিল উল্লেখযোগ্য বড় শহর এবং ঐ শতকে বাংলার নাগরিক সমাজ প্রধানতঃ ক'লকাতাকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ক'লকাতার দেশী এলাকায় পল্লী-অঞ্চলের মতোই এক এক বৃত্তিধারী লোকেরা (ছুতার, তাঁতী, কামার, ধোপা ইত্যাদি) এক এক পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। উনিশ শতকের প্রথম দুই তিন দশকে বা তার পরেও ক'লকাতার বাঙ্গালী সমাজের উপর গ্রামীণ সমাজের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। এমন কি শহরের নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ও এ যুগে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী দোল-দুর্গোৎসব, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রে ও গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ ক'রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সনাতনী আদর্শকে অনুসরণ করলেও অর্থোপার্জনের ও বিভিন্ন বৃত্তি অনুসরণের ব্যাপারে সনাতন জাতিভেদ ব্যবস্থার নির্দেশ ক'লকাতার নাগরিক সমাজ উনিশ শতকের গোড়া হতেই লঙ্ঘন করতে থাকে। ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির নতুন রীতি এবং ইংরেজ শাসনের নতুন আদর্শের প্রভাবে ক'লকাতার বাঙ্গালী সমাজ পুরাতন গ্রামীণ সমাজ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় গড়ে উঠে। জীবন-যাত্রার ভঙ্গীই এখানে স্বতন্ত্র হয়, বাস্তব প্রয়োজনে। গ্রামীণ সমাজের মতো পরিবার-কেন্দ্রিক না হয়ে ক'লকাতার এই নাগরিক সমাজ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক রূপ ধারণ করে। বর্ণগত বা কৌলিক মর্যাদা লোপ পেয়ে শিক্ষা, অর্থ ও উপজীবিকাই এখানে সামাজিক মর্যাদা লাভের মানদণ্ড হিসাবে গৃহীত হয়। অর্থের কৌলীন্য অন্য সব কৌলীন্যকে নস্যাৎ করে দেয়।

প্রাচীন সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের নতুন ধারণা ক'লকাতার নাগরিক সমাজে প্রসার লাভ করে এবং এখান হতেই দেশের অন্যত্র, বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক নতুন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে ক'লকাতা মহানগরী বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে।[২৫]

উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের মৌলিক কারণ অর্থনৈতিক হলেও এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসার এবং তার আনুষঙ্গিক হিসাবে ধর্ম জগতে আলোড়ন এই পরিবর্তনগুলি ঘটাতে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিল। বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), এই রকম একটি ভুল ধারণা বহু দিন আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কোনো চেষ্টা করার বহু পূর্ব থেকেই ক'লকাতার ধনী হিন্দুরা, কিছু মানবহিতৈষী ইংরেজ এবং বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার 'স্কুল' খোলার জন্য সচেষ্ট হন। জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক স্পৃহা ছাড়া-ও শাসককুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের, ব্রিটিশ আইন-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হবার ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায় চালানোর প্রয়োজন-ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোককে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথম বৃহৎ ও সার্থক প্রচেষ্টা হ'ল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক'লকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন অন্যতম কিনা (ডেভিড হেয়ারের সহযোগী হিসাবে) সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু ঐ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নে রামমোহনের যে কোনো অবদান ছিল না তা তর্কাতীত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসারে হিন্দু কলেজের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই কলেজের ছাত্রেরাই পরবর্তীকালে ধর্ম তথা সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সাধনা ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ক'লকাতার ধনী হিন্দুরা ও কিছু ইংরেজ প্রথমে এই কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কয়েক বৎসর পরে ডেভিড হেয়ার তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই কলেজটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের অনুকরণে বা অনুসরণে ক'লকাতায় ও তার

কাছাকাছি কয়েকটি শহরে ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য আরো অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ ধীরে ধীরে স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), ক'লকাতায় স্কটিশ প্রেস-বিট্যারিয়ান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (১৮৩০) ও চুঁচুড়ায় সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হুগলী কলেজের (১৮৩৬) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ক'লকাতা স্কুল সোসাইটির প্রযত্নে ক'লকাতায় অনেক উন্নত শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা দান এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এই সব বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের হিন্দু কলেজে বা অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা দেবার-ও ব্যবস্থা করা হয়। এই সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ ও প্রয়াস সব চেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষ স্মরণীয়। কালক্রমে ক'লকাতার বাইরে শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী, বারাসত, বর্ধমান, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা প্রভৃতি শহরে-ও 'স্কুল' প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দেশের ইংরেজ সরকার বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নতুন সনদ পান তাতে প্রতি বৎসর এ দেশে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ ছিল, কিন্তু কার্যত, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই ব্যয় করেন নি। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বারো বৎসর সরকারের শিক্ষা-খাতে বরাদ্দ অর্থের প্রায় সবটুকুই ব্যয় হয় এ দেশে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে (১৮২৩) এবং সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা দানের চেষ্টায়, যদিও ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশবাসীর তখন আগ্রহের অভাব ছিল না। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের এই একদেশদর্শী নীতির বিরুদ্ধে রামমোহন রায় তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, কিন্তু তাঁর এই প্রতিবাদ তখন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি-নবীশ ও সংস্কৃত-ফার্সী-নবীশদের মধ্যে প্রবল বাদ-বিতণ্ডার পর মেকলের চেষ্টায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের সরকার প্রথম এ দেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান

শিক্ষার প্রসারকে সরকারী শিক্ষা-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেন। এর-ও প্রায় বিশ বৎসর পরে বিলাত থেকে Wood's Despatch নামে শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধীয় আদেশপত্রে (১৮৫৪) এ দেশে সরকারী প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদান ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়, ও সেই অনুযায়ী লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলেই বহু শতাব্দীর পর এ দেশের শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রাধান্য লাভ করে, এবং ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র-শাসন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানা সংস্কারের চিন্তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। আধ্যাত্মিক জগতের তুলনায় ঐহিক জগতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, মানুষের মনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়। দেশাত্মবোধ বা স্বজাতিপ্রীতি বলতে আমরা আজ যা বুঝি তা-ও বহুলাংশে এই পাশ্চাত্য শিক্ষারই দান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে নাগরিক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শহরে বা গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কোনো দিনই এ শিক্ষা প্রসারিত হয় নি। মেকলে বিশ্বাস করতেন, মুষ্টিমেয় ধনী ও মধ্যবিত্ত, যাঁরা প্রথমে এই শিক্ষা লাভ করবেন, তাঁরাই পরে তাঁদের দেশবাসীর মধ্যে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেবেন (Filtration Theory), কিন্তু তাঁর এই আশা কখনো বাস্তবে পরিণত হয় নি। শিক্ষার বাহন বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী হওয়া এই সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ; তবে দেশের সরকার ও বিত্তশালী লোকেরা কেউই যে এ ব্যাপারে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন নি সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিয়োজিত সরকারী হাণ্টার কমিশনের প্রতিবেদনেও জনশিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা ছিল খুবই সীমিত। ইংরেজী শিক্ষা চাকুরি লাভের শর্ত হওয়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের নেতারা স্বভাবতই ঐ ভাষায় তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন, নিম্নবিত্ত লোকেদের শিক্ষার জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র মতো দু-চারজন দূরদর্শী ব্যক্তি ছাড়া কেউই বিশেষ চিন্তা করেন নি। এ-দিকে জনসাধারণের প্রাথমিক

শিক্ষা লাভের জন্য যে পুরাণো পাঠশালা-ব্যবস্থা আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল সরকার ও বিত্তশালী লোকেদের আনুকূল্যের অভাবে তা-ও ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মিশনারী প্রচেষ্টা-ও এ ব্যাপারে স্তিমিত হয়ে আসে। এর ফলে, বাংলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যাপক অজ্ঞতা প্রকট হয়ে উঠে তার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা-ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে তা আন্দোলিত করতে পারে নি।[২৬]

শুধু শিক্ষাজগতে নয়, ধর্মজগতেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাব স্বভাবতই বাঙ্গালী সমাজে পড়েছিল। মিশনারীদের দ্বারা এ দেশে ছলে বলে কৌশলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা ও কোনো কোনো ব্যাপারে মিশনারীদের সরকারী আনুকূল্য লাভ বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে একটি বিরাট শক্তিপরীক্ষার রূপেই দেখা দেয়। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম আন্দোলন শুধু যে তাঁর শিক্ষিত দেশবাসীর অন্ধ ধর্মবিশ্বাস দূর করার চেষ্টা ছিল তা নয়, মিশনারীদের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ রূপটিকে বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ-ও এর পিছনে যথেষ্ট ছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম দুজন নেতা, রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুজনকেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল, এটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরবর্তী কালে কেশব চন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কারের একটি বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়, যদি ও প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দু সমাজে-ও ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হয় নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসে, এবং তাঁদের মধ্য থেকেই সনাতন হিন্দু আদর্শের একদল নতুন সমর্থকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারাকে মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সদর্পে ঘোষণা করতে থাকেন। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভূদেব, বঙ্কিম, নবীন ও রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চা, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন

সেন ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের প্রচার কার্য এবং থিওসফিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই হিন্দু নব-জাগরণের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ আন্দোলন এই নব্য হিন্দুবাদের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শেষোক্ত আন্দোলনের মধ্যে যে আত্মতৃপ্তির মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল তার ফলে সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় ও সমাজে রক্ষণশীল মনোভাব এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সতেজ হয়ে উঠে। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির প্রয়োজন-ও হয়ত কিছুটা ছিল।[২৭]

বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাঙ্গালী সমাজে নতুন শ্রেণী-বিন্যাস, আধুনিক নগর-জীবনের সূচনা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং ধর্মজগতে আলোড়ন, এই সব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা বাংলার নব-জাগরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মতো সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে-ও বিদেশী ইংরেজ-সরকার দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে বহুদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যে কোনো দায়িত্ব থাকতে পারে তা তাঁরা প্রথমে স্বীকার করতে চান নি। কিছু উদারচেতা, মানবহিতৈষী ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক প্রথম এই সব সামাজিক কুপ্রথার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং পরে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সামাজিক চেতনা জাগ্রত হলে তাঁরাও সমাজ-সংস্কারের দাবীতে সোচ্চার হন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল রূপ ধারণ করে এবং অবশেষে সরকার-ও কোনো কোনো সামাজিক কুপ্রথা দূর করতে আইনের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই ভাবেই সরকারী প্রচেষ্টায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাসাগরে পিতামাতার প্রতিজ্ঞা পূরণে শিশু-সন্তান বিসর্জন বন্ধ করা হয়, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়, ১৮৪৩ সালে ক্রীতদাস প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতদের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সুরক্ষিত হয়, এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয় (নিম্ন বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আগেও প্রচলিত ছিল)। কিন্তু

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর এ ধারণা বহুল প্রচলিত হয় যে, হিন্দুসমাজের সংস্কারের চেষ্টা করতে গিয়েই বিদেশী সরকার দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়েছেন এবং তার ফলে আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আবার স্তিমিত হয়ে আসে।

সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ভিতর তিনটি প্রধান দলের সৃষ্টি হয়। প্রথমটি রক্ষণশীল দল, যাঁদের পরিচালনায় ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, প্রধান সংগঠন ছিল ধর্মসভা (স্থাপিত—১৮৩০ খ্রীঃ) এবং প্রধান মুখপত্র ছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা' (প্রথম প্রকাশ—১৮২২ খ্রীঃ)। এঁরা ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন ব্যবহারিক জীবনে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সারবস্তু,—উদার, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, এঁরা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলেন, এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার ন্যূনতম পরিবর্তনই ছিল এঁদের কাম্য।[২৮] দ্বিতীয় দলটি ছিল হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিও'র অনুবর্তী নব্য সম্প্রদায়, যাঁদের বলা হোত **Young Bengal** বা তরুণ বাংলা। এই দলের নেতাদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধব চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। **Society For The Acquisition of General Knowledge** (১৮৩৮), **Epistolary Association, Mechanical Institute** (১৮৩৯) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল এঁদের মিলন-ক্ষেত্র, এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), **Inquirer** (১৮৩১), **Bengal spectator** (১৮৪২) প্রভৃতি পত্রিকা ছিল এঁদের মুখপত্র। এঁরা বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্তন এঁরা চাইতেন স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থেই। সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এঁদের বিষদৃষ্টিতে দেখতেন, এবং অন্য দিকে, মাধব চন্দ্র মল্লিকের মতো নব্যদলের কোনো কোনো নেতা এ-কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি যে, প্রচলিত হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসকে এঁরা অন্তর হতে ঘৃণা করেন।[২৯] এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দলের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন

কুমার ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো স্থিতধী সমাজ-সংস্কারকবৃন্দ যাঁরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় আদর্শের সমন্বয় সাধন ক'রে নিজেদের দেশে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এঁদের প্রয়াসই সব চেয়ে ফলপ্রসূ হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে, পরিণত বয়সে, Young Bengal দলের বহু নেতাও এঁদের সঙ্গে গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের দেশপ্রেমও ছিল সন্দেহাতীত। এই তিন শ্রেণীর নেতাই, সামাজিক শ্রেণী বিচারে, ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল খুবই কম, যদিও তাঁদের আন্দোলনের প্রভাব জনসাধারণের উপরে একেবারেই পড়ে নি—এ কথা বলা অসঙ্গত হবে।

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে,—প্রথম, নারী-সমাজের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের চেষ্টা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, এবং দ্বিতীয়, জাতিভেদ প্রথার বন্ধন শিথিল করার প্রয়াস। নারী-সমাজের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য ও সফল আন্দোলন হল রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে রামমোহন-ই আধুনিক যুগে প্রথম সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন নি। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় সূচনা হতেই ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ সরকারের কাছে এই পাশবিক প্রথা আইনের সাহায্যে রোধ করার জন্য দাবী জানাচ্ছিলেন। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসী শাসকেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নিজ নিজ এলাকায় এই প্রথা রহিত করেছিলেন। ক'লকাতার সুপ্রীম কোর্ট্-ও ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আপন সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে এই প্রথা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের পাদরি উইলিয়ম কেরী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র হতে সতীদাহ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সঙ্কলন ক'রে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে এ কথা বোঝাবার জন্য যে হিন্দুশাস্ত্র কোথাও সতীদাহকে আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করে নি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘনশ্যাম শর্মা প্রমুখ নিজামত আদালতের হিন্দু পণ্ডিতেরাও কেরীর এই বক্তব্য সমর্থন করেন। ১৮১৩ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজামত আদালত হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সতীদাহ

প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত নিজামত আদালতের ব্যবস্থাগুলির পশ্চাতে ছিল সে যুগের বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সমর্থন। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে হিন্দু বিধবাদের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে সহমরণ অপরিহার্য নয়, ঐচ্ছিক মাত্র, এবং বেদান্তের দৃষ্টিতে সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। মৃত্যুঞ্জয়ের এই ঘোষণার মধ্যে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-ও (১৫২০-৭৫ খ্রীঃ আনুমানিক) এই মতের সমর্থন করেছিলেন তাঁর 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি' গ্রন্থে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ক'লকাতার বহু শিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দুও যে সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা ও এর সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো আচারের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস বুকানন নামে এক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের বই থেকে তা জানা যায়। সুতরাং রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার অনেক আগেই যে দেশে সতীদাহ-বিরোধী জনমত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, এবং সেই জনমতের চাপে সরকার এই কুপ্রথাকে সম্পূর্ণ দমন না করলেও আইনের সাহায্যে একে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তবু দেখা যায় ১৮১৮ হতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক'লকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বারাণসী ও বেরিলী এই ছয়টি বিভাগে গড়ে প্রতি বৎসর ছয় শতেরও বেশি সহমরণের ঘটনা ঘটেছিল। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব হ'ল এই যে তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে এই প্রথাকে রহিত করার জন্য একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং সতীদাহ-বিরোধী জনমত সক্রিয় ভাবে গঠনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে শুধু সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে (১৮১৮) এবং ইংরেজী ও বাংলায় পুস্তিকা রচনা ক'রে (১৮১৮-১৯) তিনি ক্ষান্ত হন নি, সতীদাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থাগুলি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য তিনি একটি তদারকি সংস্থা গঠন করেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে ক'লকাতার বিভিন্ন শ্মশানে গিয়ে সহমরণেচ্ছু বিধবাদের নানা ভাবে প্রবোধ দিয়ে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। বাংলা 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৮১৯) মাধ্যমেও রামমোহন

সতীদাহ-বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁর এই আন্দোলনের জন্য হিন্দু সমাজে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সতীদাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়। গোড়ার দিকে আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার বিরোধী হলেও রামমোহন বেণ্টিঙ্কের আইনকে সমর্থন করেন। ক'লকাতার রক্ষণশীল হিন্দুরা যখন ধর্মসভা গঠন করে সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন জানান, রামমোহন তখন তার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং তাঁর চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করে। রামমোহনের সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন মূলতঃ মধ্যবিত্ত সমাজের আন্দোলন হলেও এর ফলে জনসাধারণ উপকৃত হন, নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা তখন সমাজের সব স্তরেই প্রচলিত ছিল।[৩০]

স্ত্রীজাতির দুর্দশা লাঘব কল্পে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-'৯১) বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কোনো ভাবে লাঘব না ক'রে বলা যায় যে, তিনি এই সমাজ-সংস্কারের ঠিক পথিকৃৎ ন'ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫৬) ঢাকার রাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য ব্যর্থ হন। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে সমর্থ হলেও বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করেছিলেন বলে নিশ্চিত জানা যায় না। বরং তাঁর 'পথ্যপ্রদান' পুস্তিকা (১৮২৩) পড়লে মনে হয় তিনি এ ব্যাপারে অনুকূল মত পোষণ করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'হরকরা', 'রিফর্মার', 'ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বহু চিঠিপত্র ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতার British Indian Society এই বিষয়ে ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে পত্রালাপ করেন বলেও জানা যায়, কিন্তু তা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন শুরু হবার প্রায় দশ বৎসর আগে মধ্য ক'লকাতার নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ

প্রচলনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব এই যে বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে তিনি বাংলা দেশে এক প্রবল আলোড়ন গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং বিদেশী সরকারকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকাগুলিতে (১৮৫৫) যে সব শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন, তা খণ্ডন করার শক্তি সে যুগের কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ছিল না, কিন্তু শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের সমর্থন আছে বলেই যে বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা নয়; নারীজাতির দুঃখে তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়েছিল বলেই তিনি সমগ্র বাধা অগ্রাহ্য ক'রে তাঁদের বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করতে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনের প্রভাব ক'লকাতার নাগরিক সমাজের বাইরে-ও বহু দূরে প্রসারিত হয়েছিল, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা বিধবা-বিবাহের গান গাইতেন বলে জানা যায়। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের বিধবা-বিবাহ আইন উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহের অনুকূল মনোভাব বিশেষ সৃষ্টি করতে পারে নি, যদিও এই আইনের বলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটি বিধবা-বিবাহ ঐ সমাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রভাব অল্প কিছুদিন পরে দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও দেখা যায়।[৩২]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে কৌলীন্য এবং বহু-বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও এক প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। কৌলীন্য প্রথার কুফলগুলির দিকে রামমোহনই প্রথম সরকারের ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন (১৮২২)। উনিশ শতকের ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে-ও এই বিষয় নিয়ে অনেক বাদানুবাদ চলে। শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রেস হতে বহুবিবাহ-বিরোধী কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-'৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরী চাঁদ মিত্র, বর্ধমান, নদীয়া ও দিনাজপুরের মহারাজগণ এবং কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর-সম্বলিত অনেকগুলি বহুবিবাহ-বিরোধী আবেদন-পত্র গভর্ণর-জেনারেলের আইন সভার কাছে পাঠানো হয়। আবেদন-পত্রগুলিতে আইনের সাহায্যে কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের জন্য এ ব্যাপারে সরকার

কিছুই করতে পারেন নি। এর কয়েক বৎসর পরে, ১৮৬৬ সালে, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রায় একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি আবেদন-পত্র বাংলার ছোটলাট সার সিসিল বীডনের কাছে পেশ করা হয়। ১৮৭১ হতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং কুলীনদের বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন ক'রে এবং এর অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে দুটি পুস্তিকা রচনা করেন। পূর্ববঙ্গে তারপাশা-নিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি 'কমিশন' গঠন করলেও কোনো আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন নি। আইন-প্রণয়নের বিরুদ্ধে সে যুগের অনেক রক্ষণশীল নেতা সরকারকে পরামর্শ দেন, এবং আশ্চর্যের বিষয়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই দলে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও তিনি কৌলীন্য প্রথার সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু আইন-প্রণয়ন সম্ভবপর না হলেও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়।[৩২]

বহুবিবাহের মতো বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখনী ধারণ ক'রেছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই এ বিষয়ে তাঁর লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজের নেতারা এ ব্যাপারে সচেষ্ট হ'ন এবং ব্রাহ্ম বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন যে, এই আইনের ধারাগুলি হিন্দু বিবাহের পক্ষেও প্রযুক্ত হোক, বিদ্যাসাগর এটা চাইতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে সহবাস সম্মতি আইনের (১৮৯১) সাহায্যে বারো বৎসরের কম বয়সের বালিকা-বধূর সঙ্গে সহবাস স্বামীদের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের উদ্যোগে ক'লকাতায় যে-সব বিশাল জনসভার আয়োজন হয় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মহানগরীর শিক্ষিত হিন্দু সমাজের অধিকাংশই এ ব্যাপারে রক্ষণশীল মতের অনুবর্তী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে—১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরবিলাস সর্দার প্রস্তাবিত আইনে হিন্দুসমাজে

বাল্যবিবাহ-নিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই আইনে (১৯২৯) স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৪ বৎসর ও পুরুষের পক্ষে ১৮ বৎসর বিবাহের ন্যূনতম বয়স হিসাবে ধার্য হয়। তবে এই আইন দেশের সর্বত্র, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, বলবৎ করা বহু দিন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।[৩৩]

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতেই বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ শুরু হয়। মধ্যযুগের হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষা একেবারে অজ্ঞাত না হলেও উচ্চশিক্ষিতা, এমন কি সাধারণ শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যাও আক্ষরিক অর্থে মুষ্টিমেয় ছিল। চৈতন্যের অনুবর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষার কিছুটা প্রচলন হয়েছিল। জমিদার পরিবারে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে কোথাও কোথাও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হোত। এ ছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ত্রীশিক্ষার নিদর্শন (হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী, দ্রবময়ী প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী সমাজে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে এক ব্যাপক ও দুর্মর কুসংস্কার যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তার উপরে, বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছিল। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের ফলে ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে ধীরে ধীরে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চেতনা জাগ্রত হয়, এবং আনন্দের বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল নেতাও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে বিশেষ সহায়তা করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত Calcutta Female Juvenile Society ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এ দেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের Foreign School Society তাঁদের এ কাজে সাহায্য করার জন্য মিস কুক্‌কে এদেশে পাঠান। পরবর্তী কালে Baptist Missionary Society, Church Missionary Society, Ladies' Society For Native Female Education ইত্যাদি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে প্রধানতঃ সমাজের অতি নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাই পড়তে আসত', এবং তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক পুরস্কারের

প্রলোভনে। ভদ্র ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় উৎসাহ দেবার জন্য ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রেরণায় পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায় ক'লকাতায় Central School For Girls প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের বিষয়ে সমাজে সনাতন পন্থী ও প্রগতিশীলদের মধ্যে যে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয় সে-যুগের বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ', 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি এর বিপক্ষে তীব্র লেখনী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক ক'লকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং Young Bengal দলের রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে বেথুনকে বিশেষ সহায়তা করেন। ক'লকাতার বাইরে বারাসত, কৃষ্ণনগর, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলেও বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। Wood's Despatch (১৮৫৪) এ দেশে পৌঁছানোর কিছুদিন পরে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা অনুদান ধার্য করেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বাংলার স্কুলগুলির বিশেষ সরকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় সর্বসাকুল্যে ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে বিদ্যাসাগরকেই ব্যক্তিগত ভাবে অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম সমাজের নেতারাও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এতে সে যুগের শিক্ষিতা মহিলাদের গদ্যে-পদ্যে লিখিত অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবের চেষ্টায় Victoria Institution নামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশব মেয়েদের

বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা তাও চাইতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা ক'লকাতায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দু (পরে, 'বঙ্গ') মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ এঁদেরই চেষ্টায় মেয়েরা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার অধিকার পায়, এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ আরো পাঁচ বৎসর পরে, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম দুজন মহিলা, কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু, সসম্মানে বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'ন। কাদম্বিনী দেবীই (পরে 'গঙ্গোপাধ্যায়') প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কয়েক সহস্র শ্রোতার উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। ব্রাহ্ম সমাজের (বিশেষতঃ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের) নেতারা এ দেশে নারী-প্রগতি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার একটি নতুন আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত হিন্দু যোগ দেন। কলকাতায় ও মফঃস্বলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও নারী প্রগতির উদ্দেশ্যে নানা সভাসমিতিও এ যুগে স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা, বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্যবঙ্গ সম্মিলনী ও উত্তরপাড়া হিতকারী সভার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু সমাজে সনাতনী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন স্বামী বিবেকানন্দের স্বনামধন্যা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহিলা-পরিচালিত কয়েকটি বাংলা পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের মর্যাদা লাভ করে (১২৯১—১২৯৯ সন)।[৩৪] এ-সব সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা বা স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ বিশেষ সমাদৃত হয় নি বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাসের জন্যও সমাজ-সংস্কারকেরা সচেষ্ট হয়েছিলেন, তবে এ বিষয়ে প্রাচীন সংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল যে তাঁদের খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হয়। রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার সামাজিক ও রাজনৈতিক কুফলগুলির দিকে শিক্ষিত দেশবাসীর

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সমুদ্রযাত্রা সে যুগের প্রচলিত জাতিরক্ষণ বিধির ঘোরতর বিরোধী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে রামমোহন কখনো তাঁর ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন, স্কন্ধের উপবীত, বিসর্জন দেন নি কিংবা প্রকাশ্যে অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান করেন নি। সমাজের মধ্যে থেকে সমাজ-সংস্কারের কাজ করার এইটাই ছিল সে যুগে ন্যূনতম সর্ত। Young Bengal দলের উৎসাহী যুবকেরাও জাতিভেদ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন এবং এঁদের প্রভাবে পড়ে কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান সে যুগে নিজেদের উপবীত ত্যাগ করেন, সমাজ-নিষিদ্ধ সুরাপান এবং গোমাংস-ভোজনেও এঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের এই বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী হয়। পরবর্তী কালে কেশব চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদকে তাঁদের কর্মসূচীর মধ্যে একটি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে ব্রাহ্মণ আচার্যকে অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি বিষয়ে প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতারা (কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ) বিশেষ সচেষ্ট হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম অসবর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। বাংলা দেশে কর্মরত খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়গুলিও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে কোনো জাতিভেদ তাঁরা স্বীকার করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্য হিন্দুবাদের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দও জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন বিধি-নিষেধগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সরকারী বিধানও পরোক্ষ ভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। এগুলির মধ্যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 'লেক্স লোসি' আইন যার দ্বারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়দের (জাতিনাশ হওয়া সত্ত্বেও) পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর আইন যার দ্বারা সমাজে অন্ততঃ এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়, এই দুটি বিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ১৮৭২ সালের আইনটি হিন্দু সমাজের পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য ছিল না, ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল সদস্যেরা নিজেদের কোনো প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসী নয় বলে ঘোষণা করেই এই আইনের সুযোগ নিতে পারতেন। তবে এই

সব সরকারী বিধানের চেয়েও জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করতে আরো বেশি সহায়তা করে বাংলার নাগরিক সমাজে নতুন জীবনযাত্রার ধারা। কলকাতায় ও অন্যত্র নাগরিক সমাজে শুধু যে বর্ণগত বৃত্তি অনুসরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তা নয়, বিভিন্ন জাতির লোকেদের একত্র বসবাস ও পান-ভোজনের নিয়মের কঠোরতাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বহুল পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ে। তবে সমুদ্র যাত্রার অপরাধে জাতিচ্যুতির ব্যবস্থা এই শতকের শেষ দিকেও হিন্দু সমাজে বলবৎ ছিল এবং সত্তরের দশকের শেষ দিকে পরবর্তী কালের খ্যাতনামা দেশনায়ক সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদ্রযাত্রার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল।[৩৫] অসবর্ণ বিবাহ-ও হিন্দু সমাজে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকে বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর অসবর্ণ বিবাহগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

উপরে যে সব সমাজ-সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ করা হোল সেগুলি ছাড়াও আরো কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকরা সচেতন ছিলেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলির বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান বিসর্জনের নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার কথা আগেই বলা হয়েছে।[৩৬] ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে দাস-ব্যবসায় বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ হতে ভারতে ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করা হয় এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দাসত্ব প্রথাই আইনের সাহায্যে তুলে দেওয়া হয়। সারা ভারতে কয়েক লক্ষ দাস-দাসী এই ভাবে স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার পায়, কিন্তু এর জন্য তাদের মালিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। বাংলা দেশে প্রধানতঃ ধনী লোকেদের পারিবারিক কাজেই দাস-দাসী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, তবে শ্রীহট্ট জেলায় কৃষিকার্যেও ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হোত বলে জানা যায়।[৩৭] চড়ক পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমানুষিক নিষ্ঠুরতাগুলির দিকে মিশনারীরা প্রথমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী না হলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই নিষ্ঠুরতাগুলিকে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের এগুলি বন্ধ করার নির্দেশ

দেন।[৩৮] গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলির নামে মুমূর্ষু রোগীদের উপর যে অত্যাচার কোথাও কোথাও ঘটত মিশনারীরা তার দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকার এ বিষয়ে কোনো আইন না করলেও নির্দেশ দেন যে গঙ্গাযাত্রার পূর্বে রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের লিখিত ভাবে পুলিশকে জানাতে হবে যে রোগীর বাঁচবার আর কোনো আশা নেই, এবং সম্ভব হলে, এই মর্মে চিকিৎসকের অভিজ্ঞান-পত্রও দাখিল করতে হবে।[৩৯] উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে অত্যধিক সুরাপানের বিরুদ্ধেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে Bengal Temperance Society প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতারাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। এ ব্যাপারে অবশ্য কোনো আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি, তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে মদ্যপানের প্রচলন ধীরে ধীরে অনেক কমে যায়।[৪০]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল। বাংলা দেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমান শাসকগোষ্ঠিকে উৎখাত করে। শাসনক্ষমতা হারাবার পর মুসলমান ভূম্যধিকারী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সব কারণে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর বহু দিন পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজ ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা, ব্রিটিশ আইন-কানুন ও সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সন্দেহের ও ভয়ের চক্ষে দেখতেন। অবশ্য এর জন্য তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামিও অনেকটা দায়ী ছিল। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা নতুন শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও তাঁরা অনেক আগে আকৃষ্ট হন, এবং ফলে মুসলমানদের তুলনায় তাঁদের সামাজিক অগ্রগতি উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বেশি হয়েছিল। ইংরেজ সরকারও উনিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের প্রতিই বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; পরে হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করে তাঁরা মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন, এবং এই ভাবেই বিভেদনীতির সাহায্যে পরবর্তী শতাব্দীতে দেশ-বিভাগের পথ প্রশস্ত করা হয়। যাই হোক,

কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব, সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হারাণোর ফলে মুসলমান সমাজে যে অবসাদ ও গ্লানির সৃষ্টি হয় তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি উনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহাবি বা ফেরাজি আন্দোলনে। বেরিলীর সৈয়দ আহ্‌মদ ও ফরিদপুরের হাজি শরিয়ৎউল্লার মতো কোনো কোনো ধর্মান্ধ মুসলিম নেতা এই শতাব্দীর সূচনায় প্রচার করতে থাকেন যে কয়েক শতাব্দী ধরে কাফেরদের সংস্পর্শে থেকে তাঁরা ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা তাঁদের সামাজিক আচার-আচরণে রক্ষা করতে পারেন নি, এবং তারই ফলে তাঁদের পতন ঘটেছে। ধর্মীয় শুচিতা ফিরিয়ে না আনলে মুসলমানদের উন্নতির আর কোনো আশা নেই। দরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলমান তাঁতী ও কৃষকেরা সহজেই এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয় এবং তার ফলে পশ্চিম বঙ্গে তিতু মীর (১৭৮২—১৮৩১) ও পূর্ব বাংলায় হাজি শরিয়ৎউল্লার পুত্র দুদু মিঞার (১৮১৯-৬০) নেতৃত্বে এক দীর্ঘস্থায়ী, ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটে। অবশ্য হিন্দু জমিদার ও বিদেশী নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচার মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে ফেরাজিদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। ২৪ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, পাবনা, মালদহ, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় 'খলিফা'দের নেতৃত্বে মুসলমান কৃষক সমাজ ইংরেজদের আদালত বর্জন করে ও জমিদারদের অন্যায্য কর দিতে অস্বীকার করে। কোনো কোনো স্থানে তারা অত্যাচারী নীলকরদের কুঠিও আক্রমণ করে। বারাসতে তিতু মীর ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটেছে বলে ঘোষণা করেন (১৮৩১) ও হায়দারপুরের কাছে নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। কিন্তু ফেরাজিদের আন্দোলন স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট ছিল। তাদের বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাধারণ হিন্দু কৃষক তাদের সুনজরে দেখত' না। পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্তেরাও যে এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে গণ্য করতেন সমকালীন সংবাদপত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। জমিদার ও নীলকর সাহেবেরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফেরাজিদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেন এবং সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তিতু মীর ও তাঁর প্রধান অনুচর গোলাম মাসুম নারকেলবেড়িয়ায় ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত ও নিহত হ'ন (১৮৩১)। স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের

সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষের পর দুদু মিঞাও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় আলিপুর জেলে আনীত হ'ন এবং সেখানেই তিন বৎসর পরে রাজবন্দী হিসাবে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পরেও বহু দিন পর্যন্ত বাখরগঞ্জ জেলায় ফেরাজিদের আন্দোলন চলতে থাকে। ওয়াহাবি বা ফেরাজি আন্দোলন বাংলার মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আরো দৃঢ় করেছিল সন্দেহ নেই। তবে উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমান নেতারা সবাই ফেরাজিদের মতো ইংরেজ-বিদ্বেষী বা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না ক'লকাতার Muhammadan Literary Society'র (১৮৬৩) প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ ধনী ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ইংরেজ-বিদ্বেষ দূর করতে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করতে অনেক চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টায় ক'লকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হয় ও ধনী মুসলমানেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও একটি শিক্ষিত (পাশ্চাত্য অর্থে), বৃত্তি বা ব্যবসায়-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনারও প্রসার ঘটে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আমীর আলির নেতৃত্বে ক'লকাতায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের National Muhammadan Association স্থাপিত হয়, কিন্তু স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের আলিগড় আন্দোলন শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদী প্রবণতার বিরোধিতা করে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ কংগ্রেসী রাজনীতির বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সরকারের আস্থাভাজন হবার ও সরকারী আনুকূল্যে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে, মুসলমান রাজত্বকালে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ রাজ-দরবারে ও নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামীণ সমাজে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কচিৎ কখনো সামান্য সংঘর্ষ ঘটলেও তা স্থায়ী অশান্তির সৃষ্টি করেনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাব ক্রমশই বাড়তে থাকে ও ইংরেজ সরকারের বিভেদনীতি এই পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।[৪১]

উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক বিবর্তনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি এক নতুন নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর মাধ্যমে এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার। শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তরে যে মোহজাল বিস্তার করেছিল শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা অনেকটা ছিন্ন হয়ে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, দেশের অতীত ইতিহাস চর্চা করে ও নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বিশেষ সার্থক হয় নি। এর ফলে যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব আবার কিছুটা জাগ্রত হয় এবং অহেতুক আত্মতৃপ্তির জন্য সমাজ-সংস্কারের চেষ্টাও মন্থর হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নতুন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরের স্তরের ধনী ব্যবসায়ী, বৃহৎ ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে অথবা নীচের স্তরের গ্রাম্য কৃষক বা নাগরিক নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক যোগ ছিল না। ফলে, মধ্যবিত্ত সমাজের সাধনার দ্বারা বাংলায় যে নব-জাগরণের সৃষ্টি হয় তা ঐ সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়ে দেশের সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হতে পারে নি। আবার হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের সহাবস্থান প্রকৃত সহধর্মিতার অভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সমাজ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় সমাজ-বিপ্লবের সম্ভাবনা এই ভাবে খণ্ডিত হয়।

গ্রন্থ-নির্দেশ

(১) এই মতবাদের সর্বাধুনিক ও চূড়ান্ত প্রকাশের জন্য Asiatic Society প্রকাশিত Renascent Bengal (1972) গ্রন্থে শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত "Social Change" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) Dr. R. C. Majumdar, **Glimpses of Bengal In the Nineteenth Century** (1960), p. 14.

(৩) K. Nag and D. Burman (eds.) **The English Works of Raja Rammohun Roy** (1958), Part. IV, p. 95.

(৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত), ১৯৩৬ সংস্করণ, পৃঃ ১০-১১ ; W, Ward, A View of The History, Literature And Mythology of the Hindoos (1820), vol. III, p. 183.

(৫) The Rev. J, Long (ed.) William Adam's Reports on Vernacular Education In Bengal And Behar, 1835--1838, p. 279.

(৬) K. Nag and D. Burman (eds.) op. cit. Part I, pp. 2-3.

(৭) R. C. Majumdar, op. cit., p. 15 ; K. K. Datta, Survey of India's Social Life And Economic Condition In The Eighteenth Century, 1707-1813 (1961), pp. 33, 35.

(৮) K. Nag and D. Rurman (eds.) op. cit, Part I, p. 4, and Part III, pp, 95, 118-120.

(৯) W. Ward, A View of the History, Literature And Religion of the Hindoos (1817 , Vol, II, pp. 122-123.

(১০) Q. Carufurd, Sketches Chiefly Relating To The History, Religion, Learning And Manner of the Hindoos (1792), Vol I, p. 242.

(১১) J. Peggs, Ghat Murder In India ; B. Buchanan ; Memoir of The Expediency Of An Eccelesiastical Establishment for British India (1812), p. 98 ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড (১৩৫৬ সন), পৃঃ ৫১৫-৫১৮।

(১২) Parliamentary Papers, House of Commons, 1828, Vol. XXIV, pp. 3, 10-12, 55-58, 241-249.

(১৩) W. Ward, Op. Cit., pp 49-52 ; W. W. Hunter, the Annals of Rural Bengal (1868), pp. 127-128.

(১৪) R. C. Majumdar, op. cit., p. 16 ; W. Ward, op. cit., Vol.I, pp. 117-118 ; রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪ খৃঃ), ১৩৫৮ সনে প্রকাশিত নূতন সংস্করণ, পৃঃ ১৪-১৫

(১৫) Fanny Parkes, **Wanderings of A Pilgrim In Search of the Picturesque**, Vol II (1850), pp. 104-105.

(১৬) T. K. Ray Chaudhuri, **Bengal Under Akbar And Jahangir** (1953), pp. 98-104.

(১৭) H. H. Wilson, **Essays And Lectures Chiefly On The Religion of The Hindus** (1862), Vol. I, pp. 170-172 ; অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৮৮), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০১-২০৫, ২১৮-২২০ ।

(১৮) N. K. Sinha, **The Economic History of Bengal** (1961), Vol. I, p. 4 ; Vol. II. p. 217.

(১৯) **Ibid.**, Vol. I, p. 5 ; Vol II, pp. 222-224 ; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস—আধুনিক যুগ' (১৩৭৮ সন), পৃঃ ৩৭৯-৩৮১ ।

(২০) A. F. Salahuddin Ahmed, **Social Ideas And Social Change In Bengal, 1818-1835** (1965), pp 7-10 ; W. Hamilton, **The East India Gazetteer** (1828), Vol I, p, 319.

(২১) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮১ ।

(২২) তদেব, পৃঃ ২৭০—২৭১ ।

(২৩) বাংলার তথা ভারতের অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য R. C. Dutt রচিত Economic History of India, R. P. Dutt রচিত **India To-Day** ও Major B. D. Basu রচিত **Ruin of Indian Trade And Industries** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

(২৪) N. K. Sinha, **op. cit**, Vol II, pp. 217, 232 ; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭১—২৭২, ৩৯৩—৪০১ ।

(২৫) N. K. Sinha, **op. cit.**, pp. 219—229 ; P. Sinha, "Social Change" in **the History of Bengal, 1757—1905** (C. U.), pp. 384—393 ; S. P. Sen (ed), **Modern Bengal, A Socio-Economic Survey** (1972), C. Palit's article on "Cal-

cutta—The Primate City" ; বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০—১৯০০" (১৯৬৮), পৃঃ ৫৯—৯৪।

(২৬) উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস বহু গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—C. Trevelyan, **On the Education of the People of India** (1838), A. Mayhew, **The Education of India** (1926), K. K. Datta, **Dawn of Renascent India** (1950), S. Nurullah and J. P. Naik, **A History of Education In India** (1951) ও N. S. Bose, **The Indian Awakening And Bengal** (1960)। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পঞ্চম অধ্যায়) এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার উচ্চশিক্ষা' (১৩৬০ সন) ও 'বাংলার জনশিক্ষা' (১৩৫৬ সন) বই দুটিতে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অবদান সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য R. C. Majumdar, **On Rammohun Roy** (1972)

(২৭) J, N. Farquhar, **Modern Religious Movements In India** (1915); S N Sastri, **History of the Brahmo Samaj** 2 vols, (1911—12) ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মজীবনী' (১৯৬২ সংস্করণ) ; **Renascent Bengal** (1971), article on "The Religious Ferment In Bengal" ; অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৭১), পৃঃ ১১৬—১২৯, ১৩৮—১৪৭।

(২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় 'রাধাকান্ত দেব', 'রামকমল সেন', 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' ইত্যাদির জীবনী দ্রষ্টব্য।

(২৯) A, C Gupta (ed.), **Studies In The Bengal Renaissance**, S. C. Sarkar's article on "Derozio And Young Bengal".

(৩০) E. Thompson, **Suttee** (1928) ; P. C Ganguli and D. K. Biswas (eds.), S. D, Collet's **Life And Letters of Raja Rammohun Roy** (1962), Ch VII ; A. Mukherjee, **Reform**

And Regeneration In Bengal (1968), Ch IV ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস—আধুনিক যুগ', পৃঃ ৩৫১–৩৫৫।

(৩১) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), ৮ম অধ্যায় ; K. K. Datta, **Dawn of Renascent India** (1950) ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৫—৩৫৭।

(৩২) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সং), 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ' গ্রন্থে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনা দ্রষ্টব্য। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭—৫৪।

(৩৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮ ; পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র,' প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৬৮), পৃঃ ১১৯।

(৩৪) তদেব, পৃঃ ৩৩১-৩৫০ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার স্ত্রীশিক্ষা' (১৩৫৭ সন) ; K. K. Datta, **Education And Social Amelioration Of Women In Pre-Mutiny India** (1936), Chapter on Women's Education ; বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড ; ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

(৩৫) S. P. Sen (ed.) **Modern Bengal—A Socio—Economic Survey**, A. Mukherjee's article on the 'Transformation of Caste' ; L. S. S. O.' Malley, **Indian Caste Customs** (1932), pp. 118-120, 166-175 ; P. Sinha, **Nineteenth Century Bengal** (1965, pp. 5-6.

(৩৬) A Mukherjee, **Reform And Regeneration In Bengal** (1968), pp. 209-218.

(৩৭ **Parliamentary Papers**, Commons, 1828, Vol. XXIV ; D. R. Banaji, **Slavery In British India** (1933) ; রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬২-৩৬৪।

(৩৮) তদেব, পৃঃ ৩০৭ ; অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৩-৮৪।

(৩৯) J. Peggs, Ghat Murder In India ; the Rev. J. Long, "The Banks of the Bhagirathi" in The Calcutta Review, 1846. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৭-৩০৮।

(৪০) তদেব, পৃঃ ৩১৫-৩১৭।

(৪১) Rev. J. Long, "The Social Condition Of The Muhammadans Of Bengal," in the Transactions of The Bengal Social Science Association, Vol. III, Pt. I (1869) ; W. C Smith, Modern Islam In India (1943) ; W. W. Hunter, The Indian Mussalmans (1945) ; S. B. Chaudhuri, Civil Disturbances During The British Rule In India (1955) ; A. R. Mallick, British Policy And Muslims In Bengal, 1757-1856 (1961) ; Qeyamuddin Ahmad, The Wahabi Movement In India (1966), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬০-৬৩।

উনিশ শতকের নব শিক্ষানীতির পুনর্মূল্যায়ন

নিখিলরঞ্জন রায়

বঙ্গদেশের ইতিহাসে আঠারো শতক ছিল সব দিক থেকেই এক অন্ধকারের যুগ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক অনাচার, সামাজিক অন্যায় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নিষ্ফল বন্ধ্যাত্বই যেন এ-যুগকে বিশেষভাবে কলঙ্কিত করে রেখেছে। নবাবী আমলের শেষ অধ্যায় নানা কুকীর্তি ও কুশাসনের কেচ্ছাকাহিনীতে ভারাক্রান্ত। এ-যুগে সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আর সাধক-কবি রামপ্রসাদ। এ দু'জন ছাড়া আঠারো শতকের বাংলার সারস্বত অবদান একান্তই অকিঞ্চিৎকর। যাত্রা, খেমটা নাচ, কবির লড়াই, পাঁচালী ইত্যাদি জনপ্রিয় লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানগুলিও হয়ে উঠেছিল কুরুচি, আদিরস, অশ্লীলতা এবং ইতরামোর ধারক ও বাহক। মুসলমান আক্রমণ ও দীর্ঘদিনব্যাপী দুঃশাসনের ফলে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হিন্দুসমাজ তার প্রাণশক্তি হারিয়ে যেন পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। মুসলমান শাসকের নানা অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস ছিল না হিন্দুসমাজের। আর স্পর্শদোষে জাতিচ্যুতির অবিবেকী বিধান দিয়েই সেদিনের সঙ্কীর্ণমনা সমাজপতিরা সমাজের রক্ষাকবচ রচনার প্রয়াস করেছিলেন মাত্র, সমাজকে রক্ষা করতে পারেন নি। এরূপ একটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক সামাজিক পটভূমিতে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাও ছিল নিষ্প্রাণ ও অদূরদর্শী। মুসলমান নবাব বাদশাহরা কেউ কেউ শিক্ষা ও শিল্পের কিছু কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে সারা মুসলমান যুগটাই ছিল অজ্ঞতা ও অশিক্ষার যুগ। যে-সময়টা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রেনেশাঁ আন্দোলনের ফলে মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার যুগান্তর ঘটল, সে-সময়টা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম শক্তিশালী পাশ্চাত্যের কাছে অক্ষম, পুরাতনপন্থী ভারতের শোচনীয় পরাজয়। আঠারো শতকে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব মূলতঃ সেই

পরাজয়েরই কাহিনী। পলাশীর আমবাগানের দাঙ্গা আর রবার্ট ক্লাইভের মারফত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ ইত্যাদি ঘটনা নূতনের কাছে পুরাতনের, বীর্যের কাছে নির্বীর্যতার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারের অনিবার্য পরাভব ভিন্ন কিছু নয়। শাসন-ক্ষমতা করায়ত্ত হওয়ার পর ইংরেজরা যখন প্রথম এ-দেশীয়দের শিক্ষার কথা ভাবতে বসলেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলতে বুঝাত সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল চতুষ্পাঠি। আর, আরবী ও ফার্সি পড়ান হত মাদ্রাসায়। গাঁয়ে গাঁয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালা ও মক্তবে। অ্যাডাম (Adam) সাহেবের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা ও বিহারে প্রায় এক লাখ পাঠশালা-মক্তব চালু ছিল। অক্ষর পরিচয়, সামান্য লেখা ও পড়া, আর শুভঙ্করী হিসাব শেখান হত পাঠশালায়। ছাপান বই তো দূরের কথা, হাতে-লেখা পত্র-পত্রিকারও কোনো চল ছিল না। পড়া ও পড়ান চলত মুখে মুখে, আর লেখা চলত তালপাতায়। কিন্তু এ-হেন মামুলী শিক্ষা-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও শূণ্যগর্ভতা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, ব্যবস্থাটা ছিল অনেকটা সর্বজনীন, অর্থাৎ দেশের সব অঞ্চলে। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই পাঠশালা দেখতে পাওয়া যেত। নিরাভরণ ও নিরোপকরণ পাঠশালাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল সহজ প্রবেশ্য এবং সে-যুগের মানুষের আটপৌরে প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক। সংস্কৃত অনুশীলিত হত টোলে ও চতুষ্পাঠিতে। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরাই প্রধানতঃ সংস্কৃত চর্চা করত। মোল্লা-মৌলভীরা আরবীতে পাঠ নিত। ফার্সি ছিল নবাব-দরবার ও কোর্ট-কাছারীর ভাষা। সরকারী নথীপত্র, দলিল-দস্তাবেজ লিখিত হত ফার্সিতে। অ্যাডাম সাহেবের বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৫) দেখা যায় পাঁচটি জেলায় ফার্সি-জানা হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২০৮৭, আর মুসলমান ছিল ১৪০৯ জন। হিন্দুদের মধ্যে কায়স্থরাই ফার্সি পড়ত বেশী। নিজামতী ও জমিদারী সেরেস্তায় কায়স্থ কর্মীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

উচ্চতর দেশীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে টোল-চতুষ্পাঠি উল্লেখযোগ্য। আটারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেশের সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী নাটোরের রাণী ভবানী, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমানের মহারাজা এবং আরও অনেকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে আসছিল। কিন্তু

বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুণ সেই আনুকূল্য ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। লর্ড মিণ্টোর বিবরণে (১৮১১) পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতের সংখ্যা যেমন কমে এসেছে, শিক্ষার প্রসারও তেমনি হয়েছে সঙ্কুচিত। বঙ্গদেশে সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ প্রতিভাবান প্রতিভূ ছিলেন শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্য এবং যাবতীয় পুরাণ-শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ পণ্ডিত। উনিশ শতকের প্রারম্ভে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা যুগেরও অবসান ঘটে গেল। সংস্কৃত-চর্চার উদার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ব্যাকরণের কচকচি আর আধিবিদ্যামূলক তর্কবিতর্কে পর্যবসিত হ'ল। প্রাচীনত্বের মোহে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার ঘটল অপমৃত্যু। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণীয়।

"পণ্ডিতেরা যেথায় থাকেন বিন্ধেরত্ন পাড়ায়,
নস্যি উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়।
চলছে সেথা সূক্ষ্ম তর্ক সদাই দিবা রাত্র,
পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র॥"

প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। মানুষ তখনও সেই পুরাতনী শিক্ষাকেই সাদরে গ্রহণ করত। কিন্তু দেশ ও কালের অনিবার্য পরিবর্তনকে উপেক্ষা ক'রে কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থাই টিঁকে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোরও পরিবর্তন বা সংস্কার অপরিহার্য। আঠার শতকের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ফলে বঙ্গদেশের জন-জীবনে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনকার সেই মামুলী শিক্ষাও হয়ে পড়ল নেহাৎ অচল ও অকেজো।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে যে কয়টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :—

১৭৮১ খৃঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন ;

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে কাশীতে 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন ;

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ;

১৮০০ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী কর্তৃক কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন।

প্রসিদ্ধ ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়ম কেরী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক। এ দেশে শিক্ষাপ্রসার এবং বাংলা অভিধান ও সংবাদপত্র প্রকাশ এবং প্রথম ছাপাখানা স্থাপন ইত্যাদি শিক্ষা-বিবর্ধক কার্যকলাপের পথিকৃৎরূপে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অবদান অবিস্মরণীয়। সেকালের একটা সংস্কৃত শ্লোকে এই পথিকৃৎদের নাম কীর্তিত হত।

"হেয়ার কলিন পামরশ্চ
কেরী মার্সম্যানস্তথা।
ইতি পঞ্চগোরাং স্মরেন্নিত্যং
মহাপাতকনাশনম্॥"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং খৃষ্টান মিশনারীরা যে, তাদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে এবং কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ-সব শিক্ষোদ্যোগ করেছিলেন সেকথা অস্বীকার না ক'রেও বলা অনুচিত নয় যে, তাদের এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলেই পুরাতন জীর্ণ খোলসের পরিবর্তে একটা নূতন এবং প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এ-দেশে। এই নূতন ইংরেজীমুখ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনো মতেই জাতীয় শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু এই বহুবিতর্কিত বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার দৌলতেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তা অনুপ্রবেশ করেছিল শিক্ষিত মানুষের মনে। ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষা লোকসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রসার লাভ করতে পারে নি। তাই বিগত দু'শো বৎসরেও শিক্ষা হয়ে আছে মুষ্টিমেয় বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষের ভোগ্যবস্তু। আপামর জনসাধারণের সর্বজনীন শিক্ষা এখনও দূর অস্ত্।

অ্যাডাম এবং কেরী উভয়েই কিন্তু ছিলেন দেশীয় শিক্ষানীতির সমর্থক। দেশের টোল-পাঠশালা, মক্তব-মাদ্রাসার সময়োপযোগী সংস্কার এবং দেশীয় ভাষা-মাধ্যমের উৎকর্ষ সাধন দ্বারাই জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ করা উচিত—এ অভিমত পোষণ করতেন এঁরা এবং আরও অনেকে। ভারতীয়দের মধ্যে

শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনার যে রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সংক্ষেপে তা হচ্ছে—

(১) সাধারণের শিক্ষার জন্য দেশজ পাঠশালাগুলির সুসংগঠন ও উন্নতি সাধন।

(২) পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারতীয়গণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একটা নূতন বিভাগ স্থাপন।

(৩) ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সির সম্যক্ অনুশীলন।

১৮১৭ সনে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন সে-কালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, আলেকজাণ্ডার এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার. এডোয়ার্ড হাইড ঈষ্টের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কলেজই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যসূচির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা, ইতিহাস, ভূবৃত্তান্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞানে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়েই বৃটিশ সরকার এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে প্রত্যক্ষ-ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। তার পূর্বে এবং পরেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে প্রধান উদ্যোগ ছিল মিশনারীদের।

এই নূতন শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারার পর্যালোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। সে-সময়ে কলকাতায় একটা সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের যে পরিকল্পনা এবং সে উদ্দেশ্যে যে অর্থ বরাদ্দের কথা সরকার বিবেচনা করছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন রায় তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :—

"We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives in India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences, which the nations of Europe have carried to a

degree of perfection and that have raised them above the inhabitants of other parts of the world. We looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation.

We find that the Government are establishing a Sanskrit School under Hindu Pundits to impart the same knowledge as is already current in India. The pupils there will acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men."

রামমোহন ছিলেন প্রাচ্যভাষা ও শাস্ত্র-পারঙ্গম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়মূর্তি রামমোহন মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতের পুনরুত্থান সম্ভব। সংস্কারমুক্ত রামমোহন যেমন প্রাচীন চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা আবিষ্ট হন নি, তেমই নূতন ভাবধারার কাছে আত্মসমর্পণও করেন নি। সমন্বয়ের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে রাজা রামমোহন ভারতের নবজাগৃতির পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

পুরাতন অর্থাৎ প্রাচ্যপন্থী এবং নূতন অর্থাৎ পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ উনিশ শতকের শিক্ষেতিহাসে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। বিতর্ক বেশ প্রবল আকার ধারন করেছিল। উভয় পক্ষেই মহারথী সমাবেশ ঘটেছিল। শিক্ষায় ইংরেজীর প্রাধান্য ও গুরুত্ব আরোপিত হবে অথবা শিক্ষার মাধ্যম ও বিষয়বস্তু সব কিছুই হবে এ দেশীয়—তাই নিয়ে সে-দিনকার বাকবিতণ্ডার উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। এই বহু-বিতর্কিত প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চের সরকারী সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

"His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India and that all the funds appropriated for the purpose

of education would be best employed on English education alone".

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক নিজেও ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির অনুরাগী সমর্থক। আর তাঁর নীতির পেছনে ছিল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পূর্ণ সমর্থন। জেনারেল কমিটির সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নাম এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক অমরত্ব লাভ করেছে। আজও অবধি ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার তারা মেকলের সেই বিখ্যাত প্রতিবেদন থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে বা তার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁর অভারতীয় মনোভাবের নিন্দা ক'রে থাকেন। এই অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে মেকলে অপেক্ষা উইলিয়ম জোন্স ও জেমস প্রিন্সেপ এবং আরো কেউ কেউ ছিলেন বহুগুণে পারদর্শী। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মেকলে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন। তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনের কয়েকটি ছত্রই এর স্পষ্ট প্রমাণ। যেমন "A single shelf of good European library is worth the whole native literature of India and Arabia."

কিন্তু বিলেতের পার্লামেণ্টে ১৮৫৩ সনের 'ইণ্ডিয়া বিল' প্রসঙ্গে লর্ড মেকলের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই উক্তিতে তাঁর উদার দূরদৃষ্টি এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে।

"I will never consent to keep them ignorant in order to keep them manageable, or to govern them in ignoranee in order that we may govern them long.

It may be that the public mind in India may expand under our system till it has outgrown that system : that by good government we may educate our subjects, into a capacity for better government, that having become instructed in European knowledge, they may in some future age demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to evert

or to retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history."

ভারতের নব জাগরণের বীজ নিহিত আছে মেকলের এই উক্তিতে। মেকলে সাহেবের ভূয়োদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালীন ইতিহাসে। উনিশ শতকের নব জাগরণ ব্যাপকতায় ও বৈচিত্র্যে ইউরোপীয় রেনেশাঁর সমশ্রেণীর। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ দিনের তমিস্রা ভেদ ক'রে নবসৃষ্টির আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। আর সেদিনকার নবজাগৃতির প্রেরণা এসেছিল এক নূতন শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা থেকেই। রামতনু লাহিড়ীর জীবন চরিতে মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী তাই মন্তব্য করেছেন—তৈরি জমিতেই লর্ড মেকলে বীজ বপন করেছিলেন, আর ফসল ফলেছিল পর্যাপ্ত। "Lord Macaulay sowed his seeds on the prepared soil, and rich was the harvest reaped."

জাতীয় শিক্ষাচিন্তা

ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ পদার্থটা পণ্ডিতেরা য়ুরোপীয় শিক্ষার ফল বলেই গণনা করে থাকেন।[১] হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে যে ইংরেজি শিক্ষা এ-দেশে প্রচারিত হয়েছিল, দেশের পক্ষে সর্বতোভাবে তা কল্যাণকর হয় নি, তবে দেশের জন্য দরদ বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য এই বিদেশী শিক্ষার ভূমিকা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

'অদৃষ্টের পরিহাস না বলে একে ইতিহাসের পরিহাস বলাই ভালো। ইংরেজ সাধ করে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল, ভেবেছিল ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হবে তাদের সত্যকারের আপনজন। এমনকি, তারাই হবে সাম্রাজ্যের ধারক এবং বাহক। কিন্তু ফল এমনি উলটো হল যে সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিশেষভাবে যাঁরা বিলেতে গিয়ে বিলিতি শিক্ষাকে পাকা করে এনেছিলেন তাঁরাই হলেন ইংরেজ বিতাড়নের প্রধান উদ্যোক্তা। বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের নানা গুণে তাঁরা আকৃষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে এক পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।'[২]

কিন্তু ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানভাণ্ডার এঁরা একদিকে যেমন পরম শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগের সঙ্গে আহরণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন, তেমনি আবার এই আলোরই পাশাপাশি ভারতবর্ষে ও অন্যত্র ইংরেজ শোষণের ভয়াবহ বীভৎসতার কালিমা এঁদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল। এঁরা বুঝেছিলেন, 'ইংরেজের এক হাতে অমৃত, অপর হাতে বিষ। সেদিন ইংরেজি শিক্ষায় যাঁরা ছিলেন অগ্রগামী তাঁরাই অগ্রণী হয়ে বিষপাত্র কণ্ঠে গ্রহণ করেছেন।'[৩]

পরবর্তীকালেও আমরা এইভাবেই বিদেশে বিদেশী শিক্ষায় লালিত অরবিন্দকে পেয়েছি 'স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি' রূপে, বারীন্দ্রকে 'স্বদেশাত্মার

অগ্নিমূর্তি'রূপে—'স্বদেশী মহলের নীলকণ্ঠ' হতে হয়েছে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আরো অনেক ব্যক্তিত্বকে।

কাজেই, প্রধানত ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা[৪] যে স্থাপিত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১৮৬৭, এপ্রিল ১২); মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল। মেলার অধ্যক্ষগণ 'স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, কুস্তি ও ব্যায়ামাদির পুনর্বিকাশে উৎসাহদান করার জন্য 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' হলেন।

দ্বিতীয় বার্ষিকসভায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ[৫] বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা সাধারণের লজ্জার বিষয়।······অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।'

সংক্ষেপে বলা চলে, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসম্মান জাগরণ, জাতীয়-চরিত্রে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল 'হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।[৬] 'হিন্দুমেলা' প্রসঙ্গে যে চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ করা হলো তারই গভীরে পরবর্তী কালে স্বদেশী শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা-বাসনারও দূরতম বীজ নিহিত আছে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। গণেন্দ্রনাথ যে 'আত্মনির্ভরতা'র কথা বলেছিলেন, জাতীয় চরিত্রের সেই 'স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি' কিন্তু সেইদিনই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় নি। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টিরও প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘকাল এ জিনিস দেখা যায় নি। সেই পর্যায়টা ছিল রাজপুরুষদের কাছে দরখাস্ত লেখার যুগ—আবেদন-নিবেদন-ব্যর্থতা-অপমানে ভর্তি। স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং কর্মচেষ্টার প্রকৃতিই যে এই রকমই ছিল, তার বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় ভিন্ন প্রসঙ্গে[৭] পরবর্তীকালে রচিত[৮] রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ থেকে—"আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদঘর্ম চেষ্টা করি—এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি,

যা করবার তা করা হল। … **তখনকার দিনে চোখ-রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গভর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম।** আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনে তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। **তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।"**

একই প্রবন্ধে, "……ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এই রকম ধারনা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই।"

তাঁর বক্তব্য, বিদেশীর শাসনাধীনে থাকলেই যে দেশ স্বদেশ হয় না তা নয়। মানুষ কোনো দেশে দৈবক্রমে জন্মায়। সেই দেশকে "সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে" তুলতে হয়, অধিকার করতে হয়। 'বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে' যাকে গড়ে তোলা যায় তারই উপরে অধিকার জন্মায়, অধিকার এমনিতে আসে না।

কংগ্রেস গঠনের পরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সেকালে লক্ষ্য করা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে: "আমরা কংগ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে জীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা, দূর করবার কোনো উদ্যোগ করি নি।" কেউ কেউ সেকালে এমন অভিমতও পোষণ করতেন যে, দেশ পরাধীন বলেই অনেকে দেশ সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু এ কথার কি কোনো মূল্য থাকতে পারে? "সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতঃই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা দিলে তার উদ্যম বাড়ে বই

কমে না। লর্ড কার্জন যেদিন বঙ্গভঙ্গের সূচনা করেছিলেন, সেদিনও এই কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, প্রতিকূল অবস্থায় দেশপ্রেম—দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ আত্মত্যাগেই প্রণোদিত করে যথার্থ দেশপ্রেমিককে। বাধা আসবেই, কিন্তু উদ্যম তাতে ব্যাপক হয়, নিষ্ঠা তাতে গভীর হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে আমরা পরে প্রবেশ করবো। কেননা, কোন্ পটভূমিতে এই পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেই পটভূমিটির পরিচয় মোটামুটিভাবে না জানলে জাতীয় শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

মনে রাখতে হবে, অবস্থাটা তখন এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, 'দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে।'[৯]

আমাদের দেশ ও জাতির পরম সৌভাগ্য বলতে হবে গত শতাব্দীর শেষ দিকে একাধিক চিন্তানায়ক এই গভীর সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীর কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্নিহিত চাতুরীও এঁদের চোখে ধরা পড়েছিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা যে শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাকেন্দ্রিক স্বদেশী আন্দোলন নয়, এ কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক কালের ঐতিহাসিকবৃন্দ। এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র এতটা সরল নয়—এর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে মনে রাখতে হবে এর জটিলতা এবং বহুমুখিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির সহায়তা নিয়ে বলা যেতে পারে, 'সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা' দেশকে সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলবার ব্যাকুলতাই এই আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। বস্তুত, "যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার" উদ্যোগই স্বদেশী আন্দোলনের আকারে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা স্বদেশী আন্দোলনের প্রাথমিক

পর্যায় থেকেই লক্ষণীয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন স্পষ্ট দৃশ্যগোচর হলো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই নানা ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে জঙ্গী দেশপ্রেম ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছিল—জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এই জঙ্গী দেশপ্রেমের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দুই জন গবেষক যে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, তাঁদের ভাষাতেই সেটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে—

"The memories of the Sepoy war (1857), the Indigo Agitation (1860), the activities of the Hindu Mela (1867-1880), the Indian League (1875) and the Indian Association (1876), the Ilbert Bill Agitation (1883), the Activities of the Indian National Conference (December, 1883) followed by the Indian National Congress (1885) ;—the literary creations of Rangalal, Madhusudan, Dinabandhu, Bankim, Hemchandra, Nabinchandra and Rabindranath (from 1885-1900) ;—the national plays of Jyotirindranath (Tagore), Upendranath (Das) and Girishchandra as well as the national songs of Satyendranath (Tagore), Dwijendranath (Tagore), Manmohan (Basu), Gobindrachandra (Roy) and Dwijendralal (1868-1900) ;—the Journalistic propaganda of the Hindu Patriot (Since 1853) and the Amrita Bazar Patrika (Since 1868) as well as the Bengalee under Surendranath (Since 1879) ;—the moral and spiritual forces generated by Keshabchandra, Ramkrishna, and Bejoykrishna (1860-1899), Vivekananda's Chicago Success (1893) and the cult of Sakti-yoga ,—all these factors shook Bengal and together awakened the self-consciousness of the Bengalis and promoted the spirit of militant nationalism in our country. (From 'The origins of the National Education Movement' : Prof. Haridas Mukherjee and Prof. Uma Mukherjee)

প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে জেগেছিল দেশবাসীর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্মজ্ঞ পাঠকগণ অনুভব করতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথের যে পর্বটিকে রবীন্দ্র-রসিক সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত পরিক্রমার কাল হিসেবে চিহ্নিত করেন—সেই পর্বটি এই উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্ন। নূতন যে সত্যটি এই পর্যালোচনা থেকে আহরণ করা যায় তা' হলো—এই পর্বটি প্রাচীন ভারতে কবি রবীন্দ্রের একক পরিক্রমার ইতিবৃত্ত মাত্র নয়, কবি রবীন্দ্রের সহযাত্রীরূপে এই প্রাচীন ভারত ভ্রমণের পুণ্য সেকালের বাঙালীদের সকলেরই। অর্থাৎ, এই পর্বের রবীন্দ্রকাব্য এই বিশেষ অর্থে জাতীয় স্বপ্নকল্পনার অবিস্মরণীয় দ্যোতক হয়ে উঠ্‌লো। রবীন্দ্রনাথের কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য কাব্য পর্যায় এই প্রাচীন ভারত ভ্রমণের ছন্দোবিধৃত দিনপঞ্জীর মতো। নিজের অতীতকে যে জাতি জানে না তার বর্তমানের পায়ের তলায় মাটি নেই আর ভিত্তিহীন বর্তমান কোনো স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেও তাকে চালিত করতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই।

জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে তাই পরিকল্পনা করা হয়েছিল এমন এক ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতির—যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানশিক্ষা-সহ সাহিত্য অধ্যয়ন যাতে পূর্ণমূল্য ও মর্যাদা পেতে পারে, জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হবে তাকে এবং পরিপূর্ণরূপে এই শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং এর উদ্দেশ্য হবে, 'the realization of the national destiny.'

পরবর্তীকালে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেরই তাই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে কয়েকজন চিন্তানায়কের কাছে, যাঁদের দূরদৃষ্টিতে প্রথমেই ধরা পড়েছিল এই অশেষ সত্য যে, জাতীয় শিক্ষাকে উপরিলিখিত লক্ষ্যের দিকে চালিত করলেই 'the realization of the national destiny' সম্ভব হবে।

এই অবিস্মরণীয় চিন্তানায়কগণের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম ভারতীয় উপাচার্য' গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিচার্য। গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রারম্ভে তাঁর সমাবর্তন বক্তৃতাগুলির (১৮৯০-১৮৯২) মাধ্যমে গুরুদাস লর্ড বেন্টিকের আমল থেকে (১৮৩৫) প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য ত্রুটিগুলির দিকে একদিকে সরকারের, অন্যদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য তিনি যে সুপারিশগুলি প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করেছিলেন তারে মধ্যে ছিল—(১) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, (২) মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ-প্রবর্তন, ও (৩) যন্ত্রবিদ্যার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরবর্তীকালে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রথম ভারতীয় উপাচার্যের' সমাবর্তন ভাষণগুলির মধ্যে তারই খসড়ারূপটি লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাবিদ্ ও দেশনেতাদের দৃষ্টিতে যেমন, তেমনই কবি ও সাহিত্যিকের ধ্যান-ধারণাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ সেই অগ্রবর্তী চিন্তানায়কগণের অন্যতম, যিনি প্রায় একই সময়ে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটির কথা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই জানেন। সমস্ত প্রবন্ধটিই সকলের অবশ্যপাঠ্য ও উদ্ধৃতিযোগ্য হলেও সঙ্গত কারণেই আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ আমাদের বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য তুলে দিচ্ছি—

১. বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই।

২. এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দ-বিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।

৩. যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্য পুস্তকে নাই; যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহৃদ্ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ

শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বলিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না।

'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটির মধ্যে সেকালের দেশপ্রেমিক বাঙালীর অন্তরের গভীর আকাঙ্ক্ষা অবিস্মরনীয় ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের একাধিক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহনের নাম সর্বাগ্রে স্মরনীয়। 'সাধনা' পত্রিকার পরবর্তী মাঘ মাসের সংখ্যায় রবীন্দ্র-সুহৃদ্ লোকেন্দ্রনাথ পালিত তাঁর 'শিক্ষা-প্রণালী' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্র-ধারণাই ব্যক্ত করেন।

সুলভ নয় অথচ প্রাসঙ্গিক ব'লে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস ও আনন্দমোহনের মন্তব্য ও অভিমত [১০] এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দিচ্ছি—'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

গুরুদাস লিখেছিলেন: "আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই-একটি কথা (যথা, যুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি।··· ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধহয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমত, বঙ্গভাষায় এমন-সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান-দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও

রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাংলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভা-সমিতির কার্য ও বক্তৃতা ইংরেজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গ ভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই-সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"

আনন্দমোহন বসু এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই" কয়েক বছর পরে 'ডন' পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) সম্পাদকরূপে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা ক'রে বললেন, "এই শিক্ষা আমাদের মধ্যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে পারে নি, আত্মবিশ্বাসী আত্মনির্ভরশীলে আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকরূপে আমাদের তৈরি করতে পারে নি। পরবর্তী অংশটুকু তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "The present system of mere Examinations has failed to bring to the front the stamp of men who can hold their own in the great industrial struggle which is the marked feature of the great civilisations midst which we live. Must we still stand by with folded hands until the doom of extinction overtakes us? Seriously speaking, these are momentous questions and cannot indefinitely wait for an answer."

প্রচলিত বিদেশী শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও অন্তর্নিহিত চাতুরী নিয়ে গত শতকের সর্বশেষ দশকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, ভারতপ্রেমিক বিদেশীগণও জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনকে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর এবং দেশের সর্বতোমুখী বিকাশের পক্ষে অনিবার্য বলেই মনে

করেছিলেন। এঁদের মধ্যে Sir Birdwood, Mrs. Annie Besant ও Sister Nivedita বিশেষভাবে স্মরণীয়। Mrs. Besant ডন পত্রিকার জুন, ১৮৯৭ সংখ্যায় 'The Education of Hindu youth' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

—'Boys of the upper classes must, under the circumstances of the day, receive an English education. Without this, they cannot gain a livelihood, and it is idle to kick against facts we cannot change. We can take the English education, then for granted. But a reform in the books they study is necessary, and efforts should be made to substitute a detailed knowledge of Indian history and geography now learned. A sound and broad knowledge of univesal history widens the mind and is necessary for culture but everyman should know in fuller detail the history of his own nation, as such knowledge not only conduces to patriotism but also enables a sound judgement to be formed……'

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অস্বাভাবিকতা দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়েছিল। Sir George Birdwood 'ডন' সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রে যে-সব সুচিন্তিত অভিমতাদি প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষা। পরিষদ' তাঁদের পাঠ-পরিকল্পনা-গঠনের ক্ষেত্রে এই সকল অভিমত বহুলাংশে গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় এই ভারতপ্রেমিক বিদেশী আমাদের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে কী গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন।

সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে চিন্তনায়কগণের এই অসন্তোষ কেবল তাত্ত্বিক সমালোচনাতেই পর্যবসিত হয়নি, প্রতিকারের বাস্তব পথেও তাঁদের প্রয়াস চালিত হয়েছিল। ১৮৯১-এর আগস্ট মাসে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াসে 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব্ ইয়ংমেন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সোসাইটি

যুগোচিত প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় নি। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরে সার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'র প্রতিষ্ঠাও স্মরনীয়। কার্তিকচন্দ্র নানের ভবনে ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও এই সূত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয় 'সারস্বত আয়তন'রূপে পরিচিত হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার অবকাশ স্বল্প। খুব সংক্ষেপে, রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি[১২]— "শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা কালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।·· এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃ আমাদের ভাষা সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি-জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্‌বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেলনা। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র-ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ রাজনৈতিক চেতনাকে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে জাতিকে, এই অনিবার্য পরিণাম লর্ড কর্জন অনুভব করেছিলেন। সুতরাং "ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ্ এ্যাক্ট"—এর সাহায্যে শিক্ষার মূলেই আঘাত হানতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুছে ফেলার

জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ্ কমিশন' স্থাপিত হয়েছিল ১৯০২-র জানুয়ারি মাসে। গুরুদাস ছিলেন সেই কমিশনের একমাত্র হিন্দু সদস্য। তিনি কমিশনের মেজরিটি রিপোর্টে তীব্র আপত্তি জানালেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অবিস্মরণীয় 'নোট অব্ ডিসেণ্ট' সত্ত্বেও ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই 'দি ইউনিভার্সিটিজ্ বিল' ১৯০৪-এর ২১ মার্চ চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হলো। গুরুদাসের সঙ্গে সেকালের চিন্তানায়কগণ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু ও মোহিতচন্দ্র সেন—সকলেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রথমেই। 'এ্যাক্ট' রূপে তা গৃহীত হবার পর সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়লো অসন্তোষ। তীব্র ক্ষোভে ও ঘৃণায় ফেটে পড়লো দেশ।

গুরুদাসের 'নোট অব্ ডিসেণ্ট'-সহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাদ গণনা করেছিলেন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা সকলেই। তারই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ডন সোসাইটি'—যার অনিবার্য ফলশ্রুতি পরবর্তীকালের **'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'**। অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ—সেকালের মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশন-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হলো সোসাইটি উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতাগুলি দূরীকরণ আর স্বাদেশিক ও জাতীয় ভাবধারার অনুশীলন।

১৯০৩-র ডিসেম্বর থেকেই সারা দেশ জুড়ে চলছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভ। ১৯০৫-র ৭ আগস্ট তারিখে কলকাতার টাউন হলের ঐতিহাসিক সভা থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গর্জন ক'রে উঠলো বাংলা দেশ। বস্তুত পক্ষে, ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নবপর্যায়ের সূচনা—বয়কট-স্বদেশী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লো এই আন্দোলন—রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে এই আন্দোলন প্রবেশ করলো শিক্ষা-জগতেও গভীরতর ভাবে।

সতীশচন্দ্রের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রগণ সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার জন্য এগিয়ে গেলেন। ১৯০৫-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ধার্য পি. আর. এস. ও এম. এ. পরীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রেই এই বয়কট-আন্দোলনের সূচনা। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ

মুখোপাধ্যায়, এবং বিনয়কুমার সরকার এই বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ছাড়া সকলেই সতীশচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য, ডন সোসাইটির নিয়মিত সদস্য এবং সর্বোপরি সতীশচন্দ্রের সঙ্গে একই মেসে ১৯০৫-র জুন মাস থেকে অবস্থান করেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এই মেসটির তত্ত্বাবধায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলনের এই চারজন অগ্রবর্তী নায়ক ছিলেন সে-যুগের সর্বাধিক দীপ্তিমান ছাত্র। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন সতীশচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

সতীশচন্দ্রের নেতৃত্ব তো ছিলই, তার সঙ্গে অবিলম্বে যুক্ত হলো রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা। ইতিহাসের সেই দিনগুলি কী উজ্জ্বল! বর্তমানের দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, যখন ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি-চারণার সম্মুখীন হই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেরণা, রচনা করলেন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গীতরাজি—তাঁর অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি। গান লিখছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় অজিত চক্রবর্তীকে নিয়ে মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশনের হল ঘরে আসছেন, গান গাইছেন, উদ্বুদ্ধ করছেন ছাত্রদের, দেশপ্রেমের শিখা রাখছেন অনির্বাণ! তাঁর সঙ্গে আরো আসতেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশপ্রেমের সাধনায় এই পর্বে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, আসতেন ভগিনী নিবেদিতা—'than whom a more passionate patriot the country has rarely seen.' হীরেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত মেস-বাড়িটিতে ছাত্রদের নিয়ে সভা করতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও পরীক্ষাসমূহ বয়কট করার জন্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতেন।

সতীশচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৫-র জুন মাসেই মেসটির চালনা আরম্ভ করেন। ১৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দোতলায় শুরু হলো এই মেস। এরই একতলায় ছিল ঐতিহাসিক 'ফিল্ড এ্যাণ্ড এ্যাকাডেমি ক্লাব'—যেখানে সেদিন সমবেত হতেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাস। ক্লাবটি ছিল এঁদেরই।

জাতীয় শিক্ষা চিন্তা ও তার বাস্তব রূপায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত চিন্তানায়কগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের দান অবিস্মরণীয়। বস্তুত পক্ষে, জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি বৃহদায়তন

গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। বিশেষত, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর পান্তির মাঠে যুবক সুবোধচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ এই স্বল্প অবকাশেও অনিবার্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণাকালে সুবোধচন্দ্র মাতৃভূমির জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখেছিলেন। কী চরম দুঃখ ও ত্যাগ সেজন্য বরণ করতে হবে, তা-ও তিনি জানতেন। সেই দুঃখ বরণের উৎসাহও সেদিন চতুর্দিকে দেখা গিয়েছিল। তাই পান্তির মাঠে প্রদত্ত ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "......If we are all ready to undergo the huge sacrifices that have been lately heard of, what in the world is there in the way of starting a National University ? .. Why then do we halt and falter ? The great demand is that of sacrifice. If I may say so, the first, the next and the last essential is sacrifice in the present crisis."

আরো কত মনস্বীর চিন্তা ও স্বপ্ন, কত বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করলো **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ**, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন, রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানরূপে এবং যার অধ্যক্ষ হলেন 'শ্রীঅরবিন্দ'। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি জাতীয় শিক্ষা চিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন সম্ভব হলো ?

কোনো ভাবুকই তা মনে করতে পারেন না। এ শুধু জাতীয় শিক্ষা চিন্তার একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের পরিণতি লাভ ; এবং অবশ্যই নতুন পর্যায়ের সূচনা : আর সেই নতুন পর্বের পরিণতিরূপে কলকাতা শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় : বহু দিক থেকে নতুন ধরণের। উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বাঙলী মনীষীর শ্রম ও সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের একটি প্রতীক হয়েই তাকে উঠতে হবে : আজ, কাল কিংবা পরের দিন !

১। রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৫ [প্রথম খণ্ড] ১৩৬৭ পৌষ

২। মনোমোহন ঘোষ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬]

৩। মনোমোহন ঘোষ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবন-আশ্বিন ১৩৭৬]

৪। রবীন্দ্রজীবনী [প্রথম খণ্ড] ১৩৬৭ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৬

৫। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৪ কার্তিক-পৌষ

৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী। মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশচন্দ্র বাগল।

৭। শচীন্দ্রনাথ সেন রচিত Political Philosophy of Rabindranath নামক গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিত "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য— রবীন্দ্র-রচনাবলী : চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৬-৪৪৪

৮। অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

৯। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' : রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্বিংশ খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৪২।

১০। সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয়, পৃষ্ঠা ৬১৬-৬১৭

১১। The Dawn, February 1898. P 354.

১২। 'আভাস'—চার অধ্যায় (১৩৪১)

বাঙ্গালীর ভারতীয়তাবোধ

ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিতে উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর গৌরবে উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলায় পলাসীর প্রান্তরে মীরজাফর-রাজবল্লভদের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। মোহনলাল-মীরমদনের মত কয়েকজন বাঙ্গালী দেশপ্রেমের উন্মাদনায় সেই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে জীবনাহুতি দিলেও বস্তুত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত সাধারণ মানুষ সেদিন জাতীয় জীবনের গুরুতর সঙ্কট-ক্ষণে নিশ্চল ঔদাসীন্যে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই বহুসংখ্যক মানুষ সেদিন যদি স্বদেশের সহিত নিজেদের সত্যকার সম্পর্কে বুঝিত, স্বদেশের স্বাধীনতার গৌরব বা স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিত, মুষ্টিমেয় ইংরেজ আর কিছু বেতনভুক্ত অথবা স্বার্থলুব্ধ বিশ্বাসঘাতক ভারতীয়ের সাহায্যে ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না।

তারপর ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস সুরু হইল। ইংরেজ-শাসন একই সঙ্গে অপরিসীম মহিমা ও অপরিসীম গ্লানি যুক্ত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ও সমাজ জীবনে আবির্ভূত হইল। বাঙ্গালী একই সঙ্গে পাইল ঐতিহ্যসম্পন্ন মহান ইংরেজকে (যে ইংরেজ শিল্পে, সাহিত্যে, গণতান্ত্রিক চেতনায়, ন্যায়পীঠ-নির্ভর পরিচালন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ও সমৃদ্ধ) এবং পরস্বাপহারী, অত্যাচারী, বর্ণবিদ্বেষী ইংরেজকে। ইংরেজ একই সঙ্গে বাঙ্গালী হৃদয়ের সোৎসাহ অভ্যর্থনা ও কঠিন ধিক্কার লাভ করিল। ইংরেজের সভ্যতা-দীপ্তি বাঙ্গালীর প্রগতিশীল দৃষ্টি খুলিয়া দিল, ইংরেজের সান্নিধ্যে বাঙ্গালী স্বাধীনতা স্পৃহা, সাংস্কৃতিক চেতনা, কার্যোদ্দীপনা, সংগঠনশক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী আয়ত্ত করিবার প্রেরণা ও সুযোগ পাইল। পক্ষান্তরে, ইংরেজ সংস্পর্শেই আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রাণ মথিত হইল পরাধীনতার গ্লানিতে স্বার্থপরায়ণ ইংরেজ শাসকবর্গ ও বণিকদের হীনতায় বিরক্ত বাঙ্গালীচি ভারত হইতে ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে

আগ্রহী হইয়া উঠিল। এ কথা আলোচনা না করিলেও চলিবে যে, প্রথম আবেগ দ্বিতীয় আবেগেরই অনুপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। ইংরেজের গুণাবলীর স্বীকৃতি এবং আপন চিন্তায় ও কর্মে সেগুলির অনুসরণের ফলশ্রুতি স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্য হইয়া সংগ্রামশীল হওয়া; ইংরেজকে এ ক্ষেত্রে সম্মান করার অর্থ কোনক্রমেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম রাখার সহায়তা করা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙ্গালী চিন্তাবিদ ও সংগঠন কর্মীদের মনে এই আবেগ জন্মাইয়াছে বলিয়াই রামমোহন পুরাতন পথ ছাড়িয়া ইংরেজের পথে আপন কর্মপদ্ধতির বিন্যাস করিয়াছেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশ্যে ইংরেজ শাসনকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন, বিদ্যাসাগর ইংরেজদের শিক্ষা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নিজের জীবনে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ফলাফল ভাল করিয়া চিন্তা না করিয়া ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজের মত সমুন্নত বৈরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদের চিন্তা প্রসারিত হইবে এবং ভারতবর্ষের উন্নতি দ্রুততর হইবে বলিয়া বঙ্কিম বিশ্বাস করিতেন। ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারতবাসী লাভবান হইবে—একথা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়া বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখনও চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিত্ত ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।" (বঙ্কিম রচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল, সংসদ সংস্করণ, খণ্ড—২, পৃষ্ঠা—২৪০—২৪১)

ব্রহ্মনায়ক কেশবচন্দ্র সেনও বঙ্কিমের পথেই চিন্তা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ সমকালীন কলিকাতার নেতৃস্থানীয় নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুরের মনোভাব একই রূপ ছিল এবং এইজন্য তিনি সেই সংস্কারাচ্ছন্নতার

যুগে দুইবার সমুদ্র পার হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। এমন কি, যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে নিষ্ঠাবান সৈনিকের ভূমিকা লইয়াছিলেন, তিনিও একই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজ শাসনে ভারতের লাভের কথা বড় গলায় বলিয়াছেন। জাতীয় কংগ্রেস কঠোর সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এই কংগ্রেসও প্রথম দিকে উপরোক্ত জননায়কবৃন্দ হইতে ভিন্ন মনোভাব দেখায় নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে এই সব স্বীকৃতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, প্রস্তুতির সোপান বা সিদ্ধিলাভের উপায় মাত্র। ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য দ্বারা ইয়োরোপীয় বিদ্যা, চিন্তাশক্তি ও মনোবলে সমৃদ্ধ হইয়া ভারতবাসী ভারত হইতে বিদেশী ইংরেজ শাসন বিদূরণের শক্তি অর্জন করিয়াছে।

ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর পুনর্জাগৃতির দিক হইতে ইংরেজ শাসনের হীনতা-দীনতাও সমভাবেই বিপরীত-প্রান্তিক সাহায্য করিয়াছে। ইংরেজদের ভারতশাসন ভারত ও ভারতবাসীর স্বার্থে নয়, ব্রিটেন ও ইংরেজদের স্বার্থে; ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-শাসন-কর্তৃপক্ষ শোষণের ক্ষেত্র বলিয়া যত মনে করিয়াছেন, ভারত শাসনের ব্যাপারে তাঁহারা যত অন্যায় করিয়াছেন বা যত দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহন করিয়াছেন, আর্ত বিরক্ত বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ততই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই দুঃসহ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই পূর্ণ মুক্তিলাভ ছাড়া হইতে পারে না, ক্রমেই তাহাদের এরূপ নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে। এইজন্য সেই সময় ভারতবর্ষে শিক্ষা-প্রসারের সামান্যতম ব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত এবং ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের বা শ্বেতাঙ্গদের শোষণের অথবা অত্যাচারের একটি দৃষ্টান্ত,—দুইই বাঙ্গালীকে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের জন্য সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন এবং অভীষ্ট পথে গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী বড়লাট জন এ্যাডাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আইন জারী করেন, উভয়ক্ষেত্রেই দেশের জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। আবার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, উভয় ঘটনাতেই জনসাধারণ আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর

ঘটনাই বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর জাগরণের হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ ভারত শাসনে স্বেচ্ছায় উদারতা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে গোপনে গুরুতর দুর্নীতির পথ লইয়া ও বাহিরে নিয়মতান্ত্রিক সাজিয়া ইংরেজ-রাজশক্তি ভারতের বা ভারতবাসীর স্বাভাবিক আত্মোন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, শোষণের ইতিহাসই ভারতে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘতর ইতিহাস। কিন্তু ইংরেজ শাসনের বহিরঙ্গ রূপ যাহাই হউক, এই শাসনের অনিবার্য ফল হইয়াছে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ।

আগে ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড অনেকগুলি প্রকৃত স্বাধীন বা কার্যত স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দিল্লীর সম্রাট নামেই সম্রাট, প্রকৃতপক্ষে ঔরঙ্গজেবের পরই দিল্লীর সম্রাটের অধিকার ও ক্ষমতা অনেক সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল রাজ্য কাগজে-কলমে দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল, তাহারা আচারে-আচরণে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ রাজশক্তি ভারত সম্রাটকে হতমান ও হতবীর্য করার সঙ্গে সঙ্গে ছলে বলে কৌশলে এই সব রাজ্যের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিল। বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের (১৭৬৫) পর ক্রমে ক্রমে ভারতের শাসনকর্তৃত্ব হাতে পাইয়াও প্রকাশ্যে ভারতবর্ষের অধীশ্বরত্ব করে নাই, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট কোম্পানীর সনদ বাতিল করিয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে লইয়া নিজেকে ভারতেশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করেন। 'সিপাহী বিদ্রোহ' জাতীয় বিপ্লব নহে বলিয়াই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহের নায়কদের যে-কোন স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে কাজ করিয়া থাকুক, বিদ্রোহের আগুন দিল্লী, মীরাট, বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, পাটনা,—ভারতের নানা জায়গায় দাবানলের মত ছড়াইয়া যাওয়াতে ইহার সর্বভারতীয় রূপও প্রকাশ পায়। বহু স্থানেই ইংরেজদের মারিয়া কাটিয়া তাড়াইয়া ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার আগ্রহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের ব্যর্থ পরিণতি সংশ্লিষ্ট সিপাহীদের দিক হইতে বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক হইলেও ফলশ্রুতিতে এই ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের স্মৃতি সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও

জাতীয়তাবোধের আবেগে মহৈশ্বর্য সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এই নবচেতনার মূল্য অপরিমেয়। স্বাধীনতাপ্রিয়, চিন্তা-শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাঙ্গালী আসিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই শিক্ষক পাদ্রী উইলিয়ম কেরীর প্রতিভা বাঙ্গালীর উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মনোজগতে সর্বাধিক আলোড়ন জাগাইয়াছিল মহাবিদ্রোহী তাত্ত্বিক ফিরিঙ্গী হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক হেন্‌রী ডিরোজিও। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়ক বঙ্গসন্তানেরাও বাঙ্গালীর নব-উন্মেষিত জাতীয় চেতনা সম্প্রসারিত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় তরবারী-বন্দুক চালাইয়া নয়, বিদ্রোহোত্তর অখণ্ড ভারতের সংহতি ও সর্বাত্মক জাতীয়তাবোধ প্রতিষ্ঠার এবং তজ্জন্য সকল প্রদেশের সব ভারতীয়ের পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাঙ্গালী স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হইল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহায়তার বা পরাজিত সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতির সন্দেহে সাধারণ দেশবাসীর উপর ইংরেজ শাসন-কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে যে অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাহাও মানবতামুখী বাঙ্গালীকে ইংরেজ-বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এই সময় শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বাঙ্গালী নীলচাষীদের উপর অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহে বাঙ্গালীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল না বলিলেই হয়. কিন্তু বিদেশী রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষতাপুষ্ট নীলকরদের অত্যাচার হইতে অসহায় চাষীদের বাঁচাইবার আগ্রহে বাঙ্গালী বাংলাদেশে যে ব্যাপক আন্দোলন সুরু করিল, সে আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া পড়িল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও। সিপাহী বিদ্রোহের চেয়ে নীল-আন্দোলন ভারতের প্রত্যক্ষ জাতীয় আন্দোলন রূপে দেশের মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। এ হিসাবে 'নীলদর্পণ-এর কৃতী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অথবা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবদানের তুলনা হয় না। বাস্তবিক সব দিক বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, বাঙ্গালী চাষীরা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে সঙ্ঘবদ্ধ নীল-ধর্মঘট করে, তাহা ভারতের সার্থক মুক্তি সংগ্রামের সুমহান ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। আন্দোলনের চাপে ভারতসরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম আইনে নীলচুক্তি রদ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই

চুক্তি-বাতিল নীল-আন্দোলনের বড় জয় সন্দেহ নাই, তবে তার চেয়েও বড় জয় এই আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতের মানুষ বিদেশী ইংরেজের শাসন চক্র হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবার অধিকতর উৎসাহ অনুভব করিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুখ্যাত দাসপ্রথা বিলোপে Mrs Beechen Stowe-র 'Uncle Tom's Cabin'—এর সাফল্যের চেয়ে জাতীয় পুনরুত্থানের ব্যাপকতর পটভূমিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 'নীলদর্পণের'-এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বেশী। এই নীল-আন্দোলনের পরেই বাঙ্গালীর ভারতীয়ত্ব আবার রূপায়িত হইল নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর প্রমুখ প্রবর্তিত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' নামক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিরাট বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে। 'হিন্দুমেলা' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইবার প্রেরণা জোগাইয়া ছিল। 'হিন্দুমেলা'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাড়িতে বাড়িতে হিন্দুকর্ম্মী-প্রধান ও হিন্দু দেবদেবীর, বিশেষ করিয়া শক্তিরূপা দেবীদের অর্চনা ভিত্তিক বিপ্লব-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর (১৮৮২) 'বন্দে মাতরম্'-এ দশপ্রহরণধারিণী দুর্গামূর্তিতে প্রতিফলিত দেশমাতৃকার ধ্যানমূর্তিতে এই ভাবনাই রূপ পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ 'বন্দে মাতরম্' আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধের আবেগে ও গঠন সৌন্দর্যে গানটি কি ভাবে জনগণের হৃদয় অধিকার করে, তাহা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে :—"The cry at one time banned and barred and suppressed, has become pan-Indian and national, and is on the lips of an educated Indian when on any public occasion he is moved by patriotic fervour to give expression to the feelings of joy···Its stately diction, its fine musical rhythm, its earnest Patriotism have raised it to the status and dignity of a national song." (Surendra Nath Banerjee, 'A Nation in Making', 1925, pp. 205-206)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মূলত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলেজটি কলিকাতায় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের বোম্বাই ও মাদ্রাজে অনুরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ লর্ড ওয়েলেসলি নাকচ করিয়া দেন বলিয়া এই কলেজের অগ্রগতিতে বাঙ্গালীর প্রভাব নানাভাবে চিহ্নিত হইতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বড় বড় অধ্যাপক বা কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলেন এবং অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। কেরীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যেও অনেক বিদগ্ধ বাঙ্গালী ছিলেন। কেরী খ্রীষ্টান মিশনারী, জনসংযোগ তাঁহার স্বাভাবিক কর্তব্য ছিল। তিনি সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করাইয়া প্রচারের জন্য হরিদ্বারের মেলা প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠাইতেন। কেরীর প্রচারকার্যের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় বাঙ্গালীর অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইহার পর রামমোহন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য চলিয়া আসেন এবং সারা ভারতের সহিত সংযোগ রাখার ভিতর দিয়া আপন সমুন্নত চিন্তাশক্তির ও সৃজনীশক্তির স্পর্শ বাংলার বাহিরেও সঞ্চালিত করিতে থাকেন। বাঙ্গালীর ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠার ইহা গৌরবোজ্জ্বল সূচনাকাল সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ দৃষ্টিতে রামমোহনকে 'ভারতপথিক' বলিয়াছেন। ইতিমধ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। অল্প দিনের জন্য হইলেও ডিরোজিওর মত বিপ্লবী চিন্তানায়ক হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হইয়া বিশিষ্ট তরুণ শিষ্যগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিলেন। ক্রমে বাঙ্গালীর কূপমণ্ডুকতা এমনভাবে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বাঙ্গালীদের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন হলে ফরাসী বিপ্লবের স্মরণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই অনুষ্ঠানে ফরাসী বিপ্লবের মহৎ অবদান সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প বাঙ্গালী উদ্যোক্তারা ঘোষণা করিলেন, তাহা নিশ্চয়ই শুধু বাংলা প্রদেশের জন্য নয়, তাহার আবেদন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য। ফরাসী বিপ্লবের এই স্মরণোৎসবের অনুষ্ঠান সারা ভারতের জনচিত্তে দাগ কাটিল। সাধারণ মানুষের মুক্তির মহান প্রতিশ্রুতি এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে স্বতঃই নিহিত। বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মনেও বাঙ্গালীর

মুক্তিচিন্তা অনতিবিলম্বে ছড়াইয়া পড়িল। বাঙ্গালীদের প্রগতিশীল কার্যধারা যে এই সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের প্রভাবিত করিয়াছে, তাহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বাংলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মহারাষ্ট্রে প্রসার। বাঙ্গালীর উৎসাহে ও সক্রিয়তায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়, বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং রেজেষ্ট্রি বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সব আইনের প্রভাব সর্ব ভারতে পড়ে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও সারা ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের পীঠস্থান হইয়া দাঁড়ায়। বাংলায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হিন্দু মেলার প্রভাব পড়ে সারা ভারতবর্ষে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়, কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সমগ্র ভারতের জ্ঞানান্বেষণে এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কম নয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া লীগ' সর্ব ভারতে প্রভাব বিস্তারকারী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান; ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রধানত বাঙ্গালীদের আরও সক্রিয় ও সার্থক প্রতিষ্ঠান 'Indian Association' বা 'ভারত সভা'। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে ইহা সারা ভারতে জাতীয়তা-বোধের মন্ত্র প্রচারের এবং ইংরেজ শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ-দেশে ইংরেজ শাসনের গ্লানি সম্পর্কে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে এই 'ভারত সভা'র ভূমিকা খুবই গৌরবময়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ভারত সভার প্রতিনিধিগণ বারবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রচার কার্যে সফর করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া নিজেকে ভারতসাম্রাজ্ঞী রূপে ঘোষণা করেন, একথা আগেই বলা হইয়াছে। অতঃপর ব্রিটেনের অধীনে ভারত হইল এক অখণ্ড দেশ এবং বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী,—যে প্রদেশের লোকই হউক, সকলের মধ্যেই আপন ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে অনুভূতি ক্রমেই জাগিতে লাগিল। এই ভারতীয়বোধ সকলের মধ্যে সমভাবে বা একসঙ্গে আসে নাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি যে বিলম্বে জাগিয়াছে, তাহা

বলাই বাহুল্য। তবে রাজা রামমোহন রায় হইতে ভারতের মুক্তির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা জনমানসে, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, চিন্তাশীল দায়িত্বশীল মানুষদের আগ্রহে তাহা ক্রমেই প্রসারিত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের অধীনে ভারতবাসীর মনে এই ভাব ক্রমেই দানা বাঁধিয়াছে। নবজাগৃতির আবেগ বাংলায় প্রথম রূপায়িত হইয়াছে এবং বহতা নদীর মত ইহা দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীদের দ্বারা লালিত ও প্রসারিত হইয়া ক্রমে ভারতময় ছড়াইয়াছে। কোন দিন ইহার লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত হয় নাই। সর্ব ভারতীয় বন্ধনমুক্তিই ইহার লক্ষ্য ছিল। রাজা রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী মনীষীরা এই আহবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। মিরাইৎ-উল্-আখবার, সম্বাদ কৌমুদী হইতে সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, হিন্দু পেট্রিয়ট, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালীদের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র এই ভাব-ভাবনা নৈষ্ঠিক আগ্রহে প্রচার করে। বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা বিপুল উৎসাহে ইহার ধারণ ও বাহক হন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীরা দেশমাতৃকার প্রয়োজনে ভারতীয়তার গৌরবে সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাহস ও সক্রিয়তা দেখাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনপাদ জুড়িয়া বাঙ্গালী সাংবাদিক—সাহিত্যিকেরা সারা ভারতে অপরিমেয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নাট্যপ্রয়াসে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতবর্ষে আলোক সঞ্চার করিয়াছে বলা চলে। বিশেষ করিয়া, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের অমর নাটক 'নীলদর্পণ' লইয়া বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেশাত্মবোধক বাংলা নাটক ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রভূত উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা কবিতা ও গানের অবদান অবিস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' আপন গৌরবেই সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাইয়াছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর স্বাধীনতা না পাইলে জীবন ধারণই নিরর্থক—এই উদাত্তবাণী পরাধীন দেশবাসীর মনে আগুন জ্বালাইয়াছে।[১] মানুষের মানবিক অধিকার ও সঙ্গত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'

'বীরাঙ্গনা'র অবদান অতুলনীয়। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন, কিন্তু দেশাত্মবোধের আবেগে তিনিও উঁচুসুরে বাঁধা কবিতা লেখেন।[২] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মাতৃভূমির মুক্তি কামনায় 'ভারত সঙ্গীত'-এর ন্যায় জোরালো কবিতা রচনা করিয়াছেন।[৩] ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের [৪] মতো না হইলেও এলাহাবাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ও [৫] দেশপ্রেমসূচক কবিতায় ভারতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তিনি সাধারণভাবে রাজনীতির সহিত আপনাকে যুক্ত করেন নাই, কিন্তু তিনিও সমকালীন আন্দোলনের লক্ষ্য অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার ছবি[৬] দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'নীলদর্পণ' যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিল, সেই পথ ধরিয়াই আসিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক নাটকগুলি, উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীর কাশিম,' 'ছত্রপতি শিবাজী'। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহান বাঙ্গালী লেখকেরা এই আবেগে দেশাত্মবোধক রচনাসম্ভার দ্বারা সারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চেতনা দেশবাসীর মনে সঞ্চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মোটের উপর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০) হইতে লাহোরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন (১৯০০) পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দী ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মিলনের আলোকে বাঙ্গালীর আত্মচেতনায় ও ভারতীয়বোধে প্রোজ্জ্বল। ভারতে ইংরেজ-রাজত্বে বাঙ্গালীই প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সারা ভারতের মুক্তির ও সমুন্নতির স্বপ্ন দেখিয়া ইহা ভারতময় ছড়াইয়া দিয়াছে। এইভাবে বুদ্ধিজীবী হইতে জনসাধারণ, এক প্রদেশবাসী হইতে সমস্ত ভারতবাসী উনবিংশ শতাব্দীর শেষে একই দেশবাসীরূপে মাতৃভূমির মঙ্গল ও নিজেদের মঙ্গল এক করিয়া দেখিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু বাঙ্গালী তরুণকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া মেকলের মতো ইংরেজ শাসক-কর্তৃপক্ষ ইংরেজ রাজশক্তির দ্বিতীয় প্রাচীর গড়িবার পরিকল্পনা করেন, তাঁহাদের আশা ছিল এই ভারতীয়েরা বর্ণে এবং রক্তে ভারতীয় হইবে, কিন্তু রুচিতে, চিন্তায়, কর্মনীতিতে হইবে ইংরেজ। বাস্তবে কিন্তু ফল ফলিয়াছিল বিপরীত।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণেরা বার্ক, শেরিডন, ফক্সের লেখা, লেক স্কুলের কবিদের কাব্য প্রভৃতি মহান ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়া নিজেদের সর্ব ভারতীয়বোধে উদ্দীপিত করিয়াছে এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা ইতিহাসের পথ ঘুরাইয়া দিয়াছে বলা চলে। আচার্য যদুনাথ সরকার ইহাদেরই উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছেন : 'The Renaissance was at first an intellectual awakening and influenced our literature, education, thought and art, but in the next generation it became a moral force and reformed our society and religion.' (Jadunath Sarkar, 'India through the Ages' P. 74).

১ "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটি চন্দ্র দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।"

২ ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

৩ "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মায়ের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

ভারতের মুক্তিকামী হেমচন্দ্র নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন :

ঠিক হিন্দু কুলে! বীর ধর্ম কুলে
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছ সঁপিয়া শত্রু করতলে
সোনার ভারত করিলে ছায়!
হীন বীর্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।
যাও সিন্ধুতীরে ভূধর শিখরে
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন করে
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও;
তবে যে পারিবে বিপদ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে
যে শিরে এখনে পাদুকা বও।"

৪ "স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়,
…এই যমুনা গঙ্গানদী তোদের ইহা হয় যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্য জাহাজ যেন বয়?"

৫ কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে।
…নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
…পরদীপ মালা নগরে নগর
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কবি রাজকৃষ্ণ রায় 'ভারতবর্ষ' অবলম্বনে শতাধিক কবিতা রচনা করেন এবং সেগুলি 'ভারতসঙ্গীত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬ "নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ!
বিনাশিয়া স্বার্থজ্ঞান, করিলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য, সমাজ-ধর্ম, হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে 'মহাভারত' স্থাপিত,—
প্রেম ময়, প্রীতিময়,—পবিত্রতাময়।"

বাংলায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও বিকাশ

(১৮১৭ - ১৮৮৫)

নলিনীকান্ত রায়

॥ এক ॥

উনিশ শতক বাংলার তথা বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় যুগ। এ যুগের গৌরব যেমন, গ্লানিও তেমনি। গৌরবের কারণ হ'ল এই যে, এ-যুগে আমরা বাঙালিরা মোহ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছি; দীর্ঘকাল লালিত মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে আমরা জগৎ এবং জীবনের দিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চেয়ে দেখতে স্থুরু করেছি। আর গ্লানি—আমাদের সব চেয়ে বড়ো গ্লানি আমাদের পরাধীনতার গ্লানি—ইংরাজের দাসত্বজনিত গ্লানি। ইংরাজের শাসন ও শিক্ষা আমাদের গৌরব ও গ্লানি দুই-ই দিয়েছে। এর ফল শুভাশুভ মিশ্রিত।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নবজাগরণ বা রেঁনেশাসের মতো একটি ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রেণেসাঁসের ফলশ্রুতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক অনুশীলন, মানববিদ্যা চর্চ্চা, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা, দেশাত্মবোধের উন্মেষ এবং পুরাতনের মধ্যে যা কিছু চিরন্তন তার সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধেই নবীকরণ ইত্যাদি। এক কথায়, এই রেনেসাঁস উনিশ শতকের বাঙালির জীবনকে তার ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে নতুন করে ঢেলে সেজেছে।

রেনেসাঁসের গভীর তাৎপর্য এবং সুদূর-প্রসারী ফলাফল বিচার-বিবেচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা শুধু তার একটি লক্ষণ দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্যালোচনা করবার প্রয়াস পাব, এবং তাও অত্যন্ত সংক্ষেপে।

ইংরাজি শিক্ষার ফলেই রেনেসাঁস এসেছে—এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মত বিরোধ নেই। আর ইংরাজি শিক্ষাই আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে এই মতও স্বীকার্য। তাই ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন বিস্তারের ইতিহাস সর্বাগ্রে আলোচ্য।

॥ দুই ॥

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাঙালিরা সুনিয়ন্ত্রিত ইংরাজি শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করল। এর আগে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত যে-সব স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হ'ত সেগুলিতে এ সুযোগ ছিল না। অবশ্য রামমোহনের অ্যাংলো হিন্দু স্কুল (সে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ), ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা এ্যাকাডমি (যেখানের ছাত্র ছিলেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (যেখানের ছাত্র ছিলেন জ্ঞানসাধক অক্ষয়কুমার দত্ত) প্রভৃতি স্কুলগুলিতে ইংরাজি শিক্ষা দেবার সুব্যবস্থা যে ছিল না তা নয়। তবু হিন্দু কলেজই ছিল এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অগ্রণী। ইংরাজি শিক্ষার অর্থ কিন্তু শুধু ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা নয়। ইংরাজি ভাষা শিক্ষার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনই ছিল ইংরাজি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রশস্ত হয়। বৃত্তিমূলক তথা কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পুরোপুরি না হলেও, বেশ কিছুটা পাওয়া যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'The Calcutta Mechanic's Institute' প্রতিষ্ঠার পর।

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন ডিরোজিও। ডিরোজিও ছিলেন এই কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক। তিনি ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী ও মানবপ্রেমী। তাঁর স্বদেশপ্রেমও নিখাদ। বলা বাহুল্য, ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই স্ব-দেশ বলে মনে করতেন। তাঁর দেশাত্মবোধক ইংরাজী কবিতাগুলিতে তাঁর ভারত-প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "ফকির রব ঝাংঘিরা (১৮২৮)"র প্রারম্ভিক কবিতাটি মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে লেখা। উল্লেখ্য যে, সম্ভবতঃ এই কবিতাটিতেই সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধের সুর বেজেছে।

> My country! in the days of glory past
> A beauteous holi circled round thy brow;
> And worshipped as a deity thou wast
> Where is thy glory, where that reverence now?

One eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time.
And bring out from the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee !

ভারতের অতীত গৌরবের সঙ্গে তার বর্তমান দৈন্যদশার তুলনা করে কবি-প্রাণ কতখানি যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে তা কবিতাটি পাঠ করলেই বেশ বোঝা যায়।

কলেজে ডিরোজিও সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাস পড়াতেন। তাঁর অধ্যপনার বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা। যুক্তির মানদণ্ডে সব কিছু যাচাই করে তবে তিনি তা গ্রহণ বা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের তথ্যপুস্তক থেকে তিনি সত্যকে খুঁজতেন যুক্তির আলোকে। তাঁর এই যুক্তিনিষ্ঠাই তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে তাদের মনকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। ডিরোজিওর ছাত্রদের পরিচিত অভিধা ছিল "ইয়ং বেঙ্গল"। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাস্তিক্য বুদ্ধির জন্য তাঁরা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছে নিন্দনীয় ছিলেন বটে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন—এটাই তাঁদের বড় পরিচয় নয়। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠা এবং স্বদেশানুরাগ তাদেরকে দেশ ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর কর্মে নিয়োজিত করেছিল। বস্তুত: ধর্মভাব-বিবর্জিত দেশাত্মবোধ যা সে-দিনের বাঙালি মানসিকতায় দুর্লভ ছিল, তার ধারক ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ডিরোজিও শিষ্যসম্প্রদায়। ডিরোজিও'র শিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র হিন্দু কলেজের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, কলেজের বাইরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তার এ্যাকাদেমিক এসোসিয়েশনে (১৮২৮) তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ-সমাজ-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করতেন। বলা বাহুল্য, এই সব তর্কবিতর্কে যুক্তিবাদই প্রাধান্য পেত। ডিরোজিওর ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ

মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, দিগম্বর মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রসিক কৃষ্ণমল্লিক প্রমুখ ব্যক্তিরা। এরা সকলেই যথাকালে দেশ ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রথম পর্বের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র ঠাকুর এবং কিছু পরবর্তী কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম স্মরনীয়। দেশ ও সমাজের উন্নয়নমূলক বহুবিধ কর্ম প্রচেষ্টায় এঁদের মনীষা ও উদ্যম নিয়োজিত হয়েছিল। 'রিফর্মার' পত্রিকার কর্ণধার হিসেবে এবং গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩)-এর অন্যতম সম্পাদক রূপে দেশ ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে প্রসন্নকুমারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তারাচাঁদ ছিলেন স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গার ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি বাংলা ইংরাজী অভিধান সংকলন করেন। তা ছাড়া, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সহযোগিতায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মনুসংহিতার' একটি অভিনব সংস্করণ বের করতে সুরু করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই প্রশংসনীয় ভূমিকা ছাড়াও রামমোহনের ঘনিষ্ঠ কর্মসহচর হিসেবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বড় কম নয়। হিন্দু ইনটেলিজেন্সারের সম্পাদনা এবং দেশাত্মবোধক ইংরাজী কবিতা রচনার মাধ্যমে কাশীপ্রসাদ ঘোষও দেশ ও সমাজের সেবাতেই ব্রতী হয়েছিলেন।

ডিরোজিও-পরবর্তী কালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আপন আপন ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই ছিলেন কৃতী। ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সমাজ সেবায় এঁদের ভূমিকাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারী ও দেশীয় লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল থাকা সত্ত্বেও হিন্দু কলেজের ভূমিকাই ছিল এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী যে বৃহৎ কর্ম-যজ্ঞের আয়োজন চলছিল, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল সব চাইতে বেশি।

সাধারণের ধারণা, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরাজরাই অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। ডেভিড হেয়ার, তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, বেথুন প্রমুখ

ভারতহিতৈষী কয়েকজন ইংরাজ অবশ্য মনেপ্রাণে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার চেয়েছিলেন এবং এর জন্য তাঁরা সচেষ্টও ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ শাসনবর্গ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে তেমন উৎসাহ দেখান নি; বরং নানা অজুহাত দেখিয়ে এর প্রতিবন্ধকতা করেছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছিল; তার কানা-কড়িও ইংরাজী শিক্ষার জন্য খরচ করা হয়নি। বরং এই অর্থ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার বাবদ ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এটা যে দুরভিসন্ধিমূলক তা সহজেই অনুমেয়। শাসক ইংরেজের মনে এই ভয় ছিল যে, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে এবং তার পরিণামস্বরূপ একদিন-না-একদিন ইংরাজ ভারত ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বিচার-বিবেচনার জন্য বিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর মেজর জেনারেল লায়নেল স্মিথ সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেছিলেন, 'ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্মকর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগবে, এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে।' স্মিথ সাহেব অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষকে ভালোচোখেই দেখেছিলেন। কিন্তু স্মিথ সাহেবের কাছে যা ছিল আশার কথা, শাসক ইংরাজের কাছে তাই হয়ে উঠল আশঙ্কার ব্যাপার। ইংরাজী শিক্ষার বিষময় ফলের কথা ভেবে তাঁরা বিষবৃক্ষের বীজকে অংকুরেই বিনষ্ট করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, তাঁদের সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালিরা, এবং ডেভিড হেয়ার, স্যার এড্‌ওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রভৃতি ভারত-দরদী ইংরাজদের সঙ্গে একযোগে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং তাঁদের সে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছিল। এমন কি, অবশেষে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরাজীভাষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মুক্তবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সম্বন্ধে আমাদের সজাগ ও সচেতন করে তুলেছিল। আবার সেই সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক

চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে আমাদের নানা প্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহালও করেছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন টাউন হলে প্রদত্ত বক্তৃতায় দ্বারকানাথ এরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে, হিন্দুকলেজের মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পর রাজনৈতিক সভায় তরুণরা অধিকতর সংখ্যায় উপস্থিত থাকবেন। তাঁর এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি।

ইংরাজী শিক্ষার একটি বড় কুফল সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা কিছু সংখ্যক বাঙ্গালিকে উচ্ছৃঙ্খল ও নানা প্রকার কুক্রিয়াসক্ত করে তুলেছিল। তা ছাড়া, তারা নিজেদের দেশ ও দেশবাসীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত এবং ইংলণ্ড ও ইংরাজকেই আপন বলে মনে করত। স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দান কালে এরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে সমস্ত ভারতবাসীই একসময় ইংরাজ হয়ে যাবে। টিভিলিয়নের এই ধারণা কিছুটা হয়তো সত্যে পরিণত হলেও হতে পারত যদি-না ভারতবাসীদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য থাকত। আর যদি-না উদারপন্থী এবং রক্ষণশীল উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ইংরাজী শিক্ষার এই কুফল বোধে অধিক মাত্রায় সচেষ্ট ও সক্রিয় হতেন। তাঁরা বাঙ্গালি তরুণ সম্প্রদায়ের উপর মিশনারীদের প্রভাব এবং ইংরাজী শিক্ষার কুফল রোধ করবার জন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে "গৌড়ীয় সমাজ" স্থাপন করলেন। গৌড়ীয় সমাজেই উদার বা সংস্কারপন্থী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ নেতারা মিলিত হয়ে একযোগে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হলেন। বাংলা ভাষাই হল এই শিক্ষার মাধ্যম। উল্লেখ্য যে, এই সভার কার্যবিবরণী বাংলাতেই লিপিবদ্ধ করা হত। সেকালে এটা একটা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় কর্তৃক ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' বাংলা ভাষার অনুশীলন ও চর্চার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু কলেজ পাঠশালা'র মাধ্যমে। এই পাঠশালার কর্ণধার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লেখা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের

প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্যকরী করতে সরকার রাজি হন নি। ইংরাজী ভাষায় লেখা পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদ সরকারী একটি কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিয়ে তবে সেই অনুবাদ গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হ'ত। বাংলা ভাষার উন্নতি কল্পে এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং তার সুযোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও এখানে স্মর্তব্য। এই সব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালিদের মধ্যে ক্রমে এই ধারণা গড়ে উঠতে লাগল যে বাংলা ভাষাকে অগ্রাহ্য ও অবহেলা করে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করার মধ্যে কোন গৌরব নেই—কোন সুফল নেই। কিছু পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, কেবলমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দ্বারাই জনশিক্ষার প্রসার এবং গণজাগরণ সম্ভবপর। আর এই জনশক্তি ও গণজাগরণ ব্যতিরেকে বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক বা সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন সফল হতে পারে না। গণশিক্ষার নামে চাষীর ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাদেরকে তাদের বাপ-পিতামহের লাঙ্গল-কুড়োল ছেড়ে ইংরাজ সরকারের কেরাণী হতে প্ররোচিত করা—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের এই মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

॥ তিন ॥

শিক্ষার আলোকে যখন জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূরীভূত হয় তখন জাতি দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়—একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যটি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে জাতি আত্মসমালোচনা করে, আর বহির্মুখী দৃষ্টি দিয়ে বাইরের জগতের ঘটনা ও ফলাফল বিচার করে দেখে। পাশ্চাত্য এবং জাতীয় শিক্ষার ফলে বাঙ্গালির প্রথমে সুরু হ'ল আত্মসমীক্ষা। এবং, তার ফলশ্রুতি ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য নানা প্রকার আন্দোলন। রামমোহনে সেই আন্দোলনের সূত্রপাত। ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রে যখন সে শাসক ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এল তখন শাসকবর্গের আপাত সহযোগিতার অন্তরালে তাদের আসল স্বরূপটি ক্রমেই বাঙ্গালির কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'তে লাগল। অবশ্য, উনিশ শতকের ইংরাজের সঙ্গে যে কোন দিন আমাদের বিরোধ বাধতে পারে—গোড়ার দিকে এ সম্ভাবনার

কথা কারো মনেই আসে নি। রামমোহন-কেশবচন্দ্র সেনের মতো মনীষীরা ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই গণ্য করেছিলেন। তাঁরা এ দেশে ইংরাজদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষপাতীও ছিলেন। এমন কি, পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'হিন্দু মেলার' প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রও 'ইংরেজের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয়দের উন্নতি হবে এবং এই জন্যই ইংরাজদের এ-দেশে থাকা প্রয়োজন—এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে ইংরাজ এবং ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ ভাবকেই 'জাতিবৈর' আখ্যা দিয়েছেন এবং এর ফল যে ভারতবাসীদের পক্ষে শুভকর তাও বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের কথা হয়তো ভাবেন নি। যাই হোক, সংঘাত বাধলো। এবং, সবদিক বিচার করে দেখলে এই সংঘাতকে অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হবে। ইংরাজ শাসক, ভারতবাসী শাসিত; ইংরাজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। সুতরাং ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কের মধ্যেই ছিল সংঘাতের বীজ। এই বীজ দুর্মর—"বড়ো ইংরাজ" বা 'লিবারল্' ভারতবাসীর সাধ্য ছিল না এর অঙ্কুরোদ্গম ঠেকিয়ে রাখা। 'জাতিবৈরিতা'র মাধ্যমে যদি ইংরাজের সমকক্ষ হবার বাসনা জন্মলাভ করে থাকে, তবে ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের (সশস্ত্র নয়, আন্দোলনভিত্তিক) ফলে, সেই বাসনা নানাবিধ কর্মে রূপায়িত হয়ে ক্রমেই ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে—জাগ্রত হয়েছে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা।

উনিশ শতকে ইংরাজের সঙ্গে ভারতবাসীর যে সংঘর্ষ-সংঘাত তার বহুমুখী ধারাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—

(ক) অর্থনৈতিক শোষণ—শোষণমুক্তির সংগ্রাম আত্মনির্ভরতায় দীক্ষা।

(খ) শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় বৈষম্য—রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

অবশ্য, এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সংঘাত-সংঘর্ষের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এরূপ বিভাগের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যাবে না—এর দ্বারা মূলত একটা মূল রূপ-রেখা প্রকাশের চেষ্টাই করা হবে।

(ক) রামমোহনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিলাতে ভারতীয় প্রজাদের কাছ থেকে অধিকহারে কর আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর সেই

প্রতিবাদে কোন ফল হয়নি, কেননা জর্জ টমসনের (George Thomson) ভাষায় কর আদায়ই হচ্ছে—"The Alpha and Omega of British desire". ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে প্রজাদের "লাখেরাজ" বা নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্দেশ্যও হচ্ছে সরকারী রাজস্ব বাড়ানো। অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা (১৮৩২), বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬) এবং সর্বশেষে জমিদার সভার (১৮৩৮) আন্দোলনের ফলে প্রত্যেক জমিদারকে পঞ্চাশ বিঘা পর্যন্ত নিষ্কর জমি ভোগ করার অধিকার প্রদত্ত হয়। এই আন্দোলনের সাফল্য আংশিক এবং স্বরূপতঃ বাহ্যিক; কেননা, এর দ্বারা জমিদাররাই লাভবান হলেন, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের কোন সুবিধা হ'ল না।

ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণের উৎকট রূপ প্রকাশ পায় নীলচাষকে কেন্দ্র করে। নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবরা যে অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ণ ও শোষণ চালিয়েছিলেন সে যুগের ভারতের ইতিহাসে তার নজির নেই বল্লেই চলে। আর এর ফলে যে সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন—বলা যেতে পারে প্রথম গণআন্দোলন - গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত সে-যুগে দুর্লভ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলাদেশে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীলচাষ সুরু হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সাধারণ ভাবে সব ইউরোপীয়কেই নীলচাষের অধিকার দে়। বাংলা দেশে ব্যাপকভাবেই নীলচাষ করা হত। বিহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশেও নীলচাষ করা হত, কিন্তু বাংলাদেশের মতো এমন ব্যাপক ভাবে নয়। প্রথম থেকেই নীলচাষের সঙ্গে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার জড়িত ছিল—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রামমোহন-দ্বারকানাথের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মনেও এ ব্যাপারটা তেমন রেখাপাত করে নি। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন এবং দ্বারকানাথ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে নীলচাষের ফলে বাঙালী প্রজাদের উন্নতি হয়েছে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো অত্যাচারী নীলকরদের সংযত করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিটিতে অত্যাচার-উৎপীড়নের চার রকম প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে—

(১) নীলচাষীদের উপর শারীরিক উৎপীড়ন; (২) বাকী নীল আদায়ের জন্য নীলচাষীদের নীলের গুদামে বহু দিন ধরে বেআইনী ভাবে

আটক রাখা ; (৩) নীলকরদের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা চাষীদের ভয় দেখানো ; (৪) বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক প্রকার লাঠি (যাকে নীলদর্পণ নাটকে 'শ্যামচাঁদ' বলা হয়েছে) দ্বারা বেদম প্রহার। নীলকরদের অত্যাচারের খবর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত হ'ল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিশপ হেবর (Bishop Heber) এরূপ মন্তব্য করেন যে, নীলকরদের অত্যাচারের ফলে দেশীয়দের চোখে ইংরাজের জাতীয় চরিত্র অত্যন্ত হেয় হয়ে গিয়েছে (their oppressive conduct has done much in lowering English character in native eyes)। সুতরাং দেখা যায় যে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের বহু আগে থেকেই নীলকরদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ লাভ করেছিল। অথচ, রামমোহন ও দ্বারকানাথ এ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেন নি—এটাই আশ্চর্যের বিষয়। যাই হোক, ১৮৩০ সালের আইনে চুক্তিভঙ্গকারী নীলচাষীদের ফৌজদারি আইনে দণ্ডনীয় করা হলে নীলকরদের অত্যাচার চরমে ওঠে। প্রজাদের জোর করে তাদের সেরা জমিতে নীল বুনাতে বাধ্য করা হত। নীলচাষ করে তারা যা পেত তাতে তাদের দিন চলতো না—অভাব এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে তারা শেষ হয়ে যেত। এর উপর ছিল নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার। একবার নীলের দাদন নিলে তা থেকে আর অব্যাহতি ছিল না—পুরুষানুক্রমে তার ফল ভোগ করতে হত। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। "একা রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর।" অত্যাচারী নীলকররা আবার এর উপর শাসক ইংরেজদের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করতেন। নীলকরদের মধ্যে অনেকেই তখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হতেন। মফস্বলের আদালতগুলির ফৌজদারী অপরাধে ইংরাজদের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে, চাষীদের কিরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত—তা সহজেই অনুমেয়। এই নীলকরী অত্যচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু তা একেবারে ফেটে পড়ল ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নীলবুনা বাধ্যতামূলক থাকল না। পাবনা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার চাষীরা 'নীল বুনব না' বলে প্রতিজ্ঞা করে এবং সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালায়। শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

সমর্থনে ও নেতৃত্বে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। লেঃ গভর্ণর সার পিটার গ্রাণ্ট ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীল কমিশনের প্রতিবেদনেও নীলচাষীদের এই অভূতপূর্ব আন্দোলনের উল্লেখ আছে। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে-র 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত শিশিরকুমার ঘোষের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—It was the Indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English .... Nothing like oppression ! It was the oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by the Indigo planters which at least roused the half-dead Bengali and infused spark in his cold frame.'

এ মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শিশিরকুমারের এই মূল্যায়ন যথার্থ।

শুধু ভূমি বা কৃষি সংক্রান্ত সরকারী নীতিতেই যে শোষণের রূপ উৎকট ভাবে প্রকট হয়েছিল তা নয়, সরকারী শিল্পনীতিও ছিল রীতিমতো শোষণ ভারাক্রান্ত। ইংরাজ শাসক ভারতের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন বা প্রসারে মোটেই উদ্যোগী ছিলেন না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে কাঁচামাল নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে সেই কাঁচামাল থেকে finished product তৈরি করে ভারতবর্ষে তা বিক্রি করা। তাঁদের দেশের উৎপন্ন পন্যের জন্য তারা ভারতের বাজারকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এটাও একটা বিশিষ্ট রূপ। ভারতের দরিদ্র প্রজারা নিজেদের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য লবণ তৈরির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। এতে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের যে নাভিশ্বাস উঠেছিল 'অবাধ বাণিজ্য নীতির' কূট সমর্থক লর্ড লিটন (Lord Lyton) তা বুঝেও বুঝেন নি। বৃটিশ শাসনে এই অর্থনৈতিক

শোষণের ভাষাচিত্র সে-যুগের সাহিত্যেও অঙ্কিত রয়েছে। কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু লিখেছেন—

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর যাদু মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
× × × ×
তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায়নাকো আর, হলো দেশে—কি দুর্দিন!
× × × ×
ছুঁই সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে; খেতে, শুতে, যেতে কিছুতে
লোক নয় স্বাধীন।"
('হরিশ্চন্দ্র' পৌষ, ১২৮১)

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'রূপে ভারতে আসেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নবীনচন্দ্র সেন যে কবিতা লেখেন তার মধ্যেও ইংরাজ শাসনের বিশিষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছে—

'ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার!
লবণাম্বুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার।'

শুধু বাঙালি কবিরাই যে এই শোষণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তা নয়, বিশিষ্ট মনীষী এবং চিন্তাশীল লেখকরাও এ-সম্বন্ধে কম অবহিত ছিলেন না। হিন্দু কলেজের নাম-করা ছাত্র মধুসূদন, ভূদেব এবং রাজনারায়ন বসুর সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে" ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শাসকের অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এবং, এর প্রতিকার কল্পে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে

'moral hostility'—বা 'নৈতিক শত্রুতা' রূপ অস্ত্র অবলম্বন করে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সুপারিশ করেন।

শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে পারলেই বৃটিশের এই অর্থনৈতিক শোষণের বেড়াজাল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে—এ-ধারণা বাঙালি মনীষায় বদ্ধমূল হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। এবং উল্লেখ্য যে, এর জন্য প্রচেষ্টাও সুরু হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর বাঙালিদের দ্বারা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ও যৌথ মূলধনী কারবার সংগঠনে তৎপর হয়েছিলেন। দ্বারকানাথের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য তৎকালের বাঙালিদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে। রামমোহন অবশ্য দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাকে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রামমোহন বিরোধী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশীয় জমিদারদের কাছে আবেদন করেছিলেন দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে যাতে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙালির ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও অন্যান্য কারবারী সংগঠন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবার বাসনা তাতে লোপ পায় নি। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের একটি কার্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত "হিন্দুমেলা"র দ্বারা। এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির সার্বিক উন্নয়ন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই 'মেলা'র সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—

"মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে। অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।"

দেশীয় ভাবের চর্চা ও দেশজ বস্তু ব্যবহারের প্রবণতা যাতে বাঙালি সমাজে জেগে ওঠে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হত। প্রদর্শনীতে দেশীয় শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী রাখা হত দেশবাসীকে ঐ সব পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট করার জন্য।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসুর দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণে মেলার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্যক্ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে—"এই চৈত্র-মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত। স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য।"

এই 'পবিত্র কর্তব্য' পালনে 'হিন্দুমেলা' অনেকখানি সক্ষম হয়েছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবার প্রচেষ্টায় বাঙালি মানসে স্বদেশী ভাব জেগে উঠেছে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আত্মশক্তি অর্জন ও প্রতিষ্ঠার বাসনাও দানা বেঁধেছে এই সূত্রে।

(ঘ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য ছিল। মফস্বলের আদালতগুলিতে ইংরাজদের বিরুদ্ধে আনীত দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার বিচার করার অধিকার ছিল না। মেকলে দেওয়ানী মামলা বিচারের নিষ্পত্তির অধিকার মফস্বলের আদালত গুলিকে প্রদান করেন। কিন্তু ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের উপরই ন্যস্ত থাকে। এর ফলে, মফস্বলের ইংরাজরা, বিশেষ করে নীলকর সাহেবরা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এর প্রতিকার কল্পে বেথুন সাহেব (বীটন) এই বিচার-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য একটি আইনের খসড়া রচনা করেন। ইংরাজদের প্রতিরোধের ফলে অবশেষে এই আইন প্রত্যাহৃত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার বার্নেস পীকক্ আবার একবার বিচারবৈষম্য অবলুপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু ইংরাজদের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে তাঁর সে প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। এরপর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের কাছে কুখ্যাত Black Act কিন্তু ভারতীয়দের দ্বারা সমর্থিত এবং White Act নামে আখ্যাত 'ইলবার্ট বিলের' দ্বারা বিচারের নামে এই অবিচারের প্রহসন বন্ধ করার চেষ্টা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে ইংরাজরা তুমুল আন্দোলন সুরু করে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'নেভার-নেভার' শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতায় এই আন্দোলনের পিছনে যে ইংরাজ মানসিকতা বিদ্যমান তার স্বরূপ স্পষ্টই ধরা পড়েছে।

"হিপ্, হিপ্, হিপ্, হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিভের কাছে হবে? নেভার-নেভার!
× × × ×
চিরশিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট্ টুট্ টুট্।
স্পষ্টই কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারি—
'মিলচ্ কাউ' ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি!
তাই ড্যাম দি নেটিব বিল 'নেভার নেভার'।

আর সত্য সত্যই 'নেটিব বিল' 'নেভার' হয়েই রইল, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অকৃত্রিম চেষ্টাতেও তাকে 'Ever' করা গেল না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট রিপনের নির্দেশে সিলেক্ট কমিটিতে বিলটিই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বিধিবদ্ধ হয়। 'তিন আইন' নামে এটি সমধিক পরিচিত। এই 'তিন আইনে' দেশীয় জেলা জজদের কিছুটা বেশি ক্ষমতা দেওয়া হল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এর দ্বারা আগেকার বিচার-ব্যবস্থাই বহাল রাখা হল। অর্থাৎ অত্যাচারী ইংরাজকে আগের মতই নিরঙ্কুশ হয়ে থাকতে দেওয়া হল।

দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আন্দোলনের বড় সমর্থক ছিল। ইংরাজদের অত্যাচার অবিচার এবং শোষণের কাহিনীও তারা ফলাও করে প্রকাশ করত। শাসক ইংরাজ তাই মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস পেলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। রামমোহন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর "মীরাৎ-উল-আকবর" নামক ফার্শী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। রামমোহনের বিলাত গমনের পরও তাঁর অনুগামীরা আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ্ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন তুলে দেন। ফলে, দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি আবার ইংরাজ শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ইংরাজ শাসকদের পক্ষে এরূপ কঠোর সমালোচনা (হোক্ না তা সত্যভাষণ এবং যথার্থ) মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব

ছিল না, স্বাভাবিকও ছিল না। তাই বড়লাট লিটন আবার The Vernacular Press Act-এর দ্বারা দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। এই আঘাত এসে পড়ল কেবল দেশীয় ভাষার পত্র-পত্রিকা গুলির উপর, ইংরাজী পত্র-পত্রিকাগুলি এই আইনের আওতার বাইরে থেকে অবাধ স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হয়েই থাকল। আত্মরক্ষার জন্য দ্বিভাষী অমৃত বাজার পত্রিকা তার বাংলা অংশ বর্জন করে কেবল ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশিত হতে লাগল। 'সোমপ্রকাশ' সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণী' জরিমানা দিয়ে রক্ষা পেল। স্বধু ভারতে নয়, বিলেতেও এই আইনের তীব্র সমালোচনা হল। লিবারেল দলের নেতা গ্ল্যাডস্টোন এই আইনের নিন্দা করলেন। ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচনের পর লিবারেল পার্টি ক্ষমতাশীল হলে লর্ড রিপনকে ভারতের বডলাট করে পাঠান হয়। তিনি এই আইন তুলে দেন।

যে কোন রকমের অস্ত্র (তা সে কথার আগুণ বর্ষণ করুক অথবা প্রকৃত আগুণই উদ্গীরণ করুক) রাখার অধিকার থেকে ভারতবাসীদের বঞ্চিত করাই ছিল ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে নিরাপদ। আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং ব্যবহারের অধিকার নিয়েই আন্দোলন স্বরু হয়েছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন "অস্ত্র আইন"-এর দ্বারা যখন কেবল মাত্র ভারতের প্রকৃত অধিবাসী হিন্দু-মুসলমানকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন তখন জাতির আত্মাভিমান প্রচণ্ড ভাবে আহত হল। 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' এবং পরে 'জাতীয় কংগ্রেস' এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। কংগ্রেসের প্রথম যুগের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই এই আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হত; এই আইনে জাতির চিত্ত কতখানি বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এটাই তার প্রমাণ।

দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার বাসনা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই জেগে উঠতে আরম্ভ করে। শিক্ষায় দীক্ষায় যোগ্যতায় তারা যে ইংরাজের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—এ ধারণা তাদের মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হতে থাকে। কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজে অধিক সংখ্যক বাঙালি নিয়োগের দাবীতে 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই আন্দোলন স্বরু করে। ফলে, ১৮৩১ সালের আইনে ডেপুটি

কালেক্টার পদে এবং ১৮৪৩ সালের আইনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে দেশীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সিবিল সার্বিসের দ্বার তখন তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়নি। এর জন্য 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' এবং পরে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' জোর আন্দোলন সুরু করে। অবশেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "চার্টার অ্যাক্ট"-এ ভারতীয়দের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রোক্লামেসনেও ঐ সুবিধা বহাল রাখা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সত্যেন্দ্রনাথের সাফল্যে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থীদের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার বয়স ২৩ বছর থেকে কমিয়ে ২১ বছর করেন। তা ছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য—ভারতীয়দের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে দেওয়া। এর ফলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বিক্ষোভ ও আন্দোলন তীব্র হতে তীব্রতর হয়।

প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, নির্বাচন প্রথা চালু ইত্যাদি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন সুরু হয়। ইনকাম্ ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধেও শিক্ষিত বাঙালি তাদের মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে। এই সব আন্দোলনের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কিছু কিছু সুবিধা ভারতবাসীরা লাভ করে।

ইংরাজ শাসক কর্তৃক অর্থনৈতিক শোষণ, শাসনে স্বৈরাচার এবং বিচার-ব্যবস্থায় বৈষম্য এবং অনুরূপ নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে ইংরাজ ও ভারতবাসী—শাসক ও শাসিতের মধ্যে উনিশ শতকে যে সব সংঘর্ষ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে তার ফলে একদিকে যেমন ইংরাজ শাসকের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে। ইংরাজ শাসন যে ভারতের পক্ষে কখনই শুভকর হতে পারে না—এ বোধও ক্রমেই জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে চিন্তাশীল ভারতবাসীর মনে।

"চার"

কোম্পানির কুঠী ও বাণিজ্যকেন্দ্র ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেই আগে স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে হয় অনেক পরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলাদেশেই ইংরাজের আধিপত্য প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

বাংলা দেশ থেকেই ক্রমে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আবার ইংরেজের সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালিরাই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষা নেয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সুরু করে। ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ-সংঘাতের মাধ্যমে বাঙালীর মনেই প্রথম দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে, রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং বাংলাদেশই জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্‌গাতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম। কিন্তু এর বহু আগেই কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। অবশ্য, কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ধর্মীয় উদ্দেশ্যই প্রধান। তবু তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশ "ভারতবাসীদের ভিতরকার সুপ্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবোধের উন্মেষে" বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতি-দক্ষ নেতা। সারা ভারত পরিক্রমা করে ভারতীয়দের মনে তিনি যে পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনটি তাঁর সমসাময়িক আর কোন নেতাই পারেন নি। আর তা ছাড়া, যুবকসম্প্রদায়ের উপর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আত্যন্তিক ভাবে সক্রিয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রসভা'য় শ্রীচৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারীবল্ডি প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং The Rise of the Shikh power ও New Ireland প্রভৃতি বিষয়ের উপর সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ইতালীর গুপ্ত সমিতিগুলির আদর্শে বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল সুরেন্দ্রনাথের এই সব ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা। অবশ্য, এই গুপ্ত সমিতিগুলির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে সমিতির সভ্যদের স্বদেশানুরাগ, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং আন্তরিকতা নিশ্চয়ই উল্লেখের দাবী রাখে।

উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত ইংরাজ শাসনে কোম্পানীর আমল। এই আমলে ইংরাজ শাসকের সঙ্গে বাঙ্গালির যে সংঘাত-সংঘর্ষ তা মূলতঃ আধা-রাজনৈতিক চেতনাসম্ভূত। তখনকার ইংরাজ শাসক অত্যাচারী হলেও ঠিক 'প্রভু' হয়ে ওঠেনি; তার সাম্রাজ্যবাদী রূপটাও সবে খোলস ছাড়াতে সুরু করেছিল মাত্র। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে

মহারাণীর শাসন প্রবর্তিত হলে ইংরাজ শাসককে অন্য মূর্তিতে দেখা গেল। সে ভারতীয়দের 'প্রভু'। ভারতবাসী তার 'দাস'। ভারতীয়দের উপর এই 'প্রভুত্ব' বজায় রাখার জন্য সে অনেক বেশি তৎপর এবং কূটকৌশলী। তার শাসন যন্ত্রও খুব বেশি সক্রিয় ও সতর্ক। সুতরাং, এই ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে হলে সুরেন্দ্রনাথের মতো রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন নেতার প্রয়োজন ছিল—ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের অবদানের মূল্যায়ন করবার সময় এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক ঘটনার কার্যকারিতাও উপেক্ষনীয় নয়। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ মূলতঃ অত্যাচারী দেশীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু মহাজনদের এই শোষণ ও অত্যাচার বৃটিশ শাসনের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই চরম পর্যায়ে উঠেছিল, তাই শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করলে ভুল হবে না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙ্গালী ভালো চোখে দেখে নি। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বেশির ভাগ ফলই ভোগ করতে হয়েছে বাঙ্গালিকে এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার মনে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব আরো দৃঢ় হয়েছে। এ ছাড়া, রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস এবং বীর সাভারকারের "ন্যাশনেল ওয়ার অব্ ইন্‌ডিপেনডেন্স্" নামক সিপাহী বিদ্রোহের উপর লেখা ইংরাজী গ্রন্থ তরুণ বাঙ্গালীদের মনে দেশানুরাগ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। উনিশ শতকেয় ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে সংঘটিত ওয়াহাবী আন্দোলনে ইংরাজ শাসক কর্তৃক আন্দোলনকারীদের নির্মম বিচার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "Lord Mayo's brief Viceroyalty marked by the Wahabi-trial.........gave birth to a new political consciousness among the rising intelligentsia of the country" উল্লেখ্য যে, এই তিনটি বিদ্রোহই ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ।

ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত উনিশ শতকের সভা-সমিতিগুলি এবং তৎকালীন দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি যেমন দেশাত্মবোধের

উন্মেষ ও বিকাশে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনাও নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" অত্যাচার-পীড়িত জাতির কাছে ছিল সমর-সঙ্গীতের মত উত্তেজক এবং প্রেরণা-সঞ্চারক।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের আলোচ্য যুগে ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা ছিল ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা, স্বায়ত্ত-শাসন, নির্বাচন প্রথা প্রভৃতি প্রবর্তন পর্যন্ত। ভারত থেকে ইংরাজ শাসককে উৎখাত করার ব্যাপারে কেউ-ই তৎপর হন নি। বোধ হয় চিন্তাও করেন নি। কেবল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটির সভায় প্রদত্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতাতেই 'Quit Iudia'র পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। "The two nations must be amicably parted before anything good or great could be achieved by the people of the country—(India)." বলা বাহুল্য, তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করা সম্পর্কে কোন নেতাই আর উচ্চবাচ্য করেন নি। অন্য ভাষায়, দেশনায়কদের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

স্বপন বসু

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ বাংলায় প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্মলগ্ন হিসাবে স্বীকৃত। এই সনে রামমোহনের কলকাতা আগমন, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এই সময় কলকাতা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সুরু। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মানসে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে এই তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই নবলব্ধ চেতনা ভাষা পেল সমসাময়িক সাময়িক-পত্রে, বাংলা ভাষায় যার প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান নবাবের কাছ থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এবং জনসাধারণের অসহনীয় দুরবস্থার সূচনাও যে সেইখান থেকেই, এ কথা রমেশচন্দ্র দত্তর মত ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন। নতুন রাজশক্তি ক্ষমতায় এসে আমাদের গ্রামসমাজকে তীব্রভাবে আঘাত করলো, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যর মর্মমূলে আঘাত করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অনুগ্রহপুষ্ট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো—যারা নিজেদের স্বার্থেই হয়ে উঠলো ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষায় তৎপর। ধ্বংস হলো বাংলার কৃষক, প্রজা, কারিগর। পলাশীর যুদ্ধের অল্প দিনের মধ্যেই শোষক ইংরেজের প্রতি জনসাধারণের মনে সঞ্চিত হলো পুঞ্জীভূত ঘৃণা। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নরূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, এবং দেখা দিল বিভিন্ন স্থানে জন-বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। অন্যদিকে, বাংলার বুকে যখন ভাঙনের গান, বাংলার জনসাধারণ নিঃস্ব-রিক্ত, বাংলার হাহাকারে যখন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ, তখনই পাশ্চাত্য জগতের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার পরিচয় হতে লাগলো। ইংরেজি শিক্ষা মুষ্টিমেয় বাঙালীর সামনে পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের যে বিরাট সম্পদ নিয়ে এলো তা

তাঁদের এ দেশীয় ধর্ম, সমাজ, এমনকি রাজনীতি সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে শেখালো। এই নব্য শিক্ষিত তরুণের দল একদিকে ইংরেজের প্রতি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই ইংরেজের আসল স্বরূপও তাঁদের বুঝতে দেরী হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিদের আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারি ঃ

(ক) মধ্যপন্থী রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা ;

(খ) রক্ষণশীল বিভিন্ন জমীদার, ধনী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ;

(গ) ইংরেজী শিক্ষিত নব্য তরুণদল (ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক পরিচিত)।

বিভিন্ন বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। ধর্মীয় বিষয়ে, বা সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারে এদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই চোখে পড়ে বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে অন্তত একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে মিল চোখে পড়ে। এই তিন গোষ্ঠীই জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ছিলেন, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ব্যথা-বেদনার সঙ্গে পরিচিত হলেও তাঁরা তা দূর করতে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হন নি। এর পেছনের অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের আভিজাত্যবোধ। স্বয়ং রামমোহন রায়, তাঁর অনুগামীরা ও বিভিন্ন জমিদার বা ব্যবসায়ীরা ছিলেন ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অর্থকৌলীন্য একদিকে যেমন তাঁদের জুগিয়েছিল বিলাসের উপকরণ, অন্যদিকে করেছিল জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মাধ্যমেই জনসাধারণকে শোষণ করতো নতুন রাজশক্তি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই বিত্তশালী হয়েছিলেন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে। অন্যদিকে হিন্দুকলেজের যুবকরা অর্থকৌলীন্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমকক্ষতা দাবী করতে না পারলেও, তাঁরা ও তাঁদের কার্যকলাপ ছিল বহুলাংশে নগরকেন্দ্রিক, জনসাধারণের সুখ-দুঃখের শরিক হবার মানস-প্রবণতা তাঁদের ছিল না, অবশ্য ইংরেজি শিক্ষা তাঁদের করে তুলেছিল যুক্তিবাদী।

এ যুগকে বলতে পারি ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের যুগ। এই সময় কোন মুসলমান চিন্তানায়ক জনজীবনে আবির্ভূত হন নি, সচেতন হিন্দুরা ইংরেজের

প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্যাচার থেকে তাঁদের মুক্ত করে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নতুন চিন্তাজগতে নিয়ে যাবার জন্য। এই বোধ রামমোহন ও ইয়ংবেঙ্গল—দু'তরফেরই ছিল। অর্থাৎ এই সময়ের সৌভাগ্যবান ও সচেতন ব্যক্তিরা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার তোরণদ্বারে তাঁদের নিয়ে আসার জন্য ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

আধুনিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক রামমোহনের মুখ্য পরিচয় ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ হিসাবে। রামমোহন এই সবক'টি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাকে পরিচালিত করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত।

রামমোহন ছিলেন বৈষয়িক পুরুষ; তিনি ও তাঁর অনুরাগীরা ছিলেন ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কাজেই যুগপৎ ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থরক্ষা নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রামমোহনের মনোভাবকে রামমোহনের অনুরাগীরাও আপাতদৃষ্টিতে 'অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল' না বলে পারেন নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বনেদী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের পক্ষে তার অভিমত প্রকাশে জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং এ-দেশীয় জনগণের স্বার্থ বলতে তিনি প্রধানত জমিদার ও অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের কথাই বুঝতেন এবং তাঁর শ্রেণীস্বার্থসংরক্ষণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল—এরূপ মনে হয়, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছা তাঁর একটি উক্তিতে সুস্পষ্ট। তিনি আইনের চোখে সমদৃষ্টির পক্ষপাতী হলেও, উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের সমস্তরের তিন বা চারজন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি স্পেশাল কমিশন দ্বারা বিচার করা সরকারের পক্ষে সঙ্গত ব'লে মনে করতেন। নীলকরের অত্যাচার এক সময় বাংলাদেশে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সমাচার দর্পণে' প্রথম প্রকাশিত হতে দেখি। রামমোহনও নিশ্চয়ই তা দেখেছিলেন, এবং তাদের অত্যাচারের কথা নিশ্চয় তাঁর অবিদিত ছিল না। এর সাত বছর পরে, ১৮২৯ সালে রামমোহন নীলচাষ সম্বন্ধে বলেছিলেন, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। বাংলা,

বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের হাতে হাত মিলিয়ে রামমোহন অসিদ্ধ লাখেরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

রামমোহন ব্যক্তিগতজীবনে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজ সিবিলিয়ানদের তিনি টাকা ধার দিতেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরিও করেছিলেন কয়েকমাস, তাঁদের আনুকূল্যে তিনি লাভ করেছিলেন দেওয়ানী, এবং তাঁর বৈষয়িক সমৃদ্ধি ইংরেজ সাহচর্যেই ঘটেছিল। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সর্বান্তঃকরণে ইংরেজ শাসকগণকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ ইংরেজই ছিল তাঁদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির মূল, নতুন জ্ঞান-ভাণ্ডারের উদ্‌গাতা, নিশ্চিত জীবন যাপনের সহায়ক, এবং এই পথ ধরেই তাঁদের মনে এসেছিল ইংরেজদের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা। রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যার ফলে তিনি লাভ করেন অগতানুগতিক চিন্তাধারা। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন দেওয়ান, কাজেই প্রজাদের অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, অন্যদিকে জমিদার হিসাবে তিনি সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী স্তরে তিনি ছিলেন, এবং সেই কারণেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মধ্যপন্থী। দেশ-বিদেশের খবর তিনি রাখতেন, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তাঁর কৌতূহলের বিষয় ছিল, এবং নিজের দেশের ক্ষেত্রে ব্রিটিশের আনুগত্য তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হলেও, অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁব সহানুভূতির একাধিক পরিচয় আমরা পাই। অন্যদিকে তিনি সাময়িক পত্র পরিচালনা করতেন, যা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার অন্যতম বাহক। এই সব কারণে তাঁকে বাধ্য হয়ে আপোস করে পথ চলতে হয়েছিল ব্যক্তিক স্বার্থে, তাঁর এই 'দ্বিধা' সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলদের কাছেও ফুটে উঠেছিল। অর্থাৎ, তাঁকে যতটা বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, ততটা তিনি নন।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনীতিতেও রামমোহন ছিলেন মধ্যপন্থী। রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' নব্যদলের অন্যতম পত্রিকা 'এনকোয়েরার'-এর ভাষায়, "coming as far as half the way on religion and politics."। ইংরেজ শাসনের মধ্যদিয়েই এ দেশের উন্নতির স্বপ্ন এবং স্বার্থরক্ষার চিন্তা তাঁকে প্রাণিত করেছিল ইংরেজের এ দেশে

স্থায়ীভাবে বসবাসের আন্দোলনের নায়ক হতে। [অবশ্য তাঁদের মতে, এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল এ দেশ থেকে বিদেশে অর্থ চালান বন্ধ করা।]

বাঙালীর আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার গুরু রামমোহন পাশ্চাত্য আলোয় প্রভাবিত হয়েছিলেন বেন্থাম্ ও মন্টেস্কুর চিন্তায়, আর যাঁদের চোখে রামমোহন 'half liberal'. সেই ইয়ং বেঙ্গলরা পেইন, গিবন, হিউম-এর চিন্তাধারায়। এ ছাড়া, ফরাসী বিপ্লবের আধো রোমান্টিক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী চিন্তানায়কদের যে পরিমাণে আদর্শ ছিল, সে পরিমাণে ছিল না শিল্পবিপ্লবের তাৎপর্যের উপলব্ধি। তাই তাঁদের চিন্তাধারা ছিল যতটা 'আইডিয়াল', ততটা 'রিয়েল' নয়, কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে আসল স্বাধীনতা—এ বোধ তাঁদের ছিল না।

মন্টেস্কুর প্রভাবে রামমোহন শাসন-ক্ষমতার পৃথকীকরণ (Separation of Power), এবং আইনের শাসনের (Rule of Law) পক্ষপাতী ছিলেন। আবার বেনথামের প্রভাবেই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন। কিন্তু বেনথামের মতো তিনি সব দেশের মানুষকেই একই আইন দ্বারা চালিত করা যায়—এ কথা বিশ্বাস করতেন না।

ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর থাকাই তিনি মনে করেছিলেন বাঞ্ছনীয়, এবং আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে। এর জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে কমিটি গঠনের সাহায্যে জনসাধারণের অভিমত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা, এবং বনেদী বিত্তশালী লোকদের মতামত গ্রহণ তিনি প্রয়োজনীয় মনে করতেন। অবশ্য, কোম্পানীর বদলে পার্লামেন্টের সরাসরি কর্তৃত্ব ও শাসনের পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না, তবে প্রশাসনিক কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের দ্বৈত অস্তিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন।

এ দেশে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যায় তিনি সরকারের কাছে মফঃস্বল কোর্টে জুরি প্রথা প্রবর্তন ও এ দেশীয়দের জুরি করার জন্য আবেদন করেন। ৫ মে, ১৮২৬, পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়ান জুরি বিলে খ্রীষ্টানদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হলে

তারও প্রতিবাদ করেন তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেষ্টায়, ১৬ আগস্ট, ১৮৩২, এ দেশীয় জুরিদের ওপর ধর্মীয় বাধা অপসারিত হয় এবং তারা 'জাস্টিস্ অব পীস' এবং 'গ্র্যাণ্ড জুরি' হবারও অধিকার পায়। উল্লেখ্য, প্রথম ভারতীয় জুরিদের অন্যতম ছিলেন রামমোহন রায়।

মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তিনি অন্যায় মনে করতেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগে তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল। রাওতওয়ারী প্রথার চেয়ে জমিদারী প্রথাই তিনি সমর্থন করতেন, যদিও জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

'ভারতের প্রথম রাজনৈতিক মডারেট' [২] হিসাবে স্বীকৃত রামমোহন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রই ছিল তাঁর স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীন সত্তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের তিনি প্রতিবাদ জানান। এই নিয়মকে নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান ক'রে তিনি 'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করে দেন। সুপ্রীম কোর্ট এবং ইংলণ্ডের রাজার কাছে প্রেরিত তাঁর আবেদনপত্রটির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দিলে টাউন হলের সভায় রামমোহনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

রামমোহন রায় কায়মনোবাক্যে ছিলেন ব্রিটিশের হিতাকাঙ্ক্ষী, ব্রিটিশের উন্নতিতে নিজেদেরও উন্নতি, এরূপ তিনি মনে করতেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি তা সরকারের পক্ষে কল্যাণকর ব'লে মন্তব্য করেন, এবং দেখান স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোথাও বিপ্লব সৃষ্টি করে নি। তিনি বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতি প্রজাদের অটুট ও গভীর আস্থার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। এ দেশে ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ীকল্পে তিনি প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাও ভেবেছিলেন, যাতে তারা ব্রিটিশের প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়বে যে সৈন্যবাহিনী রাখার প্রয়োজনই থাকবে না।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সবাই রামমোহনের

দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা সবাই ছিলেন ইংরেজ ভক্ত, এবং প্রধানত স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন; তাই, মধ্যপন্থী প্রসন্নকুমার রক্ষণশীল রাধাকান্ত ও রামকমল সেনের সঙ্গে 'জমিদার সভা' স্থাপন করেন, কারণ উভয়েরই স্বার্থ জড়িত ছিল একই বিষয়ে। তারা শ্রেণীবিশেষের, অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষী ছিলেন, যদিও মুখে প্রজাদের উন্নতির কথা বলতে তারা পিছপা হতেন না, এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উন্নতির চিন্তাও তারা করতেন। এবং, তখন জমিদারদের স্বার্থকেই ভাবা হতো দেশের স্বার্থ ব'লে, এমনকি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেও রমেশচন্দ্র দত্ত এই লজ্জাজনক মনোবৃত্তিকে ধিক্কার না জানিয়ে পারেন নি।[৩] কাজেই এই মনোবৃত্তি শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে কতখানি প্রবল ছিল তা সহজেই অনুমেয়!

(৩)

আধুনিক বাংলার স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবি ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছাত্রশিষ্যদল স্বদেশ-সম্পর্কিত বোধ লাভ করেছিলেন তাদের গুরুর কাছে। ডিরোজিও তখনকার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যে পত্রিকাটি রক্ষণশীলদের ভাষায়—'ultra radical in its politics.'।

'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর তরুণরা ছিলেন ছিন্নমূল, হিন্দু সমাজ তাঁদের প্রীতির চোখে দেখতো না। ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী সমাজে তাঁরা কেহ কেহ ছিলেন অপাংক্তেয়। কোন স্বার্থবুদ্ধি এই সময় তাঁদের চালিত করে নি। ফলে, তাঁদের কাছে ইংরেজের আসল রূপটি ধরা পড়েছিল।

তাঁদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ডিরোজিও—যিনি অসাধারণ বাগ্মী, প্রতিভাবান তরুণ, স্বার্থশূন্য পুরুষ। ফলে, তিনি হয়ে উঠলেন এক বিশুদ্ধ আদর্শ। একই সঙ্গে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা এবং তারই পাশাপাশি 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর তরুণদের স্বার্থশূন্য স্বদেশচিন্তা উভয় গোষ্ঠীর প্রধান পার্থক্য। বিদেশী জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে শেষোক্তদের ছিল ব্যাপক পরিচয়। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। 'ইয়ং বেঙ্গল'রা তাঁদের গুরুর কাছ থেকে তিনটি জিনিস পেয়েছিলেন—পাপের প্রতি ঘৃণা, মুক্তিবোধ এবং সত্যনিষ্ঠা। তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও এই তিনটি জিনিসের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঈষৎ পরবর্তীকালে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের

অনেকের মধ্যে কিছুটা আপোসের ভাব দেখা যায়। সরকারী চাকরী গ্রহণ করলেও সমালোচনার স্বরকে তাঁরা ত্যাগ করেন নি। সত্য কথা বলতে দ্বিধাহীনতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

'ইয়ং বেঙ্গল' উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তাঁদের চিন্তাধারা নিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিশের দশকে তাঁরা একই সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী ও রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী। এই সময়কার জনসভাগুলিতে যেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল জুরিপ্রথা প্রবর্তন, চাকুরীর ভারতীয়করণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ সনদের সংশোধন, কুলী চালানের প্রতিবাদ, সেখানে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীই ছিলেন পুরোভাগে। অগ্নি বর্ষিত হত 'জ্ঞানান্বেষণ' আর 'এনকোয়েরার'এর পাতায়, একাডেমির সভায়। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ রাজনৈতিক বিষয়ের অন্যতম লেখক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষাগার ছিল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। এই আলোচনা সভার সদস্যরা নতুন দৃষ্টি নিয়ে মিলিত হয়েছিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে। ১৮৩৫ চার্টার সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বলিষ্ঠ বক্তৃতা, বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা উপলক্ষে মেট্‌কাফ্‌কে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আয়োজিত সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (যাতে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কে বেণ্টিঙ্কের দ্বিধাগ্রস্ত নীতিকে তিনি 'নিছক ভণ্ডামি' ব'লে অভিহিত করেন।) আমরা স্মরণ করতে পারি।

চতুর্থ দশকে 'ইয়ং বেঙ্গল' মুখ্যত রাজনীতি-সচেতন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর কাছে তাঁদের সংস্কারক রূপটি উদ্‌ঘাটিত। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর অন্য নানা কারণে টমসনের প্রভাবে তাঁদের ঝোঁক্ গিয়ে পড়েছিল রাজনীতির ওপর। দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর প্রকাশ, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় উত্তেজক রাজনৈতিক আলোচনা, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে সক্রিয় অংশগ্রহণ, 'কালা আইনে'র সমর্থনে রামগোপাল ঘোষের পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি আমাদের কথার সমর্থন।

ইয়ং বেঙ্গলের রাজনীতি চর্চার হাতেখড়ি নিতান্ত তরুণ বয়সে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে গঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও হতো। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পার্থেনন'-এর প্রথম (এবং সেই সঙ্গে শেষ) সংখ্যায়। 'স্ত্রী শিক্ষা,

এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভারতবর্ষে বাস—এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দু ধর্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য—এতদ্বয়ের উপরে দোষারোপ হইয়াছিল।[৪]

ইয়ং বেঙ্গলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ। ফরাসী বিপ্লবের স্বপ্নঘোর ছিল তাঁদের দু চোখে, পশ্চিম তাঁদের সামনে খুলে দিয়েছিল নতুন এক জ্ঞানভাণ্ডার, যার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ ছিলেন ইংরেজের কাছে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের আদর্শ ছিলেন বেকন, হিউম আর টম পেইন। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৮৩০) তাঁদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতে এই ধরণের বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন যার জন্য 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তীব্র ভাষায় তাঁদেরকে কটাক্ষ করেন।

নব্যদল রাজনীতিতে প্রগতির সমর্থক ছিলেন, রামমোহনের দ্বিধাজড়িত মনোভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে সর্বদাই স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ শ্রেণী হিসাবে তাঁরা যে ক্রমেই ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছিলেন,—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজের আসল স্বরূপ তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল, এবং তাঁরা তা অকপটে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন নি। ১৮৩৫-এ টাউন হলের সভায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোম্পানীকে প্রদত্ত নতুন সনদের সত্যকার রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে। 'এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ স্বার্থ। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি। কোম্পানীর অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন কর্তাদের মনে স্থান পায় নি।' এই নতুন সনদের ধারাগুলি যে কতখানি অমানবিক এবং অবাস্তব তা ব্যাখ্যা করে তিনি সেই ধারাগুলিকে 'কুৎসিত' বলে ঘোষণা করেন এবং 'এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজদের নাম ও শক্তিকে মসীলিপ্ত করেছে' তাও বলতে দ্বিধা করেন নি।[৫]

ইংরেজ ভারতবর্ষের যতই উপকার করুক, তারা যে 'লুঠকারি' ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও পূর্বের 'লুঠকারি'দের সঙ্গে তাদের চারিত্রিক বৈষম্য আছে। সে কথা তাঁরাই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ

প্রকাশিত 'কোন পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত' প্রবন্ধের শেষাংশে পূর্বেকার 'লুঠকারক'দের সঙ্গে বর্তমান 'লুঠকারি'দের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্বেকার শাসনকালে শুধু ধনই লুণ্ঠিত হয়নি, বিদ্যাও হয়েছিল অপহৃত। কিন্তু 'বর্তমান লুঠকারিরা এ দেশে স্বাধিকার দৃঢ় করিয়াছেন ও তাহাদিগের যদ্যপিও অন্যান্য দোষ থাকুক তথাপি প্রজাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও সুবিচারার্থে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন……' এবং লেখক আন্তরিক ভাবে কামনা করেছেন যাতে 'অনেক কালাবধি শুষ্ক এবং মলিন পূর্বাঞ্চলের জ্ঞানসমুদ্র পশ্চিম দেশীয় জ্ঞানার্ণবের জল দ্বারা পুনর্বার পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হয়'।[৬]

'জন বুল' কর্তৃক 'ভারতীয় ডিমস্থিনীস' নামে আখ্যায়িত রামগোপাল ঘোষ ১৮৪৯-র কালা কানুনের সমর্থনে লেখা তাঁর পুস্তিকায় স্পষ্টই বলেছেন—ব্যবসাস্থলে ও ব্যক্তিক সম্পর্কে তাঁর মত ঘনিষ্ঠভাবে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসতে খুব কম ভারতীয়ই পেরেছেন, এবং ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞও, কিন্তু তা সত্ত্বেও মফঃস্বলে ইউরোপীয়দের অত্যাচারের কথা অকপটে বলতে, এবং আইনের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি চাইতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। (প্রসঙ্গত স্মরণীয়:—রামমোহন-অনুগামী দ্বারকানাথের মনোভাব। ইউরোপীয়রা মফঃস্বলের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হবে—একথা ভাবতেও তাঁর কষ্ট হয়েছিল।)

এ যুগ ইংরেজের প্রতি মধ্যবিত্তের বিশ্বাসের, এবং সেইসূত্রে কৃতজ্ঞতার যুগ, এ যুগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন গভীরভাবে কেউ দেখেন নি। ভারতের জন্য দুঃখবোধ এবং ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এ দুই-ই 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্যগোচর, তবু সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি ছিল সমালোচনাত্মক। ইংরেজের এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পরিবর্তে তার সহায়তায় শক্তিমান হওয়াই ছিল শিক্ষিত গোষ্ঠীর কামনা। ঐতিহাসিক এই দ্বন্দ্ববাদ ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তায় ও আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই যুগে। ইংরেজের প্রতি মধ্যবিত্তের এই বিশ্বাস সর্বপ্রথম আহত হয় কালাকানুন সম্পর্কিত ঘটনায়।

হিন্দু কলেজের রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যদিও তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হন, এবং আলোচ্য পর্বে খ্রীষ্টের চরণে নিবেদিতপ্রাণ) প্রভৃতির নাম

উল্লেখযোগ্য। রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারাচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ ও অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং কমবেশি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তাঁরই প্রভাবে 'revolutionary doctrines of natural rights' এবং 'equality'তে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম যৌবনে তাঁদের অনেকে রামমোহনের মতো ইংরেজের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, এবং এর সমর্থনে 'পার্থেনন'-এ তাঁরা কলমও ধরেছিলেন। যদিও অনেকে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন। স্মরণীয় ১২. ২. ১৮৩০-এর 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত 'Colonisation of India' প্রবন্ধে (লেখক সম্ভবত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়) রামমোহনের মতো তাঁরাও ভারতীয়দের উচ্চ পদাধিকারের পক্ষে আন্দোলন করেন। পরবর্তীকালে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর অনেকেই (যেমন—রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী ও রাধানাথ শিকদার) উচ্চ সরকারীপদ লাভ করায় তাঁদের দৃষ্টি কিছুটা কোমল হলেও সবসময়েই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও তাঁরা ইতস্তত করতেন না। (স্মরণীয়: রাধানাথ শিকদারের ঘটনা, দ্র. ১, ৯, ১৬ সেপ্টেম্বর ও ১৭ অক্টোবর, ১৮৪২, বেঙ্গল স্পেক্টেটর)। এই সব কারণেই ১৮৩৬, ২০ মে, 'ইংলিশম্যান'-এর একজন 'হিন্দু সংবাদাতা' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'radical' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

ইয়ংবেঙ্গলের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ মুখ্যত সাময়িক পত্রিকায়। ১৮৩০ থেকে ১৮৫৪ মধ্যে তাঁদের পরিচালনায় কমপক্ষে সাতখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। (১) দি পার্থেনন, ১৮৩০, (২) দি এনকোয়েরার : ১৮৩১, (৩) জ্ঞানান্বেষণ : ১৮৩১, (৪) দি হিন্দু পাওনিয়ার : ১৮৩০, (৫) দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর : ১৮৫২, (৬) দি কুইল : ১৮৪৩ (?), (৭) মাসিক পত্রিকা : ১৮৫৪। 'পার্থেনন'-এর প্রথম এবং সেই সঙ্গে শেষ সংখ্যায় তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য ভাষা পেয়েছে, 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'এনকোয়েরার' মুখ্যত ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রতিনিধি সমস্যা ও যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সমর্থন করতে পারে নি।

'হিন্দু পাওনিয়ারে' 'Freedon', 'India under Foreigners' ইত্যাদি লেখা বেরোতো। দ্বিতীয় লেখাটিতে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে স্বৈরাচারী ও জনসাধারণের বঞ্চনার কথা বলতে একটুও ইতস্তত করেন নি। 'দি কুইল' -এর সম্পাদক ছিলেন তারাচাঁদ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ এটির প্রকাশকাল। এতে 'রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম প্রবন্ধসকল বাহির হইত'। দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর পৃষ্ঠায় রাজনীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল।

'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী। ৮. ২. ১৮৪৩-এ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'The present state of the East India Company's Criminal Judicature' and 'Police under The Bengal Presidency'. প্রবন্ধটি পাঠের সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের অশোভন আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। এতে 'ইংলিশম্যান' 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর নতুন নামকরণ করেন 'চক্রবর্তী চক্র।' যদিও দক্ষিণারঞ্জনের প্রবন্ধটিতে হৈ হৈ করার মত কিছু ছিল না এবং দক্ষিণারঞ্জন যে ব্রিটিশ শাসনের শত্রু নয়—এ কথা রিচার্ডসনের মন্তব্যের উত্তরে দক্ষিণারঞ্জন জানাতে দ্বিধা করেন নি। এই প্রবন্ধে ভারতের দারিদ্রের জন্য বিদেশী অধীনতাকে দায়ী করেছেন তিনি, প্রবন্ধটি তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার নিশান (পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল)। এতে তিনি বিচার বিভাগের দুর্নীতির কথাও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। ইয়ংবেঙ্গলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম পরিচায়ক এই প্রবন্ধটি।

(৪)

রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল রাজনৈতিক সভা ও সমিতিতেও। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং বিভিন্ন দাবীদাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য সংগঠিত হতে থাকেন, এবং প্রধানত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এই সব রাজনৈতিক সভাগুলিতে জনসাধারণের কোন ভূমিকা ছিল না, বিশেষ বিশেষ কোন গোষ্ঠীই সেগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান দুটি রাজনৈতিক সভার (ভূম্যধিকারী

সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) মধ্যে প্রথমটি বিত্তকৌলীন্য ও দ্বিতীয়টি বিদ্যাকৌলীন্যের প্রতিনিধি। জনসাধারণের সুখ-দুঃখের শরিক তারা হতে পারেন নি বিত্ত অথবা বুদ্ধির আভিজাত্যের দরুণ, এবং সেজন্য দুটির কোনটিই সাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা পায় নি। 'The two bodies existed under different names, though many of their members were the same men, and who agreed on many points in their common purpose of political amelioration—(these two) merged themselves into one, under the common designation of the British Indian Association'. এমনকি, ভূম্যধিকারী সভার প্রার্থনা মঞ্জুর করার অনুকূলে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর লেখাও আমাদের চোখে পড়ে (ভূম্যধিকারী সভা, ৮ মে, ১৮৪৩)।

চরিত্রের দিক দিয়ে দুটি সভাই 'রাজভক্ত'। এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছাই যে প্রথমটির তা' তার নামেই স্বপ্রকাশ। যোগেশচন্দ্র বাগল এটিকে রাজনৈতিক সভার মর্যাদা দিতে চান না। ভূমির সত্ত্বযুক্ত সব লোক—দেশী-বিদেশী, হিন্দু-মুসলমান এর সভ্য হতে পারতেন। এখানে প্রত্যেক সভ্যকে প্রবেশমূল্য হিসাবে ৫ টাকা ও বার্ষিক ২০ টাকা চাঁদা দিতে হতো। ১৮৩৮, এপ্রিল থেকে সভাটির পরিবর্তিত নাম হয় 'Landholders Society'। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বের চিরস্থায়িত্বে সাহায্য করা এবং 'রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করা।' এই সভা শোষক ও শোষিতের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করতে চেয়েছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় আলোচনার জন্য কালীনাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।' 'সংবাদ প্রভাকর'-এর তদানীন্তন সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এতে যোগ দেন।

এটিই 'বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ধর্ম বিষয়ের বিচার আলোচনা এখানে হবে না। 'যে সব রাজকার্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ

যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এ সভার মূল উদ্দেশ্য।' ব্রহ্মসভা ও ধর্মসভার সভ্যদের দলাদলির জন্য এ সভা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি।[১০]

১২ নবেম্বর, ১৮৩৭ জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভূম্যধিকারী সভা।' ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার একে 'the first organisation of Bengal, with a distinct political object' বলেছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক; দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রভৃতি ছিলেন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই সময়কার রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা যে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বার্থসচেতন ছিলেন তার পরিচয় এই সভার সংগঠকদের মিলনের মধ্যে। স্বার্থ রক্ষার জন্যই রামমোহন-শিষ্য প্রসন্নকুমার রক্ষণশীল রাধাকান্তের হাতে হাত মিলাতে ইতস্তত করেন নি। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি— ভূম্যধিকারী সভা তাঁদের আবেদন পেশ করতো জমিদার ও প্রজার পক্ষে যুক্তভাবে, যদিও প্রজাদের সঙ্গে এ সভার কোন যোগ ছিলনা।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডামের উদ্যোগে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয় ভারতবাসীর কল্যাণ ও ভারত সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। ৩০ নবেম্বর, ভূম্যধিকারী সভা ঐ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করে এবং বিলেতে তাদের হয়ে আন্দোলন চালানোর ভার ঐ সোসাইটির হাতে দেয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে এডামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এডভোকেট'। জর্জ টমসনের কলকাতা আসার অল্পদিন পরেই ১৭ জুলাই, ১৮৪৩ ভূম্যধিকারী সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে বিলেতে তিনি তাঁদের এজেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি 'জমিদার সভা' ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন।

দ্বারকানাথ বিলেত থেকে ফেরার সময় টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে, এবং 'ইয়ংবেঙ্গলে'র আগ্রহে ২০ এপ্রিল, ১৮৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' 'যাকে ভারতে নিয়মানুগ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগের সম্মান দেওয়া চলে।'[১১] এই সভাটি স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। প্রথম বছর থেকেই এটির মধ্যে ক্ষয়ের

লক্ষণ দেখা যায়। ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় মাত্র ১০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১৬.৯.১৮৪৩)। উচ্চ পদসমূহের ভারতীয়করণের ওপর এই সভা জোর দেয়, যার ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কিছু সংস্কারও সাধিত হয়। দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি এই সভায় যোগ দেন নি। এর সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪৬-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে (জুলাই ডিসেম্বর, ১৮৪৬) একটি লেখায় প্রজাদের দুরবস্থার অন্যান্য কারণের সঙ্গে জমিদার অথবা তার প্রতিনিধির অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৭০ মার্চ মাসে রামনাথ ঠাকুর এক সভায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্পর্কে বলেন যে, জমিদার সভা জমিদারের জন্য যা করেছে, এই সভা তাই করেছে রায়তদের জন্য। বলা বাহুল্য, নিরপেক্ষ বিচারে এ উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেব মফঃস্বলের ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য চারটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইউরোপীয়রা তাদের সুবিধা বিলোপের আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে এর নাম দিল 'কালা কানুন'। (রাধাকান্ত দেব একে সমর্থন করে এর নাম দিয়েছিলেন 'সাদা কানুন'— white Act)। তাদের প্রবল বিক্ষোভে বিলটি খসড়া অবস্থায় রয়ে গেল। রামগোপাল ঘোষ একটি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে এর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বলে ইউরোপীয়রা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'এগ্রি-হর্টি' কালচার সোসাইটি'র ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে অপসারিত করলো। ভারতীয়দের এই অপমান, এই বেদনাই ভাষা পেতে চাইল ২৯ অক্টোবর, ১৮৫১-এ স্থাপিত ভারতবর্ষীয় সভায়, যেটি ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫১-এ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে স্থাপিত 'ন্যাশানাল এসোসিয়েশন'-এরই নবরূপ। 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫১ তারিখে 'Revival of landholders' Society' শিরোনামে এই সভা প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। (উল্লেখ্য, ন্যাশানাল এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যের মধ্যে রাজভক্তির কোন উল্লেখ ছিলনা, যদিও 'legitimate means'-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি 'ন্যাশানাল' নামটি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের সবাই ছিলেন ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত।) পরবর্তী

সভাটির মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের স্বার্থ রক্ষার কথা সুস্পষ্ট। এতে মিলিত হলেন রক্ষণশীল, আপোসপন্থী ও ডিরোজিওর-শিষ্য দল। ইউরোপীয়রা কেউ এর সভ্য হন নি, আর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ রক্ষাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এই সভা বাহ্যিক ভাবে সকলের জন্য হলেও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের কোন স্থান এখানে ছিলনা। সভা জনসংযোগের কোন চেষ্টাই করেনি, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ এখানে ভাষা পায়নি। কেউ সাধারণ সভ্য হতে চাইলে তাঁকে অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা হিসাবে অন্তত ৫০ টাকা দিতে হত। স্পষ্টতই, নিম্নবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা; সেজন্য তাঁরা এটিকে নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রক্ষণশীল, আপোস পন্থী, একদা উগ্রপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল সবাই' মিলিত হয়েছিলেন এখানে। এটি যে ধনীদের বেনামদার প্রতিষ্ঠান ছিল তার একটি অভ্রান্ত প্রমাণ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই সভা লণ্ডনে তাঁদের হয়ে তদ্বির করার জন্য একজন এজেন্টের পেছনে ১২,৯৭৪ টাকা, ১১ আনা, ৪ পাই খরচ করেছিল। সরকারের চোখে এটি ছিল অভিজাতদের সভা। জমিদার সম্প্রদায়ই ছিলেন এর প্রধান অংশ। তখন জমিদারীই ছিল সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের প্রথম ধাপ এবং এই সভাও প্রধানত তাঁদেরই স্বার্থরক্ষী ছিল, আর পরিণামে পুরোপুরি জমিদার সভা হয়ে দাঁড়ালো,[১২] অর্থাৎ জমিদার সভার উদ্দেশ্য যেমন তার নামেই ধরা পড়তো, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর উদ্দেশ্য ধরা পড়েছিল তার নামে নয়, তার কাজে। এক কথায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক সভাগুলির ধর্ম ছিল জনসংযোগ নয়, জনবিচ্ছিন্নতা।

১—মুক্তির সন্ধানে ভারত। যোগেশচন্দ্র বাগল, ৩য় সংস্করণ, ১৩৬৭) উদ্ধৃত, পৃঃ ৩১।

২—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩।

৩—The Peasantry of Bengal, R. C. Dutt, Preface VII.

৪ দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১. ৯. ১৮৪৩.

৫ - মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল,

৬ দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর, জুন, ১৮৪২।

৭—History of Indian Social and Political Ideas,
Dr. Bimanbehari Majumdar, P. 58.

৮—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ১৫৪।

৯—Raja Digambar Mitra............Bholanath Chunder, Chap. vi, P. 36.

১০—মুক্তির সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৪১।

১১— ঐ, পৃ. ৪৩।

১২—The Indian Political Associations and Reform of Legislature, Dr. Bimanbehari Majumdar, P. 74.

বাংলার নবজাগরণ ঃ নাটক ও নাট্যশালা

ডঃ অরুণ সান্যাল

॥ এক ॥

উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা রেঁনেশাস বা নবজাগরণের কাল বলেই চিহ্নিত করে থাকি। এই নবজাগরণের সূচনায় আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আর পরিণতিতে স্বাধীনতার দুরন্ত স্পৃহা। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই একদিন বাঙালী মনীষা অনুভব করল আপন দৈন্য; বুঝল আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেবার অর্থ আত্ম-অবনতি আর এই আত্ম-অবনতির মধ্যেই রয়েছে জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তির বীজ নিহিত। এই উপলব্ধিই বাঙালীকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করে তুলল। রাজা রামমোহন রায়ের কার্যাবলীর মধ্যে তারই সূচনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সমাজসচেতন করে তুলতে পারলে আসবে আত্মজাগরণ, আর সেই আত্ম-জাগরণের কালই হবে সর্বাত্মক জাগরণের উষালগ্ন। তাই তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, ধর্মকে বিচার করেছিলেন বাস্তব প্রয়োজনের দৃষ্টি দিয়ে। এক কথায়, রাজা রামমোহন রায় নব্য জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

রাজা রামমোহন যখন অগ্রগতির পথে জাতিকে চালিত করতে আগ্রহী তখন গোঁড়াপন্থী রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রাচীন প্রথানুসরণেই হলেন আকাঙ্ক্ষী। অন্যদিকে, হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-পন্থী ছাত্রেরা ইংরেজীয়ানার মাদকতায় কিছুটা মত্ততার পরিচয় দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই কলেজের প্রতিভাধর ছাত্রেরা রাজা রামমোহন রায়ের নব্য জাতীয়তা-বোধের উত্তরসাধকরূপে বিচিত্র কর্মে লিপ্ত হন বলেই এঁদেরই কর্ম-সাধনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে অভিব্যক্তি ঘটে দেশহিতৈষণার, স্বদেশপ্রেমের ও জাতীয়তাবোধের।

লক্ষ্য করার বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জাতির জীবনে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চারণে বাংলা সাহিত্য, বিশেষত

বাংলা নাটক, সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমার এই আলোচনা শুধুমাত্র নাট্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

॥ দুই ॥

আগেই উল্লেখ করেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম প্রধান দুটি লক্ষণ হল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। রাজা রামমোহনের সমসাময়িক প্রিন্স দ্বারকানাথের কার্যাবলীতেও যে এই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তার প্রমাণ আছে তাঁর নিজের বক্তব্য ও 'জমিদার সভা'র প্রতিষ্ঠায়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে দ্বারকানাথ বলেন: "আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যও স্বদেশের উন্নতি সাধন।" এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভূম্যধিকারী সভা' বা 'জমিদার সভা'র উল্লেখ প্রত্যাশিত। এই সভার উদ্দেশ্যের বর্ণনাসমন্বিত মুখপত্রটি তৎকালীন জাতীয়চেতনার একটি মূল্যবান দলিল। এই মুখপত্রটিতে বলা হয়েছিল: "The Zamindary Association is intended to embrace people of all descriptions, without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country."[১]

রাজা রামমোহন ও প্রিন্স দ্বারকানাথের স্বদেশচিন্তার অর্থ শুধুমাত্র পরাধীনতার ক্ষোভ অন্তরে পোষণ করা নয়; তা ছিল শিক্ষায়, শিল্পে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে স্বদেশের সার্বিক জাগরণ ও উন্নয়ন। এই বিশিষ্ট স্বদেশ-ভাবনাই পরবর্তী স্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে—যিনি তত্ত্বরঞ্জিনী সভা (পরে, তত্ত্ববোধিনী সভা[২]) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা ছিল মহর্ষির জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:—"বস্তুত তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি প্রধান কীর্তি।……তখনকার শিক্ষিত সমাজের স্বধর্মে অনাস্থা, স্বসংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও পরানুচিকীর্ষার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন শুরু করলেন।"[৩]

স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রনাথ যখন নানামুখী কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত

তখন তিনি তাঁর অন্যতম সহযোগী রূপে পেয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুকে। এঁদের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা বা জাতীয়-মেলা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এই জাতীয় মেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন: জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় সভা, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রেরণা জোগাইয়াছে হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলা।"[৪] প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুমেলা ছিল বাংলাদেশের মানবতাবোধ, স্বদেশচিন্তা, জাতীয়চেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহার সার্থক প্রকাশ ক্ষেত্র। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা তাই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নবগোপালে মিত্রের আবির্ভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশীমেলার অন্যতম প্রধান পুরুষ নবগোপাল মিত্র সম্পর্কে লিখতে বসে শ্রীমনোমোহন বসু তাঁর 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন: অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয়ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান কর্তা।...তাঁহার মুখে 'জাতীয় জাতীয় জাতীয়।' তাঁহার সকল কার্য্য 'জাতীয় জাতীয় জাতীয়'। এই প্রসঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণীয়: "নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, তিনিই সর্বপ্রথম ন্যাশনাল কথাটার প্রচলন করেন।"[৫] প্রকৃত পক্ষে নবগোপালের সমস্ত কাজই ছিল জাতীয় আখ্যায় ভূষিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলাও তাই পরিচিত ছিল জাতীয় মেলা বলে। এই জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে মহর্ষি ব্যতীত আর যাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত তিনি হলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীত, নাটক, শিল্পচর্চা —সকল বিষয়েই গণেন্দ্রনাথের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। এঁরই উদ্যোগে তৎকালীন বাংলাদেশে দেশীয় নাট্যচর্চার সূত্রপাত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁদের উদ্যোগ ছিল তাঁদের অনেকেই এই জাতীয় মেলা থেকেই প্রেরণা লাভ করেন। বলা বাহুল্য, জাতীয় রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠা বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে মহৎ তাৎপর্যপূর্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

॥ তিন ॥

প্রথম জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। নাম হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার।' কিন্তু ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালী জাতির নাট্য-সাধনার

ধারা তার বহু পূর্ব থেকেই প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, বাঙালীর নাট্য-সাধনার পাশ্চাত্যমুখী ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন একজন বিদেশী। জাতিতে রুশ এই শিল্পীর নাম গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদেফ, যিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নিজের অর্থব্যয়ে একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করেন এবং বাঙালী জাতির উদ্দেশে সেই রঙ্গালয় উৎসর্গ করে নাম দেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার'। এই রঙ্গালয়েই প্রথম পাশ্চাত্য নীতি-অনুসারী বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' (The Disguise নাটকের অনূদিত রূপ) অভিনীত হয় ঐ একই সালে। বাঙালীর নাট্যসাধনার সূত্রপাত এইখান থেকেই।[৬]

লেবেদেফের প্রচেষ্টার পর প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার'-এ অথবা নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে নির্মিত মঞ্চে নাট্যচর্চা চলতে থাকে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে যে হিন্দু থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় তাই ছিল নব্য বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা। কিন্তু এই নাট্যালয়ে প্রধানত সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অভিনয়েরই আয়োজন হত। তাই নব্য বাঙালীর নাট্যরসাস্বাদনের তৃপ্তি ঘটাতে পারেনি। এই সময় একাধিক ইংরাজী রঙ্গমঞ্চ কিছু ধনী বাঙালীর মনোরঞ্জন করত। এই ধরণের অভিনয় দেখে যে বাঙালীদের রসতৃপ্তি ঘটত না তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।[৭]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে এই ধরণেরই এক নাট্য-প্রচেষ্টা দেখা গেল জোড়াসাঁকোর প্যারিমোহন বসুর বাড়ীতে। ইংরাজী নাটকটি ছিল শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম সেক্স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস্ সীজার'। এই নাট্যানুষ্ঠান দেখার পর তৎকালীন সংবাদপত্রে এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সব সমালোচনায় উদ্যোক্তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি জানিয়েও বলা হয়েছিল যে, এই উদ্দেশ্য মহত্তর তাৎপর্য লাভ করতে পারত যদি উদ্যোক্তারা অভিনয়ের জন্য বিদেশী নাটক নির্বাচন না করে বাঙালী দর্শকদের রসবোধকে তৃপ্ত ও রুচিকে পরিশীলিত করার সঙ্কল্প নিয়ে দেশী নাটক নির্বাচন করতেন। এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "We have a bit of wholesome advice for our young friends, who, we beg, will take our criticism in good part. We ourselves are the most steadfast admirers of the Drama. Nothing will give us greater pleasure than to behold Shakespeare

springing into new life under the histrionic talent of our cducated countrymen but we cannot calmly look on when the old gentleman is being murdered and mangled. Let tne Jorasankowallahs take in hand a couple of good Bengalee plays and we will promise them success."[৮] লক্ষ্য করার বিষয়—সংবাদপত্রটিও নাট্যানুষ্ঠানকে জাতীয় নাট্যানুষ্ঠান রূপে উপস্থাপিত করার ইঙ্গিত দিয়ে সময়-সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, বাঙালী অভিনেতারা বিদেশী নাটকের অভিনয় করলেও এবং দর্শকেরা বিদেশী নাটক দেখলেও তাদের নাট্যানুরাগ দিল খাঁটি স্বদেশী। সংবাদপত্রের সমালোচনাতেও সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তবে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি যে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির আরও একটি দিক ছিল। একদিকে বাঙ্গালীদের দ্বারা ইংরাজী নাটকের অভিনয় হলেও অন্যদিকে সংস্কৃত ও কিছু কিছু বাংলা নাটকের অভিনয় আয়োজনও চলছিল। তারই বর্ণনা দিয়েছেন প্রখ্যাত শৌখিন অভিনেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই বিবরণ সপ্ত পর্বের বিবরণ। এই বিবরণ অনুযায়ী প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় চড়কডাঙ্গার রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাট্যনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান হয় ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ীতে 'শকুন্তলা' অভিনয়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় পাইকপাড়ার রাজাদের গৃহে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া মঞ্চে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মাইকেল ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন—"অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে" এবং বাংলা ভাষায় সার্থক নাটক রচনার দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। পঞ্চম পর্বের নাট্যানুষ্ঠান 'বিধবা বিবাহ নাটক'। উমেশচন্দ্র মিত্র লিখিত এই নাটকটির অভিনয় হয় সিঁদুরিয়া পট্টীতে মেট্রোপলিটন কলেজে। ষষ্ঠ পর্বের অভিনয় 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'। নাটকটি অভিনীত হয় পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের গৃহে। এখানে আরও যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছিল সেগুলি হল 'বিদ্যাসুন্দর', 'রুক্মিনীহরণ', 'উভয় সংকট', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'বুঝলে কিনা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন।

ঠাকুর বাড়ীতে (পাথুরিয়াঘাটা) থিয়েটারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলি, দীনু ঘোষ প্রমুখদের নিয়ে একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল।[৯]

এই সমস্ত ধনী ও রাজারাই ছিলেন তখন মূলত নাট্যচর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পাইকপাড়ার রাজাদের দুই জনের একজনের মৃত্যু হলে নাটকে রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছেদ পড়ল। অন্যান্য ধনীদের উৎসাহের উৎসমুখও শুকিয়ে আসতে লাগল। নিমাইচাঁদ শীলের 'কাদম্বরী' নাটকের প্রস্তাবনায় তাই আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল :

"এ কি বিধির বিড়ম্বনা ভারতবরষে
কুরসে পুরিলো পুন, কপালেরি দোষে।
দেশের দুর্দ্দশা হেরি, গুণি মনে, যত্ন করি
সরস রস-মাধুরী প্রকাশিরে অনুতোষে।
নাটকের অভিনয়, হতেছিল দেশময়
পুন বিধি বাদী হয়ে, ঘুচাইল সব শেষে[১০]

আনন্দের কথা, এই আক্ষেপ বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। কারণ ধনীর পৃষ্ঠপোষকতাবিহীন জাতীয় সংস্কৃতির প্রায়রুদ্ধ ধারাকে আবাহন করার জন্যে এগিয়ে এলেন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা; এগিয়ে এলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্য সাধকেরা। প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণ রঙ্গালয় যা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে।

॥ চার ॥

জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ১৮৭২-এ স্থাপিত ন্যাশনাল থিয়েটারে ৭ই ডিসেম্বর অভিনীত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নাটকটি রচনায় নাট্যকার যে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্বাচনে নির্বাচকেরা যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা কিন্তু আকস্মিকভাবে অর্জিত হয়নি; সেই ইতিহাসের বর্ণনা দিতে বসে প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় লিখেছেন : "ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার মূলে ছিলো বণিকীচিন্তা—যার অস্ত্র বঞ্চনা ও শঠতা। যেন তেন প্রকারেণ আত্মস্ফীতি ঘটানোই যেখানে লক্ষ্য, সর্বপ্রকার অনাচার ও ব্যভিচার সেখানে নিত্যসহচর।

শত বৎসর শোষিত জনসাধারণের বিক্ষোভের ধূমায়মান বহ্নি ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ রূপে অকস্মাৎ দাবানলের মত বিস্তারিত হয়ে পড়লো সারা উত্তর ভারতে। ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টা এই প্রথম প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করলো। কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রথম জনবিদ্রোহ হলেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেনি। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনো ইংরেজের শৌর্যে, চাতুর্যে, দর্শনে, কাব্যে মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন, সরাসরি সশস্ত্র বিদ্রোহ তাঁদের কাম্য ছিলনা; এ ছাড়া ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ তাদেরকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের অভাব ও শিক্ষিত চিন্তানায়কদের অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ।"[২১] আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের অগ্নিস্পর্শ দেশের শিক্ষিত মানসে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রচিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' উপাখ্যানে। স্বাজাত্য-বোধের তীব্র সুরটি ধ্বনিত হল কাব্যরূপে। এই সালেই প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। দীর্ঘ দিনের অত্যাচারে জর্জরিত নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা মর্ত হয়ে উঠল এই নাটকে। বেনিয়া ইংরেজদের অত্যাচার থেকেই জন্ম নিল প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ প্রথম দিকে "বাহুর বলিষ্ঠতার চেয়ে লেখনীর তীক্ষ্ণতাকেই বেশি আশ্রয় করেছিল। সর্বসাধারণের বেদনা ও পারস্পরিক সহানুভূতি সেদিন বাংলার নাটক ও নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকের চেয়ে জাতীয় বেদনাকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর মাধ্যম সেদিন ছিলো না। সমগ্র দেশের এই অসহায় বেদনাকে প্রকাশ করলেন দীনবন্ধু মিত্র তীব্র বিক্ষোভের রূপ দিয়ে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে।"[২২]

বলা চলে, 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার মধ্য দিয়েই এতাবৎকাল বাংলায় রচিত ও অভিনীত নাটকের গোত্রান্তর ঘটল। কারণ, ইতিপূর্বে যে সমস্ত অনুবাদ নাটক ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটক ও প্রহসন রচিত হচ্ছিল সেগুলো এককভাবে বা একত্রে জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চারে আত্মঘোষণা করেনি। 'নীলদর্পণ' নাটকে এই তিন দিকেই শুধু অঙ্গুলি সংকেত ছিলনা, সেই সঙ্গে ছিল অত্যাচারী ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আহ্বান।

এই নাটকটি জাতির জীবনে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই সাক্ষ্য আছে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনায় "আমাদের মন যখন অল্পাধিক পরিমাণে উত্তেজিত তখন ১৮৬০ সালের শেষ ভাগে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেলনা; ঘটনাসকল সত্য কিনা অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেলনা; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যস্ত (?) করিয়া ফেলিল।"[১৩]

জাতির চরম সংকটে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নাটক রচনার মাধ্যমে যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তা যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি অবিস্মরণীয় ন্যাশনাল থিয়েটারের দৃপ্ত ভূমিকা। বাংলার নবজাগরণে তাই বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, ঐতিহাসিকও বটে।

যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের দল জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপন ক'রে ও 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয় ক'রে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি সাধনার ধারাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলে নতুন খাতে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁরাই আবার জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনে 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকটির অভিনয় ক'রে বাঙালী দর্শকের হৃদয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় ভাবোদ্দীপনা। সেই মর্মস্পর্শী অভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'-তে। "তৎকালীন ভারতের ও ভারত সন্তানদের দুরবস্থা প্রদর্শনই ছিল এই নাটকের উদ্দেশ্য। নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ভারতলক্ষ্মীর মুখে দুটি গান সংযোজিত হয়। একটি 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি', অন্যটি "দেখ গো ভারতমাতা"।[১৪] এই নাটকটির অভিনয় দর্শনে আবেগমথিত দর্শকবৃন্দ শেষ পর্যন্ত অশ্রু বিসর্জন না ক'রে পারেন নি।

॥ পাঁচ ॥

জাতীয় জাগরণে বিশেষত নারীজাগরণে জাতীয় রঙ্গালয়ের ভূমিকা ছিল অনন্ত। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, জাতীয় রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীসমাজ তৎকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার অবকাশ পেয়েছিল। আজ থেকে একশো বছর আগে যখন গৃহস্থ নারীর পক্ষে সাহিত্যচর্চা দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে পড়ত, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই সময়ে স্বনামে ও বেনামে বেশ

কয়েকজন মহিলা নাটক রচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করলে এই সব রচনার অনেকগুলোই হয়ত রসোত্তীর্ণ হবার গৌরব অর্জনে ব্যর্থ হবে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সেই সব রচনার মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে বন্দী নারী-মানসিকতা। জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাই নারী মানসিকতার এই মুক্তিতে জুগিয়েছে প্রকৃত প্রেরণা।

সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যে দু-একটি নাটক নারীদের দ্বারা রচিত হয়েছিল তার অন্তত একটি প্রমাণ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উর্ব্বশী' নাটক। রচয়িত্রীর নাম ছিল 'দ্বিজতনয়া'—প্রকৃত নাম কামিনী সুন্দরী দাসী। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কয়েকজন মহিলা নাট্যকার নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লক্ষ্মীমণি দেবী, সুকুমারী দত্ত (গোলাপী), নয়নতারা দে, প্রফুল্লনলিনী দাসী ও স্বর্ণকুমারী দেবী।[১৫]

অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে 'অপূর্ব্ব সতী' নাটকটি রচনা করেন তার বিষয়বস্তু ছিল পতিতা-কন্যার প্রেমনিষ্ঠা। বিষয়বস্তুর বিচারে এই নাটকটিকে উনিশ শতকী নারী মানসিকতার মুক্তির দিকদর্শন বলা অত্যুক্তি নয়। প্রসঙ্গত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। এই নাটকে গিরীন্দ্রমোহিনী মীরাবাঈ-এর অলৌকিক জীবনকাহিনী বাস্তব জীবনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাতীত। ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্র সৃষ্টিতে, জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে এই নাটকে নিঃসন্দেহে আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান। বিশেষত, এই নাটকের 'শ্রুতি' চরিত্রটি তৎকালীন নারীসমাজের গতানুগতিক জীবনধারার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের এক জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

॥ ছয় ॥

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ইংরেজদের অত্যাচারে জর্জরিত চাষীদের জীবন যন্ত্রণার কথা অতি বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হলেও স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশপ্রেমের প্রথম সার্থক রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নাট্যকার মধুসূদন রচিত বাংলার

এই প্রথম দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকে দেশের স্বাধীনতাকামী ভীম সিংহের আক্ষেপ সমগ্র পরাধীন জাতির আক্ষেপ হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছে। ভীম সিংহ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেছেন: "এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ'ত বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারিনে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি; আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো?"[১৬]

মাইকেলের নাটকে এই স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষার আকুলতার রূপটুকু চিত্রিত হয়েছে তাই আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে তাঁর পরবর্তী-কালের নাট্য-স্রষ্টাদের হাতে। মাইকেল মধুসূদনের নাট্যরচনার অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জাতের নাটকের সঙ্গে রচিত ও অভিনীত হতে লাগল নানা দেশাত্মবোধক নাটক; তাদের কোনটিতে প্রত্যক্ষ, কোনটিতে পরোক্ষ ভাবে জাতীয় চেতনা মূর্ত্ত হয়ে উঠতে শুরু করল। নাট্যকার হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩), বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' প্রভৃতি নাটক এই সময়ে দেশাত্মবোধের সুরকে ঝঙ্কৃত করে তোলে এবং তারই ফলে নাটকগুলি খ্যাতি লাভ করে।

হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকখানির আবেদন সবচেয়ে প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণ নাটকটির বিষয়বস্তু হল বাংলার ইতিহাস। বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন এই নাটকের নায়ক। দীর্ঘকাল বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বাঙালী রাজা লক্ষ্মণ সেনকে ভীরু কাপুরুষ বলেই চিত্রিত করেছেন। কিন্তু নাট্যকার হরলাল রায় তাঁর নাটকের নায়ক লক্ষ্মণ সেনকে দেশপ্রেমিক বীর অথচ ভাগ্যহত রাজারূপেই অঙ্কন করেছেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর নাটকে হয়েছেন লাক্ষ্মণ্য সেন। এই নাটকের মূল বক্তব্য—জাগতিক সমস্ত বস্তুর মধ্যে স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। লাক্ষ্মণ্য সেনকে তাঁর গুরু যখন ভবিষ্যত বিচার করে বলেন যবনের সঙ্গে তাঁর পরাজয় ঘটবে, তখন নির্ভীক লাক্ষ্মণ্য সেন বলে ওঠেন: "বঙ্গ-ভূমির কি রক্ষক পাই, রাজা নাই,

সৈন্য নাই? যবনেরা জয়পতাকা তুলে, জয়বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গ-ভূমি বিনা বাতাসে শুষ্ক পত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে—এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করবে না। নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষণ্য সেন কি পাষাণ-মূর্তি মাত্র? গুরুদেব! লাক্ষ্মণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, কিন্তু ভীরু নয়। যুদ্ধ করব।"[১৭]

এরপর ভাগ্য-বিড়ম্বিত লাক্ষ্মণ্য সেন বক্তিয়ার খিলজীর কাছে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু অপরাজিত থেকেছেন সেনাপতি বিরাট সেন। নানা প্রলোভন দেখিয়েও মুসলমান সম্রাট তাঁকে প্রলোভিত করতে পারেন নি, কারণ দেশকে ভালবেসে সেনাপতি বিরাট সেন যে সম্পদ লাভ করেছেন, অন্য কোন বস্তু তার তুলনায় তুচ্ছ।

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন'—এই দুটি প্রতীক নাটকে পরাধীন ভারতজননীর বেদনাই প্রকাশিত। ম্লেচ্ছ বধ ক'রে পরাধীন জননীকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষাই 'ভারতে যবন' নাটকটির বিষয়বস্তু। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন:

"স্বাধীনতা সম কি আছে আর?
পামর যবনে করি কি ভয়?" আবার এই নাটকেরই

প্রধান চরিত্র বাসদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে:

"বীরপ্রসূ এই ভারত জননী,
কত ক্লেশ আর সহিবে গুনিনী?
স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণ মন
লভিতে সে ধন কররে যতন।

*

যবন মরিবে এ জ্বালা যাইবে,
জননীর দুঃখ আর না থাকিবে।
স্বাধীনতা মণি হৃদয়ে ধরিবে
বিলম্ব না আর, হও অগ্রসর—"[১৮]

এই সব নাটকের মতই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকেও আমরা পুরুকে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রাম ক'রে প্রাণ বিসর্জনের সঙ্কল্প ঘোষণা করতে দেখি। সকলে যখন পুরুকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে একাকী

পুরু তখনও তাঁর তেজদৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন : "সে নরাধম প্রেম হতে আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে। কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ করতে পারবে না।" এই পুরুই আবার অন্যত্র ঘোষণা করেছেন : "আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুধু অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারী! আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি সেই কথা ভাবছি যে, যদি আর কেউ আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব।"·৯

প্রকৃত পক্ষে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম পর্বে সাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের দিকেই বেশী ক'রে দৃষ্টিপাত করেছেন। আত্মবিস্মৃত জাতির চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন জাতির অতীত শৌর্যবীর্যের অবিস্মরণীয় কাহিনী; দেশকে ভালবেসে যে অসম সাহসী বীর দেশপ্রেমিকেরা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তবু মাথা নত করেননি, তাঁদের সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে দর্শকদের স্বদেশপ্রেমে অভিষিক্ত করাই ছিল এই সব নাট্যকারদের উদ্দেশ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পথানুসরণে এলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ নাট্যকারেরা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটক। উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'শরৎ সরোজিনী' প্রকাশের সময় নাট্যকার দুর্গাদাস দাস এই ছদ্মনামের অন্তরালে থেকে ইংরেজ-বিরোধী বক্তব্যের বলিষ্ঠতার ও বিপ্লবী মানসিকার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা ইংরেজ সরকারকে রুষ্ট করেছিল। এই নাটকের নায়িকা সরোজিনী আত্মরক্ষার জন্য গোরা ডাকাতের বুক লক্ষ্য ক'রে পিস্তলের যে গুলি ছুঁড়েছিল, সেই গুলিই ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশী বাঙালীর প্রথম গুলি।

এই নাট্যকারই তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র সময় ছদ্মনামের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন। এই নাটকে নাট্যকার হুগলী জেলখানার কয়েদীদের বিদ্রোহের চিত্র অঙ্কন ক'রে আবার তাঁর বিপ্লবী মানসিকতার পরিচয় দিলেন। বাংলাদেশে যে বিপ্লববাদ আরও তিরিশ বছর পরে দৃঢ়মূল

হতে পেরেছিল, তিরিশ বছর আগেই নাট্যকার দাস তাঁর নাটকে ইংরাজ হত্যা, ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণা ও সর্বোপরি বিদ্রোহের দৃশ্যাঙ্কন ক'রে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হুগলির জেলখানায় আটক সাধারণ বন্দীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহ্বান। ঘটনা বিন্যাস, নাটকীয় সংলাপ ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ-রীতির জন্য এই দৃশ্যটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে নাটকটির এই দৃশ্যের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল :

চতুর্থ অঙ্ক। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক [হুগলির কারালয়] বন্দী বিদ্রোহী বন্দীগণ— ভাঙ্গ, মার, কাট। এই দরজাটা ভাঙ্গ। [কুঠারাদির দ্বারা কবাট ভাঙ্গার প্রয়াস]

১ম বন্দী—আরে এযে লোহার দরজা, ওকি তোরা সহজে ভাঙ্গতে পারবি, জেল ভাঙ্গ।

সকলে—ভাঙ্গ জেল, ভাঙ্গ জেল। [ভিত্তি ভঙ্গকরণের চেষ্টা]

১ জন বন্দী—এই ইংরোজের অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শিকল ছিঁড়ব, না হয় মরব। আর এ শিকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি নে। যে যেখানে আছিস দাদা,—যে কেউ কখনো ঐ পাজী ইংরাজের লাথি খেয়েছিস—আয় সব দৌড়ে আয়। এ জেলের দেয়াল ভাঙ্গা, এ বিলিতি লোহার শেকল ছেঁড়া এক আধ জনের কর্ম নয়। আয় ভাই, দাদা, সকলে আয়-যে যেখানে আছিস দৌড়ে আয়। হিন্দু হস, মুসলমান হস, বাঙালী হস, খোট্টা হস—ছেলে হস, বুড় হস—যার শরীরে এক ফোঁটা দেশী রক্ত আছে—আয় সব দৌড়ে আয়। সকলে চেষ্টা না করলে হবে না।"[২০] বলা বাহুল্য, এই নাটক দেশের মানুষকে স্বদেশিয়ানায় উদ্দীপিত করেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের বিখ্যাত গান 'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ'-এর মত এই নাটকটির প্রারম্ভে "হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।" ইত্যাদি গানটি তৎকালীন বাঙ্গালী দর্শকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় নাট্যকারেরা অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন মত কিছু দেশাত্মবোধের উপন্যাস ও কাব্যকেও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, যেমন বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মলহর রাও গায়কোয়ার', রমেশচন্দ্র দত্ত-কৃত 'বঙ্গবিজেতা' ও নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনীত হয়।

॥ সাত ॥

এমনি ভাবে দেশের নাট্যকারেরা ও নাট্যালয়গুলো যখন বাংলার নবজাগরণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর তখনই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই আঘাত নেমে এল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের রূপ ধরে। ফলে, বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথ হল রুদ্ধ। সে এক নাটকীয় কাহিনী।[২০]

প্রকৃতপক্ষে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের অত্যাচারের প্রতিরোধ ও কয়েদীদের বিদ্রোহের যে দৃশ্য নাট্যকার অঙ্কন করেছিলেন, তা এই নাটকটিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আদি যুগে এই নাটকখানি দর্শকমানসে জাগিয়েছিল বিপুল প্রেরণা। বৃটিশ সরকার তাই রুষ্ট হয়ে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারি দ্বারা এই নাটকের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন এবং নাট্যকার উপেন্দ্রলাল দাস ও অধ্যক্ষ অমৃত বসুর বিরুদ্ধে মামলা করেন। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র নাট্যশালার চারদেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশব্যাপী। এরই ফলে, শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথটি সুগম হল। এমনিভাবেই ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা এক গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে পূর্বোক্ত ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় এই সময়েই মিথ্যা অছিলায় সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথকে অপসারিত ক'রে ইংরাজ সরকার যে রাজনৈতিক চাল চালেন তা তাঁদের মৃত্যুবাণ রূপেই কাজ করল। জনগণমনের অধিনায়ক রূপে দেখা দিলেন সুরেন্দ্রনাথ। নিজের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় আদালতের অন্যায় কাজের সমালোচনা করায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫-ই মে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

সমগ্র ছাত্রসমাজ ধর্মঘট করে আদালত প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হল। কোন নেতার সমর্থনে সমগ্র দেশের বিভোক্ষ প্রকাশে ছাত্র ধর্মঘট এই প্রথম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আগের বছর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' রচনা ক'রে জাতীয়তার নবমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ঘোষণা করেছেন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নাট্যকার কেদার চৌধুরী কৃত আনন্দমঠের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে ন্যাশনাল থিয়েটার দেশের মানুষের মনে সেই মাতৃমন্ত্র পৌছে দিয়েছেন। দেশের আকাশে বাতাসে তখন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। এই ধ্বনি উচ্চারণ করেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম নিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসই শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মক মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সমগ্র দেশকে আবদ্ধ করল একই সূত্রে। সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।

জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র ক'রে দেশে যখন দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছিল, তখন ব্রিটিশ সরকারের শাসনের মুঠি ততই কঠিন হয়ে উঠছিল। এমনি করেই বেশ কিছু বছর কেটে যাওয়ার মধ্যেই আকস্মিকভাবে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন 'বঙ্গভঙ্গ'-এর কথা। লর্ড কার্জনের দুমুখীনীতি তার আসল স্বরূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় দেশে হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে সকলে রাখীবন্ধন উৎসবে মেতে উঠল। সভাসমিতি ক'রে জনগণ স্বদেশীব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হল। শুরু হল বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলন। এমনিভাবেই দেশ জুড়ে যখন দেশাত্মবোধের ও দেশপ্রেমের জোয়ার দেখা দিল, তখন সেই পরিমণ্ডলে বাংলা নাটক ও নাট্যশালাও তার নিজস্ব ভূমিকা পালনে ছিল দ্বিধাহীন।

জাতির জীবনের দর্পণ—নাট্যশালাতেও জাতির জীবনের জোয়ার তরঙ্গ তুলল; অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রতাপাদিত্য'। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্টার থিয়েটারে 'প্রতাপাদিত্য' শুরু হল। স্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় এই নাটক লাভ করল অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা।

এমনি ভাবে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে নাটক ও নাট্যশালা যে গৌরবময় ভূমিকা নিয়াছিল তা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বললেই সবটা বলা হবে না। নাট্যকাররা যে স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহার পরিচয়

দিয়েছিলেন তাই দেশের সমস্ত মানুষের মনে এই চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল জীবনদর্পণ নাটক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম শক্তি।

---

১ পরবর্তীকালে হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জমিদার সভার উদ্দেশ্যই যেন ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়—We despise race distinction. It should be our object to raise up a vast Nationality in India composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mohammedan governed by our interest, and our faith in supremacy of human love and charity." [The National Paper, 1st April 1864.]

২ " দেবেন্দ্রনাথের কর্ম জীবনের সঙ্গে একটি অধ্যাত্ম ভাবনাও নিয়ত সঞ্চরমাণ ছিল। এবং, সেই অধ্যাত্ম চিন্তার দ্বারা প্রাণিত হয়েই দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করলেন। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে দ্বিতীয় সভা থেকে নাম হয় তত্ত্ববোধিনী সভা।" ঠাকুর পরিবারের স্বদেশচর্চা ও হিন্দুমেলা : স্বপন প্রসন্ন রায় ; বসুমতী, কার্তিক, ১৩৭৫।

৩ সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৪৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পত্রিকা ৩য় সং ১৩৫৪ [পৃঃ ২০]

৪ জাগৃহি ও জাতীয়তা : যোগেশচন্দ্র বাগল ; [পৃঃ ৯৫]

৫ ঘরোয়া : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রাণী চন্দ ; কলিকাতা, ১৩৫৮ [পৃঃ ৬৮]

৬ বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : ডঃ অরুণ সান্যাল, কলিকাতা, ১৯৭২।

৭ বাঙালীর নাট্যসাধনা : জোড়াসাঁকো থিয়েটার—অরুণ সান্যাল ; দীপাবলী, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০।

৮ Hindoo Patriot, 11th. May, 1854.

৯ পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিন বিহারী গুপ্ত, কলিকাতা, ১৩২০, [পৃঃ ১৫৬]

১০ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ সুকুমার সেন (নাটক-১৮৫২-৭২), কলিকাতা, ১৩৭০ সন [পৃঃ ৮৩]

১১ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা : মন্মথ রায়, কলিকাতা, ১৯৬৫ [পৃঃ ২-৩]

১২ ঐ [পৃঃ ৩-৪]

১৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৯৫৭ [পৃঃ ২২৪]

১৪ (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা), ১৩৭৪

১৫ সাধারণ রঙ্গালয় / বাংলা নাটকের মুক্তি : বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, (অমৃত, ১৭ কার্ত্তিক ; ১৩৭৯

১৬ কৃষ্ণকুমারী : মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ৫ম সং, কলিকাতা, ১৮৮৩।

১৭ বঙ্গের সুখাবসান : হরলাল রায় ; কলিকাতা, ১২৮১ সাল।

১৮ ভারতে যবন : কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২৮১ সাল।

১৯ পুরুবিক্রম ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২য় সং, কলিকাতা, সন ১৮০১।

২০ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী : উপেন্দ্রনাথ দাস। দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, ১২৮৭ সাল।

(২১) "১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় এলেন। কিন্তু সে সময় শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজভক্তির প্রাবল্য ছিল না এবং কলকাতায় যুবরাজ সংবর্ধনায় নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্তু রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় কেবল যে যুবরাজকে সংবর্ধনা জানালেন তা নয়, দেশের প্রথা ভাল করে এবং সর্বসাধারণের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে অন্তঃপুরের নারীদের বাইরে এনে তাঁদের দিয়েই বরণ করালেন যুবরাজকে। এই ঘটনায় সমগ্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ১৮৭৬ সালে বাঙালীসমাজ এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'গজদানন্দ' নামে একটি প্রহসন রচনা করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মঞ্চস্থ করেন।...প্রথম অভিনয় রাত্রেই পুলিস এসে এর অভিনয় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু রঙ্গালয়ে পুলিশের স্থূল হস্তাবলেপেও কর্তৃপক্ষ বিচলিত বা ভীত হলেন না। তাঁরা প্রহসনটির নাম বদলে ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'হনুমান চরিত' নাম দিয়ে অভিনয় করলেন। বড়লাট এবার স্বয়ং অবিলম্বে অর্ডিনান্স জারি করে রাজভক্ত প্রজাদের মান রক্ষার জন্য এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধের আদেশ দেন। অভিনয় বন্ধ হলো কিন্তু শিল্পীরা দমে গেলেন না। অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর টণক নড়ল ও তাঁরা বুঝতে পারলেন, অবিলম্বে নাট্য দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলে যাবে। এর ফলে, (১৮৭৬ সালে) Dramatic Performances Act নামে একটি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরী হলো।" [Dramatic Performances Act/Act No. XIX of 1876 (16th Dec., 1876]—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, মন্মথ রায়, ১৯৬৫ [পৃঃ ১৫-১৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা-অভিনেত্রী

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঊনবিংশ শতকের নট-নটী প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলেই এই সময়ের নাট্যশালার কথা কিছু এসে পড়ে। এই নাট্যশালা মহাভারতে বর্ণিত বিরাট নগরে কীচকবধের নাট্যশালা নয়, বা ভরত নাট্যশালাসম্মত উজ্জয়িনীর বিক্রমোর্বশীর, বা অভিজ্ঞানশকুন্তলার অভিনয়ের নাট্যশালা নয়, বা চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের রুক্মিনীর ভূমিকায় লীলাভিনয়ের নাট্যশালা নয়—এ নাট্যশালা রীতিমত ইংরাজী থিয়েটারের অনুকরণে যা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হতে। ইংরেজরা এই দেশ জয় করে ইংরেজি থিয়েটার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই স্থাপিত করেছিল। ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে লেবেডেফ নামে জনৈক রুশদেশীয় নাট্যরসিক কলকাতায় একটি বাঙ্গালী থিয়েটারও স্থাপনা করেন। গোলকনাথ দাশ নামে এক নাট্যানুরাগী এই বিষয়ে লেবেডেফকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ধরতে গেলে, বাঙ্গালী থিয়েটারের এই হলো গোড়া পত্তন। লেবেডেফের বাঙ্গালী থিয়েটার গোলকনাথ দাশের পরিচর্যায় বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়েই পরিচালিত হয়েছিল। এ হোল ১৭৯৫ সালের কথা।

এরপর ১৮৩১ সালে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগান বাড়ীতে। এই থিয়েটারে 'উত্তররামচরিত' ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে বাঙ্গালী অভিনেতাদের দ্বারাই অভিনীত হয়। এই সময়ে শ্যামবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হয়। এর পরে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত ও রাধাপ্রসাদ বসাকের উদ্যোগে টেগোর ক্যাসেল রোডে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইংরাজী মতে স্টেজ তৈরী করে ১৮৫৬ সনে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের যে অভিনয় হয় সেটাই সর্বপ্রথম খাঁটি বাংলা মঞ্চ অভিনয়। ইংরেজী থিয়েটার রীতির অনুপ্রবেশ এই ভাবে আরম্ভ হওয়ার পর

বেলগাছিয়ার একটি স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপিত হয়। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক নিয়ে এই নাট্যশালার যাত্রা শুরু হোল। এই রঙ্গশালাতেই নাট্যকার হিসাবে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব হয় 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের পর মধুসূদন লেখেন 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রেঁা', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি প্রহসন ও নাটক। বেলগাছিয়া থিয়েটারে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় প্রথিতযশা অভিনেতা ছিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকে তার বিদূষকের অভিনয় দর্শকবৃন্দের প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছে। মধুসূদন এই নাটকখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছেন।

অতঃপর পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, শোভাবাজার থিয়েটার স্থাপিত হয়। মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময়ের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। এই সময়ের থিয়েটার বলতে যা বোঝায় তা ছিল সমাজের গণ্যমান্য লোকদের বিলাস প্রচেষ্টা। বহুবাজারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু নাট্যামোদী লোক 'রাম অভিষেক' নাটক অভিনয় করেন। এই সময়ে থিয়েটারে কিছু হাল্কারসের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি-যোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অছিলায় নানাবিধ কদাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের 'কিছু কিছু বুঝি নামক' এক উলঙ্গ রসিকতার প্রহসনে নাট্যপাদপ্রদীপের সামনে আবির্ভূত হন নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। গিরিশচন্দ্র তখন যাত্রায় অভিনয় করতেন। ক্রমশঃ থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট হন তিনি। ১৮৬৮ সনে গিরিশচন্দ্র বাগবাজার এমেচার থিয়েটার স্থাপনা করেন এবং ঐ বছরেই শারদীয়া পূজার সময় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

অভিনয়ে তিনি নিমচাঁদের ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেন। সমগ্র উত্তর কলকাতা তাঁর অভিনয় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল :

"নিমচাঁদ ভূমিকায় তুমি সুধীজন
নিদ্রাশেষে যবে তুমি হলে জাগরিত,
দেখিলে জয়ের ধ্বনি কাঁপায়ে পবন
গৃহপথ রঙ্গমঞ্চ ক'রে মুখরিত।"

এরপর ১৮৭২ সনে ৭ই ডিসেম্বর পাবলিক থিয়েটার স্থাপিত হয়। এরই নাম হয় ন্যাশানাল থিয়েটার। ন্যাশানাল পত্রিকার নবগোপাল মিত্র—এই

থিয়েটারের এই নতুন নামকরণ করেন। এই ন্যাশানাল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নিয়ে। এই সময় থেকেই প্রচলিত হয় টিকিট করে থিয়েটার দেখার প্রথা। ১৮৭২ সাল থেকেই রঙ্গমঞ্চের রূপ বদলাতে থাকে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা একটির পর একটি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে,—ন্যাশানাল, হিন্দু ন্যাশানাল, বেঙ্গল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশানাল, স্টার থিয়েটার, সিটি এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নট-নটীরা অসাধারণ প্রাণপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকেও তাঁদের অভিনয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাট্য ইতিহাসের বুনিয়াদ তাঁরা। তাঁদের বেদনাসঞ্জাত আকাশ প্রদীপে উনবিংশ শতকের নাট্যাকাশ নব নব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি নক্ষত্রই ত আলো দেয়, তাই পৃথিবী প্রত্যেকটি নক্ষত্রের কাছেই ঋণী কিন্তু তার মধ্যেও যাঁরা শুকতারা, সন্ধ্যাতারা হয়ে আসে তাদের কথাই লোকে বলাবলি করে। যাঁদের কথা আজ আলোচনা করতে বসেছি তারা ওই শুকতারা, সন্ধ্যাতারা দলের লোক।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ নীলমাধব চক্রবর্তী, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃত মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমর দত্ত, গোপাল, বিনোদিনী, বনহরিণী, গঙ্গামণি, তিনকড়ি, কুসুম কুমারী প্রভৃতি নট ও নটীবৃন্দের নাম আজও স্মরণীয়। এদের মধ্যে কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করবো।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি :—

নটকুলতিলক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ১৮৬৭ সনের ২রা নভেম্বর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনেই প্রথম অভিনেতা রূপে অংশ গ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকো থিয়েটারে এই প্রহসনটি অভিনীত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর দন্তবক্র, মুরাদ আলি ও চন্দন বিলাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর যে প্রতিভাধর নট একবাক্যে সেকথা সেদিন সকলেই স্বীকার করে নিলেন। এরপর বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে যোগদান করেন তিনি। অভিনয় কলা শিক্ষাদান ও নাটক পরিচালনায়ও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর শিখরদেশে না থাকলে গিরিশচন্দ্র গিরিশচন্দ্র হতেন কিনা সন্দেহ আছে।

উনবিংশ শতকের এই দুই নাট্য মহারথী জাতির জীবনে রেনেসাঁস কালে নাট্যরসধারায় জাতিকে পুষ্ট করেছিলেন। ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার প্রাক্কালে গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করলেও অর্দ্ধেন্দুশেখর নিজের সাংগঠনিক দক্ষতায় ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন করেছিলেন। অবশ্য, গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর হোলেও মনান্তর হয়নি। পরবর্তী কালে আবার দুইজনে মিলিত হয়ে অভিনয় করেন নীলদর্পণ নাটকে। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই নাটকে গোলক বসুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। উনবিংশ শতকের শেষ তিরিশ বছর ধরে তিনি নানা থিয়েটারে নানা নাটকে নানা চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। হিন্দু ন্যাশানালে অর্দ্ধেন্দুবাবু 'মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাসা' নামে একখানি ব্যঙ্গ নাটিকায় (স্যাটায়ার) অভিনয় করে প্রচুর অর্থ ও সুনাম অর্জন করেন। চরিত্রটির নাম ছিল দেবাকার্সন। বাঙ্গালী সাহেব, হাতে বেহালা, গান গাইতে গাইতে প্রবেশ :—

I am a very good Bengali Babu
হাম বড়া সাহেব হ্যায় দুনিয়ামে ;
None can be Compared হামারা সাথ,
মিষ্টার মুস্তাফি নাম হামারা
চাটগাঁও মেরা বিলাত।
গবকি মালেক, আদমি কি মালেক,
লর্ড অফ অল হ্যায় হাম,
নিগার্স বাট মেরা নেই টলারেট
চুনাগলি মেরা মোকাম।
কোট পিনি, পেণ্টালুন পিনি, পিনি মেরা ট্রাওসারস
Every two years new suit পিনি
Direct from Chandney Bazar.
Dirty নির্গাস hate হামারা
বড় ময়লা আছে ছোঃ ছোঃ উঃ বাপ্‌রে
Rom-ti Town—Rome-ti-Town

নটধুরন্ধর অর্দ্ধেন্দুশেখর সর্বপ্রকার চরিত্র অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগগজ সেজে দর্শকসমাজকে যেমন হাসিয়েছেন,

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ চরিত্রের রূপায়ণে তেমন দর্শকসমাজ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর নাট্যসৌকর্য চিরদিন নাট্যরস পিপাসুদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। ১৯০৮-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

গিরিশচন্দ্র ঃ—

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সোমবার গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসে যে সব মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, গিরিশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যাত্রার পালা শর্মিষ্ঠা রচনা করেন এবং যাত্রাভিনয়ে মনোনিবেশ করেন। তখন কলকাতার ধনীসম্প্রদায় ইংরেজী থিয়েটারের অনুকরণে ষ্টেজ তৈরী করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। সাধারণ মানুষের সে-সব জায়গায় প্রবেশ-অধিকার ছিলনা। গিরিশচন্দ্র যাত্রা ছেড়ে থিয়েটারেব দিকে ঝুঁকলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাজারে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটিকায় অভিনয় করেন। পূর্বেও এ কথার উল্লেখ করেছি। সধবার একাদশী নাটিকায় নিমে দত্তের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র। এই অভিনয় দেখার পর সাধারণ জনসমাজ থিয়েটার দর্শনে অনুরাগী হতে আরম্ভ করে। দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রকে বলেন, তোমার জন্যই বুঝি এই চরিত্র আমি লিখেছি। অমৃত বসু পরবর্তীকালে লিখেছিলেন…"গিরিশ প্রতিভার উন্মেষ এইখানেই", প্রকৃত পক্ষে বাংলার নাট্যশালার স্রষ্টা ও প্রবর্তক এই নিমচাঁদরূপী গিরিশচন্দ্র।

"—মদেমত্ত পদ টলি
নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথমে দেখিল বঙ্গ
নব নটগুরু তার।—"

এই সধবার একাদশী নিয়েই বাংলার জননাট্যশালার উদ্বোধন। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে তাই দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রামনারায়ণের ও মধুসূদনের নাটকের গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল ধনিক শ্রেণীর মধ্যে, কিন্তু দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, সধবার একাদশী প্রভৃতি নাটক মধ্যবিত্তদের দ্বারাই সাধারণের কাছে পরিবেশিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়। এই সধবার একাদশীতে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অভিনেতা রূপে ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকে উনবিংশ শতকের এক একজন খ্যাতিমান নট। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা দিবস। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের মতান্তর হয়। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক নিয়ে জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন হোলেও গিরিশচন্দ্র তাতে যোগদান করেন নি। অমৃতলাল বসু এই নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। এর পরে অবশ্য মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীম সিংহের চরিত্রে গিরিশচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেন। পরবর্তী কালে ন্যাশনাল থিয়েটার দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনালেই থেকে যান। এই সময় থেকেই অভিনেতা, নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নানা দিক থেকে উন্নত করে তোলে। অবস্থা গতিকে নানা বিপর্যয় ঘটলেও গিরিশচন্দ্র প্রতাপ জহুরীর সময় পর্যন্ত ন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তারপরে নটী বিনোদিনীর অভিনয় প্রীতিতে জন্ম নেয় স্টার থিয়েটার। স্টার থিয়েটারের সৃষ্টি যজ্ঞে গিরিশচন্দ্র ছিলেন বিশেষ উদ্‌যোগী। এই স্টার থিয়েটারেই 'চৈতন্য লীলা' লিখে এবং অভিনয় করিয়ে গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করেন। ঠাকুরের কৃপায় গিরিশচন্দ্র হোলেন ভক্ত ভৈরব। অমৃতলাল বসু লিখলেন গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে—

"লিখিলা চৈতন্য লীলা……হীরক হইল শিলা—
নাট্যশালা হলো তীর্থ…ভক্তমেলা থিয়েটার।"

রামকৃষ্ণদেব নানাভাবে বাংলার নাট্যশালাকে লোকশিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাবিধৌত বাংলার নাট্যশালার এই সম্মান উনবিংশ শতকের সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবু গিরিশচন্দ্রের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিলনা। রামকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর দ্বাদশ সন্ন্যাসীর অন্যতম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নাট্যশালা তবু কি জাতির কাছ থেকে মর্যাদা পেয়েছিল? বা তার নট-নটীরা?

লোকে বলে অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ,
পরের বেদনা হায় পরে কি বুঝিবে হায়,
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন জন?

তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার

তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ,

রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি

আশার নেশায় করি জীবন যাপন।

রঙ্গভূমিকে ভালবেসেই বাংলাকে ভালবেসেছিলেন গিরিশচন্দ্র।

মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙ্গে গিরিশচন্দ্র নাটকে এক অভিনয়ের ছন্দ প্রবর্তন করেন। সাধারণতঃ একে গৈরিশ ছন্দ বলা হয়।

কৃষ্ণ। এস ভাই এস বৃকোদর
দণ্ডীরে এনেছে সঙ্গে ক'রে ?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছো শ্রীহরি।
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,
দুর্য্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ,
হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু তার,
রহুক দ্রৌপদী চিরকাল এলোকেশী
ক্ষেদ নাহি করি, কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব ?
এ কলঙ্ক অর্পিতে আমায়,
ইচ্ছা কি হে তব, ইচ্ছাময়!

অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ভরা এই অভিনয়-ছন্দ। গিরিশচন্দ্রের অভিনেতা জীবন এবং নাট্যকার জীবন সমৃদ্ধ করার মূলে একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী যিনি তাঁর গভীরতম আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন গিরিশ-শিখা নটী বিনোদিনী। তার কথাই এবার বলব।

নটী বিনোদিনী।

গিরিশ-প্রতিভা বরণে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনীর কথা না বললে নয়।

বাংলা থিয়েটারকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বিনোদিনী। অল্প বয়সেই ধর্মদাস সুরের সৌজন্যে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিতে পেরেছিলেন বিনোদিনী। তাঁর নাট্যচেতনা, তাঁর শিল্পীমন স্বল্পকালের মধ্যেই তাকে সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। গিরিশ সান্নিধ্যে এসে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য পূর্ণ বিকশিত হয়। ইংরেজী সংবাদপত্র পর্যন্ত তাঁকে "সাইনো ডোরা," "প্রাইমা ডোরা অব বেঙ্গলী স্টেজ" বলে প্রশংসা করেছে। বিনোদিনীর নাট্যচিন্তা ও নাট্যভাবনা তাঁকে আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে এক মহিমাময় মর্যাদা দান করেছে। বারবণিতা, রঙ্গময়ী নটী বিনোদিনী চৈতন্য লীলায় নিমাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—"আসল নকল ত সব এক দেখলাম, তোমার চৈতন্য হোক।" ঠাকুর এসেছিলেন স্টার থিয়েটারে। কিন্তু এই স্টার থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল যে ইতিহাসকে পটভূমি করে সেই ইতিহাসের মূলাধার এই নটী বিনোদিনী। তাঁর জীবনের মহার্ঘ প্রেম, তাঁর জীবনের প্রভূত অর্থ-সম্পদ এই থিয়েটারকে ভালবেসে সে অক্লেশে দান করেছিল। বীরাঙ্গনাকে মানুষের অঙ্গনে সুস্নিগ্ধ মহিমার অঙ্গশয্যায় মণ্ডিত করেছে তাঁর নাট্যপ্রেম। নাট্যপটীয়সী বিনোদিনী এই বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে সন্ধ্যাতারার মতই উজ্জ্বল থাকবে চিরকাল।

অমৃতলাল বসু।

উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট হচ্ছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। প্রথমে ইনি দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকে স্ত্রী-চরিত্রে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীতে। পরবর্তীকালে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনুগামী হন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হলেও দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল খুবই। নটী বিনোদিনীর গৃহে প্রায়শঃই এঁদের নাট্যানুশীলন চলত, চলত নানা আলোচনা নব নব অভিনয়-পদ্ধতির প্রবর্তনা নিয়ে। অমৃতলাল যেমন ছিলেন প্রতিভাবান নট, তেমনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক। বিনোদিনীকে 'প্রাইমা ডোনা অব বেঙ্গলী স্টেজ' করতে অমৃতলালের অবদানও ছিল অনেক। কোন ইংরাজী থিয়েটারে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় বিনোদিনীকে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন অমৃতলাল

নিজে তাঁকে শিখিয়ে। স্টার থিয়েটারের প্রারম্ভিক ব্যাপারে অমৃতলাল বসু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমৃতলাল অনেক নাটক রচনা ক'রে উনবিংশ শতকের নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাংলার নাট্য ইতিহাসে সম্মানিত আসনের অধিকারী হয়েছেন।

চন্দ্র সূর্য নিয়েই যেমন আকাশ নয়, তেমন সেদিনের নাট্যাকাশ শুধু অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী, অমৃতলাল বসুর দ্বারাই উদ্ভাসিত হয়নি, উদ্ভাসিত হয়েছে আরো অনেক তারায় তারায়—যেমন, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃত মিত্র, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মতি সুর, রামরতন সান্ন্যাল, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), প্রিয়নাথ ঘোষ, অঘোর পাঠক, নীলমাধব, অমর দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতাবৃন্দ এবং গঙ্গামনি, তিনকড়ি, বনবিহারিণী, প্রমদাসুন্দরী, কুসুম কুমারী, গোলাপ প্রভৃতি উনবিংশ শতকের গন্ধর্ব কন্যাবৃন্দ, যাঁদের অভিনয় নৈপুন্য এক আকাশের আরো অনেক তারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রথমদিকে স্ত্রী-চরিত্রে মেয়েরা অবতীর্ণ হতো না। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথমে স্ত্রীচরিত্রে অভিনেত্রীর অবতারণা করেন, এবং তা করেন বলেই পরবর্তীকালে আমরা বিনোদিনী, তিনকড়ির মত অভিনেত্রী পেয়েছিলাম। বিনোদিনী নাট্যশালা ছেড়ে দিলে তিনকড়িই তার স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা রজনীতে গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় হয়। এতে তিনকড়ি লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলার নাট্য ইতিহাস রচনায় উনবিংশ শতকের নট-নটীদের অপরিমেয় আত্মপ্রতীতি, অফুরন্ত নাট্য পিপাসা, প্রয়োগ নৈপুণ্যের অমোঘ অনুশীলন—সব মিলিয়ে নাট্য জগতে এক মহাযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহানাট্য যজ্ঞের অগ্নিশুদ্ধ যাজ্ঞিক ওঁরা, ঘৃতের অর্ঘ্য সাজিয়ে সেই যজ্ঞশালায় দাঁড়িয়ে ওঁরা এক সঙ্গে ভরত-মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, আহুতি দিয়েছেন, আর বলেছেন :—

আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ব্ব বাঙ্ময়ম্।
আহার্য্যং চন্দ্রতারাদি তং নমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥

পাদরি লঙ ও লঙ সাহেবের ক্যাটালগ

প্রমীলচন্দ্র বসু

ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর জাতীয়-জীবনে নবজাগরণের জোয়ার আসে। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সমাজ-জীবনের উন্নত ও পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রগুলিতে এই সময়ে নব-প্রগতির প্রবাহ সৃষ্টি করেন অনেক গুণী ও প্রতিভাবান পুরুষ। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে দেশী ও বিদেশী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। এঁরা সকলেই আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু এ দেশের লোক না হ'য়েও যাঁরা বিদেশ থেকে এসে এ দেশকে ভালবেসেছেন, এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ-এর কাজ ক'রে প্রগতির প্রবাহ-বেগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন, অথবা এ দেশের লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত জনগণের পাশে দরদী মন নিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লাঞ্ছনামুক্ত করতে অগ্রণী হয়েছেন এই সকল সদাশয় বিদেশী ব্যক্তির কাছে আমরা চিরঋণী। মহামতি ডেভিড হেয়ার, রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরি, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রমুখ এই শ্রেণীর উন্নতহৃদয় ব্যক্তিদের শীর্ষ স্থানাধিকারীদের মধ্যে 'পাদরি লঙ' অন্যতম।

লঙ সাহেবের পুরানাম রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ। তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম জীবনের কথা বেশী কিছু জানা যায় না। তবে ঐ সময়ে তিনি কিছু দিন রাশিয়াতে ছিলেন। পরবর্তীকালেও তিনি রাশিয়াতে গিয়েছিলেন এবং ঐ দেশের সাথে বরাবর যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন ব'লে জানা যায়। রাশিয়ার দরবারে তিনি সুপরিচিত ছিলেন ব'লেও শুনা যায়। ১৮৩৯ সালে তিনি ইংলণ্ডের চার্চে যাজক সম্প্রদায়ের নিম্নপদে (deacon) নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর পুরোহিত (priest) পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির একজন মিশনারি হিসাবে লঙ ভারতে আসেন এবং এ দেশের নানা প্রগতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল কাজের মধ্যে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে কারাদণ্ড বরণ করা ব্যতীত বাঙলা ভাষা নিয়ে

তাঁর গবেষণা ও বাঙলা গ্রন্থপঞ্জীর পথিকৃৎ হিসাবে কৃত কাজ তাঁকে অবিস্মরণীয় করেছে।

এ দেশে এসে লঙ প্রথমে চার্চ মিশনারি সোসাইটি পরিচালিত ক'লকাতার মির্জাপুরে অবস্থিত এক বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন ক'লকাতায় অবস্থান করেন। পরে ক'লকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে মিশনারি কাজের জন্য প্রেরিত হন। লঙ মুখ্যত একজন ধর্ম প্রচারক হ'লেও কার্যতঃ এ দেশে তাঁর কার্যধারা বিভিন্নমুখী ছিল। জনসেবা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের নানা অঙ্গের প্রগতির আদর্শ সামনে রেখে তিনি দেশীয় সমাজের উন্নয়ন ও প্রগতিমূলক বহুবিধ কাজে পূর্ণ মাত্রায় এবং একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। ঠাকুরপুকুর গ্রামে অবস্থান কাল থেকে শুরু ক'রে পরবর্তীকালে সকল সময়ে তিনি দেশের অভ্যন্তরে নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রে জনগণের সাথে একাত্মভাবে মেলামেশা করতেন। যে কালে লঙ ভারতে ছিলেন (১৮৪০—১৮৬২; ১৮৬৬—১৮৭২) সে সময়ে এ দেশের উল্লেখযোগ্য সকল রকম শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সমাজ উন্নয়নমূলক আন্দোলন ও সভা-সমিতির সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ঐ সকল আন্দোলনে বা সভা-সমিতিতেও সহানুভূতিশীল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, সেকালের ভারতীয়েরা তাঁকে একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে যত না জানতেন তার চাইতে অনেক বেশী তাঁকে জানতেন একজন ভারতপ্রেমিক, কৃষকদরদী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসাবে। দেশের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পল্লীবাসী-শহরবাসী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল স্তরের লোকের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে লঙ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাধারণ লোকের কাছে তিনি 'পাদরি লঙ'—এই জনপ্রিয় নামে খ্যাত ছিলেন।

লঙ বহু ভাষা আয়ত্ত ও বহু ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। ভারতে আসার পূর্বেই তিনি কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষা শিখেছিলেন। ভারতে আসার পর প্রথমেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষার্থে মনোনিবেশ করেন। তিনি অন্যূন নয়টি ভাষা জানতেন ব'লে শোনা যায়। বাঙলা দেশকে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করায়

বাঙলা ভাষা ভাল রকম আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে লঙ এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হন। এবং, অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলা ভাষা ভাল রকমই শিখেছিলেন। কার্যসূত্রে তিনি মফঃস্বলের নানা জায়গায় যেতেন। সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের সাথে অবাধে মেলা মেশা করতেন। তা' ছাড়া, শিক্ষার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতাও ছিল। কাজেই তিনি অতি শীঘ্র বাঙলা ভাষার মর্মস্থলে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করছে বাঙলা প্রবচন নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি। বাঙলা ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে না পারলে বাঙলা প্রবচনের ইঙ্গিতজ্ঞাপক মর্মার্থ গ্রহণ করা সহজ নয়। ১৮৫০ সাল থেকে পাদরি লঙ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত 'সত্যার্ণব' নামে প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম তত্ত্ব বিষয়ে একখানা সচিত্র মাসিক পত্রও সম্পাদন করেছেন। মাসিক পত্রটি পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তবে প্রথম দু'বছরের পর এটি দ্বি-মাসিক পত্রে পরিণত হয়।

ইংরেজী ভাষার ভাল ভাল বই-এর বঙ্গানুবাদ ক'রে বাঙলা ভাষায় বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশী ও বিদেশী উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' অর্থাৎ বঙ্গ ভাষানুবাদক সমিতি নামে ক'লকাতায় এক সমিতি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া বাঙলায় মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্তও এই সোসাইটি গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই লঙ এই সমিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কারণ, প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে প্রথম বর্ষাধিক কাল পর্যন্ত সোসাইটির যে প্রথম কার্য বিবরণী ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তা'তে পাদরি লঙ কর্তৃক এক বাঙলা সাময়িক পত্র সঙ্কলন প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে ব'লে উল্লেখ আছে। তা' ছাড়া, সোসাইটির জন্য যাঁদের কাছ থেকে চাঁদা পাওয়া গিয়েছে ব'লে এই কার্য-বিবরণীতে উল্লেখ আছে তাঁদের মধ্যে পাদরি জে, লঙের নামেরও উল্লেখ আছে এবং তিনি পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। সোসাইটির পরবর্তী কার্যবিবরণী ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রিল লিখিত হয়। এই কার্য বিবরণীতে সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের মধ্যে লঙের নাম উল্লেখিত আছে এবং লঙ-সঙ্কলিত দেশী সংবাদ-সার অর্থাৎ দেশীয় সাময়িক পত্র থেকে সঙ্কলিত সার কথা প্রকাশ হয়েছে ব'লে উল্লেখ আছে।

লঙ যে সোসাইটির বিশিষ্ট ও সক্রিয় সভ্য ছিলেন তার প্রমাণ অন্য সূত্রেও পাওয়া যায়। ১৮৫৩ সালে সোসাইটির এক নিয়ম হয় যে, কোন গ্রন্থ মুদ্রণের পূর্বে রচিতগ্রন্থ গ্রামের বালকদের বোধগম্য হয়েছে কিনা তা লঙ তাঁর গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সে-গ্রন্থ পাঠ ক'রে নিরূপণ ক'রে সম্মতিসূচক মত দিলে তবে সে গ্রন্থ মুদ্রণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ক'লকাতায় একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনায় রত হন। লঙ সাহেবও এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে ১৮৫৪ সালের ৩১শে মার্চ শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'Society for the Promotion of Industrial Art' (শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা) নামে এক সভা স্থাপিত হয়। দেশী ও বিদেশী সতের জন সভ্য নিয়ে এই সভা গঠিত হয়। পাদরি লঙ ঐ সতের জন সভ্যের অন্যতম ছিলেন এবং উদ্দেশ্য-পত্র রচনা, অর্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি প্রাথমিক কাজের জন্য আট জন সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয় লঙ সে কমিটিরও একজন সদস্য ছিলেন। অতঃপর ১৮৫৪ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ক'লকাতায় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টি কালক্রমে সরকারি শিল্প মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক কলেজের ছাত্র উদ্যোগী হয়ে ১৮৫৭ সালে বড়বাজারে 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব' নামে এক সভা গঠন করেন। লঙ সাহেব এই সভার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহুদিন সভার সভাপতিও ছিলেন। ১৮৭২ সালে এ দেশ থেকে লঙের বিলাত যাবার প্রাক্কালে (২০শে মার্চ) ঐ ক্লাব কর্তৃক তাঁকে এক মানপত্র প্রদত্ত হয়। মানপত্রের উত্তরে তিনি বাঙালী যুবকদের কথার পরিবর্তে কাজে আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দেন। ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবের নবম বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৬৬ সালের ২৭শে এপ্রিল) লঙ "Social Science—its Utility for India" অর্থাৎ 'ভারতের পক্ষে সমাজ-বিজ্ঞানের উপযোগিতা' শীর্ষক এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার সভার (National Association for the cultivation of Social Science in Great Britain) আদর্শে এ দেশে এক সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই প্রস্তাবের

পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে বিলাতের পূর্বোক্ত সমাজ বিজ্ঞান-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিস মেরি কার্পেণ্টার ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে ক'লকাতায় আসায় এখানে এই সভা স্থাপনের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে দেশীবিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির এক সভায় বঙ্গদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার কাজ সাময়িকভাবে পরিচালনার জন্য এক অস্থায়ী কমিটি এবং আইন-কানুন প্রণয়নের জন্যে এক সাবকমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, লঙ উভয় কমিটিরই সদস্য ছিলেন। ১৮৬৭ সালের ২২শে জানুয়ারী মেটকাফ হলে বঙ্গের ছোট লাটের সভাপতিত্বে সাধারণ সভার অধিবেশনে নিয়মাবলী গৃহীত হয়। এই ভাবে প্রধানতঃ লঙ সাহেবের প্রস্তাবে, উৎসাহে ও পরামর্শে এ দেশে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (Bengal Social Science Association) আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার পরবর্তী কাজ-কর্মের সাথে লঙ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

লঙ এ দেশের তদানীন্তন আরও অনেক সভা-সমিতির সাথে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'ক'লকাতা বুক সোসাইটি'র কার্যকরী সমিতির তিনি বহুদিন সদস্য ছিলেন এবং সোসাইটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানা পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার ও বিবেচনার জন্য ১৮৫৯ সালে স্থাপিত 'বেথুন সোসাইটি', কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'গুড ফ্রেটারনিটি সভা', ক'লকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি,' 'রিলিজাস ট্রাষ্ট সোসাইটি', 'ক্রীসচান স্কুল বুক সোসাইটি' প্রভৃতির সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে লঙ অবহিত ছিলেন। তাই তিনি এ দেশের নানাদিকে গ্রন্থাগার স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন। 'ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরি'র লাইব্রেরিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্রকে ১৯৫১ সালে এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ক'লকাতা, আগরপাড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর এবং রত্নপুরে তাঁরা ইংরেজী গ্রন্থাগার এবং ঠাকুরপুকুর, সোলো, চাপরা, বল্লভপুর এবং কাপাসগঙ্গায় বাঙ্‌লা গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। তাঁদের ক'লকাতার বাঙলা লাইব্রেরিতে প্রায় আট শ' বিভিন্ন গ্রন্থ আছে। নতুন বাঙলা বই প্রকাশ হ'লে সেই বই কিনে এই সকল

গ্রন্থাগারে পাঠান হয়। লঙ ক'লকাতার বাঙলা লাইব্রেরি বলতে সম্ভবতঃ ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির লাইব্রেরির কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৫০ সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তরপাড়ার জনহিতৈষী বদান্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সোসাইটিকে তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের সমস্ত বাংলা বই দান করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বাঙ্‌লা গ্রন্থের সংখ্যা লঙের পত্রে উল্লেখিত পত্রের প্রায় অনুরূপ ছিল। লঙের উদ্যোগে সোসাইটির এই বাংলা বই-এর এক ক্যাটালগ তৈরী হ'য়ে মুদ্রিত হয়েছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সোসাইটিকে প্রদত্ত বাঙলা গ্রন্থের এই সংগ্রহ পরে ১৯৬২ সালে আবার সোসাইটি কর্তৃক ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রদত্ত হয়।

লঙ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন—সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। বাঙলা বই সম্বন্ধে সমস্ত খবর তার নখদর্পণে ছিল। সেজন্যে এ দেশে অথবা বিদেশে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের বাঙলা বই ক্রয় বা সংগ্রহের প্রয়োজন হ'লে অথবা বাঙ্‌লা বই সম্পর্কে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে হ'লে সকলে লঙ সাহেবের শরণাপন্ন হতেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। লণ্ডনে অবস্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির জন্য মৌলিক বাংলা গ্রন্থ লঙের নির্দেশে সংগৃহীত হয়েছিল। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক উইলিয়ামসের অনুরোধে সংস্কৃত থেকে অনূদিত বাঙলা বইগুলি লঙ এ দেশ থেকে কিনে অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙলা বই-এর ক্যাটালগ প্রণয়ন লঙের আর এক অপূর্ব কীর্তি। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

লঙ মানবদরদী ছিলেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের দুঃখ তার চিত্তকে ব্যথিত করতো। উনবিংশ শতকে এ দেশে নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবা যে নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালাত লঙ দেশের নানা স্থানে ঘুরে স্বয়ং সে-সকল ঘটনার সন্ধান করেছেন এবং কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেছেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে দীনবন্ধু মিত্র যখন 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা ক'রে নিজ নাম গোপন রেখে ১৮৬০ সালে নীলদর্পণ প্রকাশ করেন তখন দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। এই নাটকের এক ইংরেজী অনুবাদ লিখিত হ'ল। কথিত আছে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক রাত্রের মধ্যে বাঙলা 'নীলদর্পণ' নাটকের

ইংরেজী অনুবাদ করেন। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ লেখক বা অনুবাদকের নাম ছাড়াই পাদরি জে, লঙ লিখিত এক মুখবন্ধ-সহ ক্যালকাটা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং প্রেস থেকে সি, এইচ, ম্যামুয়েল কর্তৃক মুদ্রিত হ'য়ে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী অনুবাদ প্রচারের ফলে এ দেশের শ্বেতাঙ্গ মহলে ও বিলাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নীলকর সাহেবরা গ্রন্থকার বা প্রকাশকের হদিস না পেয়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা'কে মুখপাত্র হিসাবে দাঁড় করিয়ে মানহানিকর কুৎসা প্রচারের অভিযোগে মুদ্রাকর ম্যান্মুয়েল এবং পাদরি লঙের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন।

নির্ভীক ও তেজস্বী লঙ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করায় ম্যানুয়েল নামমাত্র জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেন। বিচারের সময় লঙ জানালেন যে, তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোন কাজ করেন নি, বা কারও কুৎসা প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বিশ বছরের বেশী সময় তিনি ভারতে আছেন। দেশীয় খ্রীষ্টানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত আছেন এবং প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদের মধ্যেই তিনি বাস করেন। এ দেশের লোকের যে মনোভাব দেশীয় সংবাদ পত্রে অথবা দেশীয় ভাষার গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হয় তিনি তা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার চেষ্টা ক'রে আসছেন বহু বর্ষ যাবৎ। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদের প্রকাশ তাঁর সেই কাজেরই অংশস্বরূপ। কিন্তু ভারতীয়-বিদ্বেষী নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ বিচারক স্যর মর্ডাণ্ট লসন ওয়েলস সকল যুক্তিতর্ক উপেক্ষা ক'রে নিতান্ত একদেশদর্শীর মতো মোকদ্দমার একতরফা রায় দিলেন। রায়ে লঙকে কুৎসা প্রচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে তাঁর প্রতি একমাস কারাবাসের ও এক হাজার টাকা জরিমানা দিবার আদেশ দিলেন। সে-সময়ে নীলকরবিদ্বেষ দেশে এত প্রবল হয়েছিল এবং পাদরি লঙ এত জনপ্রিয় ছিলেন যে আদালতের রায় দানের সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার হাজার টাকা জমা দেওয়া হ'য়ে গেল। মহাভারতের বঙ্গানুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা জমা দেন। শোনা যায়—বিচারে লঙের জরিমানা হ'তে পারে অনুমান ক'রে আরও অনেকে টাকা নিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন প্রয়োজন হ'লে

জরিমানার টাকা দিয়ে দেবার জন্যে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ লঙের মোকর্দমার যাবতীয় ব্যয় বহন করেছিলেন।

এই পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের বিরুদ্ধে এ দেশে প্রবল ধিক্কার এবং লঙের প্রতি দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছিল। বিলাতের অনেক সংবাদপত্রেও স্যর মর্ডাণ্ট লসন ওয়েলসের রায়ের তীব্র সমালোচনা হয়। কথিত আছে, লঙ এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তার কারাবাস-কালে প্রতিদিন তার দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা ভারতের গবর্ণর জেনারেলের দর্শন প্রার্থীর সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হ'ত। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ সে-সময়ে একজন কিশোর বালক মাত্র ছিলেন। তিনি জেলে লঙের সাথে তার সাক্ষাতের এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায় লঙের স্ত্রীকে লঙের সাথে জেলে বাস করতে দেওয়া হয়েছিল। লঙের কারামুক্তির দিন জনমত ও জনগণের উল্লাস প্রকাশের জমকাল ব্যবস্থা হয়েছিল।

এবার লঙের গবেষণামূলক কাজকর্মের এবং বাঙলা গ্রন্থপঞ্জীর পথিকৃৎ হিসাবে তৎকৃত কাজের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। এ দেশে আসার পর লঙ এ দেশে বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পাদরীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। তার গবেষণালব্ধ ফল ১৮৪৮ সালে A Hand Book of Bengal Missions in connection with the Church of England নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙলা প্রবাদ সম্বন্ধে তার গবেষণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫১ সালে Bengali Proverbs অর্থাৎ বাঙলা প্রবচন নামে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৯ সালে Prabad Mala or the wit of Bengali Ryots, as shown in their Proverbs প্রকাশিত হয়। বাঙলা প্রবচন, একশ' বছর পূর্বের ক'লকাতার সামাজিক জীবন, বঙ্গদেশের অধিবাসিদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে পাঁচশত প্রশ্ন, ক'লকাতা এবং বম্বের সামাজিক দিক, বঙ্গদেশের নিজস্ব উদ্ভিদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর রচিত মূল্যবান অনেক প্রবন্ধ নানা উচ্চাঙ্গের পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। বাঙলা গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে লঙ প্রথম পথিকৃতের কাজ ক'রে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর অবদানের মূল্য অসীম।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের অনুসন্ধান ও গবেষণার

কাজ এবং উৎসাহ বর্তমান যুগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই সূত্রে দ্রুত তথ্য ও বিবরণাদি সংগ্রহের জন্যে রেফারেন্স বই নামে এক শ্রেণীর বই অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। রেফারেন্স বই নানা শ্রেণীর ও নানা ধরণের আছে। এক এক রকমের অনুসন্ধান কিম্বা গবেষণার কাজের জন্যে এক বা একাধিক রকমের রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে। নানা শ্রেণীর রেফারেন্স গ্রন্থের মধ্যে 'বিবলিওগ্রাফী' বা 'গ্রন্থপঞ্জী' এক উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর রেফারেন্স গ্রন্থ। পণ্ডিত ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, গবেষক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজের জন্যে গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যক হয়। গ্রন্থপঞ্জী বলতে এ যুগে কি ধরণের গ্রন্থকে বোঝায় সে কথা সংক্ষেপে ব'লতে গেলে বলা চলে গ্রন্থের স্থিতিস্থান নির্বিশেষে কোন বিশেষ বিষয়ের বা নানা বিষয়ের অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ-তালিকা। পাদরি লঙ 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী ওয়ার্কস (A Descriptive Catalogue of Bengali Works) নামে চোদ্দ শ' বাঙ্‌লা বই-এর এক তালিকা ১৮৫৫ সালে প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত বই-এর এটি সর্বপ্রথম গ্রন্থপঞ্জী। কাজে কাজেই বাঙলা গ্রন্থপঞ্জী রচনার ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃতের সম্মান লঙ সাহেবের প্রাপ্য।

'বিবলিওগ্রাফি' ও 'ক্যাটালগ' শব্দ দুটির অর্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'বিবলিওগ্রাফি'র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে, 'গ্রন্থপঞ্জী' এবং 'ক্যাটালগে'র প্রতিশব্দ হিসাবে সাধারণতঃ 'গ্রন্থসূচী' কথাটি আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থপঞ্জী কাকে বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ক্যাটালগ বা গ্রন্থসূচী বলতে সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাগার বা গ্রন্থসংগ্রহে রক্ষিত গ্রন্থের তালিকা বোঝায়। উপযুক্ত ভাবে গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থসূচী প্রণয়নের বিজ্ঞানসম্মত অনেক নিয়ম-কানুনও এখন তৈরী হয়েছে। তবে আমাদের দেশে 'বিবলিওগ্রাফি' ও 'ক্যাটালগে'র পার্থক্য সম্বন্ধে অনেকেই এখনও সচেতন নন। সেজন্যে কথা দু'টির একই অর্থে ব্যবহারের চলন এখনও আছে। সে-যুগে লঙ সাহেবও এই পার্থক্য মেনে চলেন নি। তাই তাঁর রচিত বাঙলা বই-এর গ্রন্থপঞ্জীকে তিনি ক্যাটালগ নামেই অভিহিত করেছেন। ক্যাটালগ কথাটি ইংরেজী শব্দ হ'লেও কথাটি এ দেশে বহু দিন যাবৎই প্রচলিত আছে এবং সহজে বোধগম্য ও সহজে উচ্চারিত হ'য়ে

আসছে। তা' ছাড়া, লঙ তাঁর গ্রন্থের নামকরণেও 'ক্যাটালগ' শব্দই ব্যবহার ক'রেছেন। এই সকল কারণে, বর্তমান প্রবন্ধে লঙের এই গ্রন্থের উল্লেখ কালে গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থসূচী না বলে 'ক্যাটালগ' কথাটি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।

এবার লঙের 'ক্যাটালগে'র কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। এই ক্যাটালগের সর্বপ্রথমে আছে আখ্যা পত্র বা নাম-পত্র। তৎপরে মুখবন্ধ। মুখবন্ধের পর গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত শব্দাদির সংকোচ চিহ্ন ও ঐ চিহ্নের অর্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ক্যাটালগের মূল অংশের বিষয়ানুসারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গ্রন্থতালিকা দেওয়া হয়েছে। প্রতি শ্রেণী বা উপশ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক ভাবে গ্রন্থগুলি সাজান আছে।

গ্রন্থের নামপত্রে গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ্ বেঙ্গলী ওয়ার্কস' অর্থাৎ বাঙলা বই-এর এক বর্ণনাত্মক গ্রন্থপঞ্জী। নামের পরে কিছু ব্যাখ্যাত্মক অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এই সংযোজনাংশে বলা হয়েছে যে, গত ষাট বছর যাবৎ যে চোদ্দ শত বই বা পুস্তিকা ছাপাখানা থেকে বার হয়েছে তার এক শ্রেণীবদ্ধ তালিকা এই ক্যাটালগে সন্নিবেশিত এবং মধ্যে মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য, গ্রন্থের মূল্য এবং কোথায় মুদ্রিত সে সংবাদ যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার হিসাবে ক'লকাতার জে, লঙের নাম উল্লেখ আছে। ক্যাটালগটি ৬৫ কাশীটোলার স্যাণ্ডার্স কোন্স্ এণ্ড কো. কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত ব'লে লেখা আছে। আনুষঙ্গিকভাবে বাঙলায় মুদ্রিত গ্রন্থের গোড়ার কথায় এবার একটু আসা যাক।

আমাদের দেশে মুদ্রিত বাঙলা বই-এর ইতিহাসের বয়স দু'শ বছরের কম। মুদ্রিত বইতে বাঙলা অক্ষর সর্বপ্রথম এ দেশে ব্যবহৃত হয় ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড সাহেবের ইংরেজীতে লেখা বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ বইতে। ঐ বইয়ের নাম 'এ গ্রামার অফ্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। বইটি হুগলিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই বইতে বাঙলা অক্ষর, শব্দ বা বাক্যের উদাহরণ দিতে কিছু কিছু বাঙলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাঙলা অক্ষর সম্বলিত অথবা বাঙলায় মুদ্রিত মাত্র অল্প কয়েকখানা বই প্রকাশিত হয়। কার্যতঃ, শ্রীরামপুর

মিশনের মুদ্রাযন্ত্র কার্যকরী হবার পর এবং ১৮০০ সালে ক'লকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর অধিক সংখ্যায় বাঙলা বই প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে। লঙ ১৮৫৫ সালে তাঁর ক্যাটালগে জানাচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যাট বছরে প্রকাশিত বাঙলা বই তাঁর ক্যাটালগে সন্নিবেশিত হয়েছে। তা' হ'লে কার্যতঃ মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থের প্রায় শুরু থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ এই ক্যাটালগের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ব'লে মনে করা যেতে পারে।

লঙের ক্যাটালগের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যাঁরা শিক্ষা-বিষয়ক উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দুদের রীতি, প্রথা বা চিন্তাধারার সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে বই সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাঁদের সাহায্য করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কারণ, জনপ্রিয় সাহিত্য থেকে জনমনের হদিস মেলে। এখানে আরও বলা হয়েছে বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে, কি করা হচ্ছে এবং কি করা উচিত তা' দেখাবার জন্যে এ পর্যন্ত বাঙলা বই-এর কোন তালিকা প্রণীত হয়নি। (এই ক্যাটালগ দেখে) দেশীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁদের মাতৃভাষায় সাহিত্যের তুলনামূলক ভাবে দৈন্য অথবা প্রাচুর্যের ক্ষেত্র লক্ষ্য ক'রে তাঁদের সামনে অনুবাদ অথবা মূল রচনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে চোদ্দ শ'-এর মত গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটির সম্বন্ধে মন্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত হ'তে বাধ্য। যে সকল বই পাওয়া যায় এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারের উপযুক্ত সেগুলিকে তাঁদের নামের আগে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলি রোজারিও এণ্ড কো অথবা হে এণ্ড কোর কাছ থেকে নায্য মূল্যে ক্রয় করা যাবে। বাবু জয়কিষণ মুখার্জীর বদান্যতায় পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি দেশীয় ভাষার গ্রন্থসংগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। ক্যাটালগে বর্ণিত বই-এর অধিকাংশ সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে।

শতাধিক বছর পূর্বে প্রকাশিত এই ক্যাটালগের সাহায্যে বর্তমানকালে গ্রন্থ সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ ক্যাটালগ প্রণয়নকালে যে-সব বই সহজে পাওয়া যেত এবং জনগণের মধ্যে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়েছিল তালিকায় চোদ্দ শ বই-এর মধ্যে তাদের সংখ্যা সে-সময়েই ছিল পাঁচশ'রও কম (৪৮৮)। ক্যাটালগের অন্তর্ভূক্ত বইগুলির মধ্যে মাত্র চারশ'অষ্টাশিখানা গ্রন্থই সংখ্যা দ্বারা

চিহ্নিত হয়েছিল। বর্তমান কালে বাঙলা সাহিত্যের পরিধি সে যুগ অপেক্ষা বহু গুণ বেড়েছে। কাজেই এই ক্যাটালগের সাহায্যে অনুবাদ গ্রন্থ অথবা মূল গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনের ক্ষেত্রও বর্তমানে আর নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ক্যাটালগের মুখবন্ধে এই গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য বা উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা' যখন এখন এর দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় তখন ঐ ক্যাটালগের কি আর কোন মূল্য নেই? এ প্রশ্নের জবাব কখনও নেতিবাচক হ'তে পারে না। বাঙলা ভাষার গ্রন্থের পূর্ব যুগের দুর্লভ একখানা রেফারেন্স বই হিসাবে এবং বাঙলা বই-এর প্রাচীনতম গ্রন্থপঞ্জীর নিদর্শন হিসাবে চিরদিনই এর যথেষ্ট মূল্য থাকবে। তা ছা'ড়া, লঙ মুখবন্ধে অন্য যে কথা বলেছেন অর্থাৎ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে কোন যুগের জনমনের সন্ধান পাওয়া এবং দেশের রীতি, প্রথা বা চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়া যায় সে কথার সত্যতা চিরদিন থাকবে। কি ধরণের বই সে-যুগে প্রকাশিত হয়েছিল তা' বুঝতে হ'লে এবং ঐ সকল বই-এর বিবরণ বিশ্লেষণে সে যুগে এ দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা দিকের অবস্থা কেমন ছিল তা' জানা যাবে। কাজেই গবেষকদের পক্ষে এই ক্যাটালগের মূল্য প্রভূত। বিশেষত বাঙলা গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও ক্যাটালগটি আলাকপাত করে। সে-দিক দিয়েও ক্যাটালগটি মূল্যবান।

ক্যাটালগের মুখবন্ধের পর সংক্ষেপিত যে অক্ষরগুলি দেওয়া হয়েছে সে গুলি প্রধানতঃ ছাপাখানা বা প্রকাশকের পুরা নামের সংক্ষেপিত সঙ্কেত। কোন্ বই কাদের দ্বারা মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা' বোঝাবার জন্যে ক্যাটালগের প্রধান অংশে যেখানে বই-এর নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানে বই-এর নামের সাথে ঐই সংক্ষেপিত চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সংক্ষেপিত চিহ্নের পুরা অর্থ বুঝতে স্মবিধা হবে ব'লে মুখবন্ধের পরে এগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষেপিত সঙ্কেত চিহ্নের মধ্যে ছাপাখানা ও প্রকাশকের নাম ছাড়া কোন বই ইংরেজী, ফারশী, বা সংস্কৃত বই-এর অনুবাদ হ'লে তা বুঝাবার জন্যে, গ্রন্থে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষার একত্র সমাবেশ থাকলে তা জানাবার জন্যে এবং বই-এর মূল্য জানাতে টাকা আনা ইত্যাদি ব্যবহৃত চিহ্নগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

ক্যাটালগের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত তালিকাকে গ্রন্থের বিষয় হিসাবে মূল তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শিক্ষা বিষয়ক (Education) (২) সাহিত্য বিষয়ক এবং বিবিধ (Literary and Miscellaneous) এবং (৩) ব্রহ্মবিদ্যাগত (Theological)। শিক্ষা বিষয়ক অংশটিকে পাটিগণিত, অভিধান, নীতিশাস্ত্র, নৈতিক উপাখ্যান, ভূগোল বিদ্যা, জ্যামিতি, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, পরিমিতি, তত্ত্ববিদ্যা, জীবনতত্ত্ব, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিদ্যালয়পদ্ধতি, বানানের পাঠ বা বানান শিক্ষা এবং পাঠ্য পুস্তক—এই ক'টি উপরিভাগ করা হয়েছে।

সাহিত্য বিষয়ক এবং বিবিধ শীর্ষক ভাগটিতে আইন, সাময়িক পত্র, পত্রিকা, বিশ্বকোষ, সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি, সংবাদ পত্র, কবিতা, নাটক, জনপ্রিয় সঙ্গীত, উপাখ্যান এবং বিবিধ এই ক'টি উপরিভাগ করা হয়েছে।

ব্রহ্মবিদ্যাগত শীর্ষক ভাগটিকে শ্রীরামপুরের এবং সেকালের (খ্রীষ্টীয়) গবেষণামূলক মুদ্রিত পুস্তকাদি, পরবর্তীকালের (খ্রীষ্টীয়) গবেষণামূলক পুস্তিকাদি ও নিঃশেষিত মুদ্রিত পুস্তিকাদি, ট্রাষ্ট সোসাইটির গবেষণামূলক পুস্তিকাদি, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৌরাণিক গ্রন্থ, শৈব গ্রন্থ, বৈষ্ণব (গ্রন্থ) এবং বেদান্তিক গ্রন্থ—এই আটটি উপরিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

মোট তেত্রিশটি উপরিভাগে চোদ্দ শত গ্রন্থাদির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র তালিকাটির প্রায় এক পঞ্চমাংশ ভাগ ব্রহ্মবিদ্যাগত বিষয়ের গ্রন্থাদির উল্লেখের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তার চাইতেও বেশী স্থান লেগেছে দ্বিতীয় বিষয়টির জন্যে অর্থাৎ সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের জন্যে। এই দ্বিতীয় বিষয়ের জন্যে ক্যাটালগে যতটা স্থান লেগেছে তার মাত্র তিন চতুর্থাংশ স্থান ব্রহ্মবিদ্যাগত বিষয়ক গ্রন্থাদির তালিকার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। সব চাইতে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাদির তালিকার জন্যে। ব্রহ্মবিদ্যাগত বিষয়ের গ্রন্থাদির তালিকার জন্যে যে পরিমাণ স্থান প্রয়োজন হয়েছে তার পুরা আড়াই গুণ স্থান প্রয়োজন হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাদির নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে।

ক্যাটালগটি বাঙলা বই-এর হ'লেও সমগ্র বইটি ইংরেজীতে লেখা এবং ইংরেজী অক্ষরে লেখা বাঙলা বই-এর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র ক্যাটালগের মধ্যে কোথাও একটিও বাঙলা অক্ষরের অস্তিত্ব নেই।

এই ক্যাটালগের দ্বারা বিদেশীদের সাহায্য হবে—লঙের এই উদ্দেশ্য এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। মূল তিনটি বিষয়ের প্রতিটি উপবিভাগে যে-সব বই-এর নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলি সাধারণতঃ লেখকের নামের ইংরেজী বানানের বর্ণানুক্রমে। অবশ্য যথেষ্ট ব্যতিক্রমও আছে। তালিকায় অন্তর্ভূক্তি কালে বাঙালী লেখকের বংশগত উপাধির পরিবর্তে ব্যক্তিগত নামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, সংস্করণ সংখ্যা, প্রকাশ কাল, প্রকাশক অথবা মুদ্রকের নাম, মূল্য, কত সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে, গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সূচী, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ, অনুবাদকের নাম, গ্রন্থের বর্ণনাত্মক বিবরণ ইত্যাদি দফাগুলি অল্প বিস্তর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে এ-সম্বন্ধে সব সময়ে নিয়মকানুনের বা পদ্ধতির সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। এ ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সময়ে এই ক্যাটালগ রচিত হয় তখন এ দেশে এ ধরণের রেফারেন্স বই প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক বা নিয়মকানুন সৃষ্টি হয়নি বা দানা বেঁধে ওঠেনি। কাজেই, আজকের দিনের আঙ্গিক বা নিয়মকানুনের মাপকাঠিতে এই ক্যাটালগের বিচার করা সঙ্গত কাজ হবেনা। বাঙলা গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে এটি তো প্রথম পুস্তক, সে কথাও মনে রাখতে হবে। বিচার-বিশ্লেষণে কিছু কিছু ত্রুটি বা অসঙ্গতি প্রকাশ পেলেও এবং আর একটু সতর্ক হলে ঐ সকল ত্রুটিটা বা অসঙ্গতির অনেকটা দূর করা সম্ভব ছিল ব'লে বিবেচিত হ'লেও বাঙলা গ্রন্থপঞ্জীর পথিকৃৎ হিসাবে এবং তখনকার দিনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা দুরূহ ও অশেষ শ্রমসাধ্য কাজ লঙ সাহেব যে অনেকটা সুষ্ঠু, সহজ ও সুন্দর ভাবে সমাধা করেছিলেন একথা স্বীকার করতে হয়। সে যুগে বিদেশীরাও বাঙলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁদের অবদানও যে প্রচুর ছিল লঙ সাহেবের ক্যাটালগ দৃষ্টে তা' সহজেই বুঝতে পারা যায়। ১৮৫৫ সালে, লঙ মুদ্রিত গ্রন্থের গ্রন্থকার অথবা অনুবাদক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট—এ রকম পাঁচশ' পনের জন লোকের নাম ও লেখা এবং ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত যে সকল বাংলা সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র মুদ্রিত হয়েছে তার এক বিবরণ প্রস্তুত

ক'রে বঙ্গীয় সরকারের কাছে প্রদান করেন। সরকার কর্তৃক ঐ বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিবরণে উল্লেখিত পাঁচশ পনের জনের মধ্যে প্রায় আশি জন ছিলেন বিদেশী। ঐ বিবরণে নিরানব্বইটি পত্র-পত্রিকার নামোল্লেখ আছে। গ্রন্থগুলির বেলায় গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখ আছে। আর পত্র-পত্রিকার বেলায় পত্র-পত্রিকার নাম, প্রথম প্রকাশ কাল, কতদিন প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদকদের নাম এবং মাসিক মূল্যের উল্লেখ আছে।

লঙ ১৮৭২ সালে চিরতরে ভারত ত্যাগ ক'রে লণ্ডনে গিয়ে জীবনের অবশিষ্টকাল সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু সেখানেও ভারত সম্বন্ধে তাঁর সারা জীবনের মনোযোগ অব্যাহত থাকে। যে-সকল ভারতীয় লণ্ডনে যেতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ভারতবন্ধু পাদরি লঙের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে তাঁর সাথে অবশ্যই দেখা করতেন। তিনিও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের সাথে ভারত সম্পর্কে নানা বিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করতেন। রেভারেণ্ড জেমস লঙ ১৮৮৭ সালের ২৩শে মার্চ তিয়াত্তর বছর বয়সে লণ্ডনে (৩নং এ্যাডাম ষ্ট্রীট, এ্যাডেলফিতে) দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি প্রাচ্যের ধর্মসমূহের বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটির কাছে দু'হাজার পাউণ্ড দান করে যান।

রেভারেণ্ড জেমস লঙ বহু পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে।

পুস্তক ও পুস্তিকা

1. A Handbook of Bengal Missions in connection with the Church of England, 1848.

2. Bengali Proverbs, 1851

3. Notes of a Tour from Calcutta to Delhi, 1853.

4. What may be done : a tract for persons engaged in Education, 1854.

5. A Descriptive catalogue of Bengali works containing a classified List of fourteen hundred Bengali Books and Pamphlets—1855.

6. Notes and queries suggested by a visit of Orissa, 1859.

7 Central Asia and British India, 1865.

8. Kirlof's Fables translated from Russian, 1869.

9. Prabad Mala or the wit of Bengali Ryots as shown in their Proverbs, 1869.

10. Scripture Truths in Oriental Dress, 1872.

11. The Eastern question in its Bangla-Indian aspect, 1877.

12. Eastern Proverbs and Emblems illustrating Truths, 1881.

13. Christian Instructor

14. Questions of Natural History

15 Life of Mahomed

16. Bengali Etymology

17. Selections from the Native Press

প্রবন্ধাদি

1. Analysis of the Bengali Poem Rajmala, or Chronicles of Tripura (Journal of Asiatic Society of Bengal 1850 ; XIX, 533 – 57)

2. Analysis of Raghu Vansa, a Sanskrit Poem of Kalidasa (Journal of Asiatic Society of Bengal, 1852 ; XXI, 445—72)

3. A Return of the Names and writings of 515 persons connected with Bengali literature, either as Authors or Translators of Printed works, and a Catalogue of Bengali Newspapers and periodicals which have issued from the Press from the year 1818 to 1855 (Selections from the records of the Bengal Govt. 1855, No. XXII)

4. Returns relating to the Bengali Language in 1857 with a list of the native Presses, the Books Printed, their price and character with a Notice of the condition of the Vernacular Press of Bengal and Statistics of the Bombay and Madras Presses (selections from the Records of the Bengal Govt. 1859 ; No. XXXII)

5. The Indigenous Plants of Bengal with Notes on peculiarities in their structure, functions, uses in Medicine, Domestic life, Arts and Agriculture, (Journal of India Agricultural Society, 1857, IX, 398-424 ; 1859, X, 1—43, 338—64 ; XI, 48—73)

6. Five hundred Questions on the social condition of Natives of Bengal (Journal of Royal Asiatic Society, 1866, II, 44—84)

7. Popular Bengali Proverbs illustrating the social condition and opinion of tbe Ryots, working classes, and women of Bengal, (Transac. of Bengal Social Science Association, 1868, pt. II, 187—211)

9. Calcutta and Bombay in their Social Aspects. (Transc. of Bengal Social Science Association 1870, 9—83)

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৬ : দীনেশচন্দ্র সেন

২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা; নূতন সংস্করণ, ১৯৬৩ : যোগেশচন্দ্র বাগল।

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ; নিউ এজ সংস্করণ, ১৩৬২ : শিবনাথ শাস্ত্রী।

৪। বঙ্গ সংস্কৃতির কথা ; ১৯৭১ : যোগেশচন্দ্র বাগল

৫। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৮১৮—১৮৬৭ ; ১৩৫৯ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। Selected Papers: Rev. James Long. Edited with an Introduction and Explanatory Notes by Mahadev Prosad Saha, 1965.

৭। Nildurpan or the Indigo Planting Mirror written by Dinabandhu Mitre and translated by Michael Madhusudan Dutt; Edited by Sudhi Pradhan in collaboration with Sri Sailesh Sen Gupta. N. Ed.

৮। A Return of the Names and writings of 515 persons connected with Bengali literature, either as Authors or Translators of Printed works, chiefly during that last fifty years and a Catalogue of Bengali Newspapers and periodicals which have issued from the press from the year 1818 to 1855; submitted to the Government by the Rev. J. Long, 1855.

৯। The Dictionary of National Biography, Vol. XII, 1963–64.

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বিদ্যাসাগর

(যোগেশচন্দ্রের লেখনী মুখে)

পূর্ণেন্দু বসু

খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। পরাধীন ও অবনত ভারত সকল বিষয়ে নবচেতনা লাভ করিয়া এই সময়েই জাগিয়া উঠিয়াছে। রামমোহন রায় প্রথম জাতির ঘুম ভাঙাইয়াছেন। কেবল উপলব্ধি নয়—বিশ্লেষণ, বিচার, যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানচর্চা চলিতে লাগিল। পাশ্চাত্যজাতির প্রভাব আমাদের জীবনে আসিল। ইহাকে বিজাতীয় বলিয়া অবজ্ঞা করিবার কিছু নাই। আমাদের যাহা ভাল তাহা বিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্যের ভাল গুণ আমরা লাভ করিতে চাহি নাই। দুইয়ের সম্মিলনেই জীবনকে নূতন করিয়া গড়িতে আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। রামমোহনের পর বঙ্গভূমিতে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। খ্রীঃ ১৮২০ হইতে ১৮৯১ তাঁহার জীবন কাল। উনবিংশ শতাব্দীর মানসিক প্রস্তুতি বিংশ শতাব্দীকে বাহুবল আনিয়া দিয়াছে। এই প্রস্তুতি-পর্বের অন্যতম কাণ্ডারী বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনটাই তাঁহার কার্য। ভাষান্তরে, অবিরাম কার্যই তাঁহার জীবন। কিরূপে জাতির শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হইল, এ দেশে নূতন শিক্ষাধারা উড়িয়া উঠিল, সমাজের কুসংস্কারের বাধা অপসারিত হইল, নারীর স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার ইতিহাস মূলতঃ বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করিয়াই। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা অচিরেই নবযুগের চালককে আমাদের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দ অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করিলেন, মানুষ তৈরীর মহাযজ্ঞ সুরু হইল। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতার বুকে অনেক প্রতিষ্ঠান, অনেক শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। স্বদেশ সেবার এই কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনুধাবন করিলে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চিত্রটি সহজে অনুভব করা যাইবে।

নবজাগরণের ঢেউটি বঙ্গদেশ হইতেই ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজগণ এ দেশে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। বৃটীশ পার্লামেণ্টে মধ্যে মধ্যে ভারতের অগ্রগতি বা প্রশাসন বিষয়ে বিবরণ

উপস্থাপন-কালে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অবাধ অধিকারের সুবন্দোবস্ত হইল। পাদ্রীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেও এ-দেশের উপযোগী লোকশিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ তৎপর হন।

পাদ্রী ও তদীয় পত্নীবর্গের আনুকূল্যে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইল। নির্যাতিত দেশবাসী আত্মসচেতন হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ নারীসমাজে সতর্কতার বিধি-বন্ধন অধিকতর হইল। ফলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সামায়িক ভাবে রুদ্ধ হয়। বিদ্যালয় স্থাপন কার্যেও তথাকথিত রক্ষণশীলতা দেখা দিল। তবু কিছু সুপণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় কার্য অগ্রসর হইতে থাকে। রামমোহনের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কার্য বিদ্যাসাগরকে অতি সহজেই প্রভাবিত করিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় হইতেই এ দেশে ইংরেজীর যথাযথ পঠন-পাঠন সুরু হয়।

এই সময় রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের অনুশীলনে বিশেষ তৎপর হন। জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন হইল। ঐ বৎসরই স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলে পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্যোগ হইতে লাগিল। মধ্যে সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। ১৮২৮-এ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসভা উদার ধর্ম প্রসারে মনোযোগী হয়। ১৮২৯-এ ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারক আইন পাশ করেন। হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে নব্যচিন্তাধারা প্রবর্তিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স এই সময় মাত্র দশ বৎসর। ১৮০০ খ্রীঃ-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনও বাংলাগদ্যের ব্যাপক অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করে। মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্যসমৃদ্ধির যে উদ্যোগ হইতে লাগিল তাহা সহজেই নব প্রেরণা আনিল জাতির চিত্তে। মিশনরি ও দেশীয় পণ্ডিতগণও পত্র-পত্রিকায় বাংলাভাষায় বিবিধ জ্ঞানানুশীলনের কর্মকাণ্ড সুরু করেন। বালক বিদ্যাসাগরের মনে মাতৃভাষার দৈন্য 'বড়ো বেদনা' সঞ্চার করিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন মাতৃভাষার উন্নতি করিতে না পারিলে জাতি কোনমতেই মুক্ত দীপ্ত জীবন লাভ করিতে পারিবে না। আর জাতি সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে না পারিলে স্বদেশ বলিয়া গর্বের কিছুই থাকিবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র জাতিকে সংস্কারমুক্ত ও জ্ঞান গরিমায় বলিষ্ঠ দেখিতে চাহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—ঈশ্বরচন্দ্র বৃটীশ শাসক বলিয়া তাঁহাকে নির্মূল করিবার মনোভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। বরং ইংরেজের শিক্ষা-প্রসার ও সংস্কার—এবংবিধ কাজের সহায় হইয়াছেন। মুক্ত মন লইয়া বীরসিংহের সিংহ এইরূপে বঙ্গের স্থায়ী শান্তি-সুখ প্রতিষ্ঠায় ও সর্ববিধ উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া উঠিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের একটি মুখ্য পর্বে বিদ্যাসাগরের আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত। শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, সুবলচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে অল্প পরিসরে অনেক বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সেবায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের কথাও বিনয় ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রনাথের রচনায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষ বিদ্যাসাগরের পূর্ণ চিত্র রূপায়িত। মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর জাতির চিত্তে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও বিচার-বিশ্লেষণ চলিতেছে। অনেক অপ্রকাশিত বিষয়ও উদ্ঘাটিত হইতেছে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের কথা যতই আবিষ্কৃত হইবে ততই এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী নিত্য নূতনরূপে পৃথকভাবে গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিবেন। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগলকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে বক্তৃতা দিতে হয়। পাঁচটি বক্তৃতায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি যাহা বলেন তাহাই গ্রন্থাকারে "বিদ্যাসাগর-পরিচয়" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা সংস্কারে (সংস্কৃত ও বাংলা) বিদ্যাসাগর, শিক্ষা বিস্তারে (স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা) বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধনায় (সংস্কৃত ও বাংলা) বিদ্যাসাগর, সমাজহিতে (সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সেবা) বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর আলোচনা গুলি যেমন তথ্যভিত্তিক, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়াছে এই সব তথ্যভিত্তিক আলোচনায়। বৃটীশ শাসক-গোষ্ঠীর ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-জীবনের অনেক চিত্রও এই সকল রচনায় উদ্ঘাটিত। গ্রন্থের আরম্ভে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ও সমসাময়িক

বঙ্গের পরিচয় সন্নিবেশিত। ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব ও যৌবনের মানসিকতার ক্রম বিকাশের ধারাটি সম্যক্ উপলব্ধির জন্য সমসাময়িক বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবস্থাটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে হয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতর ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষ" পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। প্রায় মেরুদণ্ডহীন জাতির মধ্যে মেরুদণ্ড সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব এক দুর্লভ ব্যাপার। নবম বৎসর বয়সে পিতার সহিত তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৮২৯, ১ জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। "সুতরাং সাধারণ ভাবে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে জানিয়া রাখা আবশ্যক।" সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঠন-পাঠন এবং বঙ্গভাষা অনুশীলনের বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ লোকশিক্ষার আয়োজনে বিদেশীয়দের দান যে অনেকখানি তাহা স্বীকার করিতে হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য পাদ্রীদের স্ত্রীগণ এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের স্ত্রী-কন্যারা উৎসাহী ছিলেন। দেশীয় পণ্ডিত গুণী রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ রায় প্রভৃতির দানও এ ক্ষেত্রে স্মরনীয়।

লোকশিক্ষা প্রসারের কথা—তাহার বাধা-বিপত্তি, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের প্রযত্নগুলি যোগেশচন্দ্র স্বল্প পরিসরে সহজ কথায় বিবৃত করিয়াছেন। "লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ নিবারক আইন বিধিবদ্ধ হওয়া" (১৮২৯) এক স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পঁচিশ বৎসর পর বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রবর্তিত হইল। ১৮২৮-এ রামমোহন রায় "ব্রহ্ম সভা" নামে স্বদেশীয় একেশ্বরবাদী ধর্ম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার কারণ ও এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বিষয়ে যোগেশচন্দ্র সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এক অংশ উদ্ধৃত করি—"তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইউরোপীয় মূলধন এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে এদেশীয় প্রচেষ্টার সম্মিলন হওয়া আবশ্যক।" স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ভাবনা যেমন দেখা দিল, তেমনি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার মনও নব্য যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়াছে। তাই পরবর্তীকালে

শিক্ষা সংস্কার ও প্রসার কার্যে বিদ্যাসাগর যে অগ্রসর হইবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। বঙ্গভাষার দৈন্যদশায় রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরও বেদনা অনুভব করিতেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি বিধানে এই কারণে তিনি তৎপর হন।

শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে আলোচনাকে যোগেশচন্দ্র দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) সংস্কৃত শিক্ষা ও (২) বাংলা শিক্ষা। সংস্কৃত শিক্ষা আলোচনায় রেনেসাঁস প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্রের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"আমাদের ভিতরে সত্য শাশ্বত চিরন্তন যাহা ছিল, এবং যাহা একদিন চর্চার অভাবে বিলুপ্ত বা প্রায়-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার, পুনঃ প্রচার এবং তাহার দ্বারা সর্ববিধ জাতীয় শক্তির বিকাশ। * * * * একথা সত্য বটে, পশ্চিমের সংস্রবে আসার সঙ্গেই গত শতাব্দীতে বঙ্গ দেশে রেনেসাঁস সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু কোন্ বিশেষ শাসন-নীতি বা শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে বলা যায়না।"

পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নব আলোক এ দেশে ছড়াইয়া পড়িল তাহাতে নবজাগরণ ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের উপযোগী নব আলোক কেবল মাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব নয়। "প্রথম প্রচারিত বন তপোবনের" জ্ঞান-ধর্ম যাহা আমাদের মাটিতেই ছিল তাহা নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে জাতির সার্থক সমৃদ্ধি সাধনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন কয়েকজন গুণী। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই কারণে বিশেষ ভাবে অনুভূত হইল। বিদ্যা-সাগরের চেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত উন্নত হয়। সংস্কৃত কলেজে কর্মরত বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতা ইংরেজ কর্ণধারগণকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে। তাই তাঁহারা শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারের কর্মোদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্রের মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। সংস্কৃত-আরবী- ফারসী এবং দেশীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক চর্চার পথ খুলিয়া গেল।

ডাঃ হেমান উইলসন ও ডিরোজিওর শিক্ষায় কেবল বিদ্যাশিক্ষা নয়, স্বদেশ ও সমাজের উন্নতির প্রতি ছাত্রদের প্রযত্নও গড়িয়া উঠিল। এই সময় সংস্কৃতের দ্বার সকল বর্ণের মানুষের জন্য প্রথম উন্মোচিত হইল। সরকার পরিচালিত সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষার গণ্ডী হইতে প্রথমে হিন্দু

কলেজ এবং পরে ঢাকা, কৃষ্ণনগর, হুগলী ও পাটনায় সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। দেশীয় সুধীবর্গের প্রচেষ্টায় প্রাচ্য বিদ্যার সঞ্জীবন ঘটিল সত্য, কিন্তু রেনেসাঁসের পূর্ণতা আসিলনা। এই পূর্ণতায় পৌছাইতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনেকখানি। যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এমনটি কখনই হইত না। যাহা হউক, বিলম্বিত হইলেও বিধাতা যেন ইহার জন্য সংস্কৃত বিদ্যার সুপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আসন্ন বিপত্তির হস্ত হইতে জাতিতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্যন্তিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।"

বিদ্যাসাগরের কর্মধারা অনুশীলন করিলে অনুভব করা যায় তাঁহার মন প্রাণ জাতির সেবায় সমর্পিত ছিল। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার মহাভারতের বঙ্গানুবাদের কার্যক্রম উল্লেখ করা চলে। অনুবাদের কার্যে হাত দিবার পর যখন শুনিলেন যে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই কার্য আরম্ভ করিয়াছেন তখনই তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া নিজে অনুবাদ কার্য হইতে বিরত হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের পূর্ণতা আনিতেই ঈশ্বরচন্দ্র যেন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—যোগেশচন্দ্রের এই মন্তব্যেই বিদ্যাসাগরকে যথার্থ অনুধ্যানের দিকটি পরিস্ফুট। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কালে পঠন-পাঠনের আমূল সংস্কার সাধনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সম্পাদক রসময় দত্তের সহিত তাঁহার মতান্তরের বিষয়-ও সুবিদিত। মার্শালের অনুরোধে বিদ্যাসাগর এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান রূপে কাজ করেন। শিক্ষাসমাজের সম্পাদক ডঃ এফ. জে. মৌএট এবং সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মৌএট তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সংস্কারের সুযোগ লাভ করিলেন (১৮৫১, ২২ জানুয়ারী)। এই কলেজের সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট শিক্ষাসমাজ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ১৮৫১-৫৩ সময়-পর্বের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কারের কার্যে অনেকদূর অগ্রসর হইলেন। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হইয়াছে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষ প্রণীত পুস্তকাদিতে)।

কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যেরূপ পরিবর্তন তিনি আনিলেন, পঠন-পাঠনের বিষয়েরও তিনি সেইরূপ সংস্কার সাধন করিলেন। অল্প সময়ে যাহাতে সহজে শিক্ষালাভ করা যায়—তদুপযোগী পাঠক্রম রচিত হইল। ইংরেজী ও সংস্কৃতের মধ্যে সংস্কৃতের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে সংস্কৃত ভাষা সহজে শিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমনিকা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী রচনা করেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থও তৎকর্তৃক সম্পাদিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা কঠিন।

১৮৫৪ সনে ফ্রেডারিক হ্যালিডে বঙ্গপ্রদেশের গভর্ণর হইয়া আসেন। বাংলা ভাষাশিক্ষা-সংস্কারের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাহিলে বিদ্যাসাগর সানন্দে তাহাতে সাড়া দেন। ইংরেজীর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা প্রতিরোধ করিতে তখন অনেকেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে থাকেন। ক্রমে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহু পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইল। সংস্কৃত শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া ছাত্রগণ যাহাতে মাতৃভাষায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন ও তাহার মাধ্যমে দেশে সংস্কারমুক্ত আদর্শ শিক্ষাদান করিতে পারেন তাহা দেখা আবশ্যক বলিয়া তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগী হন। কিশোর উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। পরবর্তী কালে এই সকল বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের দান যেরূপ, শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁহার উদ্যম স্মরণীয়। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও ইংরেজীশিক্ষা প্রসারে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন "জন-জাগরণ, জন-অভ্যুত্থান, জন-উন্নয়ন —সমগ্র মানবসমাজের জন্য, কোন এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নহে, শুধু পুরুষের নহে, নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর, সম্প্রদায় বা জাতি নির্বিশেষে।" সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যিনি শিক্ষা প্রসারে তৎপর হইয়াছেন তিনি যে এক মহাবিপ্লব আনিতে ছুটিয়াছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ ও তৎকালীন আরও কিছু গুণীর সাহচর্যে বিদ্যাসাগর দ্রুত এই মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৫-এ

নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়। প্রথমে উত্তরপাড়া ও বারাসতে, তার পরে কলিকাতায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হয়। কিছু সংখ্যক্ রক্ষণশীল হিন্দুর বিরোধিতার সম্মুখীনও তাঁহাকে হইতে হয়। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের কর্মোদ্যোগ ও আর্থিক সাহায্য চির স্মরণীয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিলে এ দেশে জ্ঞানচর্চার প্রকৃত পরিবেশ গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষাও সফল হইবে। অর্থাৎ স্বদেশে স্বাধীন চিন্তা-ধ্যান-ধারণা গড়িয়া উঠিবে। মিশনরিগণের শিক্ষা ব্যবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পীড়ন হইতে মুক্তি লাভের জন্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, ইণ্ডিয়ান একাডেমি, হেয়ার স্কুল প্রভৃতি বে-সরকারী অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মেট্রোপলিটান (পূর্বনাম—কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল) স্কুল কালে কলেজে পরিণত হয়। এ দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি যখন বিরূপ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে তখন বিদ্যাসাগর দেশের জ্ঞানীগুণীদের এই কলেজে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান করিয়া আনেন। এই প্রতিষ্ঠান ছিল বিদ্যাসাগরের প্রাণ। নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি বিদ্যাসাগর কিরূপ কঠোর ছিলেন তাহার বিবরণ পাঠে আমরা পরম আনন্দ অনুভব করি। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষা-ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিতে চাহিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের প্রযত্ন ছিল। ডঃ মৌএট সম্ভবতঃ রামগোপাল ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রস্তাব শিক্ষা সমাজের নিকট পাঠান। কলিকাতা ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৮৫৬—তে যে উপ-সমিতি গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের-ও একজন ফেলো সদস্য ছিলেন তিনি।

শিক্ষাবিস্তারের কার্যে বিদ্যাসাগর নিজেকে কিরূপ ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন তাহা তাহার দৈনন্দিন কর্মবিবরণ ও পত্রাদি হইতে অনুধাবন করা যায়। ১৮৬৬ সনের নভেম্বরে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আসেন। উত্তরপাড়ার পল্লী বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইলে বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ আসে। সেখানে গমনের সময় পথে তাঁহার গাড়ী

উল্টাইয়া গেলে তিনি যকৃতে খুব আঘাত পান। ইহারই ফলে মৃত্যুকাল অবধি তিনি যকৃতের ব্যাধিতে ভোগেন। "নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারে তিনি শুধু আর্থিক ক্ষতিই স্বীকার করেন নাই, নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের এই উক্তি কেবল স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র শিক্ষা সংস্কার বা শিক্ষা প্রসার সম্পর্কেও। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মও তুচ্ছ নয়। সংস্কৃত বা বাংলা—উভয় ভাষাতেই সাহিত্য-রচনায় তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রদের উপযোগী সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিদ্যাসাগর যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহাতে সহজে আনন্দের সহিত উহা শিক্ষালাভ সম্ভব। গ্রন্থ সম্পাদনা-ক্ষেত্রেও তিনি গবেষকের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য-সেবাতে বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠার তুলনা হয় না। বাংলা গদ্যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিতে তখন তেমন কিছু ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে অনুবাদের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের মান উন্নত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শকুন্তলা, মহাভারতের উপক্রমণিকা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। বিদ্যাসাগর মৌলিক সাহিত্য অল্পই সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অভিযোগ যাহাদের তাহারা বিদ্যাসাগরের প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত নন। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'-এর রচনাগুণ অতুলনীয়। যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন 'কি সে যুগে, কি এ যুগে ইহার সাহিত্যিক সুষমা, সৌন্দর্য, রসমাধুর্য ও প্রসাদগুণে পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হইবেন।' যোগেশচন্দ্র প্রায় প্রত্যেকটি রচনার ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক কথা ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মন্তব্য সহ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির মূলসূত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শিশু ও কিশোর সাহিত্যরচনায় বিদ্যাসাগরের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলা শিশুসাহিত্য বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব না ঘটিলে অনেক পিছাইয়া থাকিত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শব্দচয়নে, শ্রুতিমাধুর্যগুণ রক্ষায় এবং শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি-বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য যে-সকল রচনা রাখিয়া গিয়াছেন বহু বর্ষ পর আজও তাহাদের মূল্য একটুও কমে নাই। ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ পর্যন্ত সময়ে তিনি ছোটদের উপযোগী রচনাসকল লেখেন। উদ্ধৃতি সহ যোগেশচন্দ্র এগুলির সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।

১৮৫০ সনের ডিসেম্বরে বঙ্গভাষানুবাদক বা অনুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে বহু পুস্তক অনূদিত ও সঙ্কলিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিষয় এই সময়ের পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইতে থাকে। বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পরিচয় যে কত পূর্বে আমরা লাভ করিবার প্রযত্ন লইয়াছি তাহা অনুবাদক সমাজের অনুশীলন ও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত অনুরাগীদের সৃষ্ট রচনা হইতে সুস্পষ্ট হয়।

যোগেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মের সাধারণ তথ্যভিত্তিক পরিচয় প্রদানেই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবতীর্ণ হওয়ার মর্মটিও অনুধাবনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরের ভিতরকার সাহিত্যিক মানুষটি সাধারণতঃ বাহির হইয়া আসিল আর একটি কারণে। ......বিদ্যাসাগর লোকশিক্ষক। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারে তিনি সাহিত্যকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন।" বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় শকুন্তলা, সীতার বনবাস হইতেই পাই। তিনি সাহিত্যচর্চায় পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিলে বঙ্গসাহিত্যকে আর-ও সমৃদ্ধি, আর-ও মূল্যবান করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সেবার পরিচয় "সমাজহিতে বিদ্যাসাগর" অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য বিবাহ নিবারণ-প্রয়াস তাঁহার সমাজ সেবার দুইটি বড় কার্য। একমাত্র পুত্র শম্ভুচন্দ্রকে এ সম্পর্কে তিনি লেখেন "এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজ-জীবনে এক আদর্শ সাংগঠনিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন, ডিরোজিও এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা প্রভৃতির সম্মিলিত উদ্যোগ যে নবচেতনা, নবশক্তি আনে তাহার মধ্য হইতে বিদ্যাসাগর সহজেই তাঁহার জীবনের "সর্বপ্রথম সৎকর্মের" সন্ধান পাইলেন। বাল্যবিধবার কান্নার ঢেউ-এ বিদ্যাসাগরের চিত্তদেশ আলোড়িত হইল, অমনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে তিনি অগ্রসর হইলেন। ইহার মূলে যে

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ—তাহা নিবারণেও তৎপর হইলেন। তবে হিন্দু সমাজের বিবাহ প্রথার ত্রুটি নিরসন-কার্যে অগ্রসর হইবার অবকাশ তিনি লাভ করেন নাই। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু বিবাহ-প্রথার সংস্কারক ছিলেন না।" পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর হয়ত ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার সুযোগ পান নাই। বিদ্যা-সাগরের সেবার পরিচয় গল্পাকারে বিবৃত করিয়া যোগেশচন্দ্র তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' বক্তৃতার ছেদ টানিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে মানুষ বিদ্যাসাগরের পরিচয়টি অল্পপরিসরে লাভ করা সম্ভব।

বিদ্যাসাগরকে যথাযথভাবে জানিবার চেষ্টা করিলে দেখি তিনি এক মহাবিপ্লবী। সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ যথার্থ পণ্ডিত তিনি। সাধারণত পণ্ডিতদের মধ্যে এমন সংস্কারমুক্ত মন সচরাচর দেখা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার বা আদর্শের নির্য্যাসটুকু নিংড়াইয়া লইয়া তিনি জাতির প্রাচ্যরস ধারাতে মিশাইয়া দিয়াছেন। কী সাহিত্যসেবায়, কী শিক্ষা-সংস্কারে—কী সমাজ সংস্কার কার্যে—কোন বাঁধাকেই তিনি বাঁধা বলিয়া মানেন নাই। এ কথা সত্য, বিদ্যাসাগরের বড় পরিচয় তাঁহার পরদুঃখকাতরতায়—পরের কল্যাণ ও উপকারের জন্য জীবন সমর্পনের মহৎ ভাবনা ও কর্মে। এই মহৎ হৃদয়বৃত্তি হইতেই তাহার শিক্ষা ও সাহিত্য-সেবার প্রেরণা-ধারা উৎসারিত হইয়াছে। জীবন নির্ঝরের সেই পরম প্রাপ্তিতে জাতি শুচিস্নাত, আলোকে উদ্ভাসিত।

উনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন

গোলোকেন্দু ঘোষ

পনর শতকের মাঝামাঝি জার্মানির মেইন্‌জ্‌ শহরের জোহান্‌ গুটেনবার্গ ধাতুর তৈরি হরফ দিয়ে একটি বাইবেল ছাপিয়ে পৃথিবীতে মুদ্রণ যুগের সূচনা করলেন। বিভিন্ন দেশে ছাপাখানার প্রবর্তন হতে বেশি সময় লাগল না; রোমে প্রবর্তন হল ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে, ভেনিসে ১৪৬৯, ফ্রান্সে ১৪৭০, হল্যাণ্ডে ১৪৭৩, স্পেনে ১৪৭৪, সুইজারল্যাণ্ডে ১৪৭৪, ইংলণ্ডে ১৪৭৬, ডেনমার্কে ১৪৮২, সুইডেনে ১৪৮৩, পর্তুগালে ১৪৯৫, রাশিয়ায় ১৫৫৩ এবং ভারতবর্ষে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকায় প্রথম বই ছাপা হয় ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম ছাপাখানা আসে গোয়ায় পর্তুগাল থেকে। ছাপাখানাটির গন্তব্য স্থল ছিল আবিসিনিয়া। তখন সুয়েজখাল খনন করা হয়নি বলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হত। কাজেই পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়া যাওয়ার পথে উত্তমাশা ঘুরে ছাপাখানাটিকে পুনর্যাত্রার অভিপ্রায়ে গোয়ায় নামান হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোয়াতেই ছাপাখানাটি থেকে যায়। এই ছাপাখানা থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রথম ছাপা বই বেরোয় 'দৌত্রিনা ক্রিস্টা' ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এটি একটি ১৬ পৃষ্ঠার বই এবং একই নামের মূল পর্তুগীজ ভাষার বই-এর তামিল অনুবাদ।

বাংলা ভাষায় ছাপার প্রথম নিদর্শন হল লিসবন-এ (পর্তুগাল) ছাপা একটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি ছাপা হয়, কিন্তু বাংলা হরফে নয়, রোমান হরফে। প্রশ্নোত্তরে ধর্মজিজ্ঞাসার কয়েকটি বইও সমসময়ে বাংলা ভাষায় রোমান হরফে লিসবন থেকে ছাপা হয়। লণ্ডন থেকেও রোমান হরফে বাংলা ভাষায় বারতো দ্য সিলভেস্ত্রের (১৭২৮-১৭৮৬) লেখা প্রশ্নোত্তরে ধর্মীয় বই ছাপা হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বইটি হল নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড-প্রণীত একটি বাংলা ব্যাকরণ। এটি ছাপা হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী শহরে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। কোম্পানির কর্ণধারদের ও ওয়ারেন হেস্টিংসের দেশীয় ভাষায় শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোধগম্য হয়েছিল এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স্ (প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডকে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহিত করেন ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে। এর পর হ্যালহেড ভারতবর্ষে এলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরূপে। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিপক্ষে বহু কথা বলার থাকলেও নিঃসন্দেহে তিনি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। হেস্টিংস হ্যালহেডকে দেশীয় ভাষা শিক্ষার সহায়ক বই প্রণয়ন করার ভার দিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা ভাষায় বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বই বেরুল হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ'। হুগলীতে যে ছাপাখানায় বাংলা ভাষায় ও হরফে এই প্রথম বই বেরুল, সেই ছাপাখানা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে এণ্ড্রুজ নামক জনৈক সাহেব পুস্তক বিক্রেতা এটার প্রতিষ্ঠা করেন। এর বেশি কিছু জানা যায়না।

হ্যালহেডের এইটাই কিন্তু প্রথম বই নয়। তাঁর প্রথম বই 'এ কোড অব জেণ্টুলজ্'। পার্শী ভাষা থেকে অনূদিত একটি ইংরেজি বই এটি। এটি ছাপা হয় ইংলণ্ডে, সম্ভবত এ দেশে ছাপার অসুবিধার জন্যে। বাংলায় ব্যাকরণ হল হ্যালহেডের দ্বিতীয় বই।

বাংলায় বই ছাপতে হলে প্রথম চাই বাংলা হরফ। এই সমস্যার সমাধান করলেন চার্লস উইলকিন্স। বিলেতে থাকতে উইলকিন্স-এর ছাপাখানার কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। উইলকিন্স এ দেশে এলে হেস্টিংস তাঁকে হরফ তৈরি করার দায়িত্ব দেন। অখণ্ড পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার ফলে ধাতুর তৈরি বাংলা হরফ প্রস্তুত হল। উইলকিন্স একাধারে ধাতু তৈরি, হরফের নক্সা করা, ছেনি করা, ঢালাই করা এবং অবশেষে ছাপানো—সব কাজই একা করলেন। পরে তিনি হরফ তৈরি করার সম্পূর্ণ কাজটি পঞ্চানন কর্মকারকে শিখিয়ে দেন। পঞ্চানন কর্মকারও একদল কারিগর তৈরি করেন, তাদের মধ্যে তাঁর জামাতা মনোহর পরবর্তীকালে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

হ্যালহেডের সংস্পর্শে এসে উইলকিন্সও প্রাচ্যবিদ্যায় আকৃষ্ট হন এবং সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। ভগবদ্গীতা, হিতোপদেশ এবং শকুন্তলা তিনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। উইলকিন্স দেবনাগরী হরফও তৈরি করেন এবং তাঁর রচিত একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' ছাপার জন্য কলকাতায় প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' ছাপাখানা স্থাপন করেন। সরকারী সকল ছাপাখানার কাজ এখানে হত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 'ক্রনিক্‌ল্ প্রেস্' থেকে এ. আপজন প্রণীত 'ইঙ্গরাজি এণ্ড বেঙ্গলী ভোকাবিলারি' (Ingraji and Bengali Vokabilari') নামীয় একটি অভিধানের নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশ শাসন ও ইংরেজি প্রচলনের প্রয়োজনে এ দেশে তখন বেশ কয়েকটি ছাপাখানা চালু হয়েছে এবং উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের প্রচেষ্টায় বাংলা হরফও পাওয়া যাচ্ছে, আপ্‌জন প্রণীত অভিধান তার নিদর্শন। —এই হল আঠার শতকের শেষ পাদে বাংলা মুদ্রণ জগতের পরিস্থিতি।

বাংলায় মুদ্রণ-প্রকাশন ও সংস্কৃতি জগতে উইলিয়ম কেরী একটি অনন্য শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর অপরিসীম পরিশ্রম ও প্রতিভার সমন্বয়ে বাংলায় নবজাগরণের পটভূমি রচিত হয়েছিল।

ব্যাপটিস্ট মিসনের সদস্য হিসাবে উইলিয়ম কেরী কলকাতা এসে পৌঁছলেন ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ দেশে এসেই তিনি বাংলা ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাম রাম বসুকে শিক্ষক নিযুক্ত করে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করলেন। সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করে মূল সংস্কৃতে মহাভারতের অধিকাংশটাই পড়ে ফেললেন। মিশনের সদস্য হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে চাইলেন এবং তার জন্যে পাণ্ডুলিপিও তৈরি করে ফেললেন। সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজি অভিধানের একটি পাণ্ডুলিপিও তৈরি করলেন। প্রকাশনের যথেষ্ট সুবিধা না থাকার জন্যে নিজের পাণ্ডুলিপি নিজেই ছাপাতে চাইলেন এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ পাউণ্ড দামে একটি কাঠের পুরানো মুদ্রাযন্ত্র কিনলেন। কিন্তু হরফের ব্যবস্থা কি করে করা যায়? বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আমদানি করার ব্যবস্থা করতে

গিয়ে খরচের বহর দেখে পেছিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে গেল। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে মার্শম্যানের সঙ্গে এলেন ওয়ার্ড। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজ জানতেন এবং এঁদের আসার উদ্দেশ্য কেরীকে সাহায্য করা। ওঁরা শ্রীরামপুরে আস্তানা করা সুবিধা মনে করে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে আস্তানা গড়ে তুললেন ও মুদ্রাযন্ত্রটি নিয়ে এলেন। বাংলা সংস্কৃতি জগতে নতুন যুগের সূচনা হল উনিশ শতকের গোড়া থেকে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি করা হরফ দিয়ে উইলিয়ম কেরী তাঁর প্রথম বই নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা সংস্করণ ছাপলেন এই বছরে।

১৮০১ থেকে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত এবং বর্তমানে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্য বই-এর একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।

১৮০১—বাইবেল
ধর্ম পুস্তক—কেরী
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত—রাম রাম বসু
কথোপকথন—কেরী
১৮০২—মহাভারত (চার খণ্ড)—কাশীরাম দাস
বত্রিশ সিংহাসন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
রামায়ণ—কৃত্তিবাস ওঝা
১৮০৩—বাইবেল—ও. টি. সাম্‌স্‌
১৮০৫—তোতা ইতিহাস—চণ্ডীচরণ মুন্সী

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ফলে ভাষা শিক্ষার সহায়ক ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ বিষয়ের বই প্রণয়ন ও প্রকাশনে তাঁকে মন দিতে হয়েছিল।

শ্রীরামপুরে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যে বিরাট কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বাংলা ও দেবনাগরী ভাষা ছাড়াও তিনি যে-সব ভাষা ও হরফে বই ছাপেন তার তালিকায় আছে: ওড়িয়া, মগধী, অসমীয়া, খাসী, হিন্দী, মাড়োয়ারী, গাড়োয়ালী, নেপালী, মারাঠী, গুজরাটী, পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, পুস্তু, তেলেগু ও কানারী। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে

মনোহরের তৈরী করা হরফ দিয়ে চীনা ভাষায় একটি 'গসপেল' ছাপেন তিনি। যতদূর জানা যায় পৃথিবীতে এমন চেষ্টা এই প্রথম।

ছাপার প্রধান উপকরণ কাগজ এ দেশে যা উৎপন্ন হ'ত তা ছাপার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানী করা কাগজের দাম পড়ত খুব বেশী এবং সময়ও লাগত অনেক। তাই তিনি বোল্টন থেকে একটি বয়লার আমদানী করে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি কাগজ তৈরির কারখানা খোলেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই কারখানার তৈরি কাগজ সুনামের সঙ্গে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। সরকারী কাজেও এই কারখানার তৈরি কাগজ ব্যবহৃত হত।

উইলিয়ম কেরী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায় দিয়ে রচনা করে দিলেন নবজাগরণের পটভূমি। এবং নবজাগরণের প্রথম পুরুষরূপে আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসবাস করতে এলেন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর থেকে ভারতে নবজাগরণের শুরু বলে ধরা হয়। রামমোহন কলকাতায় এসে প্রথম 'আত্মীয় সভা' (স্বজন অর্থে আত্মীয় নয়, আত্মা-সম্পর্কিত অর্থে আত্মীয়) প্রতিষ্ঠা করলেন। আত্মীয় সভার উদ্দেশ্য হল—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মার উন্নতি সাধন। 'আত্মীয় সভা' পরবর্তীকালে 'ব্রাহ্ম সভা' ও 'ব্রাহ্ম সমাজ'-এ রূপান্তরিত হয়। তিনি কয়েকটি পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেন: যেমন, 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মিরাত্-উল্-আখ্‌বর', 'বঙ্গদূত' এবং 'রিফর্মার'। তিনি বেশ-কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও রচনা করেন। রামমোহন যে কেবল তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন তা নয়, তাঁর বাস্তববোধও ছিল প্রখর। নিজের পুস্তিকাদি প্রকাশের জন্য নিজেই ধর্মতলা ষ্ট্রীটে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন—তার নাম ইউটিলিটারেনিয়ন প্রেস। এখান থেকে পুস্তিকাদি প্রকাশ করে সেগুলি আগ্রহী পাঠকদের বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে 'আধুনিক যুগ' (modern age)-এর তাৎপর্য সমসাময়িক কালে একমাত্র রামমোহনই বুঝতে পেরেছিলেন। এবং, 'আধুনিক যুগ'-এর সূত্রপাত 'মুদ্রণ যুগ থেকে'।

রামমোহনের পরে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বটে, কিন্তু রামমোহনের প্রজ্বালিত দীপ-বর্তিকা বহন করার জন্য

বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেড পণ্ডিত' রূপে নিযুক্ত হলেন। স্মর্তব্য, উইলিয়ম কেরীও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক রূপে যোগ দিলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু পরের বছর জুলাই মাসে পদত্যাগ করলেন। তারপর আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ফিরে গেলেন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। আবার সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ রূপে ফিরে এলেন ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৪ পর্যন্ত তিনি 'ইন্সপেক্টর অফ স্কুল্স্' রূপেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে দুইটি পদ থেকেই তিনি পদত্যাগ করেন এবং আর কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নি। 'ইন্সপেক্টর অব স্কুলস' রূপে তিনি কয়েকটি জেলায় বহু স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের উন্নতিকল্পে শিক্ষার প্রসার ও বই-এর ভূমিকা যে কি বিরাট এই কথা সেকালে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে আর কেউ বেশি বোঝেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দেড় বছর বেকার ছিলেন ১৮৪৭-এর ১৬ই জুলাই থেকে ১৮৪৯-এর ১লা মার্চ পর্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের মধ্যবর্তী সময়টা। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় তিনি সংস্কৃত প্রেস ডিপসিটরি নাম দিয়ে একটি বই-এর দোকান করলেন, উদ্দেশ্য বইকে সহজলভ্য করে পাঠককে বইমুখীন করা এবং সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জন করা। ১৮৪৮-৪৯ সনে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর সঙ্গে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নাম দিয়ে তিনি একটি ছাপাখানা খোলেন। পরে তিনি একাই এটির সত্বাধিকারী হন। তাঁর রচিত বই-পত্র এই ছাপাখানা থেকেই ছাপা হত। ঈশ্বরচন্দ্র-রচিত পুস্তকাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও তিনি সাহিত্য-মূল্যের ও সামাজিক সংস্কারের বইও যথেষ্ট রচনা করেছিলেন। এ সব বই তিনি নিজেই ছাপাতেন এবং নিজের বই-এর দোকান থেকে বিক্রী করতেন। বাংলা প্রকাশন জগৎ ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রচেষ্টায় অপরিসীম লাভবান হয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহ ও সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পর দেশে সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিবেশ সৃষ্টি হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে।

সমসময়ের 'বটতলা' প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করতে হয়। 'বটতলা' সম্পর্কে দু-একটা কথা বলার আছে। কলকাতা যে-তিনটি গ্রামের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত তার একটি গ্রাম সুতানুটি (বর্তমান অঞ্চল—বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার)। গ্রামের কোন বড় বটগাছের বা অশ্বত্থগাছের তলায় গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের স্ফুরণ ঘটে থাকে—এইটাই এ দেশের গ্রাম্য ঐতিহ্য। শোভাবাজারে এই ধরণের একটি বটগাছ ছিল এবং এই বটগাছকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি কুটীর শিল্পের মত বেশ কিছু ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশনা ব্যবসা গড়ে ওঠে। যতদূর জানা যায়, এখানে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৮১৮-২০ নাগাদ বিশ্বনাথ দেব। 'বাঙ্গালী প্রেস', 'হিন্দুস্থানী প্রেস', 'সংস্কৃত প্রেস' নামধেয় ছাপাখানার অস্তিত্ব এই সময়ে এখানে ছিল জানা যায়। প্রকাশিত পুস্তকের একটি তালিকা ফাদার লঙ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বটতলা প্রেস থেকে ছাপা কুড়িটি বই-এর নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ বইই ছিল ধর্ম সম্বন্ধীয়, মাত্র চারটি বই ছিল যৌন সম্পর্কিত। পঞ্চাশ কি আরো বেশি বছর ধরে 'বটতলা' বেশ ভাল ভাবেই বই-এর ব্যবসা করে এসেছে। ঈশ্বরচন্দ্র-সূচিত 'কলেজ স্ট্রিট'-এর বই-এর বাজার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হলে 'বটতলা'র প্রতিপত্তি অবশ্য অনেক কমে যায়। কিন্তু মানতেই হবে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং লোক-শিক্ষা ও লোক-সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে বটতলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বটতলা প্রকাশিত বই-এর মান অবশ্য বিশেষ উন্নত ছিল না, তৎসত্ত্বেও বই-এর বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্র্যময়, এবং মূল্যেও যথেষ্ট সস্তা ছিল। বাংলা প্রকাশন ক্ষেত্রে বটতলার ঋণ অবশ্য স্বীকার্য।

কলেজ-স্ট্রিট বই-এর বাজারে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। মেডিক্যাল কলেজের অনেক ছাত্র নিকটস্থ হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন। এঁদের সুবিধার জন্য গুরুদাস হিন্দু হোস্টেলের সিঁড়ির নিচে একটা আলমারিতে দুর্গাদাস কর রচিত 'মেটিরিয়া মেডিকা' বইটী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখতেন। গুরুদাস মেস-বয় হিসেবে জীবন শুরু করেন। এই তাঁর ব্যবসায়ের হাতে খড়ি। ধীরে ব্যবসায়ের উন্নতি হলে কলেজ স্ট্রিটে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া করে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি' নাম দিয়ে

বই-এর দোকান করলেন। তিনি ছিলেন পাকা হিসেবী এবং পাওনাদারদের টাকা সময়মত মেটাতে আগ্রহী। ফলে তাঁর ক্রমোন্নতি হল। তিনি প্রকাশন ব্যবসায়ে এলেন এবং তদানীন্তন খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের বই প্রকাশ করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখেরা। এঁদের বই আগে প্রকাশিত হত কলেজ স্ট্রিটের 'ক্যানিং লাইব্রেরি' থেকে কিন্তু ক্যানিং লাইব্রেরির অবস্থা পড়ে যাওয়ায় গুরুদাস সে স্থান অধিকার করলেন। গুরুদাস ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে বিরাট বাড়ি করে ফলাও প্রকাশন কারবার প্রতিষ্ঠা করলেন।

বরদাপ্রসাদ মজুমদার আর একটি উল্লেখ্য নাম। বাড়ি হাওড়ার একটি গ্রামে। জীবিকান্বেষণে কলকাতা এসে সামান্য পুঁজিতে বই বিক্রীর ব্যবসা শুরু করলেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমোন্নতি হলে প্রকাশন ব্যবসায়ে নামলেন। কলেজ স্ট্রিটের কাছে ঝামাপুকুর স্ট্রিটে চার কাঠা জমি কিনলেন। হাতে-চালান একটি প্রেস-এর উপযোগী ছোট একটি ঘর নিজ হাতে ইঁট গেঁথে নিজেই তৈরি করে নিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর প্রকাশন ব্যবসা (ছাপাও নিজেরই) বেড়ে উঠল। পরে তাঁর ছেলে আশুতোষ দেব (এ. টি. দেব নামে খ্যাত) অভিধান প্রকাশ করে খুবই সাফল্য অর্জন করলেন। বর্তমানে আশুতোষ দেবের পুত্র সুবোধচন্দ্র মজুমদার এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং বহু বই-এর প্রকাশক, বিশেষ করে কিশোর সাহিত্য এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৮ সনে। একটি বড় ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের অবহেলিত সন্তানরূপে তিনি বাল্যে বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান নি। অল্প বয়সেই জীবিকার্জনের জন্যে চিৎপুর রোডে (পরে, চিৎপুর রোডের প্রকাশকদের বটতলা প্রকাশক বলা হত) একটি বইয়ের দোকানে (সত্বাধিকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক) বেয়ারা-কর্মচারীরূপে কাজ নেন। বেতন মাসিক পাঁচ টাকা। কিছুদিন পরে বই-এর দোকানটি মালিক বিক্রী করে দিতে চাইলে কোনক্রমে পুঁজি সংগ্রহ করে দোকানটি উপেন্দ্রনাথ কিনে নিলেন। বই-এর দোকানে উপেন্দ্রনাথ খুঁজে খুঁজে ভাল ও আকর্ষণীয় বই মজুত করতে লাগলেন। উন্নতি হলে 'রাজভাষা' প্রথম প্রকাশ করে প্রকাশন ব্যবসা শুরু করলেন। সহজে

'ইংরেজি' শেখার বই হল 'রাজভাষা'। বইটার দারুণ চাহিদা হল। তিনি চিৎপুর থেকে বিডন ষ্ট্রিটে এসে একটি ছাপাখানা কিনে পুরোপুরি প্রকাশন ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। তারপর বিডন ষ্ট্রিট থেকে গ্রে ষ্ট্রিটে এলেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে সেখান থেকে এলেন বর্তমান বাড়ি ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রিটে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কাগজ বের হল ১৮৯৬ সনে এবং 'দৈনিক বসুমতী' কাগজ বের হল ১৯১৪ সনে। প্রথমে এটি সান্ধ্য দৈনিক ছিল। পরে এটি প্রাতঃদৈনিকে রূপান্তরিত হয়। বসুমতীর প্রকাশনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যের ক্লাসিক্‌স্‌ পর্যায়ের বইগুলি তাঁরা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার ফলে সেগুলি শুধু অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচেছে তা নয়, লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে সৎ সাহিত্যের প্রচার ঘটিয়েছে।

'বঙ্গবাসী'র যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু কৃতী ব্যক্তি। সাময়িক পত্ররূপে 'বঙ্গবাসী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৮১ সনের ১০ ডিসেম্বর। উপেন্দ্রনাথ সিংহ-র সহায়তায় যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু এটি প্রকাশিত করেন। কয়েকবছর পরে উপেন্দ্রনাথ ছেড়ে গেলে যোগীন্দ্রচন্দ্রের অর্থাভাব ঘটল। তখন তিনি গ্রাহকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে অর্থের সংকুলান করেন। এ রকম চেষ্টা এই প্রথম। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনিই প্রথম কাগজ বার করলেন। এর পূর্বের পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশিত হয়েছে কোনো আদর্শের রূপায়ণ হিসাবে। বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ছাড়াও তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'হিন্দী বঙ্গবাসী', ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক 'টেলিগ্রাফ', বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক' এবং বাংলা মাসিক পত্রিকা 'জন্মভূমি'। ১৮৮৩ থেকেই যোগীন্দ্রচন্দ্র বই প্রকাশন শুরু করেন এবং তাঁর প্রথম বই 'ধর্মমঙ্গল'। তিনি বহু বই প্রকাশ করেন। ইংরেজিতেও তিনি বহু বই প্রকাশ করেছিলেন। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হলে কলেজ ষ্ট্রিটের কাছে ৬ ভবানী দত্ত লেনে তিনি একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করেন। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় হিন্দু ধর্মের বহু শাস্ত্রীয় বই তিনি প্রকাশ করেন। এতে সনাতন-পন্থী হিন্দুদের যথেষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি হয় এবং তিনি নিজেও সনাতন-পন্থী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি দামেও বেশ সুলভ ছিল।

'হিতবাদী' প্রতিষ্ঠানের জন্ম কাহিনী ভিন্নতর। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়

কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কলকাতায়। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিউম ও অন্যান্যেরা কলকাতায় তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে পারে এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করলেন। 'বঙ্গবাসী' তখন বেশ প্রতিপত্তিশালী পত্রিকা কিন্তু সনাতন-পন্থী এবং কংগ্রেস-বিরোধী। কাজেই একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে 'হিতবাদী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানি' নাম দিয়ে তাঁরা একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থার পুঁজি হল পঁচিশ হাজার টাকা এবং শেয়ার মূল্য দশ টাকা। এই সংস্থার প্রথম ডিরেক্টরদের মধ্যে ছিলেন: জানকীনাথ ঘোষাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র বড়াল (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)। অফিস হল ২নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিটে। প্রথম শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। প্রথমে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়। পরে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী যোগেন্দ্রনাথ বসু এর সম্পাদক হন। প্রথম থেকে 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য মূল্য পরিস্ফুট হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত বিশেষ সাধিত হয় নি বটে কিন্তু এটি সংবাদপত্রের সাহিত্য-মান যথেষ্ট উন্নত করে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। 'হিতবাদী' প্রতিষ্ঠান থেকে বহু বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং এঁদের প্রকাশিত বই-এর মান অন্যের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ছিল।

এর পরবর্তী কাহিনী হবে মূলতঃ বিংশ শতকের কাহিনী।

ঊনবিংশ শতকে বাংলা গান

ডঃ কল্যাণ সেনগুপ্ত

গান আমাদের ব্যক্তিক হৃদয়ের নিভৃত ও প্রগাঢ় উপলব্ধির ফসল। বলা-বাহুল্য, প্রাত্যহিকতার নানা অভ্যাস ও সংস্কারের মলিনতা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অন্তর্লীন সংবেদনের এক গভীর ব্যাপ্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে অবগাহন না করলে সংগীতের জন্মলাভ সম্ভব নয়। জীবনে আমরা বাঁচি দু'ভাবে। এক, আমাদের ব্যবহারিকতা বা সামাজিকতায়—যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজন দিয়ে আমরা দৈনন্দিনতাকে সাজাই, যেখানে আমরা মগ্ন তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশে, অন্ধ সংকীর্ণনতার নিত্য নব মূঢ়তায়। সংসারের এই দীনতা ও নানা চিত্তবিক্ষেপে আমরা যখন আন্দোলিত—তখন সেই ক্ষুদ্রতা ও তামসিকতার দিগন্তে অস্তিত্বের নিগূঢ় দ্যোতনা আমাদের কাছে অনুদ্ভাসিত থাকে; তখন আমরা নিজেকে ভুলে থাকি। এই 'forgetfulness of Existence' প্রখ্যাত দার্শনিক হাইডেগারকেও বিক্ষুব্ধ করেছে: তাই লোকালয়ের যূথবদ্ধ জীবনের কোলাহল থেকে তিনি আমাদের ডাক দিয়েছেন নিভৃত অন্তর্লোকে যেখানে শান্ত হয়ে আমরা নিজে মুখোমুখি বসি—আর তখনই আমাদের নিগূঢ় অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন এক নূতন অর্থে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। সংসারের কলরবে, আদান-প্রদানে, প্রয়োজনে আমরা নিজেকে হারাই—এই সাংসারিক বৃত্ত পেরিয়ে আমরা নিজের কাছে আসি, আসি এক ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার বিন্দুতে যেখানে শুধু আমি একক ও অনন্য। হাইডেগার একেই authentic life বলেছেন; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছুটির কাল' যখন সমাজের প্রয়োজনের সীমানা থেকে আমার ছুটি, যখন আমার সত্তা থেকে নেমে যায় প্রত্যহের আচ্ছাদন, ছিন্ন হয় অভ্যাসের জাল, যখন নগ্ন চিত্ত সমস্তের মাঝে মগ্ন হয়ে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে উত্তীর্ণ হয়। গানে এই ছুটির আনন্দ, এই সুগভীর অন্তর্চেতনারই প্রকাশ—যে বেদনায় জগৎ গভীরতর দীপ্তি পায় এবং নিজেকেই আপনার করে পাই অসীম ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন: গুণগুণ সুরে ভৈরবী তোড়ী রামকেলী মিশিয়ে একটা

প্রভাতী রাগিনী সৃজন করে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটি অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা দিল, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার একটা সংগীতময় ভাবময়…উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল… ।

কবির বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিচেতনার একটি নিজস্ব ধারা বা pattern আছে—গান তারই অভিব্যক্তি। এ প্রসংগে Maciver ও page এর উক্তি স্মরণীয় :[১]

The relationship between culture and personality involves, on the one side, the total social heritage availabie to the individual and to which he consciously and unconsciously responds, and, on the other, the integral character of the individual being. অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন সামাজিক পরিমণ্ডলে নিঃশ্বাস নেয়, তেমনি তার একটা নিজস্ব পরিধিও আছে যেখানের ফুল সে আপনি ফোটায়, যেখানে অনুভবের এক গোপন অন্দর মহলে সে বিস্তারিত, যেখানে তার অভিজ্ঞতার দিগন্তে জগৎ ও জীবন নবতর মূর্তি ধারণ করে। গানের সৃষ্টি এখান থেকেই—যেখানে ব্যক্তি তার স্বরূপে নিবদ্ধ। এখানেই ব্যক্তির সমাজ-উত্তরণ। এই ব্যক্তিকে স্মরণে না রাখলে সংগীত-সৃষ্টির রহস্য আমাদের কাছে কখনই উদ্ঘাটিত হবে না। অবশ্য সংগে সংগে একথাও স্বীকার্য, সমাজের বিস্তীর্ণ পটভূমিও সংগীতের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। অতএব, উনিশ শতকে বাংলা গান কতটা সামাজিক আবহাওয়ায় লালিত অথবা নির্ধারিত এবং কতটা সৃষ্টি—আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়েই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছি।

॥ ২ ॥

উনিশ শতাব্দী বাংলা দেশের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইটালীতে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার ঢেউ কয়েক শ' বছর কাল ব্যবধান পেরিয়ে বাংলা দেশেও এসে পৌছল উনিশ শতকে। বাংলা দেশে এই রেনেসাঁস সম্ভব হয়েছিল প্রধানত ইংলণ্ডের

সংগে আমাদের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে। এবং, এই রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির মূল লক্ষণগুলির মধ্যে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তা হচ্ছে একটি দ্বিমুখী প্রবাহের দ্বন্দ্ব। . একদিকে দেখি ডিরোজীয় পন্থী বাঙ্গালী—যাদের মধ্যে আহারে-বিহারে, অশনে-বসনে,—এক কথায়, দৈনন্দিন জীবন ধারণ ও চিন্তায় বিদেশী ভাবধারা অনুসরণের নির্বিচার অত্যুৎসাহ; অন্যদিকে দেখি বিদেশাগত চিন্তাধারায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েও প্রাচীন সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকারের সংগে তাকে মেলানোর প্রয়াস। একদিকে অন্ধ পরানুকরণ; অন্যদিকে ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং বর্তমান জীবনচর্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সবিচার মূল্যায়ন। বলাবাহুল্য, বাংলা দেশে উনিশ শতকের গানও এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব ও আবর্তে দোলায়িত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি[২]: "১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা এই কলেজে ইংরেজী কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ প্রমোদ তাহাদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা অনেকেই কলিকাতায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় অতিশয় দেখিতে যাইতেন।" ব্রজেন্দ্র নাথের দেওয়া এই তথ্যে বাঙালীর কোন কোন মহলে পাশ্চাত্য নাটক ও সংগীত-প্রীতির সুস্পষ্ট সাক্ষর মেলে। এই সব শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মহলে আমরা দেখেছি একদিকে ভারতীয় সংগীতের প্রতি যেমন সোচ্চার বীতরাগ, তেমনি অপরদিকে বেহালা, ক্ল্যারিওনেট অথবা পিয়ানো চর্চায় সযত্ন অনুরাগ। বেঠোফেন, সোপ্যাঁর অমর রচনাগুলির একনিষ্ঠ অনুশীলন একদা উনিশ শতকে বাঙালীর গৃহকোণ মুখরিত করে রেখেছিল। এ প্রসংগে প্রমথ চৌধুরী প্রতিভা দেবী সম্পর্কে বলছেন:[৩] তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদী বিলিতি বাজনা। বেঠোফোণের **Funeral March** ও **Moonlight Sonata** আমি অন্তত: হাজারবার শুনেছি। তাই থেকে আমার বিলিতি গানের উপর যে অশ্রদ্ধা ছিল তা কমে যায়। প্রমথ চৌধুরীর সংগে সুর মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার পরিশীলিত সমাজে পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বড় ছেলে প্রমোদকুমার-ও ছিলেন পাকা ইউরোপীয়ান মিউজিসিয়ান। এবং সৌরীন্দ্রমোহনের দৌহিত্রও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতো।[৪]

এই সব বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা বাঙালীর এক বিশিষ্ট মানস-ক্রমের পরিচয় পাই। তা হচ্ছে পাশ্চাত্য নাটক ও সংগীতের কাছে সানুরাগ আত্মসমর্পণ যা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্যে অনুকম্পামিশ্রিত অবিশ্বাসে। এর সংগে সমান্তরাল একটি ঐতিহ্যমুখী ধারাও প্রবহমান যার অন্যতম হোতা রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। রেনেসাঁসের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দেশের শাশ্বত ও অন্তর্মুখী সংস্কৃতির কাছে অবনত হওয়ার আদর্শ। এই আদর্শের কাছে তিনি নিজেকে নিবেদন করেছিলেন বলেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজে উপনীত পাশ্চাত্য সংগীতের প্রবল ও অপ্রতিহত তরংগরোধে তাঁর প্রয়াস ও অধ্যবসায় ছিল অক্লান্ত। অন্য দিকে উত্তর ভারতীয় সংগীত, বিশেষ করে ধ্রুপদের পুনরুদ্ধার ও প্রচারে তিনি তাঁর সময় ও অর্থ অকৃপণভাবে দিয়েছিলেন। আমরা জানি ধ্রুপদের স্বভাব অন্তর্মুখী, ধ্যানস্তব্ধ ও ভাবগাঢ়। দিলীপ রায়ের ভাষায়, বহির্জীবনের অভিঘাতে ধ্রুপদকে পাওয়া যায় না—কারণ সে শান্তিময়, স্বপ্ন নিবিড় গহনবাসী; তার মুক্তি গম্ভীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচঞ্চল সম্পদে, সমাহিতিতে, শান্তিতে ও সংযমে।[৫] রেনেসাঁসের কাছে সৌরীন্দ্রমোহন গভীরতার পাঠ নিয়েছিলেন বলেই ধ্রুপদে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বাঙালীর জীবনে ধ্রুপদের শান্তরস প্রসারিত করে দেওয়াকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ ও ইংরেজী ভাষার বিশিষ্ট অবদানের কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ক্যাপটেন উইলার্ড[৬] উত্তর ভারতের রাজদরবারে প্রচলিত সংগীতের বর্ণনা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী ভারত-সংগীতের ধ্যানমৌনী রসে ডুব দিতে বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই অনুপ্রেরণাতেই সৌরীন্দ্রমোহন দেশীয় উচ্চাংগ সংগীতকে গৌরবের উচ্চাসন দেবার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর প্রশস্তিটি এখানে স্মরণ করি:[৭] হিন্দু সংগীতের উন্নতির জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। অথবা অমিয়নাথ সান্যালের উক্তিটি:[৮] No unbiased historian of the music of Bengal may afford to ignore the ideas and activities which grew up and engrossed a small body of intelligent artists under the leadership of Zamindar Sourindramohan Tagore

of Calcutta, the greatest of patrons of classical music that Bengal has produced within historical times. সৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া ব্রাহ্মসমাজও ধ্রুপদ প্রচার ও প্রসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল। ধ্যানধর্মী ও মীড়প্রধান এবং সর্বপ্রকারে তালের উচ্ছলতাবর্জিত বলেই ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা সংগীতে ধ্রুপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঠাকুর পরিবারকে প্রদক্ষিণ করে যে সব জ্যোতিষ্ক ধ্রুপদ চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী অন্যতম।

উনিশ শতকে রেনেসাঁসের ফলে বাংলা দেশে যে intellectual movement সুরু হয়েছিল বাংলার গানেও আমরা তার স্বর্ণোজ্জ্বল প্রতিফলন দেখি। এখানেও পুরোধায় যে অবিস্মরণীয় চরিত্র তাঁর নাম সৌরীন্দ্রমোহন। ধ্রুপদের যথার্থ শিক্ষাদানের জন্য এবং এই সংগীত-সংস্কার বাঙালীর মনে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য তিনি ওস্তাদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সহযোগিতায় একটি একাদেমী স্থাপন করেছিলেন। এই একাদেমিকে কেন্দ্র করেই সংগীতের রাগ-রাগিনী সংরক্ষণের জন্য দেশীয় স্বরলিপি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সংগীতের উপর নানা টীকা-ভাষ্য রচিত হয়েছিল; ভারতীয় সংগীত শুধুমাত্র বাঙ্গালীর কাছে নয়, সমস্ত বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সৌরীন্দ্রমোহন ইংরেজী ভাষায় বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছিলেন। এ প্রসংগে তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজী ভাষায় লেখা 'The Six Ragas' ও 'The Universal History of Music' এবং সংস্কৃত ভাষায় 'গন্ধর্ব-কল্প-ব্যাকরণম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও স্মরণ করা যেতে পারে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'গীতসূত্রসার' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত মাসিক সংগীত-পত্র 'সংগীত প্রকাশিকা'কে। এক কথায়, অমিয়নাথ সান্যাল-এর ভাষায় [৯]: ...the combined activities of the academy started by Sourindramohan was the prime moving force of a generalised intellectual movement which began with the publishing of vernacular texts on music, effective journals and thought-provoking articles concerning musical subjects generally, and classical music particularly, as early as the last quarter of the 19th and the beginning of the twentieth century.

॥ ৩ ॥

উপরের আলোচনায় উনিশ শতকের বাংলা গানে রেনেসাঁর প্রভাব বা সামাজিক অবদানের কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা ভেবে দেখব, এই শতকের বাংলা গান কতটা সৃজনশীল (creative) হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, গানের তখনই সৃষ্টি যখন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার গভীরে তার জন্ম। অর্থাৎ গান আমাদের ব্যক্তিক pattern-এরই অভিব্যক্তি যা' আমরা সমাজকে দিই। তখনই গান (creative। এই মানদণ্ডের প্রেক্ষণে বলা যায় ধ্রুপদ যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং ব্যাপক ভাবে অনুশীলিত হয়েছে তবু তা' কখনই creative হয় নি। ধ্রুপদ আমরা গ্রহণ করেছি ঐতিহ্য প্রেরণায়—যা রেনেসাঁরই একটি অন্যতম প্রসাদ। উত্তর ভারত থেকে এই সংগীত আমাদের উপর যে ভাবে আরোপিত হয়েছে আমরা সে ভাবেই তার চর্চা করেছি—কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অনুভবে তা' কখনই স্বতন্ত্র অথবা unique হয়ে ওঠেনি।

অথচ আশ্চর্য এই যে, রেনেসাঁর আলো যেখানে পৌছতে পারে নি সেই বাংলা পল্লীর নীরব প্রান্তরে, ধ্যাননিমীলিত আকাশের নিচে, নাম-না-জানা ফুলের সৌরভের মধ্যে যে-সব গান বিকশিত হয়েছে—বাংলার তদানীন্তন অনভিজাত মহলে সাধারণভাবে সেই বাউল, কীর্তন, পাঁচালি ও রামপ্রসাদী গান সৃষ্টির শাশ্বত রসলোকে উন্নীত হয়েছে। প্রথম বাউলের কথাই ধরা যাক্। এই গান বাংলা-পল্লীর নিভৃত অঙ্গনকে যা উদাত্ততায় ভরিয়ে রেখেছিল, কাঙাল হরিনাথ তাকেই এক অনুপম ব্যক্তিত্বে বিভূষিত করেছেন। কাঙাল হরিনাথ অথবা ফিকির চাঁদের গান সহজ ও গভীর সুরব্যঞ্জনায়, ভাবের লালিত্যে, প্রাণের সুবিপুল ঐশ্বর্যে ও বিনম্র আত্মনিবেদনে অনন্য। তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি রূপের মধ্যে অরূপের এক নিগূঢ় এষণা। তিনি গাইছেন :

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবানিশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ শত শত সূর্য শশী।

অথবা :

হরির চরণ নির্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন,
ফিকির কয় সেই অমূল্য সুনির্মাল্য মাল্য কণ্ঠে কর ধারণ

কিন্তু সবার উপরে সব কিছু ছাড়িয়ে ফিকির চাঁদের গান অসীমের পিয়াসে এক ব্যাকুল ও আন্তরিক আত্মসমর্পণ :

ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে,
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।

কীর্তনের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে ঢপ কীর্তনে যশোহর জেলা নিবাসী মধুসূদন কান-এর রচনা গভীর ও দূরব্যাপী হৃদয়াবেগের সংগে বৈঠকী রাগ-রাগিনীর মিলিত বন্ধনে এক রসঘন মূর্তি লাভ করেছে। মধু কান-এর সৃষ্টি সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলছেন:[১০] মধুকান বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভা-গুণে বাংলার প্রায় সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। "·····ঢপে বৈঠকী রাগরাগিনী যথাযথভাবে অনুকৃত হইত। সুরের বিশিষ্ট ভংগীতেই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। রামপ্রসাদের যেমন একটি বিশিষ্ট সুরের ভংগী ছিল যাহার জন্য রামপ্রসাদী গান বৈঠকী রীতি অনুসরণ করিলেও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, মধু কানের ঢপসুরও তেমনি একটি বিশিষ্ট সুর। ইহাতে কীর্তনেরও ছায়া সুপরিস্ফুট থাকিত।"

আরও একটি সার্থক সৃষ্টির পরিচয় পাই সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য-রচিত শ্যামা সংগীতে। তাঁর সংগীতে আমরা পেয়েছি আধ্যাত্মিক ভাবরস ও টপ্পার চিক্কণ পারিপাট্য এবং সর্বোপরি এক অতন্দ্র আত্মজিজ্ঞাসা যা' কখনও বিক্ষুব্ধ, আর কখনও অচঞ্চল বিশ্বাসে নিবদ্ধ।

বাংলা গানের আর একটি ফসল পাঁচালী গান যেখানে দাশরথি বা দাশু রায় এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। একথা সত্য যে, তাঁর কোন কোন রচনা রুচির তেমন উন্নত মানে পৌছয় নি। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উদ্দেশে তাঁর সুতীক্ষ্ণ ব্যংগ :

আমাদিগকে দিতে নাগর, এলেন গুণের বিদ্যাসাগর,
বিদ্যাসাগর বিধবা পার কর্তে তরীর গুণ ধরেছে গুণনিধি।

নিঃসন্দেহে এবংবিধ রচনায় বিদগ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়া যায় নি কিন্তু দাশু রায়ের অধিকাংশ গীত রচনায় উচ্চাংগ সংগীতের বিচিত্র রাগ-রাগিনীর অবয়বে সুদূরপ্রসারী অনুভবের মগ্নতা প্রকাশিত হয়েছে। জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কবি ও তরজা গান অথবা কীর্তনের প্রথানুগ পদ্ধতি

গ্রহণ করেন নি। ইমনে বাহারে কানাড়ায় ও খাম্বাজে তিনি অস্তিত্বের মহতী বেদনাই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন:

হৃদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।

দাশু রায় সম্পর্কে অমিয়নাথ সান্যাল যথার্থই বলেছেন:[১১] He was the original seer and creator of programme music on refined lines of the traditional art.

---

১. Society—An introductory analysis. পৃঃ ৫৬
২. বঙ্গীয় নাট্যশালা, পৃঃ ৫
৩. গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০, পৃঃ ৫৪
৪. ঐ, পৃঃ ৩৯
৫. সাঙ্গীতিকী, পৃঃ ৪৯।
৬. Captain N. Augustus Willard রচিত A Treatise on the Music of Hindoostan দ্রষ্টব্য।
৭. বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যিক বিষয়ক বক্তৃতা।
৮. Studies in the Bengal Renaissance গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ Music and Song, পৃঃ ৩১৪।
৯. ঐ প্রবন্ধ, পৃঃ ৩১৫।
১০. কীর্তন, পৃঃ ৩৫।
১১. Music and Song প্রবন্ধের পৃঃ ৩০৯। এ প্রসংগে একটি কথা। রবীন্দ্র সংগীত যদিও এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি তবু উনিশ শতক পর্যন্ত কবিগুরু যে সব গান রচনা করেছেন তা' মোটামুটিভাবে তেমন creative হতে পারে নি। তাঁর এই সময়কার রচনায় প্রচলিত উচ্চাংগ সংগীতের অনুকৃতিই লক্ষনীয়।

দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের প্রসংগ

বিমল সেন

বাঙলা দেশে প্রাচীন কাল থেকেই কবিয়াল ও অন্যান্য গীতিকারদের গান প্রধানতঃ তাদের কণ্ঠেই গীত হতো এবং মুখে মুখে প্রচারিত হতো। উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত সেগুলি সংকলনে গ্রথিত করে প্রকাশ করার কোন চেষ্টা হয়নি। সে-সব গান কিন্তু দেশের নর-নারী, পৌরাণিক দেব-দেবী বা দেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধেই রচিত হ'তো অর্থাৎ খাঁটি স্বদেশী ভাবধারা সে-সব গানের মধ্যে প্রকাশ পেতো।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অতীতের সেই সব গানের স্বাদেশিক মূল্য সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশের অতীত প্রীতি ও ইতিহাস চেতনা দেশবাসীর মনে সঞ্জীবিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সেই সব প্রাচীন কবি ও গীতিকারদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রভাকরে এজন্য তিনি বিজ্ঞপ্তি প্রচারও করেছিলেন। জনসাধারণের কাছে সেই সব লুপ্ত রচনা ও লোকান্তরিত কবিদের জীবনীর উপাদান তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আবেদনও জানিয়েছিলেন। এজন্য অর্থ মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিন পরে অবশেষে ফলবতী হয়েছিলো। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সেই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বাঙলা দেশের নবজাগরণের জন্মকাল, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ সংস্কারমুক্ত মনের স্বাধীন চিন্তা—যার ফলশ্রুতি দেশের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও প্রগতি।

নবজাগরণের চিন্তানায়কদের অনেকেই কিন্তু ছিলেন মনীষী ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্য। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মনে তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও ধর্ম ও সমাজ চিন্তায় বিপ্লব সংঘটিত করেন। প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান,

আচার-বিচার বা সামাজিক নিয়ম-কানুন অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। যুক্তিআশ্রয়ী চিন্তাধারা ছাত্রদের মনে তিনি সঞ্চারিত করেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল সমাজ জীবনে কুশিক্ষা কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশে নবজাগৃতি ত্বরান্বিত করেন। রামতনু লাহিড়ি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল বসু প্রমুখ তদানীন্তন যুবকেরা সকলেই ছিলেন তাঁর ছাত্র-শিষ্য।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, যিনি ঘোরতর বাস্তবপন্থী ও মস্তিষ্ক চর্চার অনুরাগী তিনিই আবার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশপ্রেমের আবেগ-বিহ্বল কবি। এই দেশকে তিনি নিজের স্বদেশ জ্ঞানে মনে মনে ভালবাসতেন, পূজো করতেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন। ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত ডিরোজিওর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। স্বদেশের প্রতি তাঁর ভক্তি, দেশের গৌরবের দিন অতীত হওয়ায় গভীর মর্মবেদনা এই কবিতাটিতে অপূর্ব ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাটে তব, অস্ত গেছে চলি
সেদিন তোমার, হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়।
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়!

ডিরোজিও যে স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি যুব সমাজের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে এনে বাস্তব ভিত্তিতে দেশের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে প্রয়াসী ছিলেন তার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলিতে তার ইংগিত প্রচ্ছন্ন। তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন কিন্তু তার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাদেশিক চেতনার উত্তরাধিকার সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রেখে যান।

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সাহিত্যে কাব্যে দেশাত্মবোধ; পরাধীনতার অসহনীয় যন্ত্রণা, ইংরাজ শাসকের বিবিধ অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ কখনো উচ্চারিত, কখনো বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক ও কবিতা, কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবননিষ্ঠ কবিতা, রঙ্গলালের সেই বিখ্যাত

কবিতা—স্বাধীনতার হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়। —অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে সামান্য কয়েকটি এই। ততদিনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও গভীর দেশানুরাগ ও অসামান্য প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে-নায়কের ভূমিকা ধীরে ধীরে অধিকার করেছেন। দেশমাতৃকার সেবায় তাঁর আনন্দমঠের সন্তানেরা উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছে,-বন্দেমাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।…

ঋষির সেই মাতৃমন্ত্র শতাব্দী পার হয়ে এখনও দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

সুগভীর তথ্যনিষ্ঠায় যোগেশচন্দ্র বাগল নবজাগৃতির সামগ্রিক ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। কার্য্য ও কারণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা এবং কারণের গভীরেও যে কারণ তার প্রতিও আলোকপাতই আদর্শ গবেষকের ধর্ম। উনবিংশ শতকে বাঙলার সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নবজাগরণের উৎস ও প্রবাহ অন্বেষণে যোগেশচন্দ্র সেই ধর্মই পালন করেছেন। সেই বিষয়ে যে কয়েকখানি আকর গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন তাদের অন্যতম হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের ধারাবাহিক পর্য্যালোচনায় এই গ্রন্থের প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় নবগোপাল মিত্র যে জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল, তার আত্মিক প্রেরণায় জাতীয় সংগীতের ধারা অত্যন্ত পুষ্টিলাভ করে। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, 'প্রধানতঃ জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার উৎপত্তি'। তিনি আরও লিখেছেন, 'বাঙলা সাহিত্য জাতীয় সংগীতে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে জাতীয় মেলার প্রেরণা। ইতিপূর্বে ডিরোজিও ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজি কবিতায় দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছেন, গুপ্ত কবি, রঙ্গলাল ও মধুসূদন ছন্দে জন্মভূমির ও জননী বঙ্গভাষার প্রশস্তি করিয়াছেন কিন্তু ছন্দে ও সুরে দেশমাতার বন্দনা বা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়।' জাতীয় সংগীত সৃষ্টি জাতীয় মেলার প্রেরণা থেকেই সুরু। যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা কিঞ্চিৎ

আলোচনা সাপেক্ষ অর্থাৎ জাতীয় শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে সামান্য দু-একটি কথা না বললে তাঁর সিদ্ধান্তের সহজ উপলব্ধি সম্ভব নয়। জাতি বা Nation খাঁটি স্বদেশীয় পরিভাষা নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত স্বদেশচিন্তার প্রবন্ধগুলিতে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর National Paper প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সম্পাদনার ভার দেন নবগোপাল মিত্রের উপর। মনে হয়—সুবিস্তীর্ণ স্বদেশভূমির একাত্মচেতনা সুনিয়ন্ত্রিত করার ইচ্ছাতেই মহর্ষি পাশ্চাত্য Nation শব্দ উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃত ঋষি, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তার ফলেই 'স্বদেশীয়' সহজেই 'জাতীয়ে' রূপান্তরিত হয়েছে, হিন্দু মেলা জাতীয় মেলায় এবং দেশাত্মবোধক বা স্বদেশ সংগীত জাতীয় সংগীতে।

ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় মেলার উৎপত্তি প্রংসগে তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করেছেন, 'নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধূয়া তুলিল।' স্বভাবসিদ্ধ মরমতায় পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল কথার নতুন আমদানীর উল্লেখ করে আসলে শব্দটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তারপর যোগেশচন্দ্রের মন্তব্য; 'গুপ্ত কবি, রঙ্গলাল ও মধুসূদন ছন্দে জন্মভূমি ও জননী বঙ্গভাষার প্রশস্তি করিয়াছেন কিন্তু ছন্দ ও সুরে দেশ-মাতার বন্দনা বা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়।' এখানে তিনি 'ছন্দ' অর্থে কবিতা এবং ছন্দ ও সুর অর্থে সংগীত বুঝিয়েছেন অর্থাৎ জাতীয় মেলার আগে দেশাত্মবোধক কবিতা রচিত হয়েছে সত্য কিন্তু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনায় দেশাত্মবোধক বা জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি জাতীয় মেলা-থেকেই আরম্ভ এবং সংগীতের একটি বিশিষ্ট ধারা পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধক সংগীত নামে যা চিহ্নিত, তার উৎস এই জাতীয় মেলা।

জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। আরও একখানি বিখ্যাত গান ওই অধিবেশনেই গীত হয়, সেখানি গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি ক'রে
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥

সাধিলে রতন পাই তাহাতে যতন নাই
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ॥
দেশান্তর জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥

—রাগিনী বাহার। তাল, জং।

হিন্দু মেলার শেষের দিককার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং সংগীতও স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেছেন। জাতীয় মেলা বাঙ্গালীর মনে যে স্বদেশ প্রীতি সঞ্চার করেছিলো তার অনুপ্রেরণায় আরও অনেক জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে বাঙলার নবজাগরণের কাল যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, কিন্তু সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীই বাঙলার স্বর্ণময় যুগ। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজচিন্তা—সব-কিছুতেই তার প্রতিটি দশকেই সৃষ্টিশীল অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দ দাস, আরও অনেক শক্তিমান কবি এই শতকে অপূর্ব স্বদেশী সংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান, দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ,' 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বা 'ভারত আমার জননী আমার,' এবং গোবিন্দ দাসের কয়েকটি গান বাঙলার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করেছে, দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত করেছে। অতুলপ্রসাদ সেনের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানগুলি (উঠো গো ভারতলক্ষ্মী, বল বল বল সবে ইত্যাদি) যদিও বিংশ শতাব্দীতে রচিত তবুও ঐগুলি উনবিংশ শতাব্দীর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

১ ভারতবর্ষের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবি জীবনী ও কবিতা' :

ডঃ ভবতোষ দত্ত

নারী-প্রগতি

ডঃ ঊষা চক্রবর্তী

বৈদিক যুগে মেয়েদের অবস্থা পরবর্তী যুগের তুলনায় অনেক ভাল ছিল হিন্দু ধর্মপুস্তক বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি পড়বার ও পূজা-পার্বনে অংশ গ্রহণ করবার তাদের অধিকার ছিল। এ ব্যাপারে তখনকার দিনে পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে কিছু লেখাপড়াও চালু ছিল। বিবাহ মেয়েদের কাছে তখন কোন সমস্যা ছিল না। নিজেরা নিজেদের বর পছন্দ করতেও পারত। পিতা-মাতার কাছে কন্যার বৈধব্য অহেতুক দুঃখের কারণ ছিল না। পুনঃ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল।

ঐ যুগ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়। এমন এক যুগ আসে যখন কেবল পুরুষেরাই পিতার ও পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি, পূজা-পার্বন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতিতে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পর থেকেই আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ চালু হয় এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এই প্রথার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এদিকে হিন্দুদের মধ্যে নূতন নূতন জাতের উৎপত্তি হয়—যার ফলে মেয়েদের স্বকুলে বিবাহ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ও বিধবা বিবাহ সমাজে হ্রাস পায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সমাজে সতীদাহ প্রথা ও বৈধব্যের কর্কশ জীবন—দুইই পাশাপাশি চলে। ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের এই সব কষ্টদায়ক প্রথা মাতা-পিতার মনের উপর দাগ কাটে,—মেয়ে সন্তানই যেন তাদের দুঃখের কারণ। এ ছাড়া, বিয়ের পর মেয়েদের অন্যত্র চলে যাওয়ার কষ্ট তো কোন দিনই কম ছিল না। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত মেয়েরা সাধারণতঃ ১৬ বৎসর অবধি অবিবাহিত থাকলে সমাজে পিতামাতার কোন দোষ বলে ধরা হত না, তাই ঐ সময়ে মেয়েরা সংসারের কাজের সঙ্গে কিছু লেখাপড়া শেখারও সুযোগ পেত। সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলনের সঙ্গে শিক্ষাও তাদের মধ্যে ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং কালক্রমে অশিক্ষা ও কুসংস্কারে মেয়েদের জীবন ভরে ওঠে।

মুসলমান রাজত্বের সময় মেয়েদের শিক্ষার আরও অবনতি হয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজে বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে। পূর্বের শিক্ষিত ও ধনী সমাজ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নূতন এক ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অবশ্য, ঐ সময় কিছু নূতন হিন্দু পরিবারও ধনী সমাজে স্থান পেল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত বা কৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। সেজন্য এদের মেয়েদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকল না। নূতন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নূতন নূতন সমস্যা এবং দেশে বিশৃঙ্খলা প্রকট হল। মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যাও বেড়ে গেল, সমাজে মেয়েদের উপর অধিকতর বিধিনিষেধ আরোপিত হল, পর্দা প্রথাও হল প্রচলিত। বাল্য বিবাহ আরও বাড়ল। অশিক্ষা, পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ—এই ছিল ঐ সময়ের নারী জাতির অভিশাপ।

উনিশ শতকের নবজাগরণের একেবারে প্রথম দিকে গোড়া হিন্দু সমাজের বেশীর ভাগ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে,—নারীশিক্ষা মহাপাপের ব্যাপার, শিক্ষা পেলে নারীর বৈধব্য অবধারিত। ভারতে ঐ সময় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবস্থা দেখা যায় তা হ'ল চার কোটি স্ত্রীলোকের মধ্যে লাখে একজন লিখতে পড়তে পারে। উচ্চঘরের বাঙালী মেয়েদের বিয়ের বয়স তখন মাত্র ৮।৯ বৎসর। নিম্নবর্ণের মধ্যে অবশ্য ঐ সময়ে শিশু বিবাহ বা বেশী বয়সে বিবাহ,—এই দুইই চালু। উচ্চ হিন্দু ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা ঐ শতকের প্রথম দিকে সাধারণতঃ ঘরেই আবদ্ধ থাকত; বাইরে বেরোনো পাপ—এই ধারণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এই সময়ে গোড়া হিন্দু সমাজের যে চিত্র দেখি তা হ'ল -বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, সতীদাহ, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষা, যৌতুক প্রথা, বৈধব্যের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি। এ সময়ে যে এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, তবে তুলনায় এত কম যে তা চোখেই পড়ে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার সমাজ-সংস্কারকগণ এই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান, যার ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ বিরোধ আইন, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন প্রভৃতি পাশ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করান। সমাজের কুসংস্কারগুলি

হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থ—যেমন বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; এগুলি কেবল লোকাচারের ফলস্বরূপ কালক্রমে সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। সমাজ-সংস্কারকগণ তাদের প্রচেষ্টায় উচ্চবর্ণের নারীদের অবস্থার কিছু উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও যে মূল্যবান কাজ তারা বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য করেছিলেন তা হ'ল তাদের মানস জাগরণ। তারা নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে পর্দার বাইরে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। একেই আমরা উনিশ শতকের নারী-জাগরণ বলি।

স্ত্রী-শিক্ষা সমাজে প্রচলন না থাকলেও এ সময়ে বাংলার মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু পরিমাণে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেও তখনকার দিনে দুইটি সামাজিক মহল চালু ছিল, একটি বাহির মহল বা বৈঠকখানা—যা একান্ত ভাবেই পুরুষদেরই জন্য নির্দিষ্ট; অপরটি অন্দর মহল বা অন্তঃপুর—যা সাবেকী পর্দা প্রথারই সামিল। এই দ্বিমহল প্রথা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশঃ ভাঙ্গতে থাকে। ব্রাহ্ম-সমাজবাদী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৬৫ সালে ব্রাহ্ম মেয়েদের নিয়ে "ব্রাহ্মিকা সমাজ" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজ মহিলাও এতে নিযুক্ত হন। এটাই বোধ হয় সর্বপ্রথম বয়স্কা মেয়েদের ঘরের বাইরে এনে শিক্ষা দেবার প্রথম প্রচেষ্টা। এর বিরুদ্ধে গোড়া হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, ফলে ঐ ব্রাহ্মরা প্রায় একঘরে হয়ে পড়ল! এরূপ প্রতিরোধ সত্ত্বেও একদল মেয়ে নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মিকা সমাজে আসত এবং তাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুদিন পর দেখা গেল—এই রকম মেলামেশায় নবীনগণ তাদের স্ত্রী বা বোনদের অন্য পরিবার বা আত্মীয়স্বজন বহির্ভূত পুরুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। বয়স্করা অবশ্য এই-সব পছন্দ করতেন না। ইতিমধ্যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে গেল। ১৮৬৬ সালে প্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার স্ত্রী জ্ঞানদাদেবীকে নিয়ে সরকারী ভবনে নিমন্ত্রিত হয়ে গমন করেন। ঐ একই সভায় তাঁদের বয়োবৃদ্ধ আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে তাদের সম্পর্কিত বধূমাতাকে অন্য পুরুষের মধ্যে দেখে এতই বিরক্তি বোধ করেন যে তিনি আর কাল বিলম্ব না করে সেখান থেকে রেগে চলে আসেন। এখানে

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখতে চাই যে, জ্ঞানদাদেবী সর্বপ্রথম বাংলা দেশের মেয়েদের আধুনিক প্রথায় সাড়ী ও জামা পরা প্রবর্তন করেন যা' কালক্রমে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেচে।

১৮৭১ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'বামাহিতৈষিনী সভা' নামে আর একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা অবশ্য ব্রাহ্মিকা সমাজের মত ধর্ম্মীয় সভা নয়। এতে উচ্চ হিন্দু ঘরের মেয়েদের আসার অধিকার ছিল। ১৮৭২ সালে কিছু প্রগতিশীল ব্রাহ্ম তাঁদের মেয়েদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানেও ছেলেদের মধ্যে বসতে থাকেন। এই নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে কঠোর সমালোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হল—মেয়েরা উপাসনা ঘরে চিকের বাইরে আলাদা ভাবে বসবে। কিন্তু চিকের ভিতর বসার রীতিও ক্রমে উঠে যায়। গিরিশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী ও বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের শ্বশ্রূমাতা মনোরমাদেবী ১৮৮০ সালে বরিশালে নিজেই ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা পরিচালনার দ্বারা নূতন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। এতদিন পর্যন্ত মেয়েরা কেউই ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কাজ করেন নি।

১৮৭৪ সালে মেয়েদের স্বাধীনতা ও অন্যান্য ব্যাপারে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ—নববিধান ও সাধারণ—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ মেয়েদের জন্য "আর্যনারী" নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, এটি মেয়েদের মধ্যে দেশীয় সাধারণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও 'বঙ্গমহিলা সমাজ' নামে একটি আলাদা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। এই সমিতির মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়। মেয়েদের মধ্যে শিল্পে উৎসাহ দানের জন্য খ্রীঃ ১৮৭৯ সালে এরা একটি শিল্প মেলা করে। এটাই বোধ হয়, সর্ব প্রথম বাঙ্গালী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প মেলা। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখীসমিতি' কর্তৃক আরেকটি শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব মেলায় প্রদর্শিত মেয়েদের হাতের জিনিষ খুব সমাদৃত হয়েছিল। এই ভাবে নানা প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে মেয়েদের কুটীর শিল্প নির্মিতিতে প্রণোদিত করে। ১৯০১ সালে ভারত সরকার সিমলা অধিবেশনে ঠিক করে যে, এ দেশে মেয়েদের জন্য কুটীর শিল্প দ্রব্যাদি

তৈরী করতে শিক্ষা দানের জন্য কেন্দ্র খোলা হোক। যে-সব মেয়েরা মিশনারী বা দেশীয় স্কুলে লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারেনা তারা এই-সব কুটীর শিল্পে শিক্ষা নিলে নিজেদের ভরণ-পোষণ করার সুযোগ পাবে। ক্রমে এই ধারায় বরানগরে 'বিধবাকুটীর শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র', কলিকাতায় 'মহিলা শিল্প সমিতি' প্রভৃতি আরও অনেক অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলির কাজ ভালই চলে এবং এতে মেয়েদের শিল্পকর্মক্ষমতা অর্জনের আনন্দলাভ এবং অর্থ আয় করবার সুযোগ এনে দেয়।

এদিকে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে তাদের উন্নতি হতে থাকে ও নূতন নূতন সৃজনশীল ক্ষেত্রে তারা পদচারণা সুরু করে। ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণকামিনী দাসীর ৩২ পৃষ্ঠার কবিতা বই "চিত্ত বিলাসিনী" ছাপা হয়।

১৮৫৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত নারীরা যে-সব বই লেখেন তার সংখ্যা ৪৪১৮। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯১০ সাল অবধি ২১ জন নারী পত্রিকা সম্পাদনা করে। এ ছাড়া ১৮৫০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ১৬টা পত্রিকা একান্তভাবে নারীদের রচনা নিয়েই প্রকাশিত হতে থাকে। স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, অনুরূপা দেবী, কামিনী রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, কুসুম কুমারী রায় চৌধুরী, শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গমহিলা কবি-সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

১৮৮১ সালে ৪১,৩৪৭ জন মেয়েকে সরকারের সাহায্যপুষ্ট স্কুলে পড়তে দেখা যায়। ১৮৮৩ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ৪৯ জন মহিলা বি. এ. এবং ১৮৮৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ৮ জন মহিলা এম. এ. পাশ করেন।

১৮৬৯ সালে তরু দত্ত তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে ইউরোপে যান এবং ফ্রান্সের এক স্কুলে ভর্ত্তি হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি ফরাসী ভাষায় পারদর্শী হয়ে একশতটি ফরাসী কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি নিজেই ফরাসী-ভাষায় ২৫৭ পৃষ্ঠার একটি বই লেখেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

থেকে ডাক্তার হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যান এবং এডিনবরা, গ্লাসগো ও ডাবলিন থেকে যথাক্রমে এফ. আর. সি. পি., এম. আর. সি., এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। সরোজিনী নাইডু (চট্টোপাধ্যায়) বি. এ. পাশ করে ইংলণ্ডের গীটন কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত এড্‌মণ্ড গুজ্‌, লেখক সাইমন ও ফ্রান্সের জ্ঞানী পুরুষ ডারমেষ্টার তরুদত্ত ও সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়ের (পরে নাইডু) ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই দুই নারী দেখালেন যে, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে মেধাগত তফাৎ নেই।

এ ভাবে দেশে-বিদেশে বাঙ্গালী মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। এ ছাড়া শিক্ষণ বিদ্যায়ও অনেক মেয়ে এগিয়ে আসেন। মনোমোহিনী হুইলাল (বন্দ্যোপাধ্যায়)—পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা ১৮৭৯ সালে সরকারী স্কুল পরিদর্শিকার কাজ গ্রহণ করেন, শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা রাধারাণী লাহিড়ী ১৮৮০ সালে বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা ও ১৮৮৬ সালে প্রধান শিক্ষিকা হন। প্রথম মহিলা এম. এ. চন্দ্রমুখী বোস ১৮৮৪—১৮৮৫ সালে বেথুন কলেজের সুপারিণ্টেণ্ড ও পরে ১৮৮৬—১৯০১ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষা ছিলেন। এইভাবে, বেথুন ও অন্যান্য স্কুলে শিক্ষিকা মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

এদিক ছাড়াও, শিক্ষিত মেয়েরা ক্রমে বাংলার বাইরে নূতন নূতন চাকুরী নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে গেলেন। ১৮৯৪ সালে কুমুদিনী খাস্তগীর, ১৮৯৫ সালে সরলা চৌধুরাণী মহীশূর মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করেন। সরলা দেবী পরে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হ'য়ে মাসে ৪৫০ টাকা বেতন পেতেন। হেমন্তকুমারী চৌধুরী পাঞ্জাবের পাতিয়ালা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৫০ টাকায় সুপারিণ্টেণ্ডের কাজ নেন। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী দেশে ফিরে ১৮৮৮ সালে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতায় ডাফরিন হাসপাতালে সুপারিণ্টেণ্ড পদে বৃত হন।

সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মচেতনা বা আত্মসম্মান বোধও জাগ্রত হয়। এতে সমাজে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যায়। দি বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন নামক

পত্রিকায় দেখি যে, বাংলা দেশে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা লাখে ১৮৭৩ সালে ৩৪.৩, ১৮৭৪ সালে ৪৩.৬, ১৮৭৫ সালে ৪১.৫ ও ১৮৭৬ সালে ৪৪.৬ জন। ঐ একই পত্রিকায় কলিকাতার মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা সংখ্যা লাখে ১৮৭৩ সালে ৫৪.২, ১৮৭৪ সালে ৮৮.০; ১৮৭৫ সালে ১৪৯.০ এবং ১৮৭৬ সালে ১২৭.২ জন ছিল। বাংলার বাহিরে অন্যান্য জায়গায় যথা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, এমন কি ইংলণ্ডেও মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা ঐ সময় অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

উনিশ শতকের মধ্য পর্যন্ত পতিতা মেয়েদের হিন্দু সমাজে কোন স্থান ছিল না; (অবশ্য খৃষ্টান মিশনারীরা ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিতাদের নিজেদের সমাজে স্থান দিত) অথচ, শহরে সৈনিকদের প্রয়োজনে ও কোন কোন বড়লোকের আভিজাত্যের মাপকাঠি হিসাবে এদের চাহিদা ছিল। ১৮৭৩ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুপ্রেরণায় প্রথম এদের নিয়ে থিয়েটার ব্যবসা আরম্ভ হয়। জগৎতারিণী, এলোকেশী, গোলাপ, শ্যামা প্রভৃতি পতিতা মেয়েরা বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত মাইকেল মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করে। এইভাবে এই সব মেয়েরা সৎভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেল। ক্রমশঃ অপরাপর রঙ্গমঞ্চ খোলা হ'লে সে-সবে এরা ভদ্র সমাজের পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করত। কালক্রমে, এদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। কেউ কেউ বই লেখে, যথা—বিনোদিনী, কেউ বা বিয়ে করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৫—১৯২৭ সালের মধ্যে এরা ১টী নাটক, ১টি গল্পের বই, ৩টি আত্মচরিত, ২টি কবিতার বই ও ১টি বিবিধ বিষয় নিয়ে বই লেখে। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ প্রচুর আয় করে এবং ঐ সব অর্থ হাসপাতালে বা দুঃস্থতা বিদূরণ সংস্থায় গরীব লোকদের সাহায্যার্থে দান করে। বহুকাল পরে এ-সব মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়।

এ দেশের নারী শিক্ষা বিস্তারে খৃষ্টান মিশনারী

উনিশ শতকে মেয়েদের উন্নতির জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা যে-সব কাজ করে তার মূল্য কম নয়, যদিও তাদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও তাদের ধর্মান্তরিত করা। ১৮০৭ সালে খৃষ্টান মেয়েদের জন্য স্কুল,

১৮১১ সালে নিরাশ্রয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের জন্য স্কুল, ১৮১৯ সালে সাধারণ মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন ক'রে এরা মেয়েদের শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮০৭-১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এরাই কেবল মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে। ১৮৪৭ সালে উচ্চ ঘরের মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার পর আমরা মিশনারীদের কেবল দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের জন্য স্কুল করতে দেখি এবং খ্রীঃ ১৮৫৭-র কাছাকাছি সময় তারা গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারেও মনোযোগ দেয়। অধিকন্তু তারা সমাজের শিক্ষিত ও উদার লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক সামাজিক ব্যভিচার দূর করতে সাহায্য করে। ১৮২৯ সালে যখন সতীদাহ আইন পাশ হয় তখনও তারা দেশীয় সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে ছিল। ১৮৬৪ সালে যে সংক্রামক ব্যাধি-রোধ আইনে সমাজচ্যুত মেয়েদের উপর সৈন্যদের অত্যাচারের সুযোগ এনেছিল তখন তারা এর বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়। স্মরণীয়, এরাই সর্বপ্রথম ১৮৯৬ সালে কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম এবং ১৯০৬ সালে অন্ধদের জন্য স্কুল স্থাপন করে।

নারীর কল্যাণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেবল খৃষ্টান মিশনারীরা, দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম-সমাজবাদী বাঙালী ও কোন কোন প্রগতিশীল হিন্দু এবং পরে বাঙালী নারীরাও স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৮৭২ সালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নূতন ভাবে মেয়েদের দেখতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সারদা দেবীকে জগতের মাতা রূপে কল্পনা করে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এ পর্যন্ত মেয়েদের কাজকর্ম প্রধানত পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা জগতের কল্যাণকারিণী রূপে প্রকাশ পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ বিধবা মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় সুপরিকল্পিত ভাবে এই কার্যে পরবর্তী কালে মনঃসংযোগ করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী মেয়েরা তাঁদের ভাইদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় তার জন্য বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে একদল মেয়ে লিখিত ভাবে আবেদন পত্র পাঠায়। কবি কামিনী রায় (সেন)ও আলাদাভাবে বেথুন স্কুলের মেয়েদের নিয়ে এই বিলের সমর্থন জানান। এই বোধহয় প্রথম বাঙালী মেয়েদের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে মফঃস্বলে দেশীয় বিচারকদের অক্ষমতা অবিলম্বে দূর করা ছিল ইলবার্ট বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে দুইজন বঙ্গনারী—স্বর্ণকুমারী দেবী ও ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যোগদান করেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে তাতে বাঙ্গালী মেয়ে ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী আরও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে ধন্যবাদ সূচক ভাষণ দেন। ১৯০১ সালে সরলাদেবী কংগ্রেস অধিবেশনের সময় গানে অংশ নেন। দেশের মুক্তির জন্য সরলাদেবী নানাভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতী পত্রিকায় সুলিখিত প্রবন্ধাদির মধ্যে আজও তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ ছাড়া যুব সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সরলা দেবীর প্রচেষ্টা ভুলবার নয়। স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে নানা আঁখড়া গড়তে তিনি ছেলেদের উৎসাহিত করেন ও নিজেও তাদের জন্য কুস্তিগীর নিয়োগ করে ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করে দেন। ছেলেদের দিয়ে তিনি ভারতের মানচিত্র স্পর্শ করিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিতেন যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য দরকার হলে তারা প্রাণ বিসর্জন দেবে। এইভাবে জাতীয় কংগ্রেস ও তার বাইরে মেয়েরা জাতীয় আন্দোলনে নানা ভাবে অংশ নেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলার মেয়েরাও ব্যাপক ভাবে বাংলা ভাগ হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বাংলার গ্রামে, সহরে ও বাংলার বাইরেও বাঙালী মেয়েরা নানা সভাসমিতির মাধ্যমে রাখিবন্ধন, অরন্ধন, ও বিদেশী দ্রব্যবর্জনের শপথ গ্রহণ করে।

মুসলমান নারী

বাঙ্গালী-হিন্দুদের মত মুসলমান নারীরাও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পর্দানসীন ছিল। প্রচলিত শিক্ষা থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। আইনে অবশ্য তারা ছেলেদের সমান ছিল। বিধবা বিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল, স্বামী ত্যাগ ত তারা আইনত করতে পারতো, পণ-প্রথা তাদের ছিল না। পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার ছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারা কোন কিছু সম্মানজনক ভাবে ভোগ করতে পারত না, তাদের অজ্ঞতাও ছিল পর্দা-প্রথার জন্য। হিন্দুদের চেয়ে এদের পর্দা-প্রথা বেশী বিভীষিকাময় ছিল, কারণ পর্দা-প্রথার সঙ্গে যুক্ত ছিল 'বোরখা' প্রথা। এ বিভীষিকার কথা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নামে এক মুসলমান নারী তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন। তাঁর এক আত্মীয়া এক সময় বোরখা পরে ট্রেনে চেপে অন্যত্র যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ গাড়ীর তলে পড়ে বোরখায় জড়িয়ে যান। তাঁকে কিন্তু সেখান থেকে তুলে নেবার অনুমতি কোন লোক পায় নি, কারণ সেখানে কোন স্ত্রী-লোক ছিল না—কেবল পুরুষই ছিল, ফলে তিনি গাড়ীকাটা হয়ে মারা যান। আর এক ক্ষেত্রে একজন পর্দানসীন মুসলমান মেয়ে ঘরে আগুন লাগা সত্ত্বেও বাইরে না এসে পুড়ে মরে।

হিন্দু মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনের সাথে সাথে এদের মধ্যেও কিছু কিছু শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। মুরশিদাবাদের সৈয়দ মনসুর আলির স্ত্রী মুসলমান নারীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে অর্থ দান করেন। এ ছাড়া, তিনি নানা দাতব্যালয়েও দান করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই সব দানের জন্য তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯০৭ সালে রোকেয়া বেগম সাখাওয়াৎ হোসেন কর্তৃক কলিকাতায় মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য এটি সরকারী স্কুলে পরিণত হয়ে বর্ত্তমানে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। এইভাবে মুসলমান সমাজের নারীরা ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানা সমাজকল্যাণ কাজে ব্রতী হন। তাদের অনেকে পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনেও হিন্দুনারীদের হাতে হাত মিলিয়ে যোগ দেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের নিম্ন কোটীর মেয়ে।

সমাজের বহু নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সাধারণত বেশী বয়সে বিবাহ হত। উঁচু ঘরের মেয়েদের মতো যৌতুক বা বরপণ প্রথা এদের মধ্যে ছিল না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেরাই মেয়ের মা-বাবাকে টাকা দিত। বিধবা বিবাহ এদের সমাজে চালু ছিল। বহু বিবাহ প্রথা প্রায় ছিলই না। কন্যা সন্তান জন্মালে এদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মতো কোন বিরূপ ভাব জন্মাত না।

মেয়েরা বিয়ের আগে তাদের মা-বাবার সঙ্গে পরে স্বামীর সঙ্গে সমানে কাজ করত। কাজেই তারা মা-বাবা বা স্বামীর ঘরে ভার স্বরূপ বিবেচিত হতো না। তবু তাদের সীমিত আয়ের কোন উদ্বৃত্ত থাকত না। ফলে, কোন বৎসর অজন্মা বা বন্যা হলে তাদের দুঃখ চরমে উঠত। অনেক সময় অভাবের তাড়নায় মা-বাবা তাদের অবিবাহিত কন্যাদের সমাজচ্যুত নিন্দনীয় মেয়েদের কাছে অথবা খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে বিক্রয় করে দিত।

গরীব ঘরের মেয়েরা বাড়ির কাজের ফাঁকে ফাঁকে জাত ব্যবসায়ে বাবা-মা বা স্বামীদের সাহায্য করত। উনিশ শতকের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে কুটীর শিল্পের দুর্দিন আসতে থাকে এবং এই শতকের শেষের দিকে বিশেষত যখন বাংলাদেশে বিদেশীয় অর্থে কলকারখানা গড়ে ওঠে, তখন এদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়। গ্রামের কুটীর শিল্প বিনষ্ট হয়ে যায়। অভাবের তাড়নায় তাই তারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সহরে কাজের চেষ্টায় চলে আসে। এদিকে কল কারখানা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে কাজ করার লোকেরও চাহিদা বেড়ে চলে। পুরুষ মজুরের বেতন বেশী, সেজন্য কিছু কিছু কারখানার মালিক কম মজুরীতে মেয়ে মজুর নিযুক্ত করত।

১৮৬০ সালে ঘুস্থরী মিলে পুরুষ ও নারী মজুররা মিলিতভাবে বেশী বেতনের দাবিতে কারখানার কাজ বন্ধ করে। ১৮৮১ ও ১৮৯০ সালেও মেয়ে মজুররা একযোগে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করে।

বর্তমান যুগ

বর্তমানে উনবিংশ শতকেরই ক্রিয়াকলাপের ফল রূপে বাঙ্গালী মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীর ধর্ম সংসার করা। শিক্ষিত মেয়েরা তাও করে এবং অধিকন্তু জাতির সর্ববিধ কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত

হয়ে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, সরকারী বে-সরকারী কার্যে নিম্নপদ থেকে উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

অনেক বাঙালী মেয়েকে পাইলট, যাদুকর, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ, আইনজীবী, সমাজসেবিকা, মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট, সেনেটের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, প্রাদেশিক গভর্ণর, পর্বতারোহী, প্রত্নতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি দেখি। আবার এই সব বাঙালী মেয়েদের অনেকে ভারতীয় নারীর মধ্যে প্রথম মহিলা। সরোজিণী নাইডু (চট্টোপাধ্যায়) প্রথম মহিলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও গভর্ণর হয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩১ সালে বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বাংলার স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দীতেই অবশ্য তাঁর জন্ম। বলা দরকার, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও, অন্যান্য রাজ্যের মহিলারাও বাঙালী নারীদের ন্যায় সমাজ জীবনের সর্বস্তরে কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন।

জ্ঞানান্বেষণ

ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র

॥ ১ ॥

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

'জ্ঞানান্বেষণ' জ্ঞানের অন্বেষণে ধাবিত হয়েছিল, দয়া ও সত্য প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তার লক্ষ্য। জনগণের মধ্য থেকে অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূরীভূত করাই ছিল তার সাধনা। যে মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি দেশবাসীর অন্তরলোক অধিকার করে আছে, জ্ঞানান্বেষণ সেই শঠতার অবসান কামনা করেছিল।

জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ ছিল ঐ দুইটি সংস্কৃত শ্লোক, আর তারই অনুবাদ চারি ছত্র বাংলা পদ্য। ইতিপূর্বে Enquirer ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে একই কাজ করে চলেছিল। মাত্র একমাস পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ঐ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৭ই মে ১৮৩১ সন। আর জ্ঞানান্বেষণ আত্মপ্রকাশ করল ১৮ই জুন, ১৮৩১ সন। এনকোয়ারার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; ১৮৩১ সনের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল; প্রকাশনা বন্ধ হয়েছিল ১৮৩৫ সনে মে মাসেই। ক্যালকাটা কুরিএরে এনকোয়ারার পত্রিকার একটি ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে ১৮৪০ সনে ১৪ই মার্চের সংখ্যায়। তাতে বলা হোল, ঐ পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মুখপত্র হবার জন্য এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; দেশের উন্নতির সঙ্গে জড়িত সর্বপ্রকার প্রশ্নই এই পত্রিকায় উত্থাপিত হোত; ঐ চমৎকার ভদ্রলোকের (Excellent gentleman) খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বনের পর পত্রিকাটিও খৃষ্টীয় চরিত্র ধারণ করে। দুই

শত সংখ্যার অধিক ছিল এর প্রচার ; অধিকাংশ পাঠক এতদ্দেশীয়। প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক ; পরে ত্রিসাপ্তাহিক ; তারপর দ্বিসাপ্তাহিক ও আবার কিছু কাল পরে তার পূর্বতন রূপে ফিরে এল, সাপ্তাহিক হোল। পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়ে যাবার ছয় মাস পূর্ব থেকে রেভারেণ্ড ডক্টর হিবার্লিন (Haeberlin) মাসিক পত্রিকা রূপে এই কাগজটি পরিচালনা করেছিলেন।

জ্ঞানান্বেষণ প্রথম সংখ্যা ১৮৩১ সনের ১৮ই জুন আত্মপ্রকাশ করল ; পত্রিকার মুখবন্ধ স্বরূপ প্রবন্ধটি এখানে উৎকলিত করা গেল। "এর প্রয়োজন এই যে, এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোত্তর অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মনু মিতাক্ষর প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়ত: এই যে এতদ্দেশ নিবাসি অনেকেই আপন জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে। ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়ত: এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি-বিস্তারিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"

স্বভাবতই এই মুখবন্ধ পড়ে আমাদের ডিরোজিও পন্থীদের অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এনকোয়ারার' পত্রিকার মুখ-বন্ধ প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ স্মরণ হয়। 'Enquirer-এর বক্তব্য ও ভাষা ছিল অনেক জোরালো, বিতর্কপরায়ণ এবং আক্রমণমূলক।

জ্ঞানান্বেষণ আত্মপ্রকাশ করলে নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ যে মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে গঠনমূলক পরামর্শ ছিল। "জ্ঞানান্বেষণ" কতক বিজ্ঞতম যুব মহাশয়েরদের

কর্তৃক কলিকাতা নগরে প্রকাশিত অত্যুত্তম। জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অনুষ্ঠান আমরা এই সপ্তাহে অনুবাদ করিলাম। তাঁহারদের এই প্রশংসনীয় ব্যাপারে তাঁহারা যে কৃতকার্য হন এবং তৎপ্রকাশিত পত্রে তাঁহারদের সম্ভ্রম ও দেশের উপকার হয় এমত আমাদের আকাঙ্ক্ষা। মধ্যে ২ জ্ঞানান্বেষণের উক্তি দর্পণে অর্পণ করিতে আমাদের মানস আছে।

অপর তৎপত্র সম্পাদক যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে কেবল জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড বিষয়কো কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞান সম্পর্কীয় পত্র পাঠার্থে জনপদ তাদৃশ পরিপক্ক নয় সকলিই নূতন ২ সম্বাদ শুশ্রূষায় অনুরক্ত। বিশেষতঃ ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানা কর্ম হইতেছে অতএব সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা ব্যগ্র কিন্তু যদ্যাপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থির রাখিয়া সম্বাদ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাঁহার প্রতি আমারদের এই পরামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে ২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পাঞ্জিকা কি রাধার সহস্র নাম তাহার একটাও না ছাড়েন। অতি গুরুতর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে। এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকো যন্ত্রালয় আছে তাহাতে প্রতি মাসে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা প্রায় সম্পাদক ও অন্য ২ লোকের বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে যে এ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এ মত কদাচ অনুমেয় নহে।" (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই, ১৮৩১)।

বেঙ্গল ক্রনিকল পত্রিকায় ৭ই জুলাই সমাচার দর্পণের এই মন্তব্যটি অনূদিত হয়। এবং বিনা মন্তব্যে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বেঙ্গল ক্রনিকল সমাচার দর্পণের পরামর্শকে সুপরামর্শ বলে বিবেচনা করেছিল। বেঙ্গল ক্রনিকল ছিল বেঙ্গল হরকরা দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ। উদার পন্থী কাগজ। রামমোহন পরিচালিত সম্বাদ কৌমুদী সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিল : "জ্ঞানান্বেষণ নামে এক সমাচার পত্র যাহার সূচনা পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় নাই গত শনিবার ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদৃষ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ

পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ হইল।" (২ জুলাই, ১৮৩১)। প্রায় ছয় মাস পরে সম্বাদ তিমিরনাশক এক বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

"সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহ দত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন যে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্মিক-বর শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা কর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দু শাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোক মাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটিতে পাঠাইয়া দেন।" (২১ জানুয়ারী, ১৮৩২)। এই মন্তব্যে সম্পাদক এবং সম্পাদকের সহায়ক সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রিকার সহযোগী, অর্থাৎ ধর্মসভার সমর্থক ও পক্ষভুক্ত। পরবর্তীকালে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকায় একই প্রকার বিরূপ মন্তব্য করা হয়। 'এনকোয়ারার' জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার প্রকাশনায় আনন্দ প্রকাশ করেছিল; এবং দেশবাসীকে এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন। সমগ্র মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা গেল:

The Gannanneshun

Since our last appearance we have had the pleasure of receiving the first number of the Gannanneshun, a weekly periodical, conducted in the Vernacular Tongue by a few Hindoo gentlemen, who were educated at the college. The object of the proprietors is not to render this journal a newspaper. It is intended to be a medium of communicating

knowledge to the natives. Considering the able hands by which it is managed, we have strong reasons to expect that it will be conducive materially to the moral and intellectual improvement of the Hindoos. Prejudices when deeply rooted make men blind as to render them unfit for entering into any reasonable enquiry after truth. Conscious of this, our new contemporary has very widely assumed a character some what like that of thc Spectator of old. Ridicule and satire are well adopted to expose superstition and begotry in their native black colour, and thus by gradual steps to eradicate them from the mind. We heartily wish success to our contemporary, and hope his paper will command the respect and influence which it truly diserves. We particularly recommend it to the support of our countrymen ; and assure them that it will greatly contribute to the promotion of their interests."

এনকোয়ারারের এই মন্তব্যটি বেঙ্গল ক্রনিকল পত্রিকায় ৩০শে জুন, ১৮৩১ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এনকোয়ারার যা চেয়েছিলেন, তা জ্ঞানান্বেষণ অবশ্যই পূরণ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানান্বেষণ অনতিকালের মধ্যে শুধু যে বাংলা ভাষা নির্ভরতার অবসান ঘোষণা করল, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সমস্যার পাশাপাশি সাময়িক প্রসঙ্গ ঐ পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত হোল।

জ্ঞানান্বেষণ প্রথম যুগে সম্ভবত সংকলন গ্রন্থের স্বভাব অনুসরণ করেছিল। ১৮৩৩ সালে মিঃ ডবলু উলাষ্টোন, গঙ্গাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় "The Hindu Manual of Literature and Science" নামে যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে তার ছিল প্রকৃতিগত ঐক্য।

এই পরিবর্তনের পূর্বে নিম্ন ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় :—

"আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাত পূর্বক বিজ্ঞাপণ করিতেছি আপনকারদিগের আনুকূল্যে জ্ঞানান্বেষণ পত্র আরম্ভাবধি এ পর্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল এই ক্ষণে আমাদের

বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবধি গৌড়ীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেন না যদিও বঙ্গ-ভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষা পাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয় দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃশ মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উক্তমানুরক্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয় অতএব বিবেচনা করিলাম জ্ঞানান্বেষণে যে ২ বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা ঐ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণ পাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয় দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম। বর্তমান মাসাবধি পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হইল।"

[জ্ঞানান্বেষণ, উদ্ধৃত-সম্বাদ কৌমুদী, ১৯ জানুয়ারী, ১৮৩৩]

এই বিবরণ থেকে জ্ঞানান্বেষণ-পাঠকদের সংখ্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা গ্রহণ করতে পারি। সম্বাদ তিমিরনাশক লিখেছিলেন "ভদ্রলোক মাত্র ঐ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটিতে পাঠাইয়াদেন।" সম্ভবত এই উক্তি বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির উক্তি; সাধারণত বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিরা সত্যের বিকৃতি সাধন করে থাকেন; এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

শুধু দেশীয় ভদ্র ব্যক্তিরা নন, বিদেশীয় ভদ্র ব্যক্তিরাও এই পত্রের পাঠক ছিলেন, উৎসাহদাতা ছিলেন। Calcutta Courier ১৮৭০ সনে ২৬শে নবেম্বর লিখেছেন, "In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos" ১৮৩৩ সনে জ্ঞানান্বেষণ ডাকযোগে একশত কপি প্রেরিত হোত; ১৮৩৮ সনে ২১০ কপি। ঐ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রচার সংখ্যা খুব নিন্দনীয় নয়। কারণ, জন বুলের প্রচার সংখ্যা ছিল ডাকযোগে ৩০৬; ইণ্ডিয়া গেজেটের ৩৭৩; রিফর্মারের ৪০০; আর বেঙ্গল হরকরার ছিল ৭০০। অবশ্য হাতে হাতে যে কয়টি কাগজ বিক্রীত হোত, তার সংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। সে যুগে সংবাদ-পিপাসা জাগছে; কিন্তু তার সঙ্গে সমান তালে নিয়মিত প্রকাশনা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার পরিচালনা-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করা উচিত।

এই পত্রিকার শিরে একটি সংস্কৃত শ্লোক বাংলা অনুবাদসহ শোভা পেত। এই রীতি শুধু জ্ঞানান্বেষণ একা অনুসরণ করেনি। দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত

রামমোহন পরিচালিত পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র শিরে শোভা পেত একটি শ্লোক—

দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ॥

সম্বাদ কৌমুদীর বিরোধী ছিল সমাচার চন্দ্রিকা; কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বিরূপতা ছিল না। তার মস্তকেও শোভা পেত একটি সংস্কৃত শ্লোক। বঙ্গদূত (১৮২৯, মে), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১, ২৮ জানুয়ারী), সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫, ১০ জুন), সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ রসরাজ, সোমপ্রকাশ, গ্রামবার্তা প্রকাশিকার শিরেও সংস্কৃত শ্লোক শোভা পেত। এমন কি খৃষ্টীয় পত্রিকা অরুণোদয় পত্রিকার শীর্ষেও একটি সংস্কৃত শ্লোক স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অমৃত বাজার পত্রিকাও মস্তকে শ্লোক ধারণ করত, কিন্তু সেটি সংস্কৃত শ্লোক নয়, বাংলা।

জ্ঞানান্বেষণ এ ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অবলম্বন করেছে। জ্ঞানান্বেষণ কেন দ্বি-ভাষিক হোল? সংস্কারধর্মী পত্রিকা বলেই হয়ত জ্ঞানান্বেষণ দ্বি-ভাষিক পত্রিকায় পরিবর্তিত হয়। দেশীয় (native) ও ইংরেজ ভদ্র ব্যক্তিদের কাছে নব্যশিক্ষিতদের মাতামত পৌঁছে দেওয়াই পত্রিকার উদ্যোক্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে পত্রিকা দ্বি-ভাষিক রূপ পরিগ্রহ করে।

সেকালের অনেক পত্রপত্রিকাই দ্বি-ভাষিক রূপে প্রকাশিত হোত। Baptist Auxiliary Missionary Society প্রচারিত Gospel Magazine (1819, Dec.); রামমোহন রায় প্রচারিত Brahminical Magazine (1821, Sept.) ছিল দ্বি-ভাষিক। এ ছাড়া, বিজ্ঞান সার সংগ্রহ (Hindoo Manual of Literature and Science) ছিল দ্বি-ভাষিক পত্র। তবে এই পত্রিকা ঠিক সাময়িক পত্রিকা নয়। ১৮৩১ সনে প্রকাশিত সম্বাদ সার সংগ্রহ ছিল দ্বি-ভাষিক পত্রিকা।

এই বঙ্গীয় সংস্করণ অমৃত বাজারের সঙ্গে যেমন আজ যুগান্তর পত্রিকা জড়িত বা আনন্দবাজারের সঙ্গে Hindusthan Standard পত্রিকা জড়িত, ঐ জাতের বঙ্গীয়ত্ব নয়।

জ্ঞানান্বেষণের এই দ্বি-ভাষিক রূপ রক্ষা করা যত্নসাপেক্ষ ছিল; এবং

গৌরীশংকর (সম্ভবত আর্থিক কারণে) পদত্যাগ করলে এই পত্রিকা পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

গৌরীশংকর ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর সম্বাদ ভাস্করের জন্যও ইংরাজি সংবাদসমূহ অনুবাদ করার কাজে অন্য লোক নিয়োগ করতে হয়েছিল। 'ভদ্রার্জুন' প্রণেতা তারাচরণ শীকদার এই কাজ করতেন। শীকদার মহাশয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"তিনি আমাদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গ ভাষায় ইংরাজির অনুবাদ করিতেন।"

জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার অনুবাদাদি সম্ভবত রামচন্দ্র মিত্রেরাই করতেন। গৌরীশংকর ঐ অনুবাদের ব্যাকরণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্যান্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

॥ ৩ ॥

জ্ঞানান্বেষণের প্রকাশক ও সম্পাদক কে ছিলেন—এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। সুখেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনী গ্রন্থে বলেছেন যে, রসিককৃষ্ণ ১৮৩৫ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৩৭ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদনা ভার বহন করেছিলেন। অথচ হিন্দু কলেজের কমিটির ১৮৩১ সনের ১১ই জুনের কার্যবিবরণীর অন্যতম বিষয় হোল, "Letter from Rassic Kista Mullic proposing to publish a newspaper and applying for subscription." এবং কমিটি এই আবেদন নামঞ্জুর করেন নি, মঞ্জুরই করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। * * * দক্ষিণানন্দন নামে সম্পাদক হইলেও ইহার সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশংকর। * * * ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জ্ঞানান্বেষণ দ্বি-ভাষিক (ইংরাজী বাংলা) পত্রে পরিণত হয় এবং ইহার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন দক্ষিণানন্দনের বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। গৌরীশংকর পূর্ববৎ ইহার বাংলা বিভাগ পরিচালন করিতে থাকেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ খণ্ড গৌরীশংকর তর্কবাগীশ—পৃ—১২৩)।

অথচ কলেজের কার্যবিবরণী থেকে রসিককৃষ্ণের অনুমতি প্রসঙ্গের সংবাদ পাচ্ছি। সেকি তবে অন্য কোন কাগজের জন্য? ব্রজেন্দ্রবাবু বলছেন, ৩১শে মে দক্ষিণানন্দন সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছিলেন। ১৮৩২ সনে ২১শে জানুয়ারি সম্বাদ তিমিরনাশন জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার অনেক নিন্দাবাদ করেছে; কিন্তু ঐ নিন্দাসূচক প্রবন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ আছে। পত্রিকায় বলা হয়েছে, "সন ১২৩৮ সালের ৫ই আগষ্টে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয়, তাহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত দক্ষিনানন্দন ঠাকুর..." দক্ষিণানন্দন যদি কেবল প্রকাশক হন, তা হলে রসিককৃষ্ণ মল্লিককে সম্পাদক বলে সাব্যস্ত করা যায়। তবে ঐ প্রবন্ধের অন্যত্র দক্ষিণানন্দনকে 'এডিটর পদলোভী'ও বলা হয়েছে। তবে সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রিকার সম্পাদকের ইংরিজি জ্ঞানের দৌড় খুব বেশি নয়। কাজেই পরিচালক ও সম্পাদকের পার্থক্যটুকু তিনি গুলিয়ে ফেলতে পারেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর Philanthropist পত্রিকায় দক্ষিণানন্দন সম্পর্কিত একটি সংবাদে তাঁকে "শ্রীযুক্তবাবু দক্ষিণানন্দ মুখুয্যা (Last Editor of the Jnanunneshun)" বলে অভিহিত করা হয়। তবে কি রসিককৃষ্ণ এই সময়ে সম্পাদকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি প্রথমে প্রকাশক ছিলেন? হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাগজ প্রকাশ করবার জন্য অনুমতি চাইবার সার্থকতা কি? রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' বলেছেন যে, আদালতে দাঁড়িয়ে রসিক কৃষ্ণ বলেছেন যে "আমি গঙ্গা মানি না।" (পৃঃ ১২১, নিউ এজ সংস্করণ)। ঠিক একই প্রকার কাজ করেছিলেন রসিকের বন্ধু কৃষ্ণমোহন; তিনি তাঁর পত্রিকা Enquirer-এর অনুমতি পত্র গ্রহণের জন্য পুলিশ কার্যালয়ে এফিডেবিট করার সময় গঙ্গাজল স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন, বলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম মানেন না। রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে যে কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, তা তো পত্রিকার প্রকাশ-অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এ প্রশ্ন পরিহার্য প্রশ্ন নয়।

জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে রসিককৃষ্ণের যোগাযোগ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পর, তা অনস্বীকার্য। ১৮৩৩ সালে তিনি যখন জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে বাধ্য হন, তখন জ্ঞানান্বেষণের জন্য নতুন পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯শে জুলাই জ্ঞানান্বেষণে এই নব ব্যবস্থা গ্রহণের

প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে একটি নিবন্ধ প্রচারিত হয়; ঐ প্রবন্ধ জ্ঞানান্বেষণের ইতিহাস সম্পর্কিত বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে। প্রবন্ধটির অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম।

The Gyananneshun

The Gyananneshun of the 12th instant will have informed our readers and subcribers of the change that has occurred in the labour of its editorial duties, and they our now to understand that these have reverted to the hands of the earliest conductor. It will not be deemed irrelevant if we take this occasion to recapitulate what was contemplated on the first establishment of the paper which has received the patronage and countenance of both Europeans and natives for space of nearly three years, who have disposed to foster its pretension from a conviction that the honesty and disinterestedness of its purposes were not at all assumed. Gain was never the desideratum because the intent was purely to animate the energies of the natives by opening a channel of information exclusively directed towards their immediate advantage, and although there has at all times been a subscription list sufficiently full to answer the expectation of the proprietors—the consideration has been served to the hope of inviting encouragement,·········The paper has paved its way so as to maintain the position it was expected to hold, but it would be making a very cold and heartless return to the kindness of those who have lent it the assistance of their purse and their influence, if we manifested no warmer feeling for their generosity and friendship than a mere

recital of the fact. We have had the happiness to remember amongst our contributors men distinguished by liberality of sentiment, and a strong disposition to promote the moral and political amelioration of their compatriots. The work, whatever its degree of merit, has been altogether native ; and we please ourselves with thinking that our columns have never proved the medium of scandal or unkindness, but rather that the details have been so conducted as to lead by legitimate means to the very end for which the paper was originated.

Several European gentlemen of the first-rank and respectability (attracted solely by the principle on which we started) afforded us their best wishes by taking copies of our little periodical and in these the instance was so much the more striking as they had on their inducement than the native impulse of their benevolence, in stimulating our labours, for the sake of that good which, at least those labours were intended to produce, and which we hope we may without immodesty declare have been watched with scrupulousness, and an unrelaxing determination to work up to our professions.

About 7 years ago, when the Gyananneshun was first issued and published in the vernacular tongue of Bengal, and continued to be delivered in that language for the space of nearly three years. A change was afterwards wrought by placing in juxtaposition articles in English and Bengalli in the belief that the doing so would increase the interest of the paper and afford an opportunity to its European friends and readers of ascertaining the progress,

which the native mind was making in the acquirement of knowledge generally, and specially such portion of it, as would prove the most likely to raise them from the slavish condition in which they had been found, and encourage a spirit of enquiry which would necessarily put forth the fruits of their labour and their cure. Shortly prior to this arrangement indisposition and absence from the Presidency induced us to call in the aid of our esteemed and talented co-partner Baboo Rassic Krishna Mullick, whose abilities have from that period to the present proved the mainstay of publication. It is needless to state with what power and success he has preserved our interests. The credit he created is to be found in the extracts which we have had pride of seeing in the various publications of the Calcutta Press. Our contemporaries of the Hurkara, India Gazette, Englishman, Courier and Durpun, have frequently deemed our effusions worthy of repetition in their columns, and we could aspire to no higher praise.

Within thc period to which we refer many a native paper has risen and disappeared. The Gyananneshun has been destined to witness the decline of many co-simultaneous efforts and its proprietors cannot but feel grateful for that support which has borne them then far truimphantly through. In the first instance the expenses of the paper were for some years defrayed from the pocket of its orginators, but eventually it has paid itself. As, however, the present intention is to give it a wider scope by causing to embrace a multiplicity of objects not hitherto contemplated, the proprietors solicit a continuance of that kindness an generosity

which Gyananneshun has hitherto never failed to experience. To meet this enlargement of plan, which must necessarily be attended by superincumbent expense, proprietors rely on the assistance of their friends, and of all those who are disposed to the extension of native information and the general welfare of India In a future number we shall take occasion to detail the extension to which we thus cursorily allude, for the present it may be permitted us to observe that if the Gyananneshun has fulfilled the intent of the conductors, it has been found the unflinching advocate of every enlightenend measure, and has scanned with impartiality those acts of power which referred to the condition of our country not fearing to censure, where to censure seemed necessary. nor hesitating to applaud, where the act in question appear to merit the support and sanction of every honest mind. On these principles the paper has been carried forward, and from these, it may be fairly assumed that its departure and its death will have but one eloge ; whilst it will endeavour to convey under its new arrangement, a variety of intelligence which may have probably been wanting in its past efforts, from the limited scale in which the paper was originally projected.

(Gyananneshun, July 19 ; Englishman, 20th July, 1837.)

এই প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল তিনটি।

(১) ইংরেজী ভাষার সংশ্রবে আসার পর রসিককৃষ্ণ এলেন। এবং, তাঁর সম্পাদনার যুগ এই পত্রিকার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। (২) পত্রিকার পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হোত, তা বহন করতেন পত্রিকার উদ্যোক্তাগণ, ব্যক্তিবিশেষ কেবল নন। দক্ষিণানন্দন অধিক আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেও তিনিই একক সাহায্যকারী ছিলেন না। পরবর্তীকালে

পত্রিকা স্বয়ংনির্ভর হয়েছিল। (৩) জ্ঞানান্বেষণ কর্তব্য পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নি। নতুন ব্যবস্থায় সম্পাদক যিনিই হোন, নেপথ্যে থাকলেন রামগোপাল ঘোষ। পত্রিকার মুদ্রণ ব্যয়, লেখা সংগ্রহ করা, নীতি নির্ধারণ করা প্রভৃতি সব কাজের দায়িত্ব তিনিই বহন করতেন বলে মনে হয়। বন্ধুবর রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হলে সাময়িক ভাবে তারকচন্দ্র বসু প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সে খবর আমরা পাচ্ছি রামগোপাল লিখিত একটি চিঠি থেকে। "Taruck (Chandra Bose), the Principal Editor of Gyananneshun has ben lucky enough to get a Deputy Collectorship of Hooghly. I wonder who wlll carry on the paper now" (21 September, 1831)। ১৮৫৮ সালে সেপ্টেম্বর থেকেই রামচন্দ্র মিত্র কাগজের সম্পাদক মনোনীত হয়। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে পত্র-পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

রসিককৃষ্ণের পর দীর্ঘকাল সম্পাদকের দায়িত্ব শুধু রামচন্দ্রই বহন করেন। সম্ভবত তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন হরমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামগোপাল ঘোষের এক চিঠিতে তাঁকে অন্যতম 'conductor' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমরা কোন পত্রিকায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যুগ্ম সম্পাদক রূপে বিজ্ঞাপিত হতে দেখিনি। হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেকালে হিন্দু কলেজের কেরাণী। তাঁর লেখা 'ডিরোজিয়ো যুগের স্মৃতিকথা' ঐ যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সম্ভবত তিনিও পর্দার আড়ালে থেকে সহযোগিতা করেছিলেন। এই রকম সহযোগিতা করেছেন গোবিন্দচন্দ্র বসাক। তিনিও প্রবন্ধাদি লিখেছেন।*

---

* 'জ্ঞানান্বেষণ' সে যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল। এটি সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত সারগর্ভ আলোচনা তার প্রকাশিতব্য গ্রন্থে করেছেন।

—সম্পাদক

জাতীয় জাগরণে শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা

সুবোধ নারায়ণ চৌধুরী

উনবিংশ শতককে ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাসে এক নব জাগরণের যুগ বলা চলে। জাতির মননে-চিন্তায়, ধ্যানে-ধারণায় যে নবচেতনার সঞ্চার তার প্রকাশ সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম ও রাষ্ট্র-চিন্তায়। দেশাত্মবোধক প্রেরণা জাতিকে কী ভাবে বীর্য সাধনায় প্রবুদ্ধ করেছিল—চিন্তানায়কদের চিন্তাকে কীরূপ প্রভাবিত করেছিল, ও পরবর্তীকালে যুব-সমাজের মধ্যে কী প্রকার আলোড়ন এনে দিয়েছিল—এই নিবন্ধে তার কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে।

উনিশ শতকের নব জাগরণের যুগে বাঙ্গালীকে শরীর চর্চার দিকে যিনি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করেছেন, তিনি হলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। হিন্দু কলেজে ছাত্রদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল না দেখে তিনি হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত, তাঁরই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানসম্মত শরীর ও স্বাস্থ্য-চর্চার সূত্রপাত হয় বাংলা দেশে। ভারতে যে শরীর-চর্চার দিকে দৃষ্টি ছিল না, এ কথা বললে ভুল হবে। রাজযোগ বা হঠযোগ বা যৌগিক আসন ইত্যাদি শরীর-চর্চার এক বিশেষ পদ্ধতি ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এগুলি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ক্রমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তা একেবারেই সরে যায়। সুতরাং নব জাগরণের যুগে ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়া ডিঙিয়ে তাকে বস্তুভিত্তিক অথচ বিজ্ঞান-সম্মত কাঠামোর উপর দাঁড় করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই যেন অক্ষয়কুমার লেখনী ধারণ করেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'শরীর ও মন' ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে (ব্যায়াম ইত্যাদি) আঠার উনিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৪৮ সন থেকে প্রায় তিন বছর যাবৎ। মহেন্দ্রকুমার রায় রচিত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঐ সব নিবন্ধ পুস্তকাকারে (দু'খণ্ডে) মুদ্রিত হলে দূর দূরান্তের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এতে বিদ্যার্থীরা

শরীর গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। অধিকন্তু, সে-যুগের মননশীল শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনার উপর অক্ষয়কুমারের এই প্রচার প্রভাব বিস্তার না করে পারেই নি। ফলে, অঙ্গ-সঞ্চালক বিভিন্ন ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য-বর্ধক ক্রীড়াকলাপ বিষয়ে গঠনমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে শরীর-চর্চা বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে।

অক্ষয়কুমার দত্ত, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ বাড়ীতে বিজ্ঞানানুমোদিত শরীর-চর্চা করতে প্রবৃত্ত হলেন। পরে, তিনি তাঁর পুত্রদের গৃহশিক্ষার সঙ্গে ব্যায়াম-চর্চারও ব্যবস্থা করেন। হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যায়াম-চর্চার কথা তো সুবিদিতই। ক্রমে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শরীর-চর্চার সঙ্ঘ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ব্যায়াম-চর্চার এই প্রচেষ্টাকে হিন্দুমেলার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন—'এই ব্যায়াম-চর্চা হিন্দুমেলার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠি

অক্ষয়কুমারের উদ্দিষ্ট শরীর-চর্চার পশ্চাৎ-পট ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক, আর রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার অঙ্গ হিসাবে ব্যায়ামাদির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তার উদ্বোধন। হিন্দুমেলার মাধ্যমে এ দেশে শিক্ষিত মহলে শরীর-চর্চার প্রচলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজনারায়ণ সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শরীর-চর্চাকে যুক্ত ক'রে এক মহতী প্রেরণার সৃষ্টি করে গেছেন। রাজনারায়ণের জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত হন নবগোপাল মিত্র। তাঁর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এর অপরাপর বিচিত্র কার্যকলাপের সঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম ও সাহসিকতাপূর্ণ খেলাধূলার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে অমৃতবাজার পত্রিকার ভূমিকাও স্বীকার না ক'রে পারা যায় না। হিন্দুমেলার অষ্টম অধিবেশন উপলক্ষে খ্রীঃ ১৮৭৪ সনে ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই পত্রিকার মন্তব্যটি উল্লেখের দাবী রাখে। "আমরা যখন দেখিব হিন্দুমেলার সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমি মল্লবেশধারী হিন্দুসন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালীরা তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্রমে ও অমোঘ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দুসন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার

প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহপূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহ বা আহত হস্তে, কেহ বা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—সেইবার জানিব হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইরাছে।" বলা প্রয়োজন, অমৃতবাজারে হিন্দুমেলা সম্পর্কে এই মন্তব্য এবং আরও এরূপ দু'-একটি মন্তব্য প্রকাশের পরে হিন্দু মেলার অঙ্গরূপে বীরত্ব প্রকাশক ক্রীড়াদি অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় জাতীয় জীবনের সকল স্তরে অবসাদ, দুর্বলতা ও দৈন্যদশা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং বল-বীর্য-সাহসের অভাব দেখা দিয়েছিল। সেই কারণে, আত্মপ্রত্যয় ও সাহস প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যায়াম ও সাহসিকতাপূর্ণ ক্রীড়াদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দান করা হল। স্বদেশী ভাব উজ্জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে নানা অনুষ্ঠানের (যথা, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য স্বাবলম্বী হওয়ার প্রেরণা দান, নারীদের কারুকার্যে উৎসাহদানের জন্য তাদের নির্মিত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী) উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। তাই, এই সময়টাকে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষকাল হিসাবে যেমন, তেমনি শরীর-গড়া ও আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। হিন্দুমেলার পরিচালকদের কথা বাদ দিলেও, আরো অনেকের কাছ থেকে ব্যায়াম ও খেলাধূলা সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তাধারা ও তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, হিন্দুমেলার নামের পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম এর নাম ছিল 'চৈত্রমেলা', পরে 'হিন্দুমেলা' এবং সর্বশেষে 'জাতীয় মেলা'। 'জাতীয় মেলা'র কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হত 'জাতীয় সভা'-র দ্বারা। এই সভার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল "বাঙ্গালীকে বলবীর্যের অধিকারী করিয়া তোলা"। এবং "সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয় ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চার অনুষ্ঠান হইত। বিবিধ প্রকারের অঙ্গচালনা, কুস্তি, কসরৎ, লাঠিখেলা, অসি চালনা, অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড় প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন ছিলনা। কাজেই বন্দুকের ব্যবহার অবাধে চলতে পারত। মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত এবং ব্যায়াম-বিদ্যাকুশলীরা পুরস্কৃত হতেন।

এই সময়-পর্বে শরীর-চর্চা ও খেলাধূলার প্রচলন ও প্রসারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিবর্তে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। কেবল বাংলাদেশেই নয়, অপর দু'-চারটি প্রদেশেও (যথা—মহারাষ্ট্র) শরীর-চর্চার এরূপ পটপরিবর্তন ঘটেছিল। তবে, বাংলাদেশই ছিল এ ব্যাপারে অগ্রণী।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক তাঁর 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় খ্রীঃ ১৮৬৫ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত ইতালীর মুক্তিযুদ্ধের উদ্‌গাতা মাট্‌সিনির জীবনী প্রকাশিত হয়। ম্যাট্‌সিনির 'কার্বোসারী' নামক সন্ত্রাসবাদী গুপ্তসমিতির কাহিনী বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও দেশপ্রেমী শিক্ষিত উদীয়মান যুবকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়জয়কারী বক্তৃতায় দেশের শিক্ষিত যুবকদের স্বদেশ উদ্ধারে ও জনসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতের প্রথম র‍্যাংলার বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় সভা'ও সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মের অনুগামী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ম্যাট্‌সিনির 'কার্বোসারী' সমিতির আদর্শে কিছু কিছু গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা' এরূপ একটি সমিতি ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল সহ ছ'জন যুবক শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ হচ্ছে খ্রীঃ ১৮৭৭-র কথা। খ্রীঃ ১৮৭৮-এ, শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে দু'জন যুবক বরাহনগরে গঙ্গাতীরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই 'পুণ্যব্রতে' দীক্ষা নেন। গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিতদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে হাটু গেড়ে বসে যে প্রতিজ্ঞা করতে হত তার ছঁদফা বয়ানের মধ্যে শরীর-চর্চা বিষয়ক বয়ানটি নিম্নরূপ :

"নিজের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও শৌর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা ও তাঁহার প্রচার করিব, নিজেরা অশ্বারোহণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালনা অভ্যাস করিব, এবং সমস্ত দেশে যাহাতে অশ্বারোহণ এবং বন্দুক ছুড়িবার অভ্যাস প্রচারিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব।" খ্রীঃ ১৮৭৮-এ, অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে এ দেশবাসী নিরস্ত্র হয়ে পড়ে। যে কারণে গুপ্ত সমিতির সভ্যদের বন্দুক-পিস্তল চালনায় গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হ'ল। শরীর-চর্চার সাথে লাঠিখেলা, ছোরা-তলোয়ার খেলার

রেওয়াজ বৃদ্ধি পেল। উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে গুপ্ত সমিতিসমূহের সভ্যদের দৃঢ় মনোবল ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের ফলে শরীর গড়া ও সাহসিকতা পূর্ণ খেলাধূলার শিক্ষা বিস্তারের যেমন সম্ভাবনা দেখা দিল, তেমনি ভাবী অগ্নি যুগের বীজও উপ্ত হ'ল। এই শতকে বাংলাদেশে গুপ্ত বিপ্লববাদের চিন্তা ও উত্তেজনা সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল না; শরীর গঠন ও শক্তিশালী হবার জন্য ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরা, তলোয়ার ও বন্দুক চালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় হুগলীতে সরকারী কাজে অবস্থান করার সময় (১৮৭৫-এর পর থেকে) দেশকে জাগাবার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করতে এবং স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা নির্দেশকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন 'আনন্দমঠ' (১৮৮১)। এই মনীষীদ্বয় ব্যায়াম ও খেলাধূলা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বুঝে এ বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হলেন। "তাহারা পরামর্শ করিয়া তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়কে (ভূদেব বাবুর ভাগিনেয়) চন্দননগর ও হুগলীর আশেপাশে শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। ···তিনকড়ি বাবু ঐ সকল অঞ্চলে কয়েকটি আখড়া স্থাপন করেন। সেই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে·· 'বৈপ্লবিক' সাহিত্য পাঠও চলিত। সেই সময়ে শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল।······ইহার জন্য অনেককে সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়িতে হইয়াছিল।·········তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইরা ৭ বৎসর পণ্ডিচারীতে পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হন।······"

বিশ শতকের সুরুতে শরীর-চর্চাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদপুষ্ট 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়। এই সমিতির সদস্যেরা স্বামীজিকে তাদের রাজনৈতিক গুরুরূপে ভাবতেন। এই-সব যুবকের প্রতি স্বামীজির নির্দেশ ছিল: "জনগণের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাহার সনাতন ধর্মের অনুসরণ কর······" ইত্যাদি। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন—"প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে, শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়াই তরুণ বালার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর-সাধনা এমনকি "ভগবদ্গীতা' পাঠ করার অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।··· "

আমরা জানি, স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে ব্যায়াম অভ্যাস করতেন, লাঠিখেলা ও বন্দুক চালনায় সিদ্ধহস্ত এবং ক্রীড়নিপুণ ছিলেন।

'হিন্দু মেলা' ও 'সঞ্জীবনী সভা'-র সঙ্গে বালক কবি রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। তাঁকে যে ব্যায়াম অভ্যাস করতে হয়েছিল, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শরীর গড়া, স্বাস্থ্য বজায় রাখা, জীবনে খেলা-ধূলার আবশ্যকতা—বিষয়ে বহু বহু নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন যৌবনেই। 'জিহ্বা আস্ফালন'। 'ন্যাশনাল ফণ্ড', 'হাতে কলমে' 'ব্রহ্মচর্য' প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা গেল। তিনি কার্যক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ব্যায়াম এবং লাঠিখেলা, কুস্তি, জুজুৎসু, টেনিস, ফুটবল ইত্যাদি দেশী-বিদেশী খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রয়োগের মূল্য অপরিসীম।

বাংলাদেশে প্রথম ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৫-এ। এটির সদস্যরা সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে তাঁর ও অপর কতিপয় নেতার উৎসাহে গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘ-সমিতি ও দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা' পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এদের আসল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণ সাধন; শরীর-চর্চা উপলক্ষ মাত্র। 'ছাত্রসভা'-র অন্তর্ভূক্ত নয় এমন-সব ছাত্রদের চারিত্রিক গুণ, শারীরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের জন্য 'নববিধান' ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চেষ্টায় জন্ম নিল "Society for the Higher Training of Youngman" এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সভাপতিরূপে বিচারপতি Tottenham এবং বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিপুরুষগণ। এখানকার শরীর-চর্চা ও খেলাধূলা বিভাগের ভার ছিল Mr. H. Lee-র উপর। এখানে বিদেশী ক্রীড়াদি, যথা—টেনিস, ফুটবল, বক্সিং, পোলো প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৮৯৬-এ, এই প্রতিষ্ঠান নব রূপ পরিগ্রহ করে। এর নূতন নামকরণ হল—"Calcutta University Institute". উদ্দেশ্য: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অভাব পূরণ। এই ব্যাপারে উদ্যোগীদের মধ্যে ছিলেন (এফ. এম. আব্দুর রহমান, মনমোহন ঘোষ (ব্যারিষ্টার) প্রভৃতি বিদগ্ধ জন। এখানেও যুগপৎ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াকলাপের ব্যবস্থা করা হয়। এতে রাজনীতি বা

ধর্মের সংস্রব থাকল না। আন্তর্কলেজ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপক এই সংস্থা এবং তার আরম্ভ হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী কর্মব্যপদেশে এক বছর দাক্ষিণাত্যে বাসান্তে খ্রী ১৮৯৫-এ কলিকাতায় ফিরে এলে 'ভারতী' পত্রিকার যুগ্মসম্পাদিকা পদে বৃত হন। তখন থেকেই তিনি 'ভারতী'তে নিবন্ধের পর নিবন্ধ ছাপিয়ে খেলাধূলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, জনসেবায় প্রাণপণ করার প্রেরণা সঞ্চার করতে লাগলেন বাঙ্গালী যুবসমাজের মনে; এই সময়-পর্বে তার বালীগঞ্জের বাসস্থানের সন্নিকটে যুবকদের 'স্বাস্থ্য উজ্জ্বল' ক'রে গড়ে তোলার মানসে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর দ্বারা। এতে ব্যায়াম, লাঠিখেলা ও খেলাধূলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল। স্বীয় অর্থ ব্যয়ে সরলা দেবী লাঠিখেলা শেখাবার জন্য নিযুক্ত করলেন মোটা মাইনে দিয়ে প্রফেসর মার্তাজাকে। এই প্রফেসর মার্তাজা এর পূর্বে শ্রীরামপুরের উকিল মহেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ীর ছেলেদের তলোয়ার চালনা, গংকা প্রভৃতির গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী যুগের বিখ্যাত লাঠিয়াল বিপ্লবী পুলিন দাসের শিক্ষা সরলা দেবীর এই ক্লাবে। বাঙ্গালী ছেলেদের সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ও স্বদেশপ্রেমী করে গড়ে তোলাই কাম্য ছিল সরলাদেবীর। এই ব্যাপারে সহযোগীরূপে তিনি পেয়েছিলেন আদর্শবাদী ব্যারিষ্টার পি. মিত্রকে।

বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শৈশব কাটে মেদিনীপুরের তমলুকে। তাঁর পিতা পাকা লাঠিয়াল রেখে তাকে ও তার ভাইদের লাঠি ও তলোয়ার চালনা শিখিয়েছিলেন। ১৯০৫-এ কলকাতায় এসে তিনি দেখলেন তখন গায়ের জোর ও সাহসের খেলার দিকে লোকের খুব ঝোক্, পাড়ায় পাড়ায় কুস্তি ও জিমনাস্টিকের আখড়া। দর্জিপাড়ায় অম্বু গুহের আখড়ার খুব নাম ডাক। তার ছোট কাকা গৌরবাবুর জিমনাস্টিকের আখড়া শুধু কলকাতা ও শহরতলিতেই ছিল তা নয়, হাওড়া. হুগলী প্রভৃতি জিলায়ও ছিল। গৌরবাবু অনেক কলেজেই জিম্‌নাষ্টিকের আখড়া খুলেছিলেন। শ্যামকান্ত রায় ও গৌরবাবু—দু জনেই বাঘের সঙ্গে লড়তেন। শ্যামাকান্তর বুকে পাথর ভাঙা হ'ত। ভারতে সার্কাসের জন্মদাতা এরা দু'জনে। শ্যামাকান্ত রায় পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী হয়ে 'সোহং স্বামী' নামে পরিচিত হন। এদের

ছাত্রদের অনেকে সার্কাস পার্টি গড়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রফেসর মতিলাল বসুর সার্কাস পার্টি খুব বিখ্যাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ খুব খুশী হয়ে উৎসাহ দেবার জন্য উদ্দীপনাব্যঞ্জক ভাষায় বলেছিলেন "মতি দেখিয়ে দিয়েছে, বাঙ্গালীর দৈহিক বল কি করতে পারে।"

'অগ্নিযুগ' গ্রন্থে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, "১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ অবধি সমগ্র বাংলায় শক্তি চর্চার এক বহুমুখী আন্দোলন রূপ পেয়েছে।"

বিদেশী শাসনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও এ দেশের মননশীল নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় "The timid Bengalee has been turned into a ferocions tiger"।*

* এই নিবন্ধটি উনবিংশ শতকের শরীর-চর্চা ও খেলাধূলা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিবেশ (outline) মাত্র, পূর্ণ ইতিহাস নয়।

বাংলার ঊনবিংশ শতক ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা

ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইহলোক চিন্তা, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের পুনরাবিষ্কার, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার্জনে আগ্রহ, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল। এই শতকে ধর্মচিন্তা তথা ধর্মান্দোলনের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রামমোহনের কথা স্মরণ হয়। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রাচ্য বিদ্যা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁর মনে তরুণ বয়সেই তৎকালীন বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগেছিল। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের মূল সত্যকে স্বীকার করেছেন কিন্তু তার ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি যে পাঁচখানি উপনিষদের বাংলা ভাষান্তর করেছিলেন তার পিছনে তাঁর ধর্ম-চিন্তার স্বাতন্ত্র্যই লক্ষিত হয়। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন; নানক, কবীর সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস ছিলেন। সুফী মরমিয়াবাদের প্রতিও তাঁর অনুরাগ লক্ষ করা যায়। তুলনামূলক ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতবর্ষে প্রথম জিজ্ঞাসু রামমোহন। রামমোহনের ধর্ম-চিন্তায় বেদান্তের ন্যায় তন্ত্রও উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকারী। তার জ্ঞানমার্গী ধর্মে 'ভক্তি'র ভূমিকা মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে আহৃত।

রামমোহনের কলকাতায় বসবাস (১৮১৫) থেকে বিলাত যাত্রা (১৮৩০) পর্যন্ত পনের বছরে রামমোহনকে বহু বিচার-বিতর্ক করতে হয়েছে, বৈষ্ণবদের সঙ্গে, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে, কার সঙ্গে নয়! তিনি ঠিক কোনো ধর্মান্দোলন চালনা করতে চাননি। তাঁর Trust-Deedএ (১৮৩০) বা অর্পণ-নামায় উপাসনার কথা আছে কিন্তু প্রচারের কোন উল্লেখ নেই। ১৮২৮ সালে তিনি যে 'ব্রহ্ম সভা' স্থাপন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য উদার ও সর্বজনীন, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোনো চিহ্ন নেই। লোকহিতের ধারণাটি প্রকৃত পক্ষে ঊনবিংশ শতকীয়, রামমোহন উপনিষদগুলির যে ভাষান্তর করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর ঘোষিত "লোকশ্রেয়ঃ" চেতনা।

তাঁর ধর্মান্দোলন তাঁর জীবৎকালে অবশ্য কলকাতা শহরের স্বল্প সংখ্যক উচ্চবর্গের সভ্রান্ত ধনী ও হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এবং তাঁদের অনেকেই যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ব্রহ্ম সভা'য় বন্ধুত্বের খাতিরে আসা-যাওয়া করলেও নিজেদের পারিবারিক পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করেন নি। কিম্বা রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের শিষ্য হলেও প্রচলিত 'লৌকিকাচার' লঙ্ঘন করা সঙ্গত মনে করতেন না। রামমোহন নিজে অব্রাহ্মণ শ্রোতার সম্মুখে বেদ পাঠ নিষেধ করেছিলেন। এ তথ্যও মনে রাখা দরকার।

রামমোহনের মূর্তিপূজাবিরোধী জ্ঞানমার্গী একেশ্বরবাদী ধর্ম-চিন্তা সাধারণ বাঙালীর মধ্যে প্রবেশ করবার কথা নয়। ভক্তিবাদ ছাড়া ধর্মান্দোলন প্রসারিত হয়না, সেজন্য নানক বা কবীর যে 'পন্থ' তৈরী করতে পেরেছিলেন রামমোহনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের 'সন্ত' কবিদের পক্ষে যা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল উনবিংশ শতকের গোড়ায় নতুন শহর কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, ধনী-নাগরিক, রামমোহন বা তাঁর সহচরদের পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা। কাজেই তাঁর পরিকল্পিত ধর্মান্দোলন শিকড় ছড়াতে পারল না। শিকড় ছড়াবার শক্তি তার মধ্যে ছিলনা। যেটুকু আলো তিনি জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর বিদেশ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সে-প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হল।

আর এক ধনী বিলাসী যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) তাঁর একুশ বছর বয়সে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রা কালে গঙ্গাতীরের নির্জন সন্ধ্যায় বৈরাগ্য ব্যাকুলতা বোধ করলেন। সেই বৈরাগ্যবোধে অনুপলব্ধ-পূর্ব আনন্দ চেতনা জড়িত। পরবর্তী কালে শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন যে, এই আনন্দকেই তিনি সারাজীবন খুঁজেছেন। এই আনন্দযুক্ত বৈরাগ্যবোধ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে কোনো ধর্ম বা কোনো সমাজের যোগ নেই। হৃদয়ের শূন্যতা দূর করার জন্য তিনি 'মহাভারত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করেন, বেদ-উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন (ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে তিনি পথ-নির্দেশ লাভ করেন) কিন্তু বেদকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে পারেন নি। উপনিষদেরও সকল অংশকেও সমর্থন জানাতে পারেন নি, ব্রহ্ম ভক্তিমূলক স্তোত্র চয়ন করলেন রামমোহন-স্বীকৃত 'মহানির্বাণ তন্ত্র' থেকে।

কিন্তু তিনি মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোকও আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করেন নি। তাকেও সংস্কার করে নিজের মতো করে নিয়েছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি দেকার্তে কথিত 'autonomy of thinking self' বলতে পারি। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্মাদর্শের ভিত্তি শাস্ত্র-প্রামাণ্য দ্বারা সমর্থিত হলেও মূলতঃ "আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়।"

দেবেন্দ্রনাথ পরে 'ফরাসিস মহাত্মা ফেনেলেন' রচিত ঈশ্বর স্তোত্রকেও ব্রহ্ম বন্দনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। 'পূর্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।' দেবেন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শে সুফী মতও বিশেষ স্থান পেয়েছিল। খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্বের 'পাপ'-'করুণা'তত্ত্বও সম্পূর্ণ অলক্ষিত নয়। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম মতে নানা স্রোত এসে মিলিত হয়েছিল, তিনি মোটামুটি একটি সমন্বিত ধর্মাদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। রামমোহনের অদ্বৈতবাদকে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি, তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বললেই ঠিক বলা হয়। তবে দেবেন্দ্রনাথ 'যত মত তত পথ' এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান পাদরিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, হিন্দুদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। রামমোহন রায়ের তুলনায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে তুলতে পেরেছিলেন।[১] বৈষ্ণবদের অনুরূপ 'মহোৎসব' ও 'সংকীর্তন' তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে গ্রহণ করলেন, রামমোহন রায়ের সময়ে এ ধরণের ব্যাপার অকল্পনীয় ছিল।

১৮৫৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের অনুগত শিষ্যরূপে বিখ্যাত ধনী দেওয়ান বৈষ্ণব রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত। দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তরূপে তিনি ব্রাহ্মবিরোধী খ্রীষ্টান পাদরি ডাইসনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি লাভ করলেও দীর্ঘদিন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রইলেন না। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ও বাইবেল-ভক্ত। নিউম্যান ও থিওডোর পার্কারের গ্রন্থের অনুরাগী। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি খুঁজছেন আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ এবং অক্ষয়কুমার খুঁজছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ। দুয়ের মধ্যে দুশ্ছেদ্য ব্যবধান।

তেমনি একই ফরাসের এক কোনে দেবেন্দ্রনাথ পড়েছেন উপনিষৎ, অপর কোণে কেশবচন্দ্র পড়েছেন বাইবেল। কেশবচন্দ্র বেন্থাম, কঁতের Comte) মতামতের, অর্থাৎ যুক্তিবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি একান্তভাবে ভক্তিপথের পথিক। সে-পথে খ্রীষ্ট-ভক্তির প্রতি কেশবচন্দ্র সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন। পাপবোধ, মার্জনা-ভিক্ষা, করুণালাভ যে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একেবারেই ছিলনা তা জোর করে বলা যায় না। "ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান" গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় রয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের সাধনা 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ' হলেও তার মূলভিত্তি উপনিষৎ। তাঁর সাধনায় সুফী বা খ্রীষ্টান ধর্ম-সাধনার যে ভূমিকাই থাকুক সে সাধনার মূলভিত্তি ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম।[২] কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা—"Jesus Christ, Europe and Asia" (৫ মে, ১৮৬৬) গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ১৮৬৬ সালে ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের 'সমাজ' গঠন করলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ।" কেশবচন্দ্র যে একটা জোরালো ধর্ম-আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারিত হয় ও ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হয়। বহু শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন, হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর হাতে হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করেন।

কেশবচন্দ্র রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ থেকে ধর্ম ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রে নতুন পথে যাত্রা করেন। চৈতন্যদেবের মতো তিনি প্রচার করলেন "যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।" ভক্তিতে মুক্তি—এই ঘোষণায় কেশব 'Reason' পন্থাকে তুচ্ছ করে 'Faith'কে বড়ো করে তুললেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং বৈষ্ণব বংশের সন্তান, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। কাজেই ভক্তিপথ, জাতিভেদ বর্জন, মহোৎসব, সংকীর্তন কেশবচন্দ্রের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর ধর্মমত ও তাঁর 'সমাজ'কে একটি স্বাতন্ত্র্যদান করতে চেয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' যে অন্য ধর্ম ও সমাজের মতোই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত এই লক্ষ্য কেশবচন্দ্রের ছিল। দেবেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের প্রগতিশীল অংশ বলে মনে করতেন। কেশবচন্দ্র মনে করলেন 'ব্রাহ্মেরা হিন্দু নন', তাঁরা একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মাবলম্বী। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের

এক অংশ তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৮৭৮ সালে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠন করেন। এই বিচ্ছেদ মূলতঃ কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত আচরণ ও সমাজ সংস্কারগত হলেও সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাও প্রচ্ছন্নভাবে এর পিছনে ছিল। (দেখা যায় কেশবপন্থীরা ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, আর ঐ আন্দোলনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা অগ্রণী হয়েছিলেন)। কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্ম সাধনায় নতুন পথের ইঙ্গিত দিলেন ১৮৮০ সালে জানুয়ারী মাসে 'নববিধান' সমাজ [The New Dispensation] গঠন করে। সর্বধর্ম সম্পর্কে উদারতা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস এই প্রথম দেখা গেল। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন:

> হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন,
> বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ,
> ললিত বিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্মশাস্ত্র মিলিল।
> নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেননা 'সত্য'ই ইহার
> বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের
> সঙ্গে সংযুক্ত।[৩]

'নববিধান'—প্রবর্তনের পূর্বে, 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মৃত্যুকাল (১৮৮৪) পর্যন্ত এই সংযোগ অব্যাহত ছিল। অনেকে মনে করেন কেশবচন্দ্রের ধর্ম সাধনায় 'মাতৃভাব' এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে। কেশবচন্দ্র নিজে বলেছেন—

> "কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব,
> কখনো জগদ্ধাত্রী—এই নানাভাবে কখনো একনামে
> কখনো অন্য নামে হরিকে নিত্য নবীন বেশে
> দেখিব।"

এই ধরণের উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই প্রভাবজাত।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্রের ধর্মান্দোলন বাংলা দেশের ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অধ্যায়।

অবশ্য ধর্মান্দোলনের দিক থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামও বিশেষ ভাবে (১৮৪১-৯৯) উল্লেখযোগ্য। তিনি অদ্বৈতাচার্যের বংশধর, তরুণ বয়সে প্রথমে

বেদান্ত, পরে ডাক্তারি পড়তে এসে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসেন, দেবেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার ফলে উপবীত ছিঁড়ে ফেলে কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগী হন। ব্রাহ্ম ধর্মের আদর্শকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবানুরাগীদের সংঘাতের সময় তিনি কেশবচন্দ্রের পক্ষে থাকেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তির বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন নি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠিত হলে তিনি উক্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'ও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর ধর্মপিপাসা ও তার নিবারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে তিনি কর্তাভজা, অঘোরপন্থী, কাপালিক, শাক্ত, বৈষ্ণব, দরবেশ-ফকির, বৌদ্ধ ভিক্ষু সকলের কাছেই গিয়েছেন, কিন্তু কোনোখানে তিনি চিত্তের শান্তি পান নি। তিনি গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের প্রদর্শিত যোগ-সাধনাতে সেই কাম্য শান্তি পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্য-কৃপা বিজয়কৃষ্ণ লাভ করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি জানিয়েছিলেন "বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনাকালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখা যায়।' (১৮৮৬)

পূর্বেই বলা হয়েছে যুক্তিনির্ভরতার চেয়ে ভক্তিনির্ভরতা এ যুগে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সকলের প্রসঙ্গেই এ কথা সত্য। অদ্বৈতের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গৌর-নিতাইয়ের ভক্তি-আন্দোলনকে উনবিংশ শতকে নতুন বেগ দান করলেন। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'-এর নেতা ও কর্মীদের অধিকাংশই পরবর্তিকালে নব্য-বৈষ্ণব (Neo-Vaisnava) ধর্মান্দোলনে যুক্ত হন।

ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মান্দোলন যখন উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে প্রবল প্রভাব বিস্তাররত তখন নব্য-হিন্দু (Neo-Hindu) আন্দোলন অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। একে হিন্দু-পুনরভ্যুত্থান বা Hindu-Revivalism বলা হয়। এই কাল-পর্বে বিচারপতি উডরফ (১৮৬৫-১৯৩৬) ও তাঁর তান্ত্রিক গুরু শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩) তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন এবং হিন্দু সমাজ এই প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালের শুরুতে কর্ণেল অলকট,

(১৮৩২-১৯০৭) ও মাদাম ব্লাভাটস্কি (১৮২১-৯১) ভারতে আসেন ও থিয়সফিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ করেন। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে অ্যানি বেশান্তের প্রচেষ্টায়। বারাণসী থেকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) কলকাতায় আসেন ব্রাহ্ম ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মকে জোরদার করতে। এই সূত্রে 'গীতার্থ সান্দীপনী' রচয়িতা পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (১৮৫১-১৯০২) নামও উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মকে নতুন ভাবে, চিন্তায় ও কার্যে রূপ দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান সহযোগী, পরবর্তী কালে 'ঋষি' রাজনারায়ণ নামে পরিচিত, রাজনারায়ণ বসু ১৮৭২ সালে 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পাঠ ও প্রকাশ করেন। (স্মরণীয় যে এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন 'ব্রাহ্ম হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত নয়)। শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর একাংশকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় বঙ্কিম-সহচরও শশধরের অনুগামী হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম দিকে শশধরের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শশধরকে বর্জন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিচারশূন্য ভক্তিবাদ, সংসারবিচ্যুত অধ্যাত্ম-সাধনা বা পাপবোধ, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার বা গৌরব-বর্ধনের জন্য তিনি কোনো আন্দোলন করেন নি। তিনি মননশীল মানুষ, তাই প্রধানত: গীতাকে ভিত্তি করে হিন্দুধর্মকে নিজস্ব দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম এই দুয়ের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিসিদ্ধ হিন্দু ধর্মকে উপস্থাপিত করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দু ধর্মকে দাঁড় করালেন তার সঙ্গে অবশ্য তৎকালে প্রথাগত প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই—

> "ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।" —এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ। কথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill, ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকারে অযত্ন করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না। ...সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে

> হিন্দুধর্ম বলে যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণ বাক্যই যথার্থ লক্ষণ।

এই আলোচনার শেষে বঙ্কিম আরো লিখেছেন—

> আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুগে ও পরবর্তিকালে চিন্তার দিক থেকে বরণীয় হয়ে আছেন। হিন্দু ধর্মকে তিনি গৌরবের আসনে বসাতে পেরেছিলেন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে। তা ছাড়া জাতিগর্বী বঙ্কিমের চিন্তায় ধর্ম ও স্বাদেশিকতা মিশে যাওয়ায় স্বদেশ ও স্বধর্ম শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সমান শ্রদ্ধা লাভ করেছে। স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বাণী সব চেয়ে বেশি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। তবে মনে রাখা ভালো যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মের প্রচারক, বা আন্দোলনের নেতা ছিলেন না। সেদিক থেকে সব চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬)। তিনি কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্ত। তাঁর সহজ সরল ভক্তি-বিশ্বাস, গোঁড়ামিহীন জীবনচর্যা, উদার ধর্মমত, জনজীবনের উপমা-উপাখ্যানযুক্ত ধর্মোপদেশ দ্বারা নানাবর্ণের বহু মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তিনি। কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি তাঁর অনুরাগী ছিলেন। পরমহংসদেব ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন, কেশবের সঙ্গে ১৮৭৫ সাল থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি কবি-সাধক রামপ্রসাদের মতো নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ভবতারিণী উভয়কে মিলিয়ে নেন, তবে ব্রাহ্মদের পাপতত্ত্ব তাঁর সমর্থন পায়নি। যীশুর চরণে তিনি কোটি কোটি প্রণাম জানান, তাঁকে ঈশ্বরের অবতার রূপে স্বীকার করেন। কিন্তু তার জন্য তাঁকে কিছুই ছাড়তে হয় না। পরমহংসদেব যুক্তিবাদী শাস্ত্রজ্ঞদের নিন্দা করেছেন, তাঁরও মূল কথা, ভক্তিবাদ, সংশয়হীন ঐকান্তিক ভক্তি। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশের মতো অন্তরের তাগিদে ভক্তিবাদী রামকৃষ্ণকে গুরু রূপে বরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মান্দোলনকে বেগ, শক্তি ও মর্যাদা দান করেন— যে শক্তিতে মার্গারেট নোবল হন "নিবেদিতা" এবং রমা রলাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দ সম্পর্কে রচনা করেন দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দিয়েছিলেন 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'। তাঁর ধর্মচিন্তা ও সাধনায় এইটি খুব বড়ো কথা। বিবেকানন্দ বেদান্তকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দীনতম মানুষের কল্যাণে। 'ভজন-পূজন সাধন আরাধনা'র চেয়ে তিনি নরসেবাকেই উচ্চে স্থান দিয়েছেন, এমন কথাও বলেছেন, যে ঈশ্বর মানুষকে ইহলোকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারেন না, তিনি মানুষকে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করবেন—এ তিনি বিশ্বাস করেন না। পরবর্তিকালে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"God Himself does not venture to come before the hungry man except in the form of food." এ কথা তো বিবেকানন্দেরই কথার প্রতিধ্বনি।

উনবিংশ শতকে রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সবাই পথের সন্ধান করে ফিরেছেন। রামমোহন প্রচলিত সব ধর্মের ও ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান নিয়েছিলেন, শেষে এসে পৌঁছেছিলেন নিজস্ব ব্রাহ্ম ধর্মে। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেরই মধ্যে চলেছে পথ-সন্ধান।

---

১ দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে, তিনি তাঁর ধর্মপ্রচারের জন্য প্রথম দিকে তাঁর "শ্রেণী"র (class) নদীয়ার মহারাজা ও বর্ধমানের মহারাজাকে আশ্রয় করলেন। উভয়েই কিছুকাল উপর-উপর থেকে ফিরে গেলেন নিজেদের কৌলিক ধর্মে। দেবেন্দ্রনাথ 'প্রজা'দের কাছে যেতে পারেন নি, গিয়েছিলেন 'রাজা'দের কাছে—এ তথ্য বিস্মৃত হওয়া চলেনা।

২ "তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যতখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থ ভাবে ঔদার্য রক্ষা হয়—তখন পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।" —রবীন্দ্রনাথ

৩ দেবেন্দ্রনাথ এই ধরণের সমন্বয়বাদের বিরোধী "তিনি [কেশব] ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে প্যালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন—ইহা অতি কষ্টকল্পনা।"—পত্রাবলী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র।

৪ কৃষ্ণ চরিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নারী জাগৃতি

ড. মিনতি মিত্র

আজ আমরা যা হয়েছি, তথা আমাদের দেশ ও সমাজ সংসারের যে রূপ তা পুরুষ এবং নারী উভয়ের মিলিত সাধনার ফল। অতএব পুরুষের কাজ বা নারীর কাজ বলে কোন প্রচেষ্টাকে অভিহিত করার চলতি রেওয়াজ যথার্থ কি না তা আমাদের বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার। তবু এ কথা ঠিক যে, সকলে যেমন সমান আগ্রহ বা দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ করতে পারেন না, তেমনি নারী পুরুষের ক্ষেত্রেও আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা ইত্যাদির তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক, এবং ঘটেও।

আর একটা কথা। সৃষ্টির পূর্বেকার দীর্ঘ পরিচর্যার কথা নিয়ে আমরা বড় বেশি মাথা ঘামাই না। ন্যায় অন্যায়ের কথা বলছি না। শুধুমাত্র যেটা ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। ফলটা কি হয়? নেপথ্যলোকে থেকে যারা তিল তিল করে সাধনার উপচার যুগিয়ে সাফল্যের তিলোত্তমা কারো হাতে তুলে দেন—সে নেপথ্য ঋণ কদাচিৎ স্বীকৃত হয়। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। তাই যত্নে রচিত হলেও যথার্থ ইতিহাস পাওয়া সুসাধ্য নয়।

ভারতের স্বাধীনতার সাধনার ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ ভেদ করতে আমার কুণ্ঠার শেষ নেই। তবু বিশেষ করে মহিলা সমাজের অবদান নিয়ে দু' একটি মাত্র কথা লিখতে ব্রতী হয়েছি। এ প্রচেষ্টা একান্তই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কেননা প্রকরণের অসুবিধা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ তথ্যও সহজ লভ্য নয়। লিখবার সুযোগও সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের মধ্যে আলোচনা সীমিত বলে আরও অসুবিধা।

'লিখতে পড়তে জানা'র শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গুরুত্ব দেওয়া হতো বলে মনে হয় না। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষিত মন গড়ে স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেককে কাজের মানুষ করে তোলার আয়োজন ছিল আমাদের ধর্মকর্ম তথা জীবন যাপনের পদ্ধতির মধ্যেই। তার মূল স্রোতটি ছিল আধ্যাত্মিকতার। বাইরের তথাকথিত কাঠিন্যের অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার ফল্গুধারা প্রবহমান ছিল। গান্ধীজি এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন "ভারতীয় সংস্কৃতি।" এখানে নারী পুরুষের কোন ভেদ ছিল না। একে অপরের

পরিপূরক। সামাজিক ও ধর্মীয় বহু আচার-আচরণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথভাবে পালনীয়। এটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের এই সংস্কৃতির প্রকাশ কখন থেকে রুদ্ধ হতে আরম্ভ হয় তা ঠিক করে নির্ধারিত হয় নি। তবে একদিকে লুণ্ঠনকারী মুসলমানের শক্তি ও পরবর্তীকালের ভোগপ্রমত্ত নবাবদের সুন্দরী নারীদেহের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির ফলে সুন্দর দেহধারী অভিজাত নারীসমাজকে গৃহাভ্যন্তরে চলে যেতে হয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে নবাবী কালচারের প্রসার ঘটেছিল। এই কালচার বা সংস্কৃতির ফল শ্রমবিমুখীন বিলাসপ্রমত্ত জীবন। শ্রমকর্মহীন জীবনে বৈচিত্র্য আনবার অবলম্বন ছিল নেশা ও নারী ; শিকার ও চক্রান্ত রচনা। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান বা নারী-পুরুষ সকলের দেহে পচনক্রিয়া সুরু হয়। আর তার পরিনতিতে একদল ইংরেজ বণিক এ দেশে ব্যবসা করতে এসে আমাদের ইহ জীবনের হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ে দাঁড়ালো।

এদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘকাল আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে ইতিহাস মোটামুটি আমাদের জানা। এ কাজে বিপুল সংখ্যক পুরুষের সঙ্গে বিস্তর নারী অংশ নেন। ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়ের পর স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশ গ্রহণ সহজতর হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও উনিশ শতকের শেষভাগে বোমা বন্দুকের তথা গুপ্ত আন্দোলনের যুগেও বহু নারী এসে দাঁড়িয়েছিলেন পুরুষের পাশে। সেই বিপুল সংখ্যক নারীর যে ক'জন মহিয়সী মহিলা ভাগ্যক্রমে পাদপীঠের আলোতে এসে পড়েছেন তাদের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তারা প্রতিনিধি-স্থানীয় বলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের অবদান বিশেষ একটি গুরুত্বের অধিকারী। এ ইতিহাস নানা জনে রচনা করতে যত্ন নিয়েছেন। সে প্রযত্ন এখনও অব্যাহত আছে। যাঁরা এ বিষয়ে জনমানসের শ্রদ্ধিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে সদ্য পরলোকগত স্বনামধন্য যোগেশচন্দ্র বাগল অন্যতম। তিনি যে তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন বস্তুত তাই অনুসরণ করে আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রয়াসী হয়েছি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা আসে দেশাত্মবোধ থেকে। পরাধীন দেশে দেশাত্মবোধও স্বাধীনতা সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দেশাত্মবোধের সমকালীন

ধারণার উন্মেষ ঘটে মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। এই যুগটাকে আমরা নব জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করেছি। স্বদেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়-গুলি আমরা নতুন এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। পরশাসনের প্রতি যেমন, তেমনি সমাজ-অভ্যন্তরের নানা অনাচার ও অবিচারের প্রতিও আমাদের ঘৃণা প্রকটিত হয়ে ওঠে। এই যুগের নারী সমাজের মানসিকতা পুরুষদের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না। পার্থক্য যা কিছু তা ঐ প্রকাশের ক্ষেত্রে। এই যুগে সাহিত্য সাধনায় নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করেই। এই সূত্রে স্বদেশজননীর চিন্ময় সত্তা তাদের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

স্বর্ণকুমারী দেবী সে যুগের সাহিত্যসাম্রাজ্ঞী বলে অভিহিতা ছিলেন। তাঁর রচনায় পাই :'

সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য ; করিলাম এ শপথ।
পরিছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্যা ধন্যা আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর পরাহত।

স্বর্ণকুমারীর দেশাত্মবোধ সাহিত্য সাধনা অতিক্রম করে নানা কর্মেও রূপ পরিগ্রহ করে। সখী-সমিতি, বিধবাশ্রম, শিল্পাশ্রম ইত্যাকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আজকের রাজনৈতিক পরিভাষায় ফ্রাটার্ণাল অরগানিজেশন বলা যেতে পারে। কন্যা সরলা দেবীর মধ্যে স্বর্ণকুমারীর ধ্যান-ধারণাদি যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সরলাদেবী সব্যসাচীর ন্যায় একহাতে সাহিত্য সাধনা করেছেন, অন্য হাতে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে লড়েছেন। তার সাহিত্য কর্মও দেশাত্মবোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। তার লেখার বিষয়বস্তু ও ভাষা সবই যেন আগুন ছড়াতো। 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' জাতীয় রচনারাজি সে দিন আগুন জেলে দিয়েছিল শত শত যুবজনচিত্তে। যার ফলে সরলা দেবীর সহায়তায় গড়ে ওঠে পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামচর্চার কেন্দ্র। এই সব কেন্দ্র থেকে দেশমাতৃকা পেয়েছেন পুলিন দাসদের ন্যায় বীর বিপ্লবী সন্তানদের।

উনিশ শতকের আয়োজন ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে বিশ শতকের গোড়াকার নানা ঘটনার মধ্যে। এই সময় আমাদের জাতীয় জীবনে বহু বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। তাই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বা সাময়িক ঘটনার প্রতি আমাদের মনোযোগ

পড়ে না। কিন্তু যখন নারীর অবদান পৃথক করে দেখবার প্রয়োজন হয় তখন এই সময়কার ঘটনাও আমাদের চোখে খুব বড় হয়ে ওঠে।

অরন্ধন ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা। এর উদ্গাতা যারাই হোন, যে নিষ্ঠার সঙ্গে দেশব্যাপী এই অরন্ধন ব্রত ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা উদ্‌যাপিত হয়েছিল নারী সমাজের সক্রিয় ও বার্ষিক সহযোগিতা ছাড়া কি কখনও সম্ভব হতো?

আর একজন, ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বিদেশিনী হলেও আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছেন। আমাদের ভাল-মন্দ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি। ভারতবর্ষের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে নতুন একটা শ্রদ্ধাযুক্ত মানসিকতাও তিনি সৃষ্টি করেন। জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাবোধ জাগ্রত করতেও নিবেদিতার অবদান অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দ ছাড়া অপর যে ভারতবাসী নিবেদিতাকে প্রভাবিত করেছিলেন তিনিও নারী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসঙ্গিনী জননী সারদাদেবী। আর এক ভগ্নী সাখাওয়াৎ। এই মুসলীম নারীর অতুলনীয় দেশাত্মবোধ এবং নারীশিক্ষা প্রচারকর্ম যথার্থ প্রচারের অভাবে স্বল্পজ্ঞাত। তাঁকে বাদ দিয়ে এ শতাব্দীর দেশাত্মবোধ সম্পর্কিত কোন রচনা শেষ হতে পারে না।

এ আলোচনা প্রস্তাবনা মাত্র। মিশনারী মহিলাদের এর আওতায় আনা হয় নি। যোগেশচন্দ্রের 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী' নামক পুস্তকে রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের প্রথম আবির্ভাব থেকে তার বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস সূত্রাকারে বিধৃত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিস্তর তথ্য পাবেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্বর্গত ডক্টর যদুনাথ সরকার যোগেশচন্দ্রের **Women's Education in Eastern India** গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন—

No proper study of the great social revolution which we call the Renaissance of India is possible without the works of......Jogesh Chandra Bagal...... .

উনিশ শতকের দেশাত্মবোধের, তথা—স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, তা নারীর হোক বা পুরুষেরই হোক, যথার্থ ভাবে জানতে হলে যোগেশচন্দ্রের রচনার মুকুরেই আমাদের জানতে হবে।

নবজাগরণের প্রস্ফুটনে সভা-সমিতি

ড. মল্লার ঘোষ

উনবিংশ শতক বাংলার নব জাগরণের যুগ। এই শতকের প্রথম পাদের শেষভাগে এই নব জাগরণের স্ফুরণ, ১৮৬০ পর্যন্ত গঠন-পর্ব এবং তারপর এর বিকাশ। নব জাগরণের প্রথম দিকটাকে, অর্থাৎ ১৮৬০ পর্যন্ত কালসীমাকে আমরা Transition Period—যুগ পরিবর্তনকাল আখ্যা দিতে পারি। বাংলার সৌভাগ্যক্রমে এই যুগ পরিবর্তনকালে বহু সংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি না করতে পারলেও এর উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন, আর তারা দেশে যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্যোতি, ধর্মজ্যোতি প্রকাশ হয়, যাতে দেশের কুসংস্কার, মূঢ়তা, মোহাচ্ছন্নতা, অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়, যাতে সমাজ-জীবন স্বচ্ছ দৃষ্টসম্পন্ন হতে পারে, কুরুচি ও অশোভনতা অপসৃত হয়, যাতে সমাজ নূতন পথে নির্বিবাদে চলতে পারে এবং স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাই-ই করে গেছেন। এই কাজগুলি গুরুতর নিঃসন্দেহ এবং সর্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যে তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। পরিবর্তনযুগে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হলেও লেখাপড়ার চর্চা বহুল পরিমানে বেড়ে যায়। বাংলা ও ইংরেজি—এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়। যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তাদের মধ্যে জন কয়েকের নাম না করলেই নয়। তাদের নাম করতে সকল বাঙ্গালীরই হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হওয়া উচিত। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম স্থাপনকর্তা, ইনি সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারক, এর বিদ্যা অগাধ, এর মতো দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেউ ছিল না। সমাজ যে ভাঙ্গতে বসেছে তিনি তা বুঝেছিলেন, সমাজ যে পথে যাবে তাও বুঝেছিলেন এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বাংলা গদ্যের একজন শিক্ষাগুরু এবং ব্রাহ্মধর্মের ঘোরতর বিরোধী, হিন্দু সমাজের মহামান্য ব্যক্তি, তখনকার একটি প্রধান বাংলা সংবাদপত্রের

সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গদ্য-পদ্য সাহিত্যের রচয়িতা, তৎকালীন সর্বপ্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক। অল্পবয়স্ক বিদ্বান বুদ্ধিমান সৎচরিত্র যুবকদের লেখক বা কবি হতে সাহায্য করেছেন তিনি। এরূপ অপর অনেকের কথা বাদ দিলেও, মনে রাখা দরকার দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথমে তার কাব্যশিষ্য ছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের উন্নতি তার জীবন-সাধনা ছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), কালীপ্রসন্ন সিংহ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বাঙ্গালীর প্রথম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, ডিরোজিও প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবই আমরা। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইনি তো একাই একশ'। বাঙ্গালী জাতিকে তাঁর দানের তুলনা নেই।

স্থূলতঃ, পরিবর্তন সময়ের কাজ এইগুলি:—ভাষার সৃষ্টি, গদ্যের সৃষ্টি, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক ইংরেজি ভাবের প্রচার, এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, সমাজকে নূতন পথে চালানো, বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ ও এতে উন্নতি, সাময়িক পত্র-পত্রিকার অগ্রগতি, বাংলা সাহিত্যের কোরকের উৎপত্তি। বস্তুত, এর থেকে আরও অনেক কিছু বেশী। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনও এই যুগে। এ যুগে ব্যক্তিবাদের স্থলাভিষিক্ত হল সঙ্ঘবাদ প্রয়োজনের তাগিদে। সমাজে সংসারে ভাঙ্গা-গড়ার পালা চলেছিল। যে যে পথের পথিক হন, যে-ভাবের ভাবুক হন, একক প্রচেষ্টায় কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবেনা, চাই সংঘবদ্ধ প্রয়াস—কী প্রগতিশীল, কী রক্ষণশীল - সকল উদ্যমী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই শুভ চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। সুরু হয়ে গেল তাই বিবিধ ধরণের সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা। এবং নানা রকমের সভা-সমিতি জন্ম নিল।

বাংলা নব জাগরণের বিকাশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের, কবি-সাহিত্যিকদের, সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যেমন, তেমনি এই যুগের সভা-সমিতিসমূহের অবদানও অপরিসীম। স্মর্তব্য—ঐ কালে ইংরেজি **Society, Association, Institute, Committee**—শব্দগুলির বাংলা করা হয়েছিল প্রথমে সমাজ এবং পরবর্তীকালে সভা বা সমিতি।

নব্য শিক্ষা তথা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন বঙ্গ সন্তানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশবাসীর কল্যাণকর বিবিধ কার্যে যত্নপর হন। সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস কী পরিমাণ ফলপ্রসূ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত তাদের সম্মুখে ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোন্‌স্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে প্রখ্যাত হয়েছিল। ঐ অষ্টাদশ শতকেই পাদ্রী উইলিয়াম কেরি গঠিত 'কৃষিসমাজ' বা 'কৃষি-উদ্যান বিষয়ক সমাজ' বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও উদ্যান রচনায় বাংলা দেশে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভিদ-প্রীতি ও কৃষি-জ্ঞান সঞ্চারিত করেছিল এর কার্যকলাপ। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি এখনও বেঁচে আছে সগৌরবে, ১৯৩৫ থেকে Royal Agricultural and Horticultural Society of India' এই নূতন নামে। নবযুগের বার্তাবহ রামমোহনের স্থাপিত 'আত্মীয় সভা'র সাফল্যও তাদের চোখের সামনে ছিল।

গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মস্থ হতে শিখেছিল। বেসরকারী হিন্দু কলেজে (আসলে, এটি প্রথম ছিল স্কুল) ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ চলে। আবার সরকারী সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনও সূচিত হয়। এই উভয়ের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সে যুগের বিভিন্ন সভা-সমিতির মারফৎ প্রকর্ষ লাভের সুযোগ পেল। এই সব সভা-সমিতির মধ্যে প্রথমে ১৮১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত **স্কুল-বুক সোসাইটির** নাম উল্লেখ্য। এই প্রতিষ্ঠানই নব্য শিক্ষার উপযোগী নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশে নিয়োজিত থাকে। বাংলা ছাড়াও, ইংরেজি ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রকাশ করত এই সংস্থা।

হিন্দু কলেজে ও রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় যুবক, যথা—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচরণ চন্দ্র প্রমুখ এবং ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন কতিপয় প্রবীণ, যথা—রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, আর কতিপয় সংস্কৃত পণ্ডিত, যথা—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রামজয় তর্কালঙ্কার মিলিত হয়ে স্থাপিত করলেন 'গৌড়ীয়

সমাজ' ১৮২৩-এ। সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও এই সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হন। সম্পাদক :— রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

এই সমাজ যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তার গুরুত্ব পরবর্তী কালের অন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রয়াসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এটির উদ্দেশ্য ছিল :—দেশবাসীর মধ্যে নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন ও নিরোধ কল্পে যত্নপর হওয়া; ঐ উদ্দেশ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা বের করা, প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি দ্বারা গ্রন্থাগার গঠন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার দশ-পনর বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় ইংরেজি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বিজ্ঞান পত্রিকা এবং ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, মানচিত্র, সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বঙ্গানুবাদ ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। এই সমাজের পক্ষে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-ইংরাজি অভিধান সঙ্কলন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সহায়তায় তিনি অনুবাদ সহ 'মনুসংহিতা'ও প্রকাশ করেন। বাংলা গদ্য সাহিত্য এ সময় সবে শৈশব পার হয়ে কৈশোরে পদার্পন করেছে।

সে যুগের নব্যশিক্ষিত যুবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিসমূহের মধ্যে **একাডেমিক এ্যাসোসিয়েসনই** সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিষ্ঠা ১৮২৮ সনে। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর উপদেশেই উক্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ এটি স্থাপন করেন। সভাপতি স্বয়ং ডিরোজিও; সম্পাদক—উমাচরণ বসু। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, শিবচরণ দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক এবং আরও অনেকে। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষানুযায়ী দেশের ও সমাজের হিতকর নানা বিষয়ই এই সমিতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যথা—স্বাধীন ইচ্ছা, অদৃষ্ট, প্রত্যয়, পবিত্র সত্য, গুণাবলী অনুশীলনে মহান কর্তব্য, পাপের নীচতা, স্বদেশ প্রেমের মহত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, পৌত্তলিকতার অসারত্ব, যাজনিক ব্যবস্থার ঘৃণ্যতা। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় স্বভাবতই যুবকদের মনে যুগপৎ প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা দিল। ছাত্রগণ কার্যত যে সকল আচরণ করতে

লাগল তাতে হিন্দু সমাজ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। খাদ্য-অখাদ্যে অনাচার, শ্রেণীভেদে আনাস্থা, সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একদিকে যেমন নতুন যুগের সূচনা করলে, অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল সমাজে তীব্র আলোড়ন উপস্থিত হল। স্বচ্ছ মনে বিচার করলে বোঝা যাবে প্রথাবদ্ধ সমাজবক্ষে এ ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। এই এ্যাসোসিয়েসানের সদস্যরা ১৮৩০-এ **'পার্থেনন'** নামে একখানা ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকায় 'ভারতবর্ষে ব্রিটিশের স্থায়ী ভাবে বসবাস,' 'বিচার আদালতে অনাচার' এবং 'স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'—এরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনা-প্রবন্ধ ছিল। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই কলেজ কর্তৃপক্ষ এটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

এই এ্যাকেডেমিক এ্যাসোসিয়েসানের আদর্শে কলকাতায় অন্যান্য শিক্ষায়তনের ছাত্ররাও কতকগুলি বিতর্ক সভা স্থাপন করেছিল। এই সময়ে যে সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার প্রাবল্য ঘটে, মধ্যে মধ্যে স্তিমিত হলেও তা সক্রিয় হয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে।

রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও হিন্দু স্কুলের তৎকালীন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় **'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'** ১৮৩২-এ, জ্ঞান বিজ্ঞানসমূহের 'গৌড়ীয় ভাষায় উত্তমরূপ আলোচনার্থে'। সভাপতি হন রমাপ্রসাদ; সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর বয়স এ সময় মাত্র পনর বছর। এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসনের বক্তৃতাদি চলত ইংরেজিতে, এখানে বাংলার মাধ্যমে। এটি পুরোপুরি ছাত্রদের সাহিত্যসভা। ঐ কালে যে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অগ্রসর হল, এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 'ধর্ম'ও ছিল।

খ্রীঃ ১৮৩৩ সনে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের (পরবর্তীকালে, সম্বাদ ভাস্করের সম্পাদক) সভাপতিত্বে জন্ম নিল **'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'**। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, রামলোচন ঘোষ, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়) প্রমুখ সাহিত্যিক ও বিদ্যোৎসাহীরা। এতে 'ধর্ম' আলোচনা নিয়ম বহির্ভূত ছিল। এটি প্রথমে সাহিত্যমূলক সভা ছিল, পরে রাজনৈতিক সভায় পরিণত হয়ে পড়ে।

এই সভায় আলোচিত কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিষয়, যথা—'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ' সাধারণের মনকে আলোড়িত করেছিল।

দুই-তিন বছরের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্য কলকাতায়, কলকাতার আশে-পাশে এবং ঢাকা শহরেও বেশ কিছু সভা-সমিতি গঠিত হয়েছিল। 'বঙ্গ রঞ্জিনী সভা', 'প্রবোধ উজ্জ্বল সভা', 'শুভদা সভা' এবং ঢাকার 'তিমির নাশক সভা' প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসানের সদস্যগণ ইতঃমধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হলেও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার উপকারিতা ভুলতে পারেন নি। তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা ভেবে আবার তারা গঠন করলেন খ্রীঃ ১৮৩৮ সনের প্রথম দিকে **'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'**। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ দে ইত্যাদি হলেন এর উদ্যোক্তা। এই সভাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সমাজের কল্যাণ সাধনে রত থাকে এবং খ্যাতিও অর্জন করে। বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বাংলা ভাষায় বাঙালী কর্তৃক এই সভাতেই প্রথম ব্যক্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটির রচয়িতা সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের তৎকালীন সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য। এতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই আলোচিত হত।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপিত হবার কিঞ্চিদধিক দেড় বছর পরে **'তত্ত্ববোধিনী সভা'** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহকর্মী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দশজন যুবকের দ্বারা। প্রথমে এটির নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা', দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই এর নাম করা হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। জাতীয়তার ব্যাপক ও উদার আদর্শ নিয়ে এই সভাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হল। যোগেশচন্দ্র বলেন, "গৌড়ীয় সমাজ, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রভৃতির মধ্যে যাহার বীজ উপ্ত ছিল, এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসান এবং অনুরূপ ছাত্র ও যুব সভাসমিতির ভিতরে আমরা যে সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইল এই তত্ত্ববোধিনী সভা।"

এখানেও নব্য শিক্ষিতরাই সক্রিয়, কিন্তু এ সময়ে তাদের ভাবাদর্শ কাল ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে একটি জাতীয় আকার পরিগ্রহ করার সুযোগ পেল। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, এই সভার দ্বারা জাতীয় শিক্ষায়তন (তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা) প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার এবং সর্বোপরি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ শুধু বাঙালী সমাজের নয়, সর্বভারতীয় সমাজেরও অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর উপকার করেছে।

১৮৫০-এ, কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ও বাঙালী মনীষীদের প্রচেষ্টায় প্রসূত **বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ** (Vernacular Translation Society) সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালী সমাজের নর-নারীর জ্ঞান বর্ধন ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হল। উদ্যোক্তা ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন বীটন, গ্রোট, উড্রো, মার্শম্যান প্রভৃতি ; বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলরাম দত্ত প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হত। এই প্রতিষ্ঠানই সহজবোধ্য ভাষায় রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ, শেক্সপিয়রের নাটকের গল্পগুলির অনুবাদ, লর্ড ক্লাইবের জীবন চরিত (বাংলায়) এবং অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ সুলভ মূল্যে সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান বাংলা বই প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা স্বল্প শিক্ষিত নর-নারীর চিত্তকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী করে-তুলতে সাহায্য করেছিল। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, পাদ্রী লঙ যুক্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা গ্রহণকারী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর (১২ আগষ্ট, ১৮৫১) অল্পকাল পরে তারই নামে **কলিকাতা বেথুন সোসাইটি** গঠিত হয়। সমাজে শীর্ষস্থান অধিকারী উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনারই শুধু ব্যবস্থা করা হল না এতে, যাতে আলোচনা-প্রসূত সদর্থক বস্তুকে জীবনে তারা প্রয়োগ করেন—তা-ও এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ক নানা রকম আলোচনার দ্বারা স্থায়ীভাবে বঙ্গীয় সমাজের কল্যাণ সাধনই ছিল সোসাইটির লক্ষ্য। এই সোসাইটি গঠিত হবার মূলে ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক এবং তৎকালীন শিক্ষা সমাজের

(Council of Education) সম্পাদক ডাঃ জে. মৌএট। এর প্রাথমিক সদস্যরূপে যে ২৪ জন গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙ্গালী ছিলেন তাদের মধ্যে ইংরেজ ৫ জন: মৌএট স্বয়ং, পাদ্রী লঙ., মার্শাল, স্প্রষ্টার, ক্লিণ্ট; আর ১৯ জন বাঙ্গালী: রে. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাশচন্দ্র বসু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্যারীচরণ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রসন্নকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র দত্ত হরচন্দ্র দত্ত এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

পূর্বেকার সভা-সমিতি অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল এটি স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৮১, ১৯-এ এপ্রিল তারিখের অধিবেশনে যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ 'গান ও ভাব' শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। (ভারতী, ১২০৮, পৃঃ ৬৯)। ১৮৮৮ সন নাগাদ একটি অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল "The Present Social Re-action" নামক একটি প্রস্তাব পড়েছিলেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্য, বাংলা কবিতা, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত ভাষা ও গদ্য সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিদ্যুৎ, জ্যোতিষ, শারীর তত্ত্ব টেলিগ্রাফ, আইন-কানুন, সমাজ-ব্যবস্থা, মাদক দ্রব্য নিবারণ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বর্তমান সভ্যতা, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ, বিজ্ঞানের উন্নতির নানা পর্যায়, চীন দেশ ও চীন জাতি, বাংলার ভূমিবন্টন ব্যবস্থা, বাংলার কৃষি সম্পদ, বাংলার নারী সমাজ, স্ত্রী শিক্ষা, শরীর-চর্চা, বঙ্গ বিদ্যালয় ও বাংলা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করা হত এখানে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৩-র একটি মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সরকারী ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল ই. গুডউইন ২রা মার্চ, ১৮৫৪, তারিখের অধিবেশনে "Union of Science, Industry and Art" নামে পঠিত প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান, শিল্প এবং কলা—এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজ-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। এর ফলে, কলকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল। এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তীকালে 'গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্'-এ পরিণত হয়।

কালক্রমে উহাই সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করেছে। বেথুন সোসাইটি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র রূপে সমাজ-চেতনা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষে সহায়ক হয়েছে।

বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত কর্ণেল গুডউইনের "Union of Science, Industry and Art" বিষয়ক বক্তৃতার ফলশ্রুতিরূপে মাসখানেকের মধ্যেই গঠিত হল **'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা'**। সভাপতি হলেন গুডউইন এবং সম্পাদক হডসন প্র্যাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। উদ্দেশ্য : শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হতে বিলম্ব হয় নি।

এতদতিরিক্ত, সাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ বৃদ্ধিকল্পে তৎপর হল এই সভা। এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ১৮৫৫ সনে জানুয়ারী মাসে 'শিল্প প্রদর্শনী' করা হয়। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবে চারু ও কারুশিল্পের কাজ করতে লেগেছে। তথাপি তাদের কাজের নমুনা এই শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান পেল। বাঙ্গালী প্রধানদের গৃহে সংরক্ষিত চিত্রাদি এবং সাধারণ ব্যক্তিদের শিল্পকর্মের বহু নিদর্শনও এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে এটিই বোধ হয় প্রথম শিল্প প্রদর্শনী।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৮৫৪-র ডিসেম্বর মাসে **সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি** স্থাপিত হয়। নাম থেকেই প্রকাশ, সমাজের উন্নতি সাধনে সমবেতভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই এই সমিতির উদ্দেশ্য। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, বহু-বিবাহ প্রচলন নিরোধ—এই সব এর মুখ্য কার্যসূচী ছিল। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে আইন সিদ্ধ করাবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। অন্তর্জলী প্রথার বিলোপেও এই সমিতি অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্য চর্চার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৫৩ সনে। তার দু' বছর পরে, ১৮৫৫-তে, সেটিই **'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'** নাম ধারণ করে। সমাজসেবা এই প্রতিষ্ঠানটির একটি অঙ্গ থাকলেও, বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলন এবং সাহিত্যসেবীদের বিবিধ উপায়ে উৎসাহ ও সাহায্য দানই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য। এর অধিবেশনে কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বরচিত কবিতাদি পাঠ করতেন তো বটেই, আবার প্যারীচাঁদ

মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সুধী সাহিত্যিকবৃন্দ এখানকার সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন; তারা এটির সভ্যও ছিলেন।

সভার একখানি মুখপত্র ছিল—'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকায় প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্য সেবীদের উৎসাহ দানে রত থেকে এই সভা বাস্তবিকই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও এই সভা অভিনন্দিত করেছিল।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার নেতৃত্বে খ্রীঃ ১৮৫৬ সনে কলকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে কলকাতার নব্য শিক্ষিত ধনী সন্তানগণ নিজ নিজ আবাসে, যেমন—আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) ভবনে, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতে রঙ্গালয় স্থাপনে অগ্রসর হন। পাইকপাড়া সিংহদের নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বউবাজার নাট্যশালা প্রভৃতিও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সখের নাটমঞ্চের পরবর্তী ধাপরূপে খ্রীঃ ১৮৭২ সনে সাধারণের প্রবেশ-অধিকার দিয়ে (অবশ্য, টিকেটের বিনিময়ে) ন্যাশনাল থিয়েটার জন্ম নিল।

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারে এই সভা আন্তরিকতার সঙ্গে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। প্রথম প্রথম যারা বিধবা নারীকে বিবাহ করবেন তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করেছিল এই সভা। কলকাতার সামাজিক জীবনকে শুদ্ধ-সংযত করার নিমিত্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভা একাধিক উপায় অবলম্বন করেছিল।

১৮৬৩-র কথা। যোগেশচন্দ্র লিখছেন: "এতদিন পর্যন্ত নব্যশিক্ষিতেরা নিজেদের কল্যাণমূলক বিষয়ের আলোচনা-গবেষণায় রত ছিলেন। প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতার মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের আলোচনা চলিত, কিন্তু ক্রমে তাহারা কার্যেও অগ্রসর হইলেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হইতে তাহারা বিশেষভাবে কর্মে লিপ্ত হন। এই সময়কার নবলব্ধ ভাবধারা কার্যে সহায় হয়। আর ইহার ফলে বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা—জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি পরিপূর্তি লাভ করিতে থাকে। সমাজের অর্ধেক অংশ নারী। নারী সমাজের শিক্ষা ও সাহিত্যমূলক সর্ববিধ কর্মের সূচনাও হয় এই দশক থেকে।"

এ যাবৎ বালিকারা দশ-এগার বছর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারত। এর পরই তাদের বিয়ে হয়ে যেত। যতটুকু শিক্ষা লাভ করতে পারত, তা গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে তারা নিরক্ষরের পর্যায়ে পড়ত। পরিবার বা সমাজের কোন কাজে লাগত না তাদের শিক্ষা। খ্রীঃ ১৮৬৩ সনে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে **'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'** প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভার কার্যসূচীর বিশেষ একটী বিধান ছিল 'নারীজাতির উন্নতি সাধন'। প্রচলিত স্ত্রী শিক্ষার পরিপূরকরূপে এই সভার সভ্যগণ কর্তৃক বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার্থে **'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা'** গঠিত হয়। এই সভার সম্পাদক হরলাল রায়ের ভাষায় " ... এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণের বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবে। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।" কয়েকটি বালিকা পুরস্কার পেয়েও ছিল। ১৮৭১-এর ১লা এপ্রিল থেকে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর ভার অর্পিত হয় বামাবোধিনী সভার হস্তে।

উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হেমন্তকুমার ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ) প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবনেতা উদ্যোগী হয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন **'বামাবোধিনী সভা'**। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল মূলত চারটি :—(১) দেশীয় নারীগণের মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ; (২) শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা ; (৩) বাঙ্গালী পরিবার সমূহে বয়স্ক স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন, এবং (৪) নারীজাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাহায্যদান। সভার আনুকূল্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় **বামাবোধিনী পত্রিকা** প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পত্রিকায় কেবলমাত্র মহিলাদের রচনাই প্রকাশিত হ'ত।

এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষাপ্রণালী—উচ্চ শিক্ষা, লোক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি, স্বাস্থ্য: আধি-ব্যাধি, আইন-কানুন, আমোদ-প্রমোদ, ভাষা-সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, অপরাধ ও অপরাধী, কারাগার ও কারাবিধি, কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা—এক কথায়

সমাজ-জীবনের সবদিকেরই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যেই ১৮৬৬-এ ইংলণ্ডের National Association for Cultivation of Social Science in Great Britain—এর আদর্শে **বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা**-র প্রতিষ্ঠা। ইংলণ্ডের খ্যাতনাম্নী সমাজ সংস্কারিকা মিস্ কার্পেণ্টার পাদ্রী লঙ্-এর অনুরোধে গভর্ণমেণ্টের অনুদান নিয়ে এটিকে গড়লেন। সমাজ-উন্নয়নমূলক বহুবিধ কার্যে এই সভার সভ্যগণ মন নিবিষ্ট করেছিলেন। এই সভার প্রথম সভাপতি : ডব্লু. এম. সীটনকার : সম্পাদক : এইচ্. বিভার্লি ও প্যারীচাঁদ মিত্র। আবদুল লতিফ খাঁ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, শ্যামাচরণ সরকার, কৈলাশচন্দ্র বসু, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষিগণ এখানে আইন-কানুন, শিক্ষা, সাহিত্য, পাল-পার্বণ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, কুমারী কার্পেণ্টার ১৮৭৫ সনের শেষে দ্বিতীয়বার এ দেশে এসে এর সভায় "Prison Discipline and Reformatory Schools" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান কালে সেখানকার জনহিতকর কার্যাবলীর পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসেই সুহৃদবর্গের সঙ্গে পরামর্শান্তে কালবিলম্ব না করেই **"ভারত সংস্কার সভা"** স্থাপন করলেন। উদ্দেশ্য :—"To promote the Social and Moral Reformation of India"—ভারতবর্ষের সামাজিক এবং নৈতিক সংস্কার সাধন করা। সভাপতি : কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক : গোবিন্দচন্দ্র ধর। দ্বিতীয় বছরে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হন।

উক্ত ব্যাপক উদ্দেশ্য কার্যে রূপায়িত করবার জন্য সভা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হল। এই শাখাগুলি যথাক্রমে (১) স্ত্রী-জাতীর উন্নতি (২) শ্রমজীবীদের শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যালয়, (৩) সুলভ সাহিত্য প্রকাশ (৪) মাদক দ্রব্য নিবারণ এবং ৫) দাতব্য।

প্রত্যেকটি শাখারই যথারীতি কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। স্ত্রী-জাতির উন্নতি বিভাগ একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন খ্রীঃ ১৮৭১-এর ডিসেম্বরে। বিভাগটির অধীনে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'

ভারত-সংস্কার সভার স্ত্রী শাখার মুখপত্র হল। **শ্রমজীবীদের শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যালয়ঃ** এই শাখার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৭০ সনের নবেম্বরে। শ্রমজীবীদের ইংরেজী ও বাংলা এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের কারুশিল্প শিক্ষাদান—এই শাখার কার্য। বিদ্যালয়ও দু'টি; প্রথমটি নৈশ, দ্বিতীয়টি প্রাতঃকালীন। নৈশ বিদ্যালয়ে কারিগর, দোকানদার, ভৃত্য প্রভৃতিকে সন্ধ্যা ৭ হইতে ৯ টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পড়ান এবং কারিগরি বা শিল্পবিদ্যালয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের ছুতারের কাজ, সেলাই, ছবি-আঁকা, ঘড়ি মেরামত, মুদ্রণ কার্য, লিথোগ্রাফি ও এনগ্রেভিং শিখান হত। ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুলভ সাহিত্য প্রকাশ বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর আগে এক পয়সায় এরূপ সুসম্পাদিত পত্রিকা কখনই প্রকাশিত হয় নি। ভাষাও ছিল সহজ, সরল। এই দিক দিয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকের ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' কাগজের অগ্রজ বলা যায় একে। বাঙ্গালী জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সহজভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হত এতে। এই পত্রিকাই, বোধ হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা সর্বপ্রথম সাধারণের নিকট প্রকাশ করে। 'মাদক দ্রব্য নিবারণ' বিভাগের উদ্দেশ্য—সুরাপান ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য পান করা থেকে লোককে বিরত করা। পুস্তিকা প্রকাশ ও বক্তৃতা দানে মাদকদ্রব্য পানের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করান হতো। এই শাখা থেকে ১৮৭১ সনে "মদ না গরল" নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হতে থাকে। 'দাতব্য' বিভাগ দরিদ্র ও নিঃসম্বল ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক দিয়ে বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা অন্ধ-খঞ্জ-বধিরকে আর্থিক সাহায্য, বিধবা পিতৃহীন শিশু এবং দুঃস্থ ভদ্র পরিবারকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তিদান এবং অনাথ-আতুরকে ঔষধপত্রাদি বিতরণ করত।

এই পাঁচটি বিভাগ ছাড়া 'ভারত সংস্কার সভা' আরও কতকগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করে, যেমন—পতিতাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় বন্ধ ও জুয়াখেলা নিবারণ প্রভৃতি।

কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় 'ভারত সংস্কার সভা'র শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বামা

যোগেশচন্দ্র বাগলের রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস

যোগেশচন্দ্রের প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা বর্ণনানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের নামের পাশেই যে যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার নাম এবং সন তারিখ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। শত প্রচেষ্টা সত্বেও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

নিম্নে রচনাপঞ্জীর সূচী :

ক. বাংলা গ্রন্থ

খ. সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ

গ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

ঘ ইংরাজী-গ্রন্থ

ঙ. সম্পাদিত গ্রন্থ

চ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনা

ছ. প্রকাশের অপেক্ষায় সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি

ক. বাংলা গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)

১. **আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন**। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। [সাহিত্য সাধক-চরিতমালা নং-৯৫] পৃঃ. ৭০।

২. **উইলিয়ম ইয়েট্স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত**। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। [সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং-৯৬] পৃ. ৯১।

৩. **উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ**। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭০। [সাহিত্যসাধক-চরিতমালা নং-৯৮] পৃ. ৬০।

৪. **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা**। কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৮ পৃ: ৵৹ (৪), ২৩৯। সচিত্র।

ভূমিকা: সজনীকান্ত দাস।

সূচিপত্র: দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামলোচন ঘোষ। রুস্তমজী কাওয়াসজী। ডেভিড হেয়ার। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তারাচাঁদ চক্রবর্তী। রসিককৃষ্ণ মল্লিক। রাধানাথ শিকদার। ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন। সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। ভগবানচন্দ্র বসু। জেমস্ লঙ্।

পরিশিষ্ট: ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। আনন্দমোহন বসু। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অনুষ্ঠান পত্র।

৫. **কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র**। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৬৬। পৃ. ৷৵. ২৬৪। সচিত্র।

ভূমিকা: শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচিপত্র: [আমার কথা]। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি। ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। টাউন হল। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ। কৃষি সমাজ। মাধ্যমিক পাঠশালা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। হেয়ার স্কুল, ডাফসাহেবের স্কুল। স্কটিশ চার্চ কলেজ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। মেটকাফ হল। শীলস্ ফ্রী-স্কুল। বেথুন স্কুল ও কলেজ। প্রেসিডেন্সি কলেজ। কলা মহাবিদ্যালয়। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। সেনেট হল। এ্যালবার্ট হল। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ। সায়েন্স কলেজ। বসু বিজ্ঞান মন্দির। নির্ঘণ্ট।

৬. **কেশবচন্দ্র সেন**। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৫ [সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ৯৭] পৃ. ১২৮।

৭. **জগৎ কোন পথে**। (কিশোরদের জন্য) কলিকাতা, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৪৬। পৃ. ১৯২। সচিত্র।

সূচিপত্র: জাগ্রত ভারত। সীমান্তের পরে—(১) শ্যাম (২) আফগানিস্থান ৩) ইরাণ। বেদুইনের দেশে। নব্য তুর্কী। ইউরোপের আতঙ্ক—(১)

হেবর্সাই সন্ধি (২) ইটালী (৩) জার্মানী (৪) বৃহত্তর জার্মানী। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ—(১) ফ্রান্স (২) ব্রিটেন (৩) সোভিয়েট রুশিয়া। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা (১) চীন (২) জাপান (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরিশিষ্ট (ক) ও (খ)।

৮. **জাগৃতি ও জাতীয়তা**। কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৬।

পৃ. ৵. ২০১।

সূচিপত্র: ভূমিকা। জাগৃতি॥ পশ্চিমের সংস্রব ও বাঙ্গালী চিত্তে প্রতিক্রিয়া। বঙ্গের সংস্কৃতি চর্চা ও নবজাগৃতি। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা। জন-জাগরণে পত্র-পত্রিকা। জাতীয়তা॥ জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ। জাতীয় শিক্ষার কথা। ভারতীয় পটভূমিকায় বাংলার জাতীয়তা। বাংলার নব যুগের কথা। রাজনীতির আবর্তে বাংলা। নির্ঘণ্ট।

৯. **জাতি বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ**। কলিকাতা, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫৩। পৃ. ।৵, ২২৪। সচিত্র।

ভূমিকা: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সূচিপত্র: মোট তেরটি অধ্যায়।

পরিশিষ্ট: (ক) বাঙ্গালীর চরিত্র বিশ্লেষণে রাজা রামমোহন রায়। (খ) ইংরেজী শিক্ষার ফল (গ) প্রজা বিদ্রোহ ও সরকারী নীতি (ঘ ইলবার্ট বিলে—বিহারীলাল গুপ্তের মন্তব্য লিপি।

১০. **জাতির বরণীয় যাঁরা**। কিশোরদের জন্য) কলিকাতা, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫০। পৃ. ৵., ৮৫।

সূচিপত্র: (১) রায়গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ। স্বধর্মনিষ্ঠ দম্পতি—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতা-মাতা। স্থিতপ্রজ্ঞা নারী—জর্জ ওয়াশিংটনের জননী। আদর্শ জননী—নেপোলিয়নের মাতা। জাতির বরণীয়—১) বিদ্যাসাগরের জনক-জননী। (২) সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী (৩) সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জনক-জননী। জাতির স্মরণীয়: প্রেসিডেন্ট মার্সারিক কামাল আতাতুর্ক, লেলিন, মুসোলিনী, হিটলার, চিয়াংকাইশেক ও মহাত্মা গান্ধীর জনক-জননী।

১১. **জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী**। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪ খ্রীঃ। [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ১১২] পৃ. ৫৮ [৬]।

সূচিপত্র : ভূমিকা। রাজনীতিতে বঙ্গনারীর যোগদান। সরলা দেবী। স্বদেশী আন্দোলন। নারী ও বিপ্লবী দল। স্বদেশী আন্দোলনের ফল। সরোজিনী নাইডু। রাজনীতির নূতন রূপ। অসহযোগ প্রচেষ্টা। প্রস্তুতি। আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন। বিপ্লব কার্য। কর্তব্য ও দায়িত্ব। আগষ্ট বিপ্লব ১৯৪২। আগষ্ট বিপ্লবের পরে।

১২. **জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত**। কলিকাতা, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫২। পৃ. ||., ১১২।

সূচিপত্র : প্রথম অধ্যায়—পূর্বাভাষ। জাতীয় মেলার জন্মকথা এবং প্রথম তিনটি অধিবেশনের বিবরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ন্যাশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা। পরবর্তী তিনটি অধিবেশনের কথা। তৃতীয় অধ্যায়—পরবর্তী কার্যকলাপ—বারুইপুরের মেলা। ন্যাশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়। ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা। সপ্তম অধিবেশন। চতুর্থ অধ্যায়—জাতীয় সভার কার্যক্রম। 'মহাব্যায়াম প্রদর্শন'। নব গোপাল মিত্র। অষ্টম অধিবেশন। ষষ্ঠ অধ্যায়—পরবর্তী কার্য, পরবর্তী অধিবেশন সমূহ। জাতীয় সংগীত। পরিশিষ্ট : তৃতীয় অধিবেশনের বিশদ বিবরণ। দিল্লীর দরবার। রাজনারায়ণ বসু রচিত অনুষ্ঠান পত্র।

[বি. দ্র. উক্ত পুস্তকটির নূতন সংস্করণ পরে 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' নামে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। ইহার পরিমার্জিত সূচিপত্র 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।]

১৩. **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর**। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫২। [সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং ১৫] পৃ. ১১২।

১৪. **নারী উন্নয়ন**। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, প্রকাশন উপসমিতি, ১৯৬৯ খ্রীঃ। [গান্ধী শতাব্দী পুস্তকমালা নং-৫] পৃ ৪৭।

১৫. **বঙ্গসংস্কৃতির কথা**। কলিকাতা, দি ওয়ার্লড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০ খ্রীঃ। পৃ. [১০], ১৭১।

সূচিপত্র : জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা : কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা—লাইব্রেরীর প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব, লাইব্রেরির রূপান্তর : ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর আবির্ভাব। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয় : পূর্বাভাস—শিল্প বিদ্যালয়ের জন্ম কথা—প্রথম বৎসর -

পরবর্তী দেড় বৎসরের কথা—ক্রমিক বিবর্তন। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা।

১৬. **বরণীয়**। কলিকাতা, এ. মুখার্জী, ১৩৬৬। পৃ. দ. ২৪৪।

সূচিপত্র : ভূমিকা। গুরু মহাশয়। তিনজন শিক্ষাব্রতী। অশ্বিনীকুমার দত্ত। কামাখ্যাচরণ নাগ। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। জগদীশচন্দ্র বসু। অবলা বসু। প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মেঘনাদ সাহা। রবীন্দ্রনাথ। নেতাজী। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্র পাল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। যদুনাথ সরকার। হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। রামনাথ বিশ্বাস। স্মৃতির মণিকোঠায় : চণ্ডীচরণ বিশ্বাস। নিশিকান্তের মা। জলধর সেন। রামকমল সিংহ। সুরেশচন্দ্র দেব। কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাধাচরণ চক্রবর্তী। বটুকদেব মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পিতৃদেব।

১৭. **বাংলার উচ্চ শিক্ষা**। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪ খ্রীঃ। [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং-১০৪] পৃ ৬০।

সূচিপত্র : ভূমিকা। উচ্চ শিক্ষার আয়োজন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্ধারণ। সরকারী শিক্ষা নীতির মৌলিক পরিবর্তন। উচ্চ শিক্ষা। খ্রীষ্টান বিরোধী আন্দোলন ও সরকার। উচ্চ শিক্ষার নূতন পর্ব। উচ্চ শিক্ষার ফলাফল।

১৮. **বাংলার জনশিক্ষা** (১৮০০-১৮৫৬)। কলিকাতা। বিশ্বভারতী, ১৯৪৯ খ্রীঃ। [বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ৭৬]।

সূচিপত্র : ভূমিকা। জন শিক্ষায় লর্ড ময়রা। রবার্ট মে-র পাঠশালা। শ্রীরামপুরের পাঠশালা। বর্ধমানের পাঠশালা। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যারম্ভ। সোসাইটির পরবর্তী কার্যক্রম। সোসাইটির পরিণতি। কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয়। মফঃস্বলে জন শিক্ষার প্রসার। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট ও তাহার পরিণাম। হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলার পাঠশালা। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। হার্ডিঞ্জ স্কুলসমূহ। জন শিক্ষায় সরকার।

১৯. **বাংলার নব জাগরণের কথা**। কলিকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, পৃ ২০৩, এ।

সূচিপত্র : বাংলার নবজাগরণের কথা। বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারী সমাজ। বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমান।